বয়কট
আবিসিনিয়া
কাবা
সীরাহ
মুহাম্মাদ ﷺ
মুহাজির
আবু বকর
জাহিলিয়াহ
আনসার
তায়িফ
কুরআন
বদর
মেষপালক
দাওয়াহ
মক্কা
ইবরাহীম

প্রথম খণ্ড

রেইনড্রপস কোনো বিশেষ দল, আন্দোলন বা চিন্তাধারার সাথে জড়িত নয় এবং তাদের প্রকাশিত কোনো কন্টেন্ট বা মতাদর্শ প্রচার করে না। কোনো পাঠক কিংবা শ্রোতা যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এধরনের কোনো সংযোগ স্থাপন করেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেটা একান্তই তার ব্যক্তিগত মতামত যা রেইনড্রপস সমর্থন, সত্যায়ন বা স্বীকার করে না।

রেইনড্রপস

প্রকাশিত

সীরাহ্

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক ▪ জিম তানভীর

প্রথম প্রকাশ ▪ জুমাদা আস সানী ১৪৩৭ হিজরি,
ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ ▪ রবিউস সানী ১৪৩৭ হিজরি,
মার্চ ২০১৮ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ▪ আনিকা [illegible]

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ▪ ২৫০ টাকা

www.raindropsmedia.org
www.facebook.com/raindropsmedia
rdmedia2014@gmail.com

শারঈ সম্পাদনা: শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবন জাকির

ISBN: 978-984-34-0250-9

بسم الله الرحمن الرحيم

সীরাহ্

প্রথম খণ্ড

সূচিপত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর নগণ্য কিছু বান্দাকে তাঁর শ্রেষ্ঠতম বান্দার জীবনকথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন এমন একজন, চৌদ্দশ বছর পরেও যাকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি। যারা তাকে জেনেছে, তারা তাঁকে ভালোবেসেছে; যত বেশি জেনেছে, তত বেশি ভালোবেসেছে। যারা তাঁকে জানেনি, তাঁরা ভালোবাসার নদী দেখলেও মহাসমুদ্র দেখেনি। না-দেখেও যাকে পৃথিবীর মানুষ সবচাইতে বেশি ভালোবেসেছে, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

গল্পের নায়কদের কথা মানুষ খানিক বাদেই ভুলে যায়, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের প্রভাব টিকে থাকে বড়জোর কয়েকটা বছর, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একজন যাকে এত বছর পরেও লোকেরা ভালোবাসে, তাঁর অনুসরণ করে, তাঁর সম্মানে নিজের জীবন দিয়ে দেয়। জীবদ্দশায় আবু জাহেলরা তাঁকে ভয় করতো, মৃত্যুর পরে আবু জাহেলের উত্তরসূরিরা তাঁর অনুসারীদের ভয় করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, যে জাতির কাছে 'মুহাম্মাদ' ﷺ আছে, সে জাতিকে আজ টং এর মামা থেকে শুরু করে বারাক ওবামা – প্রত্যেকেই দিকনির্দেশনা দিতে ব্যতিব্যস্ত। মুসলিমদের আজকে অমুসলিমরা ইসলাম শেখায়, উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির সবক দেয়। বিষয়টা লজ্জা আর গ্লানির।

আমরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ চিনলেও তাঁকে আমরা জানিনা। জানিনা বলেই তিনি কারো কাছে নিছক একজন 'ভালো মানুষ', আর দশজন মনীষির মতো, যারা কিনা কিছু দার্শনিক তত্ত্ব আর নীতিকথা বলে খালাস! কিংবা কারো কাছে তিনি একজন 'ধর্মপ্রচারক', কিছু ভালো ভালো কাজ করেছেন, এই যা!

কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন রাসূল। তিনি একটা গ্লোবাল মিশন নিয়ে এসেছিলেন এবং আমরা সেই মিশনের অংশ। আল্লাহ এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পথ দেখানোর জন্য। তিনি মানুষকে সেই পথ দেখিয়ে গেছেন যে পথ খুঁজে পেতে আমাদের বুদ্ধিজীবী-দার্শনিক-বিজ্ঞানী-আমলারা মাথা কুটে মরে, কিন্তু সমাধান খুঁজে পায় না।

এই সমস্যার একটিই সমাধান। তা হলো রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানা। আর জানার জন্যই তাঁর সীরাহ পড়া। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ব্যক্তি জীবন, তাঁর

নবুওয়াত, তাঁর নেতৃত্ব এবং তাঁর চারপাশের মানুষগুলো নিয়ে একটি চমৎকার কাহিনীপ্রবাহ। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ পড়লে ইনশা আল্লাহ, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সংকীর্ণ ধারণার দেয়ালগুলো ভেঙে যাবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন সম্পর্কে জানলে, ইসলামবিদ্বেষীদের প্রোপাগান্ডা শুনে আমাদের মনে যে 'খচখচ' হয় সেটা দূর হয়ে যাবে, বিইযনিল্লাহ। আমরা জানব রাসূলুল্লাহ ﷺ কত চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কারো মন জয় করতেন, কাউকে রুখে দিতেন, আর কাউকে মোকাবিলা করতেন। নিজের ঘর থেকে শুরু করে যুদ্ধের ময়দান – প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। যারা তাঁকে ভালোবেসেছে, তাদের জীবন আমূল বদলে গেছে, যে জাতি তাঁর অনুসরণ করেছে, তাদের ভাগ্য বদলে গেছে। এমন একজন মানুষ সম্বন্ধে যদি আমরা না জানি, না মানি, তাহলে তো আমরাই 'মিস' করলাম!

আদর্শিক দৈন্যতার কারণে ইতিহাস বলতে হয়তো আমরা ৫২ বা ৭১ এর আগে কিছু চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের ইতিহাসের সামনে সকল ইতিহাসই ম্লান। পৃথিবীর যত বিপ্লব, তার সবক'টা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কিছু পরিবর্তন করে কয়েক দশক বা সর্বোচ্চ কয়েক শতক পরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কিন্তু যে বিপ্লবের সূচনা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, সেটা চলবে ততদিন, যতদিন না মুসলিম জাতির সমগ্র পৃথিবীর উপর বিজয়ী হবে।

বাংলা ভাষায় রাসূলুল্লাহর ﷺ একাধিক সীরাহ থাকা সত্ত্বেও আমরা এই সীরাহতে হাত দিয়েছি মূলত দুটি কারণে। একটা হলো, মুসলিমরা সীরাহকে গল্প হিসেবে পড়ে, কিন্তু সেখান থেকে কিছু শেখে না। এই সমাজের আবু জাহেল কিংবা মুনাফিক্ব আবদুল্লাহ ইবন উবাইদেররকে তারা চিনতে পারে না। এই সীরাহতে প্রায় প্রতিটি ঘটনা থেকে কী শেখার আছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি ভাষাগত। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামকে আমাদের দেশের মূলধারার শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ায় ইসলামী সাহিত্যের সাথে সাধারণ মানুষের বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে যে ধরনের সাহিত্য আমরা পড়েছি, সেগুলোর সাথে ইসলামী সাহিত্যকর্মের ভাষাগত ব্যবধান তৈরি হওয়ায় বরেণ্য আলিমদের লেখা বইগুলো পড়েও মানুষ যথাযথভাবে উপকৃত হতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই সীরাহ সেই ব্যবধানকে কমিয়ে আনার প্রয়াস। চৌদ্দশো বছর আগের কথাগুলো যেন আমরা আমাদের পরিস্থিতির সাথে মেলাতে পারি, সেই সময়ের আলোয় নিজেদের দেখতে পারি সে জন্য প্রয়োজন ভাষাগত দেয়ালটি ভেঙে ফেলা। সে উদ্দেশ্যে এই সীরাহতে কাহিনিগুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে কিছুটা আধুনিক যুগের ঢঙে, যেন পাঠক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে নবীজির যুগে প্রবেশ করতে পারে।

এই সীরাহর বিষয়বস্তুগুলো মূলত নেওয়া হয়েছে শাইখ আলি আস-সাল্লাবির রচিত সীরাহ এবং আর-রাহীকুল মাখতুম থেকে। রেইনড্রপস এর ভাইবোনেরা চেয়েছে

কেবল একটি প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় সীরাহ উপহার দিতে, যেন রাসূলুল্লাহকে ﷺ আমরা ভালোবাসতে পারি, তাঁর জন্য জীবন দিতে পারি।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম।

জিম তানভীর
২০ রবিউস সানি, ১৪৩৭ হিজরী।

সীরাহ নিয়ে কিছু কথা

সীরাহর সংজ্ঞা

সীরাহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। আরবিতে সাইর মানে হাঁটা, কেউ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হেঁটে যায় তখন আরবিতে বলা হয় সাইরতু ফুলান, অর্থাৎ অমুক হাঁটছে।

সীরাহ বলতে এমন একটি পথ বুঝায় যার উপর দিয়ে একজন ব্যক্তি তার জীবনভর হেঁটে চলে। হান্স ডিকশনারিতে (Dictionary of Modern Written Arabic by Hans Wehr) সীরাহর যে সব অর্থ দেওয়া হয়েছে তা হলো: আচার-ব্যবহার, চালচলন, মনোভাব, জীবনযাত্রার ধরন, সামাজিক অবস্থা, প্রতিক্রিয়া, কাজকর্মের ধরন ও জীবনী–এই সবগুলোই সীরাহ এর অন্তর্ভুক্ত। সীরাহ বলতে শুধুমাত্র মুহাম্মাদের ﷺ জীবনী বোঝায় না বরং তা দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির জীবনীকেই বোঝানো হয়। কিন্তু মুহাম্মাদের ﷺ এর জীবনীর সাথে সীরাহ শব্দটি এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সীরাহ বলতে অধিকাংশ সময় নবীজি মুহাম্মাদের ﷺ জীবনীকেই বোঝানো হয়। সীরাহ বলতে যেহেতু যেকোনো ব্যক্তির জীবনচরিতকে বোঝায় তাই আবু বকরের ؓ সীরাহ, উমারের ؓ সীরাহ – এভাবে বললেও ভুল হবে না।

সীরাহ অধ্যয়ন করার গুরুত্ব

১) ইসলামের ইতিহাস জানা

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনকে ঘিরেই ইসলামের ইতিহাস। তাঁর জীবন অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইসলামের আসল ইতিহাস জানা যাবে, অর্থাৎ তাঁর পুরো জীবনকাল হলো ইসলামের ইতিহাস জানার একটি উপযুক্ত মাধ্যম। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিগুলো জানা বর্তমান সময়ের দাওয়াতি কাজের জন্য খুবই জরুরি। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন তাই নিছক একজন ব্যক্তির জীবন নিয়ে আলোচনা নয় বরং রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হলো মুসলিম জাতির ইতিহাস, দ্বীন ইসলামের ইতিহাস।

দুনিয়াতেই জান্নাতের সুখবরপ্রাপ্ত ১০ জন আশরা-ই-মুবাশশারাহর একজন হলেন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ؓ। তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইবন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ؓ বলেন, 'আমাদের পিতা (সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস) রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিচালিত যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ পড়ানোর সময় বলতেন, এগুলো হলো তোমাদের বাপ-দাদাদের ঐতিহ্য, কাজেই এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করো।' তাঁরা সীরাহকে মাঘাযি বলে অভিহিত করতেন, মাঘাযি মানে যুদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষভাগের প্রায় পুরোটা সময় বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাই তাঁরা মাঘাযি বলতে তাঁর পুরো জীবনকেই নির্দেশ করতেন।

আলী ইবন আবি তালিবের ﷺ নাতি আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবি তালিব বলেছেন, 'আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শেখানো হয়েছিল ঠিক সেভাবেই রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনীও পড়ানো হয়েছিল।' অর্থাৎ সীরাহ তাঁদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে কুরআন অধ্যয়ন করার পেছনে তাঁরা যেভাবে সময় দিতেন সীরাহর পেছনেও ঠিক একইভাবে সময় দিতেন।

সীরাহ অধ্যয়ন করা কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। কুরআন থেকে মূসা ﷺ বা ঈসার ﷺ জীবন সম্বন্ধে যতটা বিস্তারিত জানা যায়, ততটা রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন সম্বন্ধে জানা যায় না। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই তাঁর সীরাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

২) রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসা

সীরাহ অধ্যয়ন করার একটি অন্যতম কারণ হলো অন্তরে মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি এক গভীর ভালোবাসা গড়ে তোলা। নবীজিকে ﷺ ভালোবাসা হলো ইবাদাত। দ্বীনের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।'

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহকে ﷺ সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে না পারা পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়া যাবে না। সুতরাং মুহাম্মাদকে ﷺ কে ভালোবাসা হলো ইসলামের একটি অংশ।

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ ছিলেন খুবই সৎ ও স্পষ্টভাষী একজন মানুষ, তিনি যা বলার তা সরাসরি বলে ফেলতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমি নিজেকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসি, আমি নিজেকে ছাড়া অন্য সবকিছুর চাইতে আপনাকে বেশি ভালোবাসি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যতক্ষণ না আমাকে ভালোবাসতে পারবে', এর মানে হলো যতক্ষণ না আমাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করতে পারবে না। এরপর উমার ইবন খাত্তাব ﷺ বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাহলে আমি আপনাকে আমার নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল-আন আমানতা', অর্থাৎ 'এখন তুমি পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করেছ।'

এই উম্মাহও মুহাম্মাদকে ﷺ ভালোবাসে। যে কোনো মুসলিমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবাসে কিনা তাহলে সে নিশ্চয়ই উত্তর দেবে, 'হ্যাঁ, বাসি।'

কিন্তু কারও সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনে তাকে মনের গভীর থেকে, আন্তরিকভাবে ভালোবাসা যায় না। কাউকে ভালোবাসতে হলে তার সম্পর্কে জানা চাই। আর নবীজির ﷺ ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য, কেননা তিনি এমন একজন মানুষ যার সম্পর্কে যত জানা হয়, ততই তাঁর ব্যক্তিত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসাও তৈরি হয়। যদিও বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমরা তাঁর সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জেনেই তাঁকে ভালোবাসে, তারপরও তাঁর সম্পর্কে ভালোভাবে না জানা পর্যন্ত তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসার জন্ম নেবে না। তাই দেখা যায় যে, সাহাবারা ﷺ রাসূলকে ﷺ যত বেশি জানতেন, তাঁরা তত বেশি তাঁর সান্নিধ্য পেতে চাইতেন এবং তাঁকে তত বেশি ভালোবাসতেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমর ইবন আল আসের ﷺ কথা। তিনি ছিলেন এক সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘোরতর শত্রু। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও দুশমনদের মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীতে একসময় তিনি মুসলিম হন। মৃত্যুশয্যায় তিনি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করেন। পিতাকে মৃত্যুশয্যায় কাঁদতে দেখে ছেলে আবদুল্লাহ ইবন আমর ﷺ বললেন, “বাবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাকে (ঈমানের) সুসংবাদ দেননি?”

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন আল আস ﷺ সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘আমানা আমর’, অর্থাৎ আমর ইবন আল আস ঈমান অর্জন করেছে। খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন আল আসের ﷺ মু’মিন হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র একজন মুসলিমই ছিলেন না, বরং উঁচু স্তরের একজন মু’মিনও ছিলেন। তাই তাঁর পুত্র তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল যে, “আপনি একজন মু’মিন। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন সেখানে আপনি মৃত্যুর পূর্বে এভাবে কান্নাকাটি করছেন কেন?”

আমর ইবন আল আস ﷺ তাঁর ছেলের দিকে ফিরে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর ভাষায়–

আমি আমার জীবনে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে এসেছি। জীবনের প্রথম ভাগে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর প্রতি আমার বিদ্বেষ এতটাই তীব্র ছিল যে, তাঁকে যেকোনোভাবে পাকড়াও করে হত্যা করার ব্যাপারে আমি ছিলাম বদ্ধপরিকর। এটাই ছিল আমার অন্তরের আকাঙ্খা, তীব্র বাসনা। যদি সে সময় আমি মারা যেতাম তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমার স্থান হতো জাহান্নামে।

কিন্তু এরপর আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেন। আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললাম, ‘হে মুহাম্মাদ ﷺ, আমি মুসলিম হতে চাই! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার কাছে বাই’আত দিব।’

কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ যখন হাত সামনের দিকে বাড়ালেন তখন আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'
-আমার একটি শর্ত আছে।
-কী শর্ত?
-আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক, এটাই আমার শর্ত।

আমর ইবন আল আস ﵁ জানতেন যে, তিনি অতীতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যা যা করেছিলেন তা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই তিনি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তাঁর অতীতের কার্যকলাপের জন্য পাকড়াও না করেন।

তখন নবীজি ﷺ বললেন, 'হে আমর, তুমি কি জানো না যে, ইসলাম তার আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়, হিজরত তার আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয় এবং হাজ্জ তার আগের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়?'

আমর ইবন আস ﵁ বলতে থাকেন, 'তারপর আমি মুসলিম হয়ে গেলাম। তখন থেকে মুহাম্মাদের ﷺ চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিল না। অথচ তিনিই কিনা একসময় আমার ঘোরতর শত্রু ছিলেন।

তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ এতটাই তীব্র ছিল যে, আমি কখনো তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। কেউ যদি আমাকে তাঁর দৈহিক সৌষ্ঠব বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করত তাহলে আমার পক্ষে তাও সম্ভব হতো না। আমি যদি সে সময় মারা যেতাম তাহলে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করতে পারতাম...'

এই হাদীসটি এখানেই শেষ নয়, এর পরে আরও কিছু অংশ রয়েছে। কিন্তু এই হাদীস থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয় হলো, যে নবীজিকে ﷺ আমর ইবন আস একসময় চরম শত্রু বলে গণ্য করতেন, সেই মুহাম্মাদকে ﷺ তিনি যখন কাছ থেকে দেখলেন, তাঁকে জানতে শুরু করলেন, তখন থেকে তিনিই হয়ে গেলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

সুলাহ আল হুদাইবিয়্যাহ অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে কুরাইশরা সুহাইল ইবন আমরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পাঠায়। উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মাদের ﷺ সাথে দফা-রফা করা। সুহাইল ইবন আমর ছিল একজন উঁচুমানের কূটনীতিক। তাকে পারস্য, রোমান ও আবিসিনিয়ান সাম্রাজ্যের দরবারে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানো হতো। তিনি বেশ সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাকেই কুরাইশরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পাঠিয়েছিল আপস-মীমাংসা করার জন্য।

সুহাইল ইবন আমর মদীনায় গেল। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে আবিষ্কার করল সাহাবারা ﷺ

নবীজিকে ﷺ কতটা ভালোবাসেন, তাঁর সাথে কেমন আচরণ করেন। কাজ শেষে সুহাইল ইবন আমর মক্কায় ফিরে আসল। কুরাইশদেরকে বলল,

'আমি রোমান সাম্রাজ্য দেখেছি, পারস্যের বাদশাহর দরবারেও গিয়েছি। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীকে দেখেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত মুহাম্মাদের ﷺ মতো এমন কোনো নেতা দেখিনি যাকে তাঁর অনুসারীরা এত বেশি ভালবাসে, এত বেশি সম্মান করে! আমি দুনিয়াতে তাঁর মতো আর কাউকে দেখিনি। রোমান, পারস্য ও আবিসিনিয়ার বাদশাহদের যদিও অনেক ক্ষমতা, শক্তিসামর্থ্য ও বিশাল সাম্রাজ্য আছে, কিন্তু মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি তাঁর অনুসারীদের যে ভালোবাসা আমি দেখেছি তা অন্য কোথাও দেখিনি।

আমি দেখেছি অসাধারণ কিছু বিষয়। যখন মুহাম্মাদ ﷺ অযু করেন, তখন সাহাবারা ﷺ তাঁর কাছে কাছেই থাকেন যেন তাঁর দেহ থেকে অযুর পানি চুইয়ে পড়া মাত্রই তা সংগ্রহ করতে পারেন। তোমরা যা খুশি তাই করতে পারো, কিন্তু মনে রেখ এই মানুষগুলো তাদের নেতাকে কোনোদিনও ছেড়ে যাবে না।'

আসলেই সাহাবাগণ ﷺ কখনোই রাসূলুল্লাহকে ﷺ পরিত্যাগ করেননি। তাঁরা নিজের জীবন দিয়েছেন, তাঁর জন্য তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করেছেন, কিন্তু কখনো তাঁকে ছেড়ে যাননি।

তাই সত্যিকার অর্থে নবীজিকে ﷺ ভালোবাসতে হলে অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে হবে। যদিও মানুষজন তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি জানে না, তাঁর জীবনী নিয়ে পড়াশোনা করেনি, তারপরেও দুনিয়ার বুকে মানুষ তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছে । তাঁর নাম হলো দুনিয়ার সবচেয়ে পরিচিত নাম। তাই দুনিয়াতে শত-শত হাজার-হাজার মানুষ পাওয়া যাবে যাদের নাম ভালোবেসে মুহাম্মাদ রাখা হয়েছে। ইতিহাসে এমন আর কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার নামে এত মানুষের নাম রাখা হয়েছে।

যদি তাঁর ব্যাপারে খুব ভালোভাবে না জানা সত্ত্বেও মানুষ তাঁকে ভালবাসে, তাহলে যে তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করবে তার ভালোবাসা কেমন হবে সে তো চিন্তার বাইরে! রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদের ﷺ নাম পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক উচ্চারিত নাম। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় না। প্রতিটি সেকেন্ডে, প্রতিটি মিনিটে, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও অন্তত একজন মুয়াযযিনের মুখে তাঁর নাম প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে, *"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"*

মুহাম্মাদ শব্দের মানে হলো প্রশংসিত আর এই দুনিয়াতে মুহাম্মাদের ﷺ মতো প্রশংসিত দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। তাঁর নাম যথার্থতা লাভ করেছে কারণ, তিনি সদা

প্রশংসিত এক ব্যক্তি। তাঁর নাম শুনলে মুসলিমরা তাঁর প্রশংসা করে বলে, "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।" তাই তাঁকে ভালোবাসতে হলে তাঁর সীরাহ অধ্যয়ন করা কর্তব্য। তাঁর সম্পর্কে যত বেশি জানা যাবে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> **"বল, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করো এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো – যদি এগুলো তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" (সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ২৪)**

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলিমদের ভালোবাসার সর্বোচ্চ হকদার হলেন আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ﷺ এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। পিতা, পুত্র, ভাই, নিজ গোত্র, ধন-সম্পদ সবকিছুর চেয়ে এই তিনটি বিষয় অধিক প্রিয় হতে হবে। প্রতিটি মুসলিমের কাছে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও ইসলাম সবকিছুর চেয়ে প্রিয় হওয়া উচিত।

৩) সর্বোত্তম আদর্শের অনুসরণ

ইবন হাজার বলেছেন, 'কেউ যদি আখিরাতের জীবনে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে চায়, দুনিয়াবি জীবনে প্রজ্ঞা হাসিল করতে চায়, জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে চায় এবং নিজের মাঝে প্রকৃত নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চায়, তবে সে যেন রাসূলুল্লাহর ﷺ পথ অনুসরণ করে।' মুহাম্মাদ ﷺ এর ছিল সর্বোশ্রেষ্ঠ আখলাক। তাঁর মাঝে যাবতীয় অসাধারণ গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তাই তাঁর সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে তাঁকে আরও বেশি করে অনুসরণ করা সম্ভব হবে।

৪) কুরআনকে অনুধাবন

কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো ওয়াহী নাযিল হওয়ার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়, যেমন, আখিরাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ। পরিবেশ-পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন এ আয়াতগুলো সবসময় স্বতন্ত্র থাকে। আবার কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাই দেখা যায় যে কিছু আয়াত কোনো ঘটনার পূর্বে নাযিল হয়েছে অথবা ঘটনা ঘটার সময়ে নাযিল হয়েছে কিংবা ঘটনা ঘটার পরে নাযিল হয়েছে।

সীরাহ এসব আয়াতের বিস্তারিত বিবরণ দেয়। এর মাধ্যমে কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে–তা সীরাহ থেকে জানা যায়। যেমন, সূরা আল আহযাবের অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আল-আহযাব বা খন্দক্বের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। আবার সূরা আলে ইমরানে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার কিছু কথোপকথন। মূলত নাযরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথোপকথনে রাসূলুল্লাহকে ﷺ সমর্থন যোগানোর জন্যই এই আয়াতসমূহ নাযিল হয়। আর আলে ইমরানের পরবর্তী অংশে গাযওয়ায়ে উহুদ অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা এই সূরাতে দেওয়া হয়নি। একমাত্র সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমেই আয়াতগুলোকে যথাযথ পরিস্থিতির নিরিখে বোঝা সম্ভব।

৫) মুহাম্মাদের ﷺ জীবন ইসলামি আন্দোলনের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াতের জীবন বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রথমে তিনি গোপনে দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। এরপর তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াহ দেওয়া শুরু করেন এবং পরবর্তীতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ পরিচালনা করেছেন। ইসলামি আন্দোলনে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য এই পর্যায়গুলোর মাঝে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ওয়াহী দ্বারা নির্দেশিত। নিছক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হুটহাট সিদ্ধান্ত নিতেন না। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে ﷺ প্রতিটি পদে সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে যা কিছু ঘটেছে তা কোনো এলোমেলো বা আকস্মিক ঘটনাবলির সমষ্টি নয়, বরং এ সকল ঘটনা ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিকল্পনার অংশ, যাতে দ্বীন ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসব ঘটনা মুসলিম উম্মাহর জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব ধাপ অতিক্রম করেছেন সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব পর্যায় পার করেছেন সেগুলোও খেয়াল রাখতে হবে।

সীরাহ এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সীরাহ সাহাবাদেরকে ﷺ শিখিয়েছিল কুরআনের শিক্ষা কীভাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। সীরাহ তাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে মৌখিক নির্দেশ, আর সীরাহ হলো সেই নির্দেশের বাস্তব প্রতিফলন। অন্য নবীদের সীরাহ সংরক্ষিত নেই, কিন্তু মুসলিমদের কাছে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি সীরাহও সংরক্ষণ করা আছে।

কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, রামাদানে কালো সুতা থেকে সাদা সুতা আলাদা না হওয়া পর্যন্ত সেহরি খাওয়া যাবে। একজন সাহাবী ﷺ এই আয়াতটির

আক্ষরিক অর্থের উপর আমল করা শুরু করে দিলেন। তিনি তাঁর বালিশের নিচে একটি সাদা সুতা ও একটি কালো সুতা রাখলেন। এরপর তিনি খেলেন। তারপর আবার বালিশ সরিয়ে দেখলেন যে সুতা দুটির মাঝে পার্থক্য করা যায় কি না। যখন তিনি দেখলেন যে, সুতার রঙে কোনো পরিবর্তন আসেনি তখন আবার খাওয়া শুরু করলেন। এরকম করে অনেকক্ষণ চলতে লাগল অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললেন। সব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন এবং বললেন যে, 'এই আয়াতের মানে এই নয় যে তুমি সুতার দিকে তাকিয়ে থাকবে, বরং সাদা সুতা বলতে এখানে দিগন্তে উত্থিত সূর্যের প্রথম আলোকে বোঝানো হচ্ছে।' অর্থাৎ আয়াতটির বাস্তব প্রয়োগ কী রকম হবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সাহাবীকে ﷺ শিখিয়ে দিলেন। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে তা নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের ﷺ জীবন থেকে জানা সম্ভব।

৬) সীরাহ অধ্যয়ন একটি ইবাদাত

সীরাহ বিনোদনের জন্য নয়, এটি একটি ইবাদাত। তাই সীরাহ অধ্যয়নের জন্য আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। যে জমায়েতে রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন করা হয়, সে জমায়েত আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জমায়েত, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার জমায়েত। আর যে জমায়েতে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হয়, ফেরেশতারা সে জমায়েত ঘিরে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **"বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৩১)**

৭) মুসলিম হিসেবে নিজেদের পরিচয় গড়ে তোলা

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী একটি অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যা জোর করে সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শক্তি প্রয়োগ করে হলেও এই অপসংস্কৃতি গ্রহণে বিশ্ববাসীকে বাধ্য করা হচ্ছে। থমাস ফ্রাইডম্যান আমেরিকার একজন বিখ্যাত লেখক, নিউইয়র্ক টাইমসে লেখালেখি করেন। তিনি বলেছেন, 'পুঁজিবাদী অর্থনীতির পেছনে রয়েছে একটি অদৃশ্য কালো হাত। ম্যাকডোনাল্ড বার্গারকে আপনার ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই ম্যাকডোনাল্ড ডগলাসের জঙ্গিবিমান F-15!' অন্যভাবে বলা যায় যে, এই অপসংস্কৃতি মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। কারো পছন্দ-অপছন্দকে এই অপসংস্কৃতি কোনো রকম তোয়াক্কা করে না। *হয় ম্যাকডোনাল্ড বার্গার কিনে খাও, নতুবা ম্যাকডোনালড ডগলাসের জঙ্গিবিমান F-15 তোমার আকাশসীমানায় হাজির হবে।* এটি এমন একটি সংস্কৃতি যা কিনা ভিন্নমত একদমই সহ্য করতে পারে না। এটি দুনিয়ার বুক থেকে অন্য সব মতাদর্শকে উপড়ে ফেলতে চায়। আলেকজান্ডার সলযেনিতসিন নামক একজন বিখ্যাত রাশিয়ান ইতিহাস-

রচয়িতা বলেছেন, 'একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে অবশ্যই তার শেকড় কেটে দিতে হবে।' কাজেই, বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে যে ভোগবাদী সংস্কৃতি ছড়িয়ে ও চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর মানুষের জন্য একটি অশনি সংকেত, কেননা এটি সকল সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে দুনিয়ার বুক থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চায়।

ইসলাম ব্যতীত অন্য সব মতাদর্শ আজ এই বৈশ্বিক সংস্কৃতির সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা যা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দুনিয়ার সকল আদর্শকে মোকাবিলা করতে সক্ষম। দুনিয়ার সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্য থাকলেও কিছু মুসলিম আজ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কিছুটা সন্দিহান। চারপাশে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলার চেষ্টা করেন এমন অনেক মুসলিম রয়েছেন, কিন্তু মুসলিম হিসেবে যে একটি স্বকীয়তা বা নিজস্ব পরিচয় রয়েছে তা অধিকাংশের মাঝে অনুপস্থিত। রকস্টার বা ফুটবল খেলোয়াড়ের সাথে একজন গড়পড়তা মুসলিমের যতটা সাদৃশ্য দেখা যায় ততটা একজন সাহাবীর ﷺ সাথে দেখা যায় না। এই যুগের যুবকেরা সাহাবীদের ﷺ সম্পর্কে যতটা না জানে তার চেয়েও অনেক বেশি জানে খেলোয়াড়দের সম্পর্কে। এমনকি তারা নবী-রাসূলদের সম্পর্কেও তেমন কিছু জানে না। আজকের দিনের অল্প ক'জন যুবকই আল্লাহ তাআলার সব নবী-রাসূলদের নাম বলতে পারবে, বা সাহাবীদের ﷺ নাম মনে রাখতে পারবে। কিন্তু সেই একই ব্যক্তিকে তার প্রিয় ফুটবল টিমের অথবা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নাম জিজ্ঞেস করা হলে দেখা যাবে সে হড়বড় করে অনেক কথা বলে ফেলছে। মুসলিমদের মাঝে আত্মপরিচয়ের যে সংকট দেখা দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এই পরিচয়সংকট দূর করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি তা হলো:

- ইসলামি ইতিহাসের উপর ভালো দখল থাকতে হবে। তাদের সিলেবাসে যেসব বিষয় থাকা খুব জরুরি সেগুলো হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ, নবীদের জীবনী, সাহাবীদের ﷺ জীবনকাহিনি এবং সবশেষে মুসলিমদের সামগ্রিক ইতিহাস। সুতরাং প্রথম পদক্ষেপ হলো ইসলামের ইতিহাস জানার মাধ্যমে নিজেদের একটি পরিচয় গড়ে তোলা, কারণ এই ইতিহাস মুসলিমদের নাড়ির ইতিহাস, মুসলিমদের অস্তিত্ব।

- সমগ্র মুসলিম জাতি এক উম্মাহ। নিজেকে পুরো মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য মনে করতে হবে। জাতীয়তার ভিত্তিতে মুসলিমদের এককেজনের যে পরিচয় রয়েছে তা যেন মুসলিম পরিচয়ের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। মুসলিমদের মধ্যে কেউ আছে কুয়েতি, আমেরিকান, ব্রিটিশ বা পাকিস্তানী, তবে এই জাতীয়তাবাদী পরিচয় যেন মুসলিম পরিচয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে যায়। ইসলাম কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা দূর করার জন্যই এসেছে। মুসলিমদের আনুগত্য হলো আল্লাহ তাআলা ও দ্বীন ইসলামের প্রতি । তাই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম ভাইবোনদের খোঁজখবর রাখতে হবে। ফিলিস্তিনে কী-হচ্ছে, না-হচ্ছে সে ব্যাপারে প্রতিটি ব্রিটিশ মুসলিমের উদ্বিগ্ন থাকা উচিৎ। প্রতিটি আমেরিকান মুসলিমের

উচিৎ কাশ্মীরের ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখা। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণে কী ঘটছে সে ব্যাপারে মুসলিমদের এমনভাবে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিৎ যেন তা নিজের বাড়িতেই ঘটছে। নিজেদের আত্মপরিচয় গড়ে তোলার ব্যাপারে এগুলো খুবই জরুরি উপাদান।

আলেকজান্ডার সলযেনিতসিন বলেছেন, 'একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য প্রথমেই সেই জাতিকে তাদের শেকড় কেটে দিতে হবে, তাদেরকে তাদের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হবে।' ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে শেকড়কে চেনার প্রথম পদক্ষেপ তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন সম্পর্কে জানা।

- মুহাম্মাদের ﷺ রিসালাতের প্রমাণ হলো তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা। রাসূলুল্লাহর ﷺ সবচেয়ে বড় মু'জিযা হলো কুরআন। এছাড়া রাসূলুল্লাহর ﷺ রিসালাতের প্রমাণ হিসেবে আরও অনেক মু'জিযা ছিল। তবে তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহই রিসালাতের অন্যতম প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অতি সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। এ সময়ে তাঁর ব্যবহার, কথাবার্তা, চলাফেরা ও চরিত্র ছিল সত্যিই চোখে পড়ার মতো। কিন্তু তিনি কোনোদিন ক্ষমতা বা আধিপত্য লাভের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পরিবর্তনের সূচনা করেছেন তা এক অভূতপূর্ব বিষয়, অবিশ্বাস্য বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন নিরক্ষর। যে মানুষটি লিখতে-পড়তে জানতেন না তিনি কিনা এমন একটি কিতাবের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন যার মতো দ্বিতীয় আর কোনো কিতাব রচনা করা সম্ভব হয়নি এবং হবেও না। এমন নজির রয়েছে ভুরি ভুরি। রাসূলের ﷺ জীবনে এমন অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা আছে যেগুলোর একটি মাত্র ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য, আর তা হলো–তিনি আল্লাহর নবী, আল্লাহ তাআলাই এই মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাগুলো ঘটিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা অর্জন করেছিলেন তা আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া কোনোমতেই অর্জন করা সম্ভব হতো না। সুতরাং সীরাহ এটাও প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার মনোনীত রাসূল।

যে মুহাম্মাদ ﷺ জীবনের প্রথম চল্লিশটা বছর একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করেছিলেন, সেই মুহাম্মাদ-ই ﷺ পরবর্তীতে একজন রাজনৈতিক নেতা, সামরিক নেতা, ধর্মীয় নেতা, বিশাল সংসারের প্রধান, আইন-প্রণেতা[1], শিক্ষক, ইমাম এবং আরও অনেক দায়িত্ব পালন করেছিলেন আর এসব ঘটেছিল তাঁর জীবনের শেষ তেইশ বছরে, নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য!

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, দুনিয়ার সর্বকালের সেরা মানুষ হলেন

---

[1] আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ এর মাধ্যমে শরীয়ার যত বিধান এসেছে তা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে।

মুহাম্মাদ ﷺ এবং সেই মানুষটির সীরাহ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সীরাহ। তাঁর মহত্ত্ব বা মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্য যা-ই বলা হোক না কেন তা আসলে কম বলা হবে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়ার যাবতীয় মাইলফলককে ছাপিয়ে যায়। দুনিয়াতে এ যাবতকাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তিকে নিয়ে বিখ্যাত আমেরিকান লেখক মাইকেল এইচ হার্ট একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম হলো *The 100 Most influential People*। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে প্রভাবশালী নেতাদের জীবনী অধ্যয়ন করেছিলেন। একজন অমুসলিম হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সন্দেহাতীতভাবে মুহাম্মাদ ﷺ হলেন এ যাবতকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। এই বইটি মূলত অমুসলিমদের জন্য লেখা হয়েছিল। অনেকে তার এই বাছাই নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে এই ভেবে তিনি সূচনাতে লিখেছিলেন,

'আমার তৈরি করা পৃথিবীর এ যাবতকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকার এক নম্বরে মুহাম্মাদকে দেখে অনেক পাঠক অবাক হতে পারে। আমার মনোনয়ন নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। আসলে পুরো ইতিহাসে একমাত্র তিনিই হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি আধ্যাত্মিক এবং দুনিয়াবী–উভয় জায়গাতেই সর্বোচ্চ সফলতার ছাপ রেখেছেন।' এরপর তিনি আরও বলেছেন, 'দুনিয়াবী ও আধ্যাত্মিক উভয় পর্যায়ে মুহাম্মাদের ﷺ অসাধারণ প্রভাব দেখে আমি তাঁকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা হিসেবে বাছাই করেছি।'

মাইকেল হার্ট সত্যের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরপর তিনি তার পাঠকদের কাছে এই বলে ক্ষমা চেয়েছিলেন যে, 'আমার কিছুই করার ছিল না', অর্থাৎ তালিকায় মুহাম্মাদের ﷺ উপরে রাখার মতো আর কাউকে তিনি পাননি। যদি তাঁকে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের যেকোনো একটি দিক দিয়ে বিচার করা হয়, যেমন, সামরিক বাহিনীর নেতা হিসেবে, তবে দেখা যায় যে, তিনি সামরিক নেতা হিসেবে সবার চেয়ে সেরা ছিলেন। আবার ধর্মীয় নেতা হিসেবেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। কাজেই যে দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, যতভাবে তাঁর জীবন ব্যবচ্ছেদ করা হোক না কেন, তাঁর জীবনের যেকোনো একটি দিকই তাঁর সেরা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানে মনে রাখা জরুরি যে, সীরাহ হচ্ছে আল-মুস্তাফার জীবনী। মুস্তাফা মানে হলো যাকে বাছাই করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে সবার মধ্য থেকে বাছাই করেছেন। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল মুস্তাফা আল খালক্বি। তিনি আল্লাহ তাআলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্য থেকে নির্বাচিত।

সীরাহশাস্ত্র ও হাদীসশাস্ত্রের পার্থক্য

সীরাহ ও হাদীসশাস্ত্র জ্ঞানের দুটি ভিন্ন শাখা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দুটি শাখার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু এই দুইটি শাখার নিয়মরীতি একে অপর থেকে অনেকাংশে আলাদা।

হাদীসের আলিমগণ নিয়মনীতির ব্যাপারে বেশ কঠোরতা অবলম্বন করেন। কিন্তু সীরাহর আলিমগণ এ ব্যাপারে বেশ ছাড় দেন। এর কারণ হলো, হাদীসের সত্যতা বা ইসনাদ যাচাই করার পর তা থেকে হুকুম-আহকাম প্রতিপাদন করতে হয়, তাই মুহাদ্দিসগণ সর্বদা হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকার চেষ্টা করেন যেন হাদীসগুলোর ইসনাদ ঠিক থাকে। দুর্বল ইসনাদের হাদীসের উপর ভিত্তি করে যেন কাউকে ইবাদাত করতে না হয় তা চিন্তা করেই আলিমগণ হাদীসের নিয়মনীতির ব্যাপারে এত কড়াকড়ি আরোপ করেন।

কিন্তু সীরাহর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নয়। সীরাহকে ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে দেখা হয়, তাই হুকুম-আহকামের উপর এর কোনো প্রভাব থাকে না। যেহেতু সীরাহর উপর ভিত্তি করে কোনো হুকুম-আহকাম নির্ধারণ করা হয় না তাই এর নিয়মকানুনের ব্যাপারে সীরাহর রচয়িতাগণ এতটা কড়াকড়ি করেন না। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, যিনি হাদীসশাস্ত্রের একজন আলিম ছিলেন, তিনি বলেছেন, 'যখন আমরা ইতিহাস নিয়ে কথা বলি তখন বেশ ছাড় দিই।' তাই দেখা যায় যে, সীরাহর রচয়িতাগণ এমন অনেক বর্ণনা সীরাহর অন্তর্ভুক্ত করেন, যেগুলো তাঁরা হাদীস হিসেবে হয়তো গ্রহণ নাও করতে পারেন। সুতরাং সীরাহ ও হাদীসের ক্ষেত্রে এটাই ছিল পূর্ববর্তী আলিমগণের গৃহীত পন্থা।

সীরাত ইবন ইসহাক্ব, সীরাতে ইবন সাদ সহ পূর্ববর্তী আলিমদের সীরাহ গ্রন্থগুলো এসব নিয়মকানুনের উপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু আলিম সীরাহ রচনার ক্ষেত্রে নতুন একটি ধারা সংযোজন করেছেন। তারা সীরাহর ক্ষেত্রেও হাদীসের নিয়ম প্রয়োগ করতে চান। এর পেছনে তারা যুক্তি দেখিয়েছেন, 'আমরা এমন একটি সময়ে বাস করছি যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হলো আমাদের জন্য আহকামের অন্যতম একটি উৎস। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের সময় খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই কোনো হুকুম-আহকাম ধার্য করার জন্য তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনী অধ্যয়ন করতেন না, বরং তারা সীরাহ থেকে সাধারণ শিক্ষা লাভ করতেন, বিশেষ কোনো হুকুম বা মাসআলা নয়, কারণ দ্বীন ইসলাম তখন প্রতিষ্ঠিত অবস্থাতেই ছিল।'

কিন্তু বর্তমান সময়ে ব্যাপারটি ভিন্ন। কীভাবে দাওয়াহ করতে হবে, ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কী কী পর্যায় অতিক্রম করতে হবে প্রভৃতি বিষয়াদি জানার জন্য অবশ্যই সীরাহ অধ্যয়ন করতে হবে। তাই সীরাহ একটি ফিক্বহশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এ কারণে তারা বলেন যে হাদীসের নিয়মকানুনগুলো সীরাহর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, সহীহ সীরাহ আন নাব্যুওউয়াহ নামক বইটিতে হাদীসের নিয়মকানুন প্রয়োগ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ, যেমন, বুখারি, মুসলিম, সুনান আবু দাউদ প্রভৃতিতে সীরাহ সম্পর্কিত যে হাদীসগুলো আছে সেগুলো একত্রিত

করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ রচনা করেছেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আলিমদের রচিত সীরাহ, যেমন, সীরাতে ইবন ইসহাক্ব বা সীরাতে ইবন হিশাম ইত্যাদি থেকে সাহায্য নেওয়ার বদলে তারা বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থসমূহের সাহায্য নিয়েছেন। সাঈদ হাওয়া হাদীসের উপর ভিত্তি করে আল-আসাস ফীস সুন্নাহ নামক একটি বই লিখেছেন। এরকম আরও কিছু বই রয়েছে যেগুলো এই রীতি অনুসরণ করেছে।

এদিক দিয়ে ইবন কাসির অন্যান্য সীরাহ গ্রন্থ থেকে বেশ আলাদা, কারণ ইবন কাসির পূর্ববর্তী আলিমদের রচিত সীরাহর বই থেকে যেমন তথ্য সংগ্রহ করেছেন, ঠিক তেমনি হাদীসগ্রন্থগুলো থেকেও সাহায্য নিয়েছেন। তাই তাঁর বইয়ে যেমন বুখারি থেকে বর্ণিত হাদীস দেখা যায় তেমনি ইবন ইসহাক্ব থেকে বর্ণিত বর্ণনাও দেখা যায়।

প্রাক কথন: নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরব

সীরাহ লেখকগণ সাধারণত নবীজির ﷺ জন্মের সময়কাল থেকে সীরাহ শুরু করেন না, বরং এই মিল্লাতের পিতা ইবরাহীমের ﷺ ঘটনা দিয়ে শুরু করেন। আর শুরুতেই থাকে ইবরাহীম ﷺ কর্তৃক স্ত্রী হাজেরা ﷺ ও পুত্র ইসমা'ঈলকে ﷺ মক্কায় রেখে আসার কাহিনি। এই বইতেও সেই রীতি অনুসরণ করা হবে।

ইবরাহীমের ﷺ কাহিনি

যমযম কূপের উদ্ভব

ইবরাহীম ﷺ তাঁর স্ত্রী হাজেরা ﷺ ও সদ্যজাত পুত্র ইসমা'ঈলকে নিয়ে হিজাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি তাদেরকে যে জায়গাটিতে নিয়ে যান সে জায়গাটিই এখন মক্কা নামে পরিচিত। ওই সময় মক্কা ছিল জনমানবশূন্য। তবে যে স্থানে কাবা নির্মাণ করা হয়েছিল তা সৃষ্টির শুরু থেকেই পবিত্র ছিল। ইবরাহীম ﷺ তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে অল্প কিছু পানি ও এক থলে খেজুরসহ সেই নিরিবিলি জায়গায় রেখে আসেন। তারপর কিছু না বলেই সেখান থেকে উল্টো পথে হাঁটা শুরু করেন।

হাজেরা ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্বামী তাদেরকে রেখে যাবেন, কিন্তু তিনি এটা আশা করেননি যে এরকম জনমানবহীন মরুভূমির মাঝে তিনি তাদেরকে এভাবে ফেলে চলে যাবেন। তিনি স্বামীর পিছে পিছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, 'ইবরাহীম, আপনি কি আমাদেরকে এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোনো জনবসতি, না কোনো ফল-ফসল!'

ইবরাহীম ﷺ চুপ করে রইলেন।

তাঁর স্ত্রী আবারও একই প্রশ্ন করলেন, ইবরাহীম ﷺ কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করা হলো। তখনও তিনি নিশ্চুপ।

হাজেরা ﷺ প্রশ্ন করলেন, 'তবে কি আল্লাহ তাআলা আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?'

এবার উত্তর এল, 'হ্যাঁ।'

হাজেরা ﷺ বললেন, 'তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তাআলাই আমাদের দেখাশোনা করবেন। তিনি আমাদের কখনোই অবহেলা করবেন না।'

হাজেরা ﷺ জানতেন, যদি আল্লাহ তাআলার আদেশে ইবরাহীম ﷺ তাদেরকে এমন জনমানবহীন অঞ্চলেও রেখে যান, তবুও দুশ্চিন্তার কিছু নেই, কেননা আল্লাহ তাআলাই

এই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলার উপর তাঁর এই বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ তাআলাই তাঁকে দেখে রাখবেন। যদি সে আদেশ হয় এরকম নিরিবিলি স্থানে একাকী বসবাস করা, তবে সেখানেও আল্লাহর হেফাজতের চাদর তাদের ঘিরে রাখবে।

ইবরাহীম ﷺ চলে গেলেন। তিনি অনেক দূরে চলে গেলেন, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তখন কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে একটি দুআ করেন। এই চমৎকার দুআটি আছে কুরআনের সূরা ইবরাহীমে,

> **“হে আমাদের রব, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে অনুর্বর উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে। আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদেরকে রিযিক্ব প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।” (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৩৭)**

Maslow's hierarchy of needs নামে একটি তত্ত্ব আছে যেখানে মানুষের বিভিন্ন চাহিদাকে একটি পিরামিড আকারে দেখানো হয়েছে। এই পিরামিডের সবচেয়ে নিচের স্তরে আছে মানুষের শারীরবৃত্তীয় চাহিদা। অর্থাৎ এই তত্ত্ব অনুসারে শারীরিক চাহিদা (যেমন খাদ্যগ্রহণ) মানব জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। গুরুত্বের দিক থেকে এর পরে আছে যথাক্রমে সামাজিক চাহিদা (সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা), আধ্যাত্মিক চাহিদা (ধর্মচর্চা) এবং পিরামিডের চূড়ায় আছে আত্মোপলব্ধি; নিজের সম্ভাবনা ও প্রতিভাকে আবিষ্কার করে তা বিকশিত করতে ধাবিত হওয়া (*self-actualization*)। মাসলোর এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলতে হয়, একজন মানুষ প্রথমে তার শারীরবৃত্তীয় চাহিদা পূরণ করতে সচেষ্ট হবে, তারপর দলবদ্ধ হয়ে থাকতে শুরু করবে, এরপর ধর্মের খোঁজ করবে এবং অবশেষে সে নিজস্ব স্বকীয়তা ও সৃষ্টিশীলতার সন্ধান করতে শুরু করবে।

কিন্তু ইবরাহিমের ﷺ দুআতে তত্ত্বের এই পিরামিডটিকে সম্পূর্ণ উল্টো রূপে দেখা যায়। তিনি তাঁর পরিবারের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রথমেই যা চেয়েছেন তা হলো–লি ইউক্বীমুস স্বলাহ–যেন তারা সালাত কায়েম করে। অর্থাৎ তিনি প্রথমে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের প্রতি। এরপর তিনি দুআ করেছেন, ফাজ'আল আফ-ইদাতাম মিনান নাস–আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন। এখানে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য মানুষের অন্তরে ভালোবাসা গড়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অনুরোধ করেছেন। এটি হলো তাঁর পরিবারের জন্য সামাজিক চাহিদা। সবশেষে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে যা চাইলেন তা হলো রিযক্ব অর্থাৎ তাদের শারীরবৃত্তীয় চাহিদাপূরণ–ওয়ারযুক্বহুম মিনাস সামারাত–তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুজি দান করুন। তবে এখানে এটাও লক্ষণীয়, ইবরাহীম ﷺ তাঁর দুআর শেষ অংশে শুধুমাত্র রুজির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেননি বরং এর সাথে ইবাদাতের ব্যাপারটিও যুক্ত করে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, লা আল্লাহুম ইয়াশকুরুন–যেন, তারা শুকরিয়া আদায় করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইবরাহীম ﷺ চলে গেলেন। মা হাজেরার ﷺ কাছে অল্প যে খাবার ছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। আর ইসমা'ঈল ﷺ তখনো ছিলেন দুধের শিশু। হাজেরা তাঁর শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন কিন্তু সেই দুধও একসময় শুকিয়ে গেল। ইসমা'ঈল প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাঁদছে। সন্তানের কান্না সহ্য করতে না পেরে মা খাদ্যের খোঁজে বের হলেন। একটি পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন, এ পাহাড়ই পরে আস-সাফা নামে পরিচিত হয়েছিল। সেই পাহাড়ের উপর উঠে একবার ডানে তাকান, আবার বাঁয়ে তাকান, কিন্তু তিনি কাছাকাছি কোনো মানববসতির সন্ধান পেলেন না। এরপর পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকায় ফিরে এলেন, কাপড় গুটিয়ে এবার উঠতে লাগলেন আরেকটি পাহাড়ে, পরবর্তীতে যা আল-মারওয়া নামে পরিচিত হয়। এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠেও ডানে-বায়ে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু এবারও কাউকে দেখতে পেলেন না।

একদিকে পুত্র ইসমা'ঈল প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে, অন্যদিকে মা হাজেরা ﷺ কিছু পাওয়ার আশায় আস-সাফা ও আল-মারওয়া পাহাড় দুটির মাঝে ছোটাছুটি করছেন। এভাবে ইতিমধ্যে সাতবার দুই পাহাড়ে ওঠানামা করে ফেলেছেন। সপ্তম বার তিনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। আওয়াজটি কোথা থেকে এসেছে তা বোঝার জন্য আশেপাশে তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, শিশু ইসমা'ঈলের ﷺ পায়ের কাছ থেকে আওয়াজটি আসছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জিবরীল ﷺ সেখানে যমযম কূপ খনন করে দিয়েছেন আর হাজেরা এই কুপের আওয়াজই শুনতে পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড খুশিতে তিনি পানির উৎসের দিকে দৌড়ে গেলেন। মরুভূমিটি শুষ্ক ছিল, তাই পানি শুকিয়ে যেতে পারে চিন্তা করে হাজেরা পানি ধরে রাখার জন্য কুয়ার মতো একটি জায়গা তৈরি করলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'ইসমা'ঈলের ﷺ মায়ের উপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন। তিনি যদি এভাবেই তা ফেলে রাখতেন তাহলে সেখানে নদী প্রবাহিত হয়ে যেত', অর্থাৎ তিনি কুয়া বানিয়ে পানি ধরে না রাখতেন তাহলে তা থেকে একটি নদী প্রবাহিত হতো।

চোখের সামনে ক্ষুধায় কাতর পুত্রের কষ্ট ও কান্না দেখে নিশ্চয়ই হাজেরা ﷺ অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁর বুক ভেঙে গিয়েছিল, হয়তোবা তিনি কাঁদছিলেনও। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন মু'মিনাহ ও মুত্তাকী বান্দী। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে পরীক্ষা করছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য এক মহাপুরস্কার ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু হাজেরা তা জানতেন না। তাই তিনি নিশ্চয়ই প্রচণ্ড কষ্টের মাঝে ছিলেন। হাজেরার এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'আর এ কারণেই আমরা (হাজের সময়) সাফা-মারওয়ায় ওঠানামা করি।' অর্থাৎ আজ পর্যন্ত আমরা হাজেরার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছি। হাজেরা যদি জানতে পারতেন যে এমন এক সময় আসবে যখন সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাহলে তিনি মুখে এক চিলতে হাসি নিয়েই সাফা-মারওয়ায় ওঠানামা করতেন!

এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। মাঝে মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে বিশেষ

কিছু পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে পরীক্ষা নেন, কিন্তু আমরা জানি না আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কী ঠিক করে রেখেছেন। কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হাজেরাও এক সময় কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন আর সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাসের কারণে তাঁকে দেওয়া হয়েছে এক অসাধারণ প্রতিদান।

মক্কায় জনবসতি স্থাপন

যমযম কূপ সৃষ্টি হলো, মরুভূমিতে পানির অভাব দূর হলো, আর স্বাভাবিকভাবেই শুরু হলো প্রাণের সমাগম। পাখিরা কূপের চারপাশে উড়তে লাগল। সেখানে তখন জুরহুম নামে একটি যাযাবর গোত্র ছিল। এদের আদি নিবাস ছিল ইয়েমেন, কিন্তু তারা ইয়েমেন ত্যাগ করে এখানে চলে আসে। ইয়েমেনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে ব্যাপকহারে লোকজন এ স্থান ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এ রকম একটি ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন ইয়েমেনে সাবা জাতির বসবাস ছিল, তারাই প্রথমবারের মতো সেখানে একটি বাঁধ তৈরি করেছিল। যে মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে সে মরুভূমিতেই বাঁধ দেওয়ার কারণে সারাবছর পানি সরবরাহ তৈরি হলো। পানির এই সহজলভ্যতা আরবের মাঝে এক বিশাল জাতির জন্ম দিল। কুরআনে বর্ণিত আছে, তাদের ব্যাপক সম্পদ আর চাষাবাদের কারণে তাদের ভ্রমণ করতে কোনো কষ্টই হতো না। কেননা, তারা বিভিন্ন জায়গাজুড়ে অনেকগুলো উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তাই তাদের থাকা-খাওয়ার জায়গার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু এ জাতির লোকেরা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের বাঁধ ধ্বংস করে দেন, এর ফলে পুরো এলাকা পানিতে ভেসে যায় এবং লোকজন ইয়েমেন ত্যাগ করে আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা যেমন আন-নাজদ, আল-হিজায, ইরাক, আশ-শাম, মদীনা ইত্যাদি এলাকাসমূহে ছড়িয়ে পড়ে।

জুরহুম গোত্র অবশেষে হিজাযে এসে বসতি স্থাপন করে। তবে তারা সেই প্লাবনের আগে এসেছিল নাকি পরে এসেছিল–সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। মক্কা ও এর আশেপাশের এলাকা সম্পর্কে জুরহুম গোত্রের ভালো ধারণা ছিল। তারা ভালো করেই জানতো যে, ওই এলাকায় পানির কোনো উৎস নেই। তাই ওই এলাকার আকাশে ব্যাপক হারে পাখিদের ঘোরাঘুরি করতে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। সেখানে কী ঘটছে দেখার জন্য দুইজন লোক পাঠাল। তারা ফিরে এসে জানাল যে সেখানে একটি কূপ রয়েছে। এরপর জুরহুম গোত্রের লোকেরা যমযম কূপের কাছে চলে গেল। মা হাজেরার দিকে ছুঁড়ে দিল একটি অদ্ভুত প্রশ্ন। আর তিনিও তাদের অদ্ভুত প্রশ্নের জবাবে অদ্ভুত একটি উত্তরই দিয়েছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমরা কি এখানে বসতি স্থাপন করতে পারি?'

জুরহুম ছিল যোদ্ধাদের গোত্র আর তারা কিনা বসতি স্থাপনের জন্য এক মহিলার অনুমতির তোয়াক্কা করছে! বিবি হাজেরা ছিলেন এমন একজন মহিলা যার সাথে ওই

সময় একমাত্র শিশু সন্তান ইসমাঈল ছাড়া আর কোনো পুরুষ ব্যক্তি ছিল না। তারা চাইলেই হাজেরাকে সেখান থেকে এক ধাক্কায় বের করে দিতে পারত। কিন্তু তারা বেশ ভদ্রতা করে তাঁর কাছে অনুমতি চাইল। হাজেরা ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে তোমরা থাকতে পারো, তবে আমার একটি শর্ত আছে আর তা হলো এই কূপ আমার অধীনে থাকবে।' মজার ব্যাপার, তিনি ছিলেন একাকী এক মহিলা, যার তাদের সাথে পেরে ওঠার কোনো ক্ষমতাই নেই, তিনিই কিনা তাদের সাথে দর কষাকষি করছেন আর শর্তারোপ করছেন, যেখানে কিনা তারা চাইলেই তাঁকে সেখান থেকে হটিয়ে দিতে পারত! যাই হোক, জুরহুম গোত্রও তাঁর এ শর্তে রাজি হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'হাজেরা মনে মনে চাইছিলেন এই গোত্র এখানে বসতি স্থাপন করুক।' তিনি চাচ্ছিলেন এখানে একটা জনবসতি গড়ে উঠুক, কিন্তু এটাও চাচ্ছিলেন যেন বিষয়টা যথাযথভাবে হয়। অবশেষে জুরহুম গোত্র যমযম কূপের নিকটস্থ এলাকায় বসতি স্থাপন করে আর এ এলাকাটি পরবর্তীতে মক্কা নামে পরিচয় লাভ করে। ইসমাঈল ﷺ তাদের মাঝেই বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। জুরহুম গোত্রের ভাষা ছিল আরবি, ইসমাঈল ﷺ সেটাও রপ্ত করে ফেললেন। তাঁর পিতা ইবরাহীম ﷺ ছিলেন ইরাকের অধিবাসী আর সে সময় ইরাকে অন্য ভাষা চালু ছিল। ইসমাঈল ﷺ জুরহুম গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন, আর এখান থেকেই শুরু হয় রাসূলুল্লাহর ﷺ বংশধারা।[2] সে সময় মক্কার রাজনৈতিক নেতৃত্ব জুরহুম গোত্রের হাতে ছিল। পরবর্তীতে ইবরাহীম ﷺ মক্কায় এসে পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে কাবাঘর নির্মাণ করেন। মক্কার ধর্মীয় নেতৃত্ব ছিল ইসমাঈলের ﷺ হাতে, আর তা যুগ যুগ ধরে তাঁর উত্তরসূরিদের মাঝে বহাল ছিল। জুরহুম গোত্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকলেও ধর্মীয় কর্তৃত্ব কখনোই তারা লাভ করেনি।

মক্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস

কুরাইশ বংশের উৎপত্তি

জুরহুম গোত্র দীর্ঘ দিন ধরে মক্কায় ছিল। ধীরে ধীরে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের স্থলে বনু খুযা'আ গোত্রকে পাঠান। বনু খুযাআ জুরহুম গোত্রকে মক্কা থেকে বের করে দেয়। বনু খুযাআ ছিল একটি ইয়েমেনি গোত্র এবং অন্যান্য গোত্রসমূহের মতো এটিও ইয়েমেন ত্যাগ করেছিল। অবশেষে তারা হিজাযে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এদিকে জুরহুম মক্কা ছেড়ে যাওয়ার আগে দুটো কাজ করলো, প্রথমত, তারা যমযম কূপের মুখ বন্ধ করে এর সমস্ত চিহ্ন মুছে দিল। দ্বিতীয়ত, আল-কাবার ভেতরে যে মূল্যবান সম্পদগুলো ছিল সেগুলো তারা সাথে করে নিয়ে গেল।

---

[2] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৩।

জুরহুম গোত্র চলে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই মক্কার শাসন ক্ষমতা চলে গেল বনু খুযাআর হাতে। যদিও সে সময় ইসমাঈলের ﷺ বংশধররা সংখ্যায় অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং অনেক গোত্রে বিভক্ত হয়ে সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কায় একটিমাত্র শাখা গোত্র রয়ে যায় আর এই শাখা গোত্রটির নাম হলো কুরাইশ। অর্থাৎ ইসমাঈল ﷺ থেকে উদ্ভূত গোত্রগুলোর একটি হলো কুরাইশ। তবে মক্কার কর্তৃত্ব তখনো কুরাইশদের হাতে নয়, বরং বনু খুযাআর হাতেই ছিল।

বনু খুযাআর অন্যতম নেতা ছিল আমর ইবন লুহাই আল খুযাই। আরবের ধর্মীয় পটভূমির আলোচনায় তাকে নিয়ে আলোচনা করা হবে। অন্যদিকে কুরাইশদের নেতা ছিল কুসাই ইবন কালব–সে সকল কুরাইশকে ঐক্যবদ্ধ করে বনু খুযাআর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে মক্কা থেকে বের করে দেয়। প্রথমবারের মতো মক্কার রাজনৈতিক ও ধর্মীয়–উভয় নেতৃত্ব কুসাই তথা কুরাইশদের হস্তগত হয়। কুসাইর হাতে তখন কাবা ঘরের অভিভাবকত্ব চলে আসে। সে একই সাথে কাবা ঘরের সিক্বায়াহ ও নিফাদা এর ব্যাপারে কর্তৃত্বশীল হয়। সিক্বায়াহ ও নিফাদা হলো কাবায় আগত হাজীদের খাবার ও পানি পান করানোর দায়িত্ব।

এই কাজগুলো সাধারণভাবে খুব আহামরি মনে না হলেও আরবে আল্লাহ তাআলার অতিথিদেরকে আপ্যায়ন করতে পারাটা অত্যন্ত সম্মানজনক একটি ব্যাপার ছিল। এই দায়িত্ব লাভের মাধ্যমে হাজ্জ করতে আগত হাজীদের মেহমানদারির দায়িত্ব বর্তায় কুরাইশদের উপর। তৎকালীন কুরাইশদের রাজনৈতিক পরিষদ আন-নাদওয়ার কর্তৃত্বও কুসাই ইবন কালবের হাতে ছিল। আন-নাদওয়া ছিল অনেকটা বর্তমান যুগের সংসদের মতো। তার হাতে আরও ছিল আল-লিওয়ার নিয়ন্ত্রণ। আল-লিওয়া ছিল যুদ্ধের ব্যানার, অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণা দেওয়ার সকল ক্ষমতাও ছিল কুসাইয়ের হাতে। এক কথায় বলা যায় যে কুসাই ইবন কালব ছিল তৎকালীন মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি।

কুসাই ইবন কালবের মৃত্যুর পর এসব ক্ষমতা তার সন্তানরা নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়। কুসাইয়ের নাতি আমর পৈত্রিক সূত্রে হাজীদের খাবার ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করার দায়িত্ব লাভ করেন। সচরাচর শুধুমাত্র স্যুপ দিয়ে হাজীদের আপ্যায়ন করা হতো। কিন্তু আমর এ খাবারে কিছুটা নতুনত্ব আনেন। তিনি রুটি ছিঁড়ে স্যুপের মধ্যে ভেজানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে খাবারটির স্বাদ আরও বেড়ে গিয়েছিল। কোনো কিছু ভেঙ্গে গুঁড়ো করার পদ্ধতিকে আরবিতে 'হাশম' বলা হয়। এই হাশম থেকেই তখন আমরকে হাশিম নামে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রপিতামহ। হাশিম বিয়ে করেছিলেন মদীনার এক মহিলাকে। এরপর তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। গাযাতে তাকে দাফন করা হয়। এর মধ্যে তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল 'শায়বা'। শায়বা মানে হলো বৃদ্ধ লোক। ছোটো শিশুর এরূপ অদ্ভুত নামকরণের কারণ হলো জন্ম থেকেই তার মাথার কিছু চুল ধূসর ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর শায়বার মা ইয়াসরিবে পিতামাতার কাছেই থেকে গিয়েছিলেন। তাই

শায়বার ছোটবেলা কেটেছিল ইয়াসরিবে তার নানাবাড়িতে। আর এই ইয়াসরিবে যখন রাসূলুল্লাহ্ হিজরত করলেন তখন সেই ইয়াসরিবের নাম বদলে হয়ে গেলো মদীনা।

আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্ব লাভ

একদিন আল-মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তি মদীনায় আসলেন। তিনি ছিলেন হাশিমের ভাই। ভাতিজা শায়বাকে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি মদীনায় এসেছিলেন। তখন শায়বার বয়স ছিল প্রায় আট বছর। প্রথমে তার মা ছেলেকে ছাড়তে চাচ্ছিলেন না, কিন্তু আল-মুত্তালিব তাকে বোঝালেন যে, সে কুরাইশের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্যতম উত্তরাধিকারী এবং তার উচিত তার নিজ বংশ ও পরিবারের নিকটে ফিরে যাওয়া এবং সেখানে দায়িত্বসমূহ বুঝে নেওয়া–একথা শুনে শায়বার মা রাজি হন।

এরপর আল-মুত্তালিব শায়বাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে যান। শায়বাকে এর আগে মক্কার কেউ দেখেনি। তখনকার দিনে দাস কেনাবেচা খুব সাধারণ একটি ব্যাপার ছিল। তাই লোকজন আল-মুত্তালিবের সাথে এই অচেনা ছোট ছেলেটিকে দেখে ভেবেছিল যে সে বোধহয় আল-মুত্তালিবের দাস। তাই তারা শায়বাকে আবদুল মুত্তালিব বলে ডাকতে থাকে আর এই আবদুল মুত্তালিবই হলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দাদা। তার আসল নাম ছিল শায়বা, কিন্তু লোকেরা মুত্তালিবের দাস ভেবে তাকে আবদুল মুত্তালিব নামে ডাকতে শুরু করেছিল।

আবদুল মুত্তালিবের বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে। বনু জুরহুম গোত্র মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় যমযম কূপের মুখ বন্ধ করে এর সব চিহ্ন মুছে দিয়েছিল, এ ঘটনার পর প্রায় তিনশ বছর পর্যন্ত যমযম কূপের অবস্থান মক্কাবাসীদের কাছে অজানা ছিল। একদিন আবদুল মুত্তালিব একটি স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নে কেউ তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল, 'খোঁড়। তায়্যিবা', তায়্যিবা মানে হলো পবিত্র। আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নের মধ্যেই সাড়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'তায়্যিবা কী?' কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। সেদিনের মতো স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। পরের দিন রাতেও তিনি একই রকম স্বপ্ন দেখেন, সেই একই আওয়াজ তাকে বলতে থাকে, 'গর্ত করো, সেই মহার্ঘ।' আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'কী সেই মহার্ঘ?' সে রাতেও তিনি কোনো উত্তর পেলেন না। তৃতীয় রাতে সেই একই আওয়াজ তাকে বলল, 'যমযম খনন করো।' আবদুল মুত্তালিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'যমযম কী?' এবার তিনি উত্তর পেলেন। সেই কণ্ঠস্বরটি এবার বলল, 'যমযম একটি কূপ যা কখনো বন্ধ হবে না বা শুকিয়ে যাবে না। এখান থেকে হাজীরা পানি পান করবে। এই কূপ রয়েছে গোবর আর রক্তের মাঝে, এর কাছেই রয়েছে সাদা পা-বিশিষ্ট কাক এবং পিঁপড়ার আবাস।'

এই দুর্বোধ্য সাংকেতিক কথাবার্তার কিছুই আবদুল মুত্তালিব বুঝতে পারলেন না। পরের দিন সকালে তিনি যখন কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন তখন কাছেই সেখানে তিনি গোবর ও রক্ত দেখতে পান। সেগুলো ছিল একটি জবাইকৃত উটের রক্ত আর

গোবর। এরপর তিনি সেই একই জায়গায় সাদা পা-বিশিষ্ট একটি কাক এবং একটি পিঁপড়ার বাসা দেখতে পেলেন। অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন যে এই স্থানের কথাই তাকে স্বপ্নে জানানো হয়েছে, এখানেই তাঁর পূর্বপুরুষের যমযম কূপ রয়েছে। এরপর তিনি পুত্র হারিসকে সঙ্গে নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করে দিলেন।

যমযম কূপ আল-কাবা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। পিতাপুত্রের এই খোঁড়াখুঁড়ি দেখে লোকজন জড়ো হয়ে যায় এবং তারা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কী করছ? আল-কাবার পাশে এভাবে খোঁড়াখুঁড়ি করছ কেন?' তারা তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর পুত্র হারিস খনন কাজ বন্ধ না করে চালিয়ে যেতে লাগলেন। একদিকে পিতা-পুত্র খনন কাজ চালিয়ে যেতে লাগল, আরেকদিকে লোকজনও তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আবদুল মুত্তালিবের এরকম করার কারণ তারা কোনোভাবেই বুঝতে পারছিল না। এক পর্যায়ে তারা তাকে ছেড়ে দিল। তারা ফিরে যাওয়ার সময় আবদুল মুত্তালিবের চিৎকার শুনতে পেল। লোকেরা দৌড়ে এসে দেখতে পেল যে আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপের ঢাকনা উন্মোচন করেছেন।

এরপর উপস্থিত কুরাইশের নেতারা এসে বলল যে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই হলো আমাদের পূর্বপুরুষ ইসমা'ঈলের ﷺ কূপ', এ কথার মাধ্যমে তারা ইঙ্গিত দিতে চাইল যে এই কূপের উপর তাদের সবার অধিকার আছে, তাই এই কূপের অংশীদার তারা সবাই। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'আমিই স্বপ্নে এই কূপের খোঁজ পেয়েছি। আমিই এটাকে আবার উন্মোচন করেছি। তাই এই কূপের মালিক আমি।' কিন্তু তারা এটা মানতে চাইল না। তারা বলতে লাগল যে তারা সবাই ইসমা'ঈলের উত্তরসূরি, তাই তারা সবাই এই কূপের মালিক। এদিকে আবদুল মুত্তালিব এই কূপের মালিকানা অন্য কারও হাতে দেবেন না বলে মনস্থির করেছেন। দুই পক্ষই তর্কাতর্কি চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মাঝে যখন এই কূপ নিয়ে প্রায় যুদ্ধ বেঁধে যাচ্ছিল তখন কেউ একজন প্রস্তাব দিল যে, 'নিজেদের মাঝে এরকম মারামারি না করে আমরা বরং বনু সাদের মহিলা জাদুকরের কাছে যাই। সে হয়তোবা আমাদের একটা সমাধান দিতে পারবে।'

বনু সাদের এই মহিলা জাদুকর দাবি করত যে তার সাথে আত্মার যোগাযোগ আছে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যমযম কূপ নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান পাওয়ার আশায় এই মহিলার কাছে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারল যে সেই মহিলা সিরিয়া চলে গিয়েছে। তখন তারা আবার আশ-শামের দিকে যাত্রা শুরু করল। যাত্রাপথে তাদের পানি শেষ হয়ে গেল। তখন তারা ছিল মরুভূমির মাঝে। সেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ অবস্থায় আবদুল মুত্তালিব বাকি সবাইকে বললেন, 'আমাদের মৃত্যু যদি এই নির্জন মরুভূমিতেই ঠিক করা থাকে তাহলে সবার উচিত যার যার কবর খুঁড়ে ফেলা যাতে কেউ একজন মারা গেলে বাকিরা তাকে কবর দিতে পারে। তাহলে অন্তত একজন ছাড়া বাকিদের কবর হবে।' তাঁর কথামতো সবাই যার যার কবর খুঁড়ে ফেলল এবং সেই কবরে শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আবদুল মুত্তালিবই আবার বলে উঠলেন, 'নাহ, আমাদের মতো পুরুষদের এভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা

করা মানায় না। তার চেয়ে বরং আমরা সবাই পানির খোঁজে বের হই।' তাঁর সাথে সবাই একমত হলো এবং একেকজন পানির খোঁজে একেকদিকে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে আবদুল মুত্তালিব পানির খোঁজ পেলেন। পানি নিয়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলে তারা বলল, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে এই মরুভূমিতে পানির সন্ধান দিয়ে রক্ষা করেছেন এবং তিনিই তোমাকে যমযম কূপ উন্মোচনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এসব কিছুই একটি জিনিস নির্দেশ করে; এই কূপ তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একটি অনুগ্রহ আর এই কূপের মালিকানা তোমারই। আমরা আমাদের দাবি ছেড়ে দিলাম। এখন চলো, আমরা মক্কায় ফিরে যাই।'

যখন কুরাইশ নেতারা যমযম কূপের মালিকানার জন্য আবদুল মুত্তালিবকে চাপাচাপি করছিল, তখন আবদুল মুত্তালিবের পাশে একমাত্র পুত্র ছাড়া আর কেউ ছিল না। এ ব্যাপারটি আবদুল মুত্তালিবকে বেশ ভাবিয়ে তোলে, কেননা গোত্রীয় সমাজে কোনো ব্যক্তির শক্তিমত্তা কেমন তা নির্ধারিত হয় তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সংখ্যাধিক্যের উপরে, যেমন যার যত ছেলে, ভাই, চাচা, কিংবা আত্মীয় – সে তত বেশি শক্তিশালী। আবদুল মুত্তালিব তখন আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি যদি আমাকে দশটি পুত্র সন্তান দেন, তাহলে আমি তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আপনার পথে কুরবানি দেব।' এরপর আল্লাহ তাআলার দয়ায় আবদুল মুত্তালিব দশটি পুত্র ও ছয়টি কন্যাসন্তান লাভ করলেন। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে কৃত ওয়াদা পূরণ করার ব্যবস্থা নিলেন। আবদুল মুত্তালিবসহ কুরাইশের অন্যান্য লোকেরা তাদের সবচেয়ে বড় মূর্তি হুবালের কাছে যায়। এই মূর্তির পাশে কিছু তীর ছিল, তীরগুলোকে তারা খুব পবিত্র বলে বিশ্বাস করত, সেগুলোর সাথে ঐশ্বরিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে বলে তারা মনে করতো। ওই তীরগুলোর গায়ে আবদুল মুত্তালিবের সব পুত্রের নাম লেখা হয়েছিল। এরপর লটারি করা হলে প্রথমবার উঠল আবদুল্লাহর নাম, দ্বিতীয়বারেও উঠল আবদুল্লাহর নাম এবং তৃতীয়বারেও আবদুল্লাহর নাম উঠল।

তারপর আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহকে আল-কাবার পাশে নিয়ে গেলেন। তিনি যখন ছুরি বের করে আবদুল্লাহকে জবাই করতে যাচ্ছিলেন তখন দৌঁড়ে আসলো তারই আরেক পুত্র আবু তালিব। আবু তালিব তাঁর পিতাকে বলল, 'আমরা আপনাকে এ কাজ করতে দিতে পারি না।' এরপর আবদুল্লাহর মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনরা এসে বলল, 'আমরা আপনাকে আমাদের পুত্রকে জবাই করতে দিতে পারি না।' তখন আবার অন্যান্য লোকেরাও আবদুল মুত্তালিবকে বলতে লাগল, 'আপনি যদি এ কাজটা করেন তাহলে তা আপনার উত্তরসূরিদের জন্য করণীয় বলে গণ্য হবে', কেননা আবদুল মুত্তালিব ছিলেন তাদের নেতা, তিনি কোনো কাজ করলে তা প্রথা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব তাদের আপত্তি মানতে চাইলেন না। তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহ তাআলার কাছে যে মানত করেছি তা কোনোভাবেই ভঙ্গ করতে পারব না।' এ নিয়ে তাদের মাঝে কথা কাটাকাটি হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা যখন কোনো

সমাধানে পৌঁছাতে পারল না, তখন তারা আবার সেই মহিলা জাদুকরের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিল।

তারা সেই মহিলার কাছে গেল এবং সবকিছু শুনে সেই মহিলা জাদুকর বলল, 'আচ্ছা তোমরা আজকে যাও, আগামীকাল আবার এসো। আমি এর মাঝে আমার আত্মাগুলোর সাথে এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করব।' কুরাইশরা পরদিন তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। এর মাঝে মহিলা জাদুকর একটি সমাধান বের করে নিল। মহিলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কোনো ব্যক্তির রক্তপণ কীভাবে আদায় করো?' তারা বলল, 'দশটি উট দিয়ে।' তখন মহিলা বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে এক পাশে দশটি উট ও অপর পাশে আবদুল্লাহকে রেখে তীর চালনা করো; তীরটি উটের দিকে নির্দেশ করলে উটগুলোকে জবাই করবে আর আবদুল্লাহর দিকে নির্দেশ করলে পূর্বের উটগুলোর সাথে আরও দশটি উট যোগ করবে।' কুরাইশরা এতে রাজি হলো এবং মক্কায় ফিরে গেল।

মহিলা জাদুকর যা যা করতে বলেছিল কুরাইশরা ঠিক তা-ই করল। তীর যতবার আবদুল্লাহর দিকে নির্দেশ করছিল ততবার তারা উটের সংখ্যা বাড়াতে লাগল। এভাবে উটের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে যখন একশতে পৌঁছল তখন এটি উটের দিকে নির্দেশ করল। কুরাইশের লোকেরা আবদুল মুত্তালিবকে বলল, 'অবশেষে আমরা তোমার ছেলেকে জবাই থেকে বাঁচাতে পারলাম।' কিন্তু আবদুল মুত্তালিব বলল, 'না, এখনো শেষ হয়নি। আমরা আরেকবার লটারি করব।' তারা আরো দুইবার একই কাজ করল এবং প্রতিবারই নিক্ষিপ্ত তীর উট বরাবর ছিল। অবশেষে সেই একশত উট জবাই করা হলো আর আবদুল মুত্তালিবকে এই উটগুলোর পুরো খরচ একা বহন করতে হয়েছিল। তিনি খুবই দয়ালু ছিলেন, নিজের জন্য গোশত না রেখে সমস্ত উটের গোশত মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। লোকজন গোশত খেয়ে আবার সাথে করে নিয়েও যাচ্ছিল কিন্তু তারপরও পশুপাখিদেরকে খাওয়ানোর মতো যথেষ্ট গোশত উদ্বৃত্ত ছিল। এরপর থেকে আরবদের মাঝে এই কথাটি ব্যাপক বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল যে আবদুল মুত্তালিবই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মানুষ ও পশুদেরকে খাইয়েছিলেন, এমনকি আকাশের পাখিদেরকেও খাইয়েছিলেন।

কুরাইশদের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, তারা বলেছিল আবদুল মুত্তালিব যে কাজ করবে, পরবর্তী আরবদের জন্য তা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, যে আরবে রক্তপণ হিসেবে ১০টি উট দেওয়া হতো, আবদুল মুত্তালিবের ১০০টি উট জবাই করার পর সেখানে রক্তপণের মূল্য ১০০টি উট নির্ধারিত হয়। ইসলামেও এই নিয়মটি বহাল রাখা হয়েছে। অবশ্য এখন আর উট দিয়ে রক্তপণ আদায় করা হয় না, বরং ১০০ উটের মূল্য মুদ্রার সাপেক্ষে হিসাব করা হয় এবং টাকা দিয়ে তা পরিশোধ করা হয়।

আবদুল্লাহ ও আমিনা হলেন মুহাম্মাদের ﷺ পিতামাতা। তাকে বলা হতো, 'তুমি হলে দুই যবীহের সন্তান। তারা হলেন ইসমা'ঈল ও আবদুল্লাহ।'

আরবের তৎকালীন ধর্মীয় পটভূমি

ইসমা'ঈল ﷺ ছিলেন আরবের নবী, আর ইসমা'ঈলের ﷺ দাওয়াহ ছিল তাওহীদের দাওয়াহ, তাই আরবরা প্রথমত মুসলিমই ছিল, কিন্তু কালের পরিক্রমায় তারা একটা সময়ে এসে মুশরিক হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহর ﷺ আমলে আরবে মূলত তিনটি ধর্মের প্রচলন ছিল, পৌত্তলিকতা, ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম।

আরবে শির্কের উদ্ভব

আমর ইবন লুহাই আল খুযাই ছিল খুযাআ গোত্রের নেতা। সে ছিল বেশ উদারমনা, ক্ষমতাবান এক ব্যক্তি। তাকে তার গোত্রের লোকেরা অনেক সম্মান করত। তারা তাকে এতটাই সম্মান করত যে তার কথাকে আইন হিসেবে মেনে নিত। একবার আমর আশ-শামে (বর্তমান সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, লেবানন এবং জর্ডান) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণে যায়। সেখানে সে কিছু মূর্তি দেখে। স্থানীয় লোকদেরকে এগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা তাকে বলে, 'মূর্তিগুলো আমাদের এবং আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। আমাদের একেক রকম সমস্যার জন্য আমরা এক এক মূর্তির কাছে সাহায্য চাই। তারা আমাদের হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।' মূর্তিপূজার এই প্রথা আমর ইবন লুহাই আল খুযাইকে অভিভূত করে। তার মনে হলো যে, এই মুহূর্তে আরবদের জন্য এমন কিছুই চাই! আরবদের এমন কাউকে দরকার যা তাদের হয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে।

আমর ইবন লুহাই আল খুযাই আশ-শামের লোকদের কাছে একটা মূর্তি চাইলো যেন সে মূর্তিটি তার গোত্রের লোকদের কাছে নিয়ে যেতে পারে। তারা তাকে হুবাল নামের এক বিশাল মূর্তি দিল। সে হুবালের মূর্তি নিয়ে মক্কায় ফেরত গেল। হারামে গিয়ে আল-কাবার ঠিক পাশে একে স্থাপন করল। তার গোত্রের লোকদেরকে বলল যে মূর্তিটি তাদের হয়ে আল্লাহর সাথে মধ্যস্থতা করবে। মক্কা ছিল আরবের কেন্দ্রবিন্দু, ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যস্থল। আর এ কারণে মক্কার চারপাশে এই বিদআতটি যেন দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের মাঝে এই ভ্রান্ত প্রথাটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আরেকটি কারণ ছিল ব্যক্তি হিসেবে সমাজে আমর ইবন লুহাই আল খুযাইয়ের গ্রহণযোগ্যতা, তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে চাওয়ার প্রবণতা। সে তার গোত্রের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। তাই সবাই তাকে অনুসরণ করতে চাইত। মূর্তি বানানো এবং তা বিভিন্ন গোত্রের কাছে বিক্রি করা মক্কার একটি ব্যবসায় রূপ নিল। বিভিন্ন গোত্র মক্কায় আসত এবং মানুষ তাদের পছন্দের মূর্তি কিনে চলে যেতো। তারা বহনযোগ্য মূর্তি বানানো শুরু করল যাতে মূর্তিগুলো নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করা যায়।

মূর্তিপূজার বিষয়ে উমারের ﷺ একটি ঘটনা আছে, একদিন উমারকে দেখা গেল একবার হাসছেন আবার কাঁদছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে কেন তিনি এমন করছেন। তিনি বললেন, 'আমি জাহেলি যুগের একটি দিনের কথা ভেবে হাসছি। সে

দিন আমি ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার মূর্তিপূজা করার শখ জাগল। কিন্তু আমার মনে পড়ল যে আমি আমার মূর্তিটি ফেলে এসেছি। তাই আমি উপাসনার অন্য একটি উপায় বের করার চেষ্টা করলাম। তখন আমার সাথে ছিল কিছু খেজুর। আমি সেই খেজুরগুলো দিয়ে একটি মূর্তি বানালাম এবং সেই মূর্তির পূজা করলাম। সেই রাতে আমার অনেক খিদে পায়। তখন আমি খেজুরের তৈরি মূর্তিটি খেয়ে ফেলি।' উমার ﵁ পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে করছিলেন এবং অনুধাবন করছিলেন যে মূর্তি পূজারিরা কত বোকা! এভাবেই ইসলাম মানুষকে বদলে ফেলে। এটাই ইসলামের কারামত। ইসলাম মানুষকে তুচ্ছ অবস্থান থেকে অনেক উঁচু স্থানে উন্নীত করে। উমার ইবন খাত্তাবের ﵁ ব্যাপারে আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ তাঁর বইয়ে একটি প্রশ্ন তুলেছেন,

'ইসলাম ছাড়া উমার ইবন খাত্তাব কী হতে পারতেন?' এর উত্তরে তিনি ব্যাখ্যা করেন, 'তিনি তাঁর গোত্রের প্রধান হতে পারতেন, অথবা তিনি কুরাইশ গোত্রের একজন প্রসিদ্ধ নেতা হতে পারতেন অথবা সর্বোচ্চ তিনি কুরাইশ বংশের নেতা হতেন। তবে তিনি যদি কম বয়সে মারা যেতেন সেটাই হতো তাঁর জন্য প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক ঘটনা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন, এই বদঅভ্যাসের জন্য তিনি হয়তো অল্প বয়সে অপরিচিত অবস্থায় মারা যেতে পারতেন। কিন্তু ইসলাম তাঁকে ও তাঁর অবস্থানকে বদলে দিয়েছে। ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি শুধু সমগ্র আরবের নেতা হননি বরং তিনি পুরো পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশের নেতা হয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তি।'

মক্কায় মূর্তিপূজা সাধারণ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া যেত। আল-কাবা এইসব মূর্তি দ্বারা অপবিত্র হয়ে যায়। তখন কাবা শরীফে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। চারদিকে শির্কের ছড়াছড়ি। একটি আমদানি করা মূর্তি থেকে শির্ক সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। দিনে দিনে এটি একটি ব্যবসায় রূপ নেয়। এভাবেই ইসমাঈলের ﵇ আনীত দ্বীনের বিকৃতি ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি জাহান্নামে আমর ইবন লুহাই আল খুযাইকে নাড়িভুঁড়ি ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে চলতে দেখেছি।'[3] কারণ সে-ই আরবে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার প্রচলন করেছিল।

ইহুদি মতবাদের প্রচলন

ইয়েমেনের রাজা তুব্বান আসআদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে আশ-শামে গিয়েছিল। মদীনা অতিক্রম করার সময় সে তার ছেলেকে সেখানে রেখে যায় যেন সে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তার ছেলে মদীনায় ব্যবসা চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মদীনার কিছু লোক তার ছেলেকে মেরে ফেলে। মদীনায় ফিরে এসে সে তার ছেলের মৃত্যুসংবাদ পায়। এ সংবাদ শুনে সে মদীনাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাই সে মদীনায় আক্রমণ করে।

---

[3] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মানাকিব, হাদীস ৩১।

তার বিশাল সৈন্য বাহিনীকে মোকাবিলা করার মতো মদীনার তেমন শক্তিও ছিল না। তুব্বান চাইলে মদীনাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সে সময় হঠাৎ মদীনায় দুইজন ইহুদী পণ্ডিতের আগমন ঘটে।

রোমানরা জেরুসালেম দখল করার পর ইহুদিরা উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল। তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ শেষ নবীর খোঁজে আরবে চলে আসে। তাদের ধর্মগ্রন্থে শেষ নবীর আগমনের কিছু লক্ষণ ছিল, তারা মদীনায় সেই লক্ষণগুলো দেখতে পায়। তাই তারা মদীনায় বসতি স্থাপন করে। সেখানে বাস করত তাদের তিনটি গোত্র–বনু কায়নুকা, বনু নাযির এবং বনু কুরায়যা। ইহুদি পণ্ডিতরা তুব্বান আস'আদের কাছে গিয়ে বলে, 'দেখুন, এই স্থানটি আল্লাহ্ তাআলা সুরক্ষিত করে রেখেছেন, যদি আপনি মদীনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন তবে আল্লাহ্ আপনাকে ধ্বংস করে দেবেন।' তারা একথা সেকথা বলে শেষ পর্যন্ত তুব্বানকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, মদীনা আক্রমণ করলে তুব্বান ভুল করবে। তাদের কথায় তুব্বান এতটাই প্রভাবিত হয় যে, সে শুধুমাত্র মদীনা আক্রমণ থেকেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তার ইহুদি ধর্ম ভালো লেগে যায় এবং সেই ইহুদিদের ধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপর সে সেই পণ্ডিতদেরকে ইয়েমেনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। তারা রাজি হয় এবং অবশেষে তুব্বান ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে।

সেই সময় হাওয়াযিন এবং কুরাইশ গোত্রের মধ্যে বিরোধ চলছিল। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা মক্কা ও তুব্বান আস'আদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়ে আসছিল এবং তারা এই উদ্দেশ্য পূরণে সফলও হয়। তুব্বান মক্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন ইহুদি পণ্ডিতরা আবার তাকে বলল যে আল্লাহ্ তাআলা মক্কাকেও সুরক্ষিত করে রেখেছেন। তাই মক্কায় আক্রমণ করার বদলে তুব্বানের মক্কায় যাওয়া উচিত এবং কাবা শরীফ তাওয়াফ করা উচিত। তুব্বান ইহুদি পণ্ডিতদের সাথে মক্কায় গিয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ করার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তারা সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ ইহুদি আলিমদের জন্য কাবা তাওয়াফ করা সমীচীন হবে না কেননা কাবা মাটির তৈরি মূর্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং তুব্বান একাই মক্কায় যায় এবং কাবা শরীফ তাওয়াফ করে। তুব্বান সর্বপ্রথম কাবা শরীফকে চাদর দিয়ে আবৃত করে। সে প্রতি বছর একবার কাবার চাদর পরিবর্তন করত। পূর্বে তারা একটি চাদরের উপর অন্য চাদর বিছিয়ে দিতো। তারা মনে করতো যে, কাবার চাদর অনেক পবিত্র তাই এটি সরানো ঠিক হবে না। এই নিয়ম ততদিন বলবৎ থাকে যতদিন না অনেকগুলো চাদর কাবা শরীফের জন্য অতিরিক্ত ভারী হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তারা কাবার চাদর অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। তুব্বান আস'আদ ইহুদি পণ্ডিতদের নিয়ে ইয়েমেনে চলে যায় এবং সেখানে তাদেরকে ইহুদি মতবাদ প্রচারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উৎসাহ দেয়। বেশিরভাগ গোত্র এই মতবাদ গ্রহণ করে। সুতরাং তখনকার সময়ে দুই ধরনের ইহুদি ছিল। একদল ছিল জাতিগত ভাবে ইহুদি, এরা মূলত খায়বার ও মদীনায় বসবাস করত, আরেকদল ছিল বিশ্বাসগত ভাবে ইহুদি, এরা জাতিগতভাবে আরব, কিন্তু বিশ্বাসের দিক থেকে ইহুদি, এরা বসবাস করত ইয়েমেনে। এ থেকে বোঝা যায়,

এক সময়ে ইহুদিরা তাদের ধর্ম প্রচার করত যা তারা এখন আর করে না। এভাবেই আরবে ইহুদি মতবাদের প্রসার ঘটেছিল।

খ্রিস্টধর্মের আগমন

ঈসার ﷺ পর পর্যায়ক্রমে খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে অনেক অনুসারী ধর্মচ্যুত হয়। খুব কম সংখ্যক লোকই অবশিষ্ট ছিল যারা ছিল সত্যিকার অর্থে এই ধর্মের প্রকৃত অনুসরণ করতো। পরবর্তীতে তারাই পুনরায় খ্রিস্টধর্ম পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়। ঈসার ﷺ ধর্মের মূল বক্তব্য ছিল বিশুদ্ধ তাওহীদ।

সেই অনুসারীদের মধ্যেই একজন একবার ইয়েমেনে যান এবং সেখানে নাযরান নামের এক এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা শুরু করেন। সেখানে অনেক গোপনে এবং ধীরে ধীরে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ চলছিল। ততদিনে তুব্বান আস'আদ মারা যায়। আর ইয়েমেনের রাজা ছিল তার ছেলে যু নাওয়াস। নতুন এই ধর্মের কথা তার কানে পৌঁছলে সে এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর অনুসারীদের ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে।

আসহাবুল উখদুদের গল্প

সহীহ মুসলিমে এই সংক্রান্ত একটি কাহিনি বর্ণিত আছে, গল্পটি এক রাজা ও এক কমবয়সী ছেলেকে ঘিরে। অনেক আলিম গল্পটিকে রাজা যু নাওয়াস এবং ইয়েমেনের তাওহীদবাদী খ্রিস্টানদের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। ঘটনাটি এমন:

এক রাজা ছিল, সে জাদুবিদ্যা চর্চা করত এবং তার উপদেষ্টাও ছিল জাদুকর। কালের পরিক্রমায় একসময় জাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হয়। সে রাজাকে বলে, 'আমার তো সময় শেষ হয়ে আসছে, আমি যেকোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি। তাই আমি একজনকে এই জাদুবিদ্যা শিখিয়ে যেতে চাই যেন আমি মারা যাওয়ার পর সে আমার অভাব পূরণ করতে পারে।' তারা জাদুকরের উত্তরসূরির সন্ধান করতে থাকে। অতঃপর তারা এক বালককে সেই জাদুকরের ছাত্র হিসেবে মনোনীত করে। ছেলেটি খুব সকালে তার বাড়ি থেকে জাদুকরের কাছে জাদুবিদ্যা শিখতে যেত এবং রাতে নিজ বাড়িতে ফিরে যেত।

একদিনের ঘটনা, জাদুকরের বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে সে দেখলো একটি ইবাদাতখানা, তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সেখানে প্রার্থনার আওয়াজ শুনতে পেল। ছেলেটির কাছে এই ইবাদাত একটু অন্যরকম ঠেকলো, সে ঠিক এই ধরনের ইবাদাতের সাথে পরিচিত ছিল না। সে জায়গাটি ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিল। বস্তুত, এটি ছিল তাওহীদের গির্জা। সেখানে ঈসা ﷺ আনীত সত্য ধর্মের দাওয়াত দেওয়া হতো। সেখানে এক লোকের কাছে সে খ্রিস্টান ধর্মের ব্যাপারে জানতে পারলো এবং তা

তাকে অভিভূত করলো। কিন্তু ওই সময়ে তার জাদুকরের কাছ থেকে জাদু শিখার কথা ছিল। ছেলেটি বুঝাতে পারছিল না সে কী করবে -- এখানে থাকবে নাকি জাদুকরের কাছে চলে যাবে, সে গির্জার ধর্মযাজককে জিজ্ঞাসা করলো যে এই ব্যাপারে তার কী করণীয়। তিনি তাকে প্রতিদিন সকালে তার কাছে এসে শিক্ষাগ্রহণের পরামর্শ দিলেন এবং তারপর জাদুকরের কাছে যেতে বললেন। যদি জাদুকর দেরি করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে যেন বলে, 'আমার পিতামাতার জন্য দেরি হয়েছে।' তিনি তাকে আরো বললেন, বাড়ি ফেরার আগে সে যেন আবার গির্জা হয়ে যায়। যদি তার পিতামাতা বাড়িতে দেরি করে ফেরার কারণ জানতে চায় তাহলে সে যেন বলে যে জাদুকর তাকে দেরি করিয়ে দিয়েছে।

এভাবেই সেই অল্পবয়স্ক ছেলেটির দিন কাটতে লাগলো, সে জাদুকরের কাছে যাওয়ার আগে এবং বাড়ি ফেরার পথে গির্জা থেকে দীক্ষা নিয়ে যায়। একদিন একটি ঘটনা ঘটলো, এক ভয়ানক জন্তু বাজারে ঢুকে পড়লো এবং বাজারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। কেউ জন্তুটিকে থামাতে পারছিল না। তখন ছেলেটি বললো, 'হে আল্লাহ! আমি আজকে জানতে চাই যে ধর্মযাজক এবং জাদুকর, এই দুইজনের মধ্যে কে সঠিক পথের উপর আছে। হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দাও।' সবাই জন্তুটিকে হত্যা করার চেষ্টা করলো কিন্তু কেউ সফল হলো না। সে একটি পাথর হাতে নিয়ে বললো, 'হে আল্লাহ! যদি গির্জার ধর্মযাজক সত্য পথের উপর থাকে তাহলে এই পাথর দ্বারা জন্তুটিকে মেরে ফেলো।'

সে সেই জন্তুর দিকে পাথরটি ছুঁড়ে মারলো এবং জন্তুটি সাথে সাথে মারা গেল। ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে ছেলেটি সব কিছু খুলে বললো। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, 'তুমি আজকে অনেক উঁচু পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছো। এখন তোমাকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।'

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা ছাড়া কেউ উঁচু মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে পরীক্ষা করার জন্য মানুষদের পাঠিয়েছেন। আর সবাইকে তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে পরীক্ষা করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ। এরপর পর্যায়ক্রমে যোগ্যতা অনুসারে সবার পরীক্ষা নেওয়া হয়।'

ধর্মযাজক বালকটিকে বলেছিলেন যে, সে শীঘ্রই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তিনি আরো বললেন যে, 'যখন পরীক্ষার সময় আসবে তখন তুমি আমার নাম কারো কাছে প্রকাশ করে দিও না।' তিনি ভয় পেয়ে নিজের নাম প্রকাশ করতে চাননি–বিষয়টা এমন ছিল না। যেহেতু তাঁর দাওয়াহর পুরো কার্যক্রমটাই গোপনে পরিচালিত হচ্ছিল তাই তিনি সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এমনটি করেছেন।

অন্যদিকে, রাজার একজন অন্ধ উপদেষ্টা ছিল। তিনি এই বালকের কাছে আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে গেলেন। এই বালক ততদিনে সবার কাছে বেশ পরিচিতি লাভ

করেছিল এবং সবাই তার কাছে বিভিন্ন সাহায্যের জন্য আসতো। যখন রাজার উপদেষ্টা বালকের কাছে গেলো, সে বললো, 'আমি নই, বরং আল্লাহ তাআলাই আপনাকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন।' অতঃপর সে আল্লাহর সাহায্যে লোকটির অন্ধত্ব দূর করে দিল। সুস্থ হওয়ার পর লোকটি রাজার কাছে গেলে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কে তোমাকে সুস্থ করে তুললো?' লোকটি বললো, 'আল্লাহ।' তখন রাজা বললো, "কী! আমি ছাড়া তোমার আর কি কোনো রব আছে?' লোকটি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ আছে। আল্লাহ আমার রব এবং আপনারও।'

এরপর রাজা তার এই উপদেষ্টাকে অনেক অত্যাচার করলো যাতে সে ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করে যে তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। অনেক অত্যাচারের পর সে ছেলেটির নাম প্রকাশ করে দিল। ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করা হলো, তাকেও অনেক নির্যাতন করা হলো। সে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তার শিক্ষকের নাম বলে দিতে বাধ্য হলো। এরপর ধরে আনা হলো বালকের দীক্ষাগুরু সেই ধর্মযাজককে। তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হলো। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। এরপর তারা একটি করাত এনে তার মাথার উপর রাখলো আর তাকে কেটে দু'ভাগ করে ফেললো। কিন্তু তবুও তিনি তার দ্বীন ত্যাগ করতে রাজি হননি। অদম্য সাহসিকতার এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত!

বাকি থাকল সেই ছেলেটি। রাজা ছেলেটিকে পাহাড়ের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার আদেশ করলো। ছেলেটি আল্লাহর কাছে দুআ করলো, 'হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে ভালো মনে করো সেভাবেই আমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করো।' সে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করলো। তারা ছেলেটিকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে গেলো। সেখানে পৌঁছানো মাত্রই পাহাড়টি কেঁপে উঠলো এবং ছেলেটি ছাড়া বাকি সব সৈন্য পাহাড় থেকে পড়ে গেল। এরপর ছেলেটি রাজার প্রাসাদে ফিরে গেল। রাজা তখন অন্য আরেকদল সৈন্যকে আদেশ দিল যে তাকে যেন গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। তারা নৌকা করে সমুদ্রে গেল এবং সে পুনরায় একই দুআ করলো, 'হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে ভালো মনে করো সেভাবেই আমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করো।' হঠাৎ মাঝপথে নৌকাটি উল্টে গেলো এবং সে ছাড়া সবাই ডুবে মারা গেলো। সে আবার রাজার কাছে ফিরে গেল।

পুনরায় রাজা ছেলেটিকে মারতে চাইলো এবং সে আরো এক দল সৈন্য নিয়োগ দিল। সে ছেলে তাকে বললো, 'আপনি আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মারতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি আমার কথামত কাজ করেন।' রাজা প্রশ্ন করলো, 'কী সেই কাজ?' তখন বালকটি বললো, 'আপনি আমাকে রশি দিয়ে একটি গাছের সাথে বেঁধে সেখানে সবাইকে জড়ো করেন। তারপর আপনি আপনার তীর নিয়ে বলবেন – বিসমিল্লাহ! এই বালকের রবের নামে। এই কাজ করলে আপনি আমাকে মেরে ফেলতে পারবেন।' অর্থাৎ ছেলেটি রাজাকে বলে দিল কীভাবে তাকে মেরে ফেলতে হবে।

ফিদায়ী বা আত্মোৎসর্গমূলক হামলা বা অভিযানের বৈধতার পক্ষের বিভিন্ন দলীলের

মধ্যে এই ঘটনাটি প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করা হয়। আল্লাহ তাআলার খাতিরে নিজের জীবন উৎসর্গ করা নিঃসন্দেহে একটি বৈধ কাজ, তবে কখন এবং কোথায় এই কাজটি করা যাবে সেই ব্যাপারে অবশ্যই কিছু বিধিনিষেধ আছে। কারণ এই ঘটনায় দেখা যাচ্ছে ছেলেটি রাজাকে বলে দিয়েছিল যে কীভাবে তাকে মেরে ফেলা সম্ভব। ছেলেটি এই কাজ করেছে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে।

রাজা ছেলেটির বলে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করলো। 'বিসমিল্লাহ! এই ছেলের রবের নামে' – এই কথা বলে সর্বসমক্ষে রাজা তার দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। তীরটি সরাসরি ছেলেটির মাথায় বিঁধে যায়। ফলে সে সাথে সাথে মারা যায়। এটা দেখে ঘটনাস্থলের সবাই মুসলিম হয়ে যায়। ছেলেটি নিজের জীবন বিসর্জন দিল যেন অন্যের জীবন বাঁচতে পারে, আর বেঁচে থাকার অর্থ তো একমাত্র ইসলামের মধ্যেই নিহিত। যে জীবনে ইসলাম নেই, সেই জীবনের কোনো মূল্য নেই। নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে সে একদল মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে গেল।

অতঃপর রাজার উপদেষ্টারা তাকে বললো, 'হায় হায়! আপনি যা আশঙ্কা করছিলেন তা-ই ঘটলো।' ছেলেটিকে রাজা মেরে ফেলতে চেয়েছিল যেন তার দ্বীন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, অথচ এখন সবাই ছেলেটিকে মারা যেতে দেখে মুসলিম হয়ে গেল, রাজার পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। রেগে গিয়ে রাজা যু নাওয়াস একটি বড় গর্ত খোঁড়ার জন্য তার সৈন্যদের আদেশ দেয়। তারপর সেই গর্তে কাঠ রেখে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। লোকদেরকে বলা হলো তাদের নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করতে। যারা অস্বীকৃতি জানালো তাদের সবাইকে ধরে ধরে এই আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো। অনেক মানুষকে সেই জ্বলন্ত আগুনে সেদিন জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এরা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিল। তারা পিছু হটেনি, ছাড়ও দেয়নি।

গল্পের শেষটা অসাধারণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'একজন মহিলা আগুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, তার কোলে ছিল তার বাচ্চা। বাচ্চাটির জন্য সে মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন সেই কোলের শিশুটি বলে উঠে, 'মা! আপনি শান্ত হোন কারণ আপনি সত্য পথে আছেন', আর এই কথা শুনে মহিলা নির্ভীকচিত্তে আগুনে ঝাঁপ দেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, 'তিনজন শিশু আছে যারা (অলৌকিকভাবে) শিশু বয়সে কথা বলে উঠেছিল। এই শিশুটি তাদেরই একজন।'[4]

সূরা আল-বুরুজে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। তাদেরকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেলা

---

[4] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮। তবে ইবন ইসহাক কাহিনীটি অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণনা অনুসারে রাজা ইসলাম গ্রহণ করে মারা যায় এবং বাকি সকলেও মুসলিম হয়ে যায়। তিন শিশুর দোলনায় কথা বলার হাদীসটি বুখারিতে উল্লেখিত আছে -- অধ্যায় নবীদের কথা, হাদীস ১০৭।

হয়েছিল, কিন্তু বস্তুত তারা মৃত্যুর মাধ্যমে নতুন জীবন লাভ করেছে। মনে হতে পারে যে, এখানে রাজা বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বলছেন ভিন্ন কথা, তিনি বলেছেন,

"...এটিইতো বিরাট সাফল্য।" (সুরা বুরুজ: ১১)

আল্লাহ্ তাআলা কেন এমন একদল মানুষকে বিজয়ী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যারা আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে? প্রকৃত বিজয় দুনিয়াবী শক্তির বিজয় নয়, বরং প্রকৃত বিজয়ী তারাই, যারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সত্য আদর্শের উপরে, নিজ বিশ্বাসের উপর অটল থাকে। জান্নাতে প্রবেশ করতে পারাই হচ্ছে বিজয়, আর তাই শহীদরা অবশ্যই বিজয়ী, যদিও তারা অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হন বা কষ্ট ভোগ করেন।

সেদিন সব মুসলিমকে হত্যা করা হলেও তাদের মধ্যে একজন বেঁচে যান, তিনি রোমান সম্রাটের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কারণ সেই সম্রাট ছিল খ্রিস্টান। খ্রিস্টানরা তৎকালীন সময় বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল, কেননা ততদিনে রোমান খ্রিস্টানরা ত্রিতত্ত্ববাদ ও ঈসাকে ﷺ ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করে তাদের ধর্মকে বিকৃত করে ফেলে। এই কারণে বিভিন্ন ফিরকার উদ্ভব হয়। সেই বেঁচে যাওয়া মানুষটি রোমান সম্রাটের কাছে গিয়ে তাদের অবস্থার কথা বুঝিয়ে বললেন এবং রোমান সম্রাটের কাছে সাহায্য চাইলেন। রোমান সম্রাট তখন বললো, 'আমরা ইয়েমেন থেকে অনেক দূরে আছি। তবে আমি যা করতে পারি, তোমাদের অবস্থার কথা জানিয়ে আবিসিনিয়ার নাজ্জাশির কাছে সংবাদ পাঠাতে পারি, আশা করি সে তোমাদের সাহায্য করতে পারবে।' তখন আবিসিনিয়ার নাজ্জাশিও খ্রিস্টান ছিলেন। তাই রোমান সম্রাট তাঁর কাছে খবর পাঠালো।

অতঃপর নাজ্জাশি তাঁর সেনাপতি আরইয়াতের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান। তারা ইয়েমেন আক্রমণ করে যু নাওয়াসের সাথে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে যু নাওয়াস পরাজিত হয় এবং লোহিত সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ইয়েমেনের কিছু অংশে তখন আবিসিনিয়ার শাসন শুরু হয়। প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা এই আক্রমণ পরিচালনা করে কারণ ইয়েমেনের ইহুদিরা খ্রিস্টানদের হত্যা করেছিল। আরইয়াত কিছুদিনের জন্য ইয়েমেন শাসন করে। এমন সময় আরইয়াতের এক সেনাপতি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে এবং এই বিদ্রোহের ফলে ইয়েমেনে বসবাসরত আবিসিনিয়ানরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল আরইয়াতের পক্ষে এবং অন্যদল ছিল বিদ্রোহী সেনাপতি আবরাহার পক্ষে। দল দুটি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

আরইয়াত আবরাহাকে বলে, 'আমরা যদি দুই দল মিলে যুদ্ধ করি তাহলে ইয়েমেনের লোকেরা আমাদের হাত থেকে ইয়েমেন ছিনিয়ে নেবে। কেমন হয় যদি শুধু আমরা দুইজন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি?' আবরাহা রাজি হয়, কিন্তু সে একটি চক্রান্ত

করে। সে গোপনে তার কয়েকজন দেহরক্ষীর সাথে আরইয়াতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো যে, যদি তারা আবরাহাকে হারতে দেখে তবে তারা যেন তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। বর্ণনামতে আরইয়াত ছিল লম্বা এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। অন্যদিকে আবরাহা ছিল খাটো এবং স্থূলকায়। তারা যখন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল তখন চারপাশে অনেক মানুষ যুদ্ধ দেখছিল। যুদ্ধের প্রথমেই আরইয়াত আবরাহাকে আক্রমণ করে এবং এক পর্যায়ে তার নাক কেটে ফেলে। এমন অবস্থায় আবরাহার একজন রক্ষী এগিয়ে এসে আরইয়াতকে মেরে ফেলে। এভাবেই আবরাহা ইয়েমেনের শাসনক্ষমতা দখল করে।[5]

আবরাহার বাহিনী ও 'হাতির বছর'

আবরাহা ইয়েমেন দখল করে নিয়ে সেখানে শাসন করা শুরু করে। সে সবাইকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চাচ্ছিলো। কাবাঘরের প্রতি আরবদের বিশেষ দুর্বলতা ছিল, তাই সে এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে কাবার অনুরূপ 'আল-কালিস' নামের একটি চমৎকার গির্জা নির্মাণ করে। কাবার সাথে প্রতিযোগিতা করার উদ্দেশ্যে এই গির্জা বানানো হয়েছিল। কিন্তু এই কাজটি আরব গোত্রগুলোর পছন্দ হয়নি। একদিন রাতের অন্ধকারে একজন গির্জায় গিয়ে মলত্যাগ করে এবং গির্জার দেওয়ালে মল ছুঁড়ে নোংরা করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় আবরাহা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। সে কাবা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। আবরাহা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে অভিযান শুরু করে। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। নুফাইল নামের একজন গোত্রনেতা তার বিরোধিতা করে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সে আবরাহার কাছে হেরে যায় এবং যুদ্ধবন্দী হয়।

আবরাহা আত-তাইফে পৌঁছানোর পর সেখানকার লোকেরা তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে, কেননা কুরাইশদের সাথে তাইফবাসীর শত্রুতা ছিল। তাইফের এক লোক আবরাহার বাহিনীকে পথ দেখানোর জন্য রাজি হয়, কিন্তু তাইফ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে সে মারা যায়।

আবরাহা আরবের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছাল। সেখানে একটি চারণভূমিতে কিছু মেষ এবং উট চড়ছিল। আবরাহা সেগুলো দখল করে নেয়। এই মেষ এবং উটগুলো ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ দাদা আবদুল মুত্তালিবের।

আবদুল মুত্তালিব আবরাহার সাথে দেখা করতে গেলেন। অন্যদিকে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন নুফাইলের বন্ধু। নুফাইল আবরাহার কাছে বন্দী ছিলেন। বন্দী অবস্থাতেই নুফাইলের সাথে উনাইস নামের এক ব্যক্তির বন্ধুত্ব হয়। উনাইস ছিল আবরাহার বাহিনীর হস্তীচালক। আবদুল মুত্তালিব নুফাইলের সাথে দেখা করে তাকে বলেন যে, তিনি আবরাহার সাথে দেখা করতে এসেছেন। নুফাইল উনাইসের সাথে কথা বলে আবরাহার সাথে আবদুল মুত্তালিবের দেখা করার বন্দোবস্ত করে দেন। উনাইস আবরাহার সাথে আবদুল মুত্তালিবের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। আবরাহা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়।

বর্ণনানুসারে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন সুপুরুষ এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাকে দেখে যেকোনো মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক ঘটবে। আবদুল মুত্তালিবকে দেখার সাথে সাথেই আবরাহা খুব সম্মানের সাথে তাকে স্বাগত জানায়, যদিও তখনও আবদুল মুত্তালিবের সাথে আবরাহার কথা হয়নি। আবরাহা ছিল রাজা, তার সাথে কেউ দেখা

করতে আসলে সে অনেক উঁচু একটি সিংহাসনে বসতো এবং বাকিরা নিচে, তার পায়ের কাছে বসতো। কিন্তু সে আবদুল মুত্তালিবকে দেখার পর তাকে পায়ের কাছে বসানো পছন্দ করলো না। সে চাইলে আবদুল মুত্তালিবকে তার সিংহাসনে বসার জন্য বলতে পারতো, কিন্তু তা না করে আবরাহা আবদুল মুত্তালিবের সাথে মেঝেতে বসলো এবং তার দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চাইলো যে তিনি কী চান।

কোনো রাখঢাক না রেখে আবদুল মুত্তালিব দোভাষীকে সরাসরি বললেন, 'আবরাহা আমার দু'শ উট লুট করেছে। আমি তা ফেরত নিতে এসেছি।'

- প্রথম দেখায় তোমার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি এসেছি তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের লাঞ্ছিত করতে, তোমাদের দেশ ধ্বংস করতে। আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বানানো আল-কাবা ভেঙে দিতে চাই। আর তুমি কিনা এসেছ আমার কাছে উট চাইতে?

- এই উটের মালিক আমি, তাই আমি আমার উট নিয়ে যেতে এসেছি। কাবা ঘরের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তাই আল্লাহই এর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

অতঃপর আবরাহা আবদুল মুত্তালিবের উট ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিল। আবদুল মুত্তালিব মক্কায় ফিরে গেলেন আর তাঁর গোত্রের লোকদের বললেন, 'আবরাহার সাথে যুদ্ধ কোরো না, মক্কা থেকে পালিয়ে যাও।' আবদুল মুত্তালিব পরিষ্কারভাবে সবাইকে পরিস্থিতির কথা জানিয়ে দিলেন। সবাই মক্কা ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আবদুল মুত্তালিব সবার শেষে মক্কা ত্যাগ করেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি কাবার চাদর জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর নিকট দুআ করেন যেন আল্লাহ তাআলা তাঁর ঘরকে রক্ষা করেন। তারপর তিনি মক্কা থেকে চলে যান।

আবরাহা তার সৈন্যদলকে কাবার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয় কিন্তু হাতিগুলো কিছুতেই সামনে এগোচ্ছিলো না। হাতি চালকরা তাদের হাতিগুলো অন্য কোনো দিকে চালনা করলে হাতিগুলো সেদিকে দৌড়ে যেতো। কিন্তু তাদেরকে মক্কার দিকে ঠেলা হলে তারা সেখানেই বসে পড়তো। এটা ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কারামত। বলা হয়ে থাকে উনাইস নামের সেই লোকটি হাতির কানের কাছে গিয়ে বলেছিল, 'এটা আল্লাহর ঘর, একে আক্রমণ কোরো না'–এই বলে সে পালিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, কোনো না কোনো কারণে হাতিগুলো কাবার দিকে এগুচ্ছিলো না।

তারা হাতিগুলোকে মারতে লাগলো, তাদের বল্লম দিয়ে খোঁচা দিয়ে রক্তাক্ত করে ফেললো কিন্তু তবুও হাতিগুলো কাবার দিকে একচুল পরিমাণ নড়লো না। অবশেষে তারা হাতিগুলোকে পিছনে ফেলে সামনে এগোনোর সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ তাআলা এবার তাঁর সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। যেকোনো কিছুই আল্লাহর সৈন্য হতে পারে; পানি,

বাতাস, জীব-জন্তু। আল্লাহ তাআলা এবার সৈন্য হিসেবে প্রেরণ করলেন এক দল পাখি। সবগুলো পাখি পায়ে একটি করে পাথরের নুড়ি নিয়ে আবরাহার বাহিনীর দিকে উড়ে গেল এবং পাথর ছুঁড়ে তারা নিমেষেই আবরাহার বাহিনী ধ্বংস করে ফেললো।[6] সূরা আল-ফীলে এই ঘটনা বর্ণিত আছে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্মের বছরে এই ঘটনা ঘটেছিল। তাই তাঁর জন্মের বছরকে 'হাতির বছর' বলা হয়।

[6] সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২। পুরো কাহিনীটি খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ আবির্ভাব: শৈশব, পেশা এবং বৈবাহিক জীবন

রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্ম

রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্মের সময় আরব এবং পুরো বিশ্বের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক, সে সময় তাদের পথ নির্দেশনা বা নেতৃত্বের খুব প্রয়োজন ছিল। তবে তখনও মানুষের মাঝে কিছু ভালো গুণ বিদ্যমান ছিল। যেমন আরবরা বেশ উদার ও অতিথিপরায়ণ ছিল, তারা কথা দিয়ে কথা রাখতো। তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রবল, তাদের মধ্যে আরো ছিল লজ্জাবোধ এবং অন্যায়কে রুখে দেওয়ার মানসিকতা। তাদের ছিল দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, উদ্যম এবং সারল্য। আরবদের এই চমৎকার গুণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সাহাবারা ﷺ এই গুণগুলোর অধিকারী ছিলেন, আর তাই তাঁরা এই দ্বীন প্রচারে সফল হয়েছিলেন। সাহাবাদের ﷺ উদারতা আর আতিথেয়তার কারণে তারা যেখানে যেতেন সেখানেই তাদেরকে সকলে বরণ করে নিত, তাদের স্বাগত জানাতো। জনগণের চোখে তারা মোটেও ঘৃণিত দখলদার ছিলেন না, বরং তারা সাহাবীদেরকে ﷺ পেয়েছিল মুক্তিদাতা সৈনিক হিসেবে। মিসর ও সিরিয়াতে এমনটা হয়েছিল। মুসলিমরা যখন তাদেরকে রোমান শাসনের অধীন থেকে উদ্ধার করে লোকজন তখন অনেক খুশি হয় এবং তাদেরকে মুক্তিদাতা হিসেবে স্বাগত জানায়।

সাহাবাগণ ﷺ ক্ষমতা বা কর্তৃত্বলোভী ছিলেন না। অনেক সময়ই তারা নিজেদের হাত থেকে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে যোগ্য লোকদের হাতে তুলে দিতেন। তারা তাদেরকে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের হাতেই নেতৃত্ব হস্তান্তর করে যেতেন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির মতো জনগণের সম্পদ লুট করার জন্য সাহাবারা ﷺ যুদ্ধ করতেন না, বরং তাদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতে তারা যুদ্ধ করতেন। তাঁরা ছিলেন বিশ্বস্ত, অঙ্গীকার পূরণে সদা-সচেষ্ট এবং নির্ভরতার প্রতীক। স্থানীয় জনগণের কাছে তাদেরকে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহিতা করতে হত। এই গুণগুলো দাওয়াহর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মক্কা ও মক্কার মানুষগুলোকে শেষ নবীর রিসালাতের স্থান হিসেবে অন্য সবকিছুর উপর মনোনীত করেছেন। কেননা তাদের মাঝেই ইসলামের বার্তা বহন করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই বছর জন্মগ্রহণ করেন, যে বছর আল্লাহ তাআলা আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। নবী ﷺ জন্মের সময় সম্পর্কিত অনেক বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই সহীহ নয় তাই সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া ভালো।

যখন নবীজির ﷺ মা আমিনা গর্ভবতী ছিলেন, তাঁর বাবা আবদুল্লাহ আশ-শামে সফররত ছিলেন। কিন্তু তিনি মদীনার কাছাকাছি একটি স্থানে এসে মারা যান। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। অর্থাৎ আবদুল্লাহ তাঁর পুত্রের জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্মের সময় তাঁর মা আমিনা একটি আলো দেখতে পেলেন।[7] তাঁর শরীর থেকে এই আলো বেরিয়ে আসছিল এবং সেই আলো আশ-শাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আলোর দ্বারাই প্রকাশ পাচ্ছিল যে, মুহাম্মাদের ﷺ বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে যাবে।

ইমাম আহমেদ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায়, লোকেরা মুহাম্মাদকে ﷺ নিয়ে নানা রকম কথা বলতো। যেমন তারা বলতো যে, মুহাম্মাদ যেন শুষ্ক মরুভূমিতে জন্ম নেওয়া একটি সবুজ সতেজ গাছ। তারা বোঝাতে চাইতো যে তিনিই তাদের বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, 'লোকেদের কিছু কথা রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট পৌঁছালো, তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা বলো, আমি কে?' তারা বললো, 'আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন,

> *'আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির সেরা অংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি সব সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, এবং আমাকে সেই দুইয়ের মাঝে উত্তম দলটিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি মানুষকে অনেক গোত্রতে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ গোত্রের মাঝে স্থান দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে অনেকগুলো বংশে ভাগ করেছেন এবং আমাকে সেরা বংশে জন্ম দিয়েছেন যারা তাদের গোত্রের মাঝে সেরা এবং চেতনায় অগ্রগামী।'*

রাসূল ﷺ খারাপ মানুষদের মধ্যে প্রেরিত ভালো মানুষ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সেরাদের মধ্যে সেরা। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য থেকে কিনানাকে পছন্দ করেছেন, এবং কিনানার মধ্য থেকে কুরাইশদেরকে মনোনীত করেছেন, এবং তিনি কুরাইশদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন বনু হাশিমকে এবং তিনি বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।'[8] অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন, 'আমি বৈবাহিক সম্পর্কজাত সন্তান, আদম ﵇ থেকে শুরু করে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত আমার বংশধারায় কোনো অবৈধ সন্তান নেই। জাহিলিয়াতের ব্যভিচার আমার বংশকে দূষিত করতে পারেনি।'

---

[7] মুসনাদ ইমাম আহমাদ, ৫/২৬২।

[8] তিরমিযী, অধ্যায় রাসূলুল্লাহর (সা) মর্যাদা, হাদীস ৩৯৬৪ (আরবি রেফারেন্স)।

জাহিলিয়াতের যুগে যদিও যিনা ব্যভিচার জাতীয় অনৈতিক কার্যকলাপ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউই এমন জঘন্য কাজে অংশ নেয়নি, আল্লাহ তাঁর বংশধারাকে সবসময় হেফাজত করেছেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ নামসমূহ

মুহাম্মাদের ﷺ সবচেয়ে সুপরিচিত নাম হলো, মুহাম্মাদ এবং আহমাদ। কিন্তু এগুলো ছাড়াও তাঁর আরও কিছু নাম আছে। তাঁর পরিবার থেকে তাঁকে নাম দেওয়া হয়েছিল মুহাম্মাদ। তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে এই নাম দেন। "মুহাম্মাদ" নামের অর্থ হলো যিনি প্রশংসিত। লোকজন তাঁর প্রশংসা করতো তাঁর চরিত্র, তাঁর কাজ, ও তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য, তিনি ছিলেন প্রশংসার মূর্ত প্রকাশ। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন সেই মানুষ যাকে দিনে-রাতে প্রতি মুহূর্তে প্রশংসা করা হয়। ইতিহাসে এমন আর কোনো মানবসত্তা নেই যাকে মানবজাতি এত প্রশংসা করেছে। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁর নামের অর্থকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। আহমাদ ও মুহাম্মাদ নাম দুটি একই মূল শব্দ থেকে এসেছে, 'হামদ'। হামদ মানে প্রশংসা। 'মুহাম্মাদ' মানে প্রশংসার অধিকারী। 'আহমাদ' মানে হলো, যিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন। রাসূল ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করেন, এবং তাঁর প্রশংসা অন্য সবার চাইতে বেশি।

মুহাম্মাদের ﷺ আরো কিছু নাম আছে, যা হাদীস থেকে জানা যায়, তার মাঝে একটি হলো "আল হাশির", আল হাশির অর্থ হচ্ছে জড়োকারী, যার জাগরণের সাথে সাথে সমগ্র মানবজাতির পুনরুত্থান ঘটবে এবং তার পেছনে জড়ো হবে। নবী মুহাম্মাদকে ﷺ হাশরের দিন সর্বপ্রথম পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং পুরো মানবজাতি তাঁর পুনরুজ্জীবনের পর জাগ্রত হবে। "আল-মুকতাফ" বা "উত্তরসূরি" - তাঁর আরেকটি নাম। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন নবী ও রাসূলদের মধ্যে সর্বশেষ। আর কেউ তাঁর পরে নবী বা রাসূল হিসেবে আসবেন না, এ কারণে তিনি হলেন সকল নবীর সর্বশেষ উত্তরসূরি। "আল মাহী" তাঁর আরেক নাম, যার অর্থ হলো "নিশ্চিহ্নকারী", যিনি কুফরিকে মুছে ফেলেন বা নিশ্চিহ্ন করেন। মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া আর কোনো নবীই পুরোপুরিভাবে কুফরিকে অপসারণ করতে পারেননি, যদিও নবীজির ﷺ এই মিশন তাঁর হাতে পূর্ণ হয়নি, তবে তা তাঁর উম্মাহর হাত দিয়ে অর্জিত হবে, তাঁর উম্মাহ এখনও পর্যন্ত এই মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সেই মুহূর্তে আসবে যখন সারা বিশ্ব মুসলিম হয়ে যাবে, সেটা আসবে উম্মাতে মুহাম্মাদীর হাতে, ঈসার ﷺ নেতৃত্বে। তাই, মুহাম্মাদই ﷺ কুফরকে সমূলে দূরীভূত করতে সফল হবেন। তাঁর আরেকটি নাম হচ্ছে "নাবিয়্যুল মালহামা" বা "যুদ্ধের নবী।" মালহামা মানে একটি যুদ্ধ নয়, বরং মালহামা দ্বারা বোঝানো হয় একের পর এক সংঘটিত ভয়ংকর যুদ্ধ। নবীজির ﷺ এই নামের একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি অর্থ হতে পারে যে, তাঁর উম্মাহ জিহাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে এই নামের অন্য অর্থও রয়েছে।

শৈশব

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রথম জীবনে লালিত হয়েছিলেন তাঁর মা এবং উম্মে আইমানের হাতে, যাঁর আসল নাম বারাকা। উম্মে আইমান ছিলেন একজন আবিসিনিয়ান মহিলা। তিনি মক্কায় বাস করতেন। তিনি পরবর্তীতে মুসলিম হন। রাসূল ﷺ তাঁকে তাঁর মুক্ত করা দাস যায়িদ ইবনে হারিসের সাথে বিবাহ দেন। আরব নগরীর একটি ঐতিহ্য ছিল তাদের সন্তানদেরকে বড় করার জন্য মরুভূমিতে পাঠানো। তারা বিশ্বাস করতো যে মরুভূমির পরিবেশ হলো স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ। মরুভূমি ছিল গরম এবং শুষ্ক, ফলে তা জীবাণুদের টিকে থাকার জন্য খুবই অনুপযুক্ত পরিবেশ। তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, মরুভূমির প্রখরতা তাদের ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় আর শক্তিশালী করে তোলে। তাই তারা তাদের সন্তানদের শহর থেকে দূরে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিত। রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন বনু সাদের ভূমিতে।

হালিমা সাদিয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দুধ-মা। তিনি তাঁর বান্ধবীদের সাথে মক্কায় এসেছিলেন শিশুর খোঁজে, যাকে তারা লালন-পালন ও দুধ খাওয়াবার জন্য নিয়ে যাবেন। এটা ছিল তাদের ব্যবসা। এই বেদুইন মহিলাগণ মক্কায় আসতো, আর কিছু শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেতো। এর বিনিময়ে তারা অর্থ লাভ করতো। যে বছর তিনি মক্কায় যান সেটি ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। আর তারাও ছিলো হতদরিদ্র। তারা মক্কার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের খোঁজ করতে লাগলো। বেদুইন মহিলাদের প্রত্যেকের কাছেই মুহাম্মাদকে ﷺ উপস্থিত করা হয়, কিন্তু তারা কেউই তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। এর কারণ ছিল, নবীজি ﷺ ছিলেন এতিম। তারা বলতে লাগলো, 'এই এতিম আমাদের কী উপকার করবে? কে আমাদেরকে টাকা দেবে, তাঁর তো বাবা মারা গেছে।' তারা ভাবলো যে তাঁর মা তাদেরকে বেশি কিছু দিতে পারবেন না। হালিমার ভাষায়,

"দিন শেষে আমার সব বান্ধবী নিজেদের সঙ্গে শিশুদেরকে নিয়ে তাদের তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিল, একমাত্র আমি ছাড়া। আমি আমার সাথে নেবার মতো একটি শিশুকেও পেলাম না! রাতের বেলা আমার স্বামীকে ডেকে বললাম, শোনো, আমি আগামীকাল সকালে মুহাম্মাদ নামের ওই বাচ্চাটিকেই নিয়ে আসব, আমি খালি হাতে ফিরে যেতে চাই না।

আমার স্বামী রাজি হলেন। পরদিন সকালে আমি মুহাম্মাদের মা আমিনা বিনতে ওয়াহাবের কাছে গেলাম। তাঁকে গিয়ে বললাম, আমি আপনার সন্তানকে নিতে রাজি আছি।

এর আগের রাতে আমরা একটুও ঘুমাতে পারিনি কারণ আমাদের উটগুলি কোনো দুধ দিচ্ছিল না, দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কারণে আমি আমার সন্তানকেও দুধ পান করাতে পারিনি। সে সারারাত কান্নাকাটি করে আমাদেরকেও ঘুমুতে দেয় নি। যখন আমি মুহাম্মাদকে

আমার তাঁবুতে নিয়ে এলাম, আমার স্তন যেন এই শিশুকে স্বাগত জানালো। তাঁকে সবটুকু দুধ দিলো, যতখানি তাঁর প্রয়োজন ছিল। সেই দুধ আমার সন্তানের জন্যেও যথেষ্ট ছিল। সেই রাতে আমরা অনেকদিন পর পুরো রাত শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছিলাম। কারণ আমার ছেলে গত কয়েক রাত ধরে ঠিকমতো ঘুমুতে পারেনি। আমার স্বামী এরপর উটের দুধ দোহন করতে গেলে, উটটি এত দুধ দিল যে আমার স্বামী আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, 'হালিমা, তুমি তো এক বরকতময় আত্মাকে নিয়ে এসেছো!'

মক্কায় আসার সময় আমি একটি দুর্বল বৃদ্ধ গাধার পিঠে ছিলাম। এটি এত ধীরে চলছিল যে এটার সাথে তাল মিলাতে গিয়ে অন্যদেরও আস্তে চলতে হচ্ছিল আর এ কারণে বাকি সবাই বিরক্ত হচ্ছিল। অথচ ফিরে যাওয়ার দিন আমার গাধাটিই হয়ে যায় পুরো দলের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী গাধা!

আমার বান্ধবীরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো,

-তুমি তো এই গাধার পিঠে চড়েই মক্কায় এসেছিলে, তাই না?

- হ্যাঁ, এটা সেই গাধাটাই।

- আল্লাহ্ শপথ, নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটছে।

সেদিনের পর থেকে আমি এবং আমার স্বামী আমাদের ছাগলগুলোকে যখনই মাঠে চরাতে পাঠাতাম, তারা ভরপেট হয়ে ফিরে আসতো। আমরা যখন খুশি দুধ দোহাতে পারতাম। অথচ আমাদের গোত্রের অন্য সকলের পশুগুলো ক্ষুধার্ত থেকে যেতো। সেগুলো কোনো দুধও দিত না। লোকজন তাদের মেষপালকদের নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। তারা বলতে লাগল, 'হালিমা তাঁর পশুগুলো যে মাঠে নিয়ে যায় তোমরা কেন সে মাঠে আমাদের পশুগুলোকে চরাতে নিয়ে যাও না?' তারাও তাদের পশুগুলোকে আমাদের পেছন পেছন একই জায়গায় নিয়ে যেতো, এরপরও আমাদের পশুগুলোই ভরপেট ফেরত আসত আর তাদেরগুলো ফিরতো খালি পেটে।

দিনে দিনে শিশুটি বেড়ে উঠতে থাকে, আর আমরা আবিষ্কার করতে থাকি যে আল্লাহ তাআলা এই শিশুর উসিলায় আমাদের সকলের জন্য রহমতের ওপর রহমত বর্ষণ করছেন! দুই বছর বয়সেই তাঁকে দেখতে খুবই চমৎকার লাগত। তিনি সেই বয়সী অন্য বাচ্চাদের মতো ছিলেন না, আল্লাহর শপথ, দুই বছর বয়সেই তিনি অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন।"

দুই বছর বয়সে শিশু মুহাম্মাদকে ﷺ মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেবার সময় চলে আসে। তারা মক্কায় ফিরে গিয়ে আমিনার কাছে শিশু মুহাম্মাদকে ﷺ আরও কিছুদিন রাখার অনুমতি চান। তারা মুহাম্মাদকে ﷺ অসম্ভব ভালোবাসতেন এবং এটাও জানতেন যে তিনি ছিলেন বরকতময়। তারা আমিনাকে বিভিন্ন রকম অজুহাত দেখিয়ে বোঝাতে

চাচ্ছিলেন যে, মুহাম্মাদের জন্য মরুভূমিতে থাকাই শ্রেয়। আমিনা রাজি হওয়া পর্যন্ত তারা চেষ্টা চালিয়ে যান। একসময় আমিনা সম্মতি দেন। এরপর হালিমা মুহাম্মাদকে ﷺ আবার মরুভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

হালিমা বলতে থাকেন, "একদিন শিশু মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দুধ-ভাইয়ের সাথে খেলা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর ভাই ছুটে এসে অন্যদের বললো,

- আমার কুরাইশের ভাই!

- কী হয়েছে তাঁর?

- আমি দেখলাম, দুইজন সাদা কাপড় পরা লোক মাটিতে নেমে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল। এরপর তাঁর বুক চিরে ফেললো।

এ কথা শোনার পর আমি আর তাঁর বাবা ছুটে গেলাম। মুহাম্মাদের মুখ ফ্যাকাসে। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

- কী হয়েছে বাবা?

- দুইজন লোক এসে আমার বুক চিরে আমার ভেতর থেকে কিছু একটা বের করে নিয়ে গেল।

আমি মুহাম্মাদকে ﷺ খুব বেশি ভালোবাসতাম। কেউ তাঁর কোনো ক্ষতি করুক এটা আমি কিছুতেই চাই না, বিশেষ করে আমার তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায়। তাই দ্রুত মক্কায় ফিরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলাম।

মক্কায় গিয়ে আমিনার কাছে বললাম, 'এই যে মুহাম্মাদ, এখন থেকে আপনি তাঁকে নিজের কাছে রাখতে পারেন। আমরা আমাদের দায়িত্ব পূর্ণ করলাম।'

- মাত্র কদিন আগেই তো তোমরা তাঁকে নিজের কাছে রাখার জন্য খুব উৎসাহ দেখাচ্ছিলে। এখন হঠাৎ করে কেন তাঁকে ফিরিয়ে দিতে এলে?

আমরা কোনো উত্তর দিলাম না। কিন্তু মা আমিনাও নাছোড়বান্দা। তিনি আমাদেরকে বারবার প্রশ্ন করতেই লাগলেন, এক পর্যায়ে আমরা তাঁর কাছে আসল ঘটনা খুলে বললাম।

সব শুনে আমিনা বললেন, 'তোমরা কি তাঁকে নিয়ে এই ভয়ে শঙ্কিত যে, শয়তান তাঁর কোনো ক্ষতি করবে? আল্লাহর শপথ, এমনটা হতে পারে না। তাঁকে যখন আমি গর্ভধারণ করি তখন সে ছিল সবচেয়ে হালকা, আর যখন তাঁকে প্রসব করি, তাঁর জন্ম অন্যসব বাচ্চাদের মতো ছিল না। যখন সে বের হয়ে আসলো, আমি আলো দেখতে পেলাম, যা ছিল আশ-শাম পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই বলছি, আল্লাহর সুরক্ষা তাঁর সাথে আছে। আমি নিশ্চিত তাঁর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল হবে।' এটুকু একনাগাড়ে বলে মা

আমিনা থামলেন।[৭]

মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর মায়ের সাথে মক্কায় থেকে যান। ছয় বছর বয়সে তাঁর মা মৃত্যুবরণ করেন। এরপর মুহাম্মাদ ﷺ পিতৃমাতৃহীন হয়ে পড়েন। এরপর তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে লালিত পালিত হতে লাগলেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁকে বড় করেন, কিন্তু নবীজির ﷺ আট বছর বয়সে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। তখন মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে বড় হতে থাকেন। তিনি তাঁকে আশ্রয় ও সুরক্ষা দেন, সাহায্য করেন, এবং তাঁকে তাঁর জীবনের পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে সহায়তা করে যান।

এই ছিল নবীজির ﷺ জীবনের প্রথম দিকের বছরসমূহ। রাসূলুল্লাহকে ﷺ আল্লাহ সর্বদা হেফাজত করেছেন। তৎকালীন সমাজে লোকেদের মাঝে নানান গুনাহ আর পাপকাজের প্রচলন থাকলেও তিনি কখনো সেসবের সাথে জড়াননি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে সেসব কাজ থেকে দূরে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ এক ঘটনা বর্ণনা করেন।

‘আমি ছিলাম একজন মেষপালক। একদিন আমি আমার এক মেষপালক বন্ধুকে বললাম, ‘আজ রাতে আমি মক্কার আসরে যেতে চাই, যেখানে অন্য সকলে যায়।’

আমি সেখানে গিয়ে দেখতে চাচ্ছিলাম যে তারা কী করে। তাই আমার বন্ধুকে বললাম, আমি না আসা পর্যন্ত যেন আমার মেষগুলোকে দেখে রাখে। সে রাজি হলো। আমি মক্কায় তাদের আসরের কাছে গেলাম। যেই না আমি সুরেলা ধ্বনি শুনলাম, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সাথে সাথে আমার কান বন্ধ করে দিলেন এবং আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম। আমি যখন জেগে উঠলাম, তখন আসর শেষ হয়ে গেছে।

পরের দিন, আমি অন্য একটি আসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আমার বন্ধুর সাথে কথা বলে সেই আগের দিনের মতো একই রকম ব্যবস্থা করে মক্কায় গেলাম। মক্কায় পৌঁছে আমি আসরে গেলাম। যখনই সুর শুনতে পেলাম, আল্লাহ তাআলা আবারও আমার কান বন্ধ করে দিলেন এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে উঠলাম আসর শেষ হওয়ার পর। আর তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে আমার জন্য এক বিশেষ নিদর্শন।’

এমন আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যায়িদ ইবনে হারিসা, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ একজন ক্রীতদাস। তিনি বর্ণনা করেন, ইসাফ ও নাইলা নামে পিতলের দুটো মূর্তি ছিল। মুশরিকরা কাবাঘর তাওয়াফ করার সময় মূর্তিগুলো স্পর্শ করতো। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, ‘এগুলো স্পর্শ কোরো না।’ তিনি তখনো নবুওয়াত প্রাপ্ত হননি, তারপরেও তিনি কেমন করে যেন জানতেন যে, এগুলো স্পর্শ করা উচিত হবে না।

---

[৭] সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১।

আসলে এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত। ঘটনা এখানেই শেষ নয়, যায়িদ আরো বর্ণনা করেন, 'আমরা যখন ঘুরে আসলাম, তখন আমি মনে মনে ভাবলাম– একটু ছুঁয়েই দেখি না কী হয়!' যেই না আমি ছুঁয়েছি আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাকে কি এটা করতে নিষেধ করা হয়নি?' [10]

যায়িদ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওয়াতের পূর্ববর্তী জীবনে কখনো কোনো মূর্তিকে নমস্কার করেননি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও কোনো মূর্তির উপাসনা করেননি এবং কোন মূর্তিকে পূজা করার উদ্দেশ্যে স্পর্শও করেননি। তিনি স্বভাবগতভাবেই মূর্তিপূজা অপছন্দ করতেন। আর তিনি এই নিয়মগুলো নিজ পরিবারের জন্যেও খাটাতেন। তিনি যায়িদকে বলতেন, যায়িদ মূর্তিপূজায় অংশগ্রহণ কোরো না। এই কারণেই আলী ইবনে আবি তালিবও কোনোদিন মূর্তিপূজা করেননি কেননা তিনি মুহাম্মাদের ﷺ বাড়িতেই বড় হয়েছেন। আবু তালিব দরিদ্র হয়ে পড়লে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ছেলে আলী ইবনে আবু তালিবের দেখাশোনা করার দায়িত্ব নেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজিকে ﷺ কিছু ইবাদত করার প্রতি নির্দেশনা দিতেন, যা সম্পর্কে এর আগে কেউ জানতো না। কুরাইশদের মধ্যে হাজ্জের সময় তারাই ছিল একমাত্র লোক, যারা আরাফাতে অংশগ্রহণ করতো না। হাজ্জের বিভিন্ন নিয়ম কানুন ছিল, যেমন - তাওয়াফ, সাঈ, আরাফাতে অবস্থান এবং মিনায় অবস্থান করা। কুরাইশের লোকজন সব নিয়ম-কানুন পালন করলেও আরাফাতে অবস্থান করতো না এর কারণ হলো তারা এটাকে হারামের সীমানার বাইরে মনে করতো। আরবের অন্য সকলে সেখানে যেতো, আর কুরাইশরা তাদের বলতো, 'আমরা আল হারামের বাসিন্দা, আমরা কীভাবে আল হারামের বাইরে যেতে পারি?' তারা আরাফাতের সীমানা পর্যন্ত গিয়ে সেখানে থেকে যেতো। জুবাইর ইবনে মুত'ইম একবার তার উট হারিয়ে ফেলেন। তিনি তা খুঁজতে খুঁজতে আরাফাতে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে অর্থাৎ আরাফাতে মুহাম্মাদকে ﷺ দেখতে পেয়ে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। তিনি বলে উঠেন, 'সে কি কুরাইশের লোক নয়? সে আরাফাতে কী করছে?'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুহাম্মাদকে ﷺ ফিতরাতের মাধ্যমে পথ দেখাতেন, তাঁর অজান্তেই তাঁকে দিয়ে হাজ্জের একটি আহকাম পালন করিয়ে নিয়েছেন, যেটা তাঁর গোত্রের লোকেরা করতো না।

মেষপালন: সকল নবীর পেশা

নবীর ﷺ প্রথম পেশা ছিল মেষপালন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি মেষপালক ছিলেন না।' তাঁর সাথীরা জিজ্ঞেস করেন, 'আর আপনি?'

---

[10] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৪।

তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমিও মাঠে ভেড়া চরাতাম আর মক্কার লোকদের কাছ থেকে এই কাজের জন্য বিনিময় নিতাম।'[11]

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো প্রত্যেক নবীই একজন মেষপালক ছিলেন। আল্লাহ তাআলা সব নবীকেই এই কাজটির মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

মেষচালনা থেকে নবীগণ অনেকগুলো শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

প্রথমত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি হলো দায়িত্ববোধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা সকলেই হলে মেষপালক এবং তোমরা তোমাদের পালের ব্যাপারে দায়িত্ববান।' উদাহরণস্বরূপ, মুসলিমদের জন্য দায়িত্বশীল হলেন তাদের ইমাম, পরিবারের জন্য দায়িত্বশীল পরিবারের কর্তা ইত্যাদি। প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনো কিছুর ব্যাপারে বা অন্যের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। একজন নেতার জন্য দায়িত্বশীলতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নেতা তার দলের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে উম্মাহর নেতা হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাই তাঁরা তাদের উম্মাহর জন্য হিসাব দিতে বাধ্য থাকবেন।

দ্বিতীয়ত, মেষপালন তাদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। ভেড়াদেরকে মাঠে চরানো একটি সময়সাপেক্ষ বিষয়। তারা খুবই ধীরস্থির প্রাণী, সময় নিয়ে আস্তে আস্তে সবকিছু করে। পশুপালককেও তাদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কখনো ভেড়াগুলো নিজেদের মধ্যেই মারামারি লাগিয়ে দেয়, আবার কখনো বা একে অপরের সাথে খেলা করে। কিন্তু মেষপালককে ধৈর্য ধরে সবকিছু লক্ষ রাখতে হয়। সে তাদেরকে এ কথা বলতে পারবে না যে, 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোমরা তাড়াতাড়ি করো।' ভেড়ারা তাদের মর্জি অনুযায়ী ঢিলেমি করবে। মেষপালকেরা সাধারণত সকালে বের হয়, আর ফেরে সন্ধ্যাবেলায়, সূর্য অস্ত যাবার সময়।

আল্লাহ তাআলা সকল নবীকে মেষপালকের দায়িত্ব দিয়ে গড়ে তুলেছেন যেন তাদের মধ্যে ধৈর্যের অনুশীলন গড়ে ওঠে, যেন তাঁরা উম্মাহর ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারেন। নবী মূসার ﷺ সাথে তাঁর উম্মাহর লোকেরা যা করেছিল, তা ছিল রীতিমতো অসহনীয়। এই খুবই দুঃসহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মত চরিত্র গঠনের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়েই সবচেয়ে বেশি সময় ধরে মেষপালন করান, দীর্ঘ দশ বছর।

নূহ ﷺ সুদীর্ঘ ৯৫০ বছর দাওয়াহর কাজে ব্যয় করেন, এরপরও তিনি ধৈর্য হারাননি। সকল উপায়ে চেষ্টা চালিয়েছেন,

---

[11] সহীহ বুখারি, অধ্যায় ইজারাহ, হাদীস ৩।

"আমি চেষ্টা করেছি প্রকাশ্যে এবং গোপনে। আমি চেষ্টা করেছি দিনে ও রাতে। আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেক উপায়ে। এবং তারা আমার বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।" (সূরা নূহ, ৭১: ৩)

তৃতীয়ত, সুরক্ষা প্রদান, মেষপালকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো তাদের ভেড়ার পালকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা। ভেড়ার পালে নেকড়ে বা অন্য পশু হামলা করতে পারে, তাদের রোগবালাই হতে পারে। মেষপালক সর্বদাই তাদেরকে এটা নিশ্চিত করে যে তারা সকল প্রকার আশঙ্কামুক্ত। আল্লাহর নবীরাও অনুরূপ। তাঁরা উম্মাহকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করেন। একবার মদীনায় রাতে হঠাৎ হৈ চৈ শুরু হয়। হৈ চৈ শুনে কিছু সাহাবা ﷺ অস্ত্র নিয়ে ঘোড়া চালিয়ে সবেগে সেখানে শব্দের উৎসের দিকে ছুটে যান। তাঁরা সেখানে পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিমধ্যেই সেখান থেকে ফিরে আসছেন আর তাদেরকে জানালেন সবকিছু ঠিকঠাক আছে।[12] সাহাবীরা ﷺ খুব তাড়াহুড়ো করে সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাসূল ﷺ তাদেরও আগে সেখানে পৌঁছে গিয়ে খোঁজখবর করে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম উম্মাহকে সম্ভাব্য সকল বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন, এমনকি ভবিষ্যতে যেসব বিপদ আসবে যেমন, দাজ্জাল, সে সম্পর্কেও সতর্ক করে গেছেন।

চতুর্থত, দূরদৃষ্টি অর্জন। এই পশুগুলো থাকে মাটির খুব কাছাকাছি এবং তাদের দৃষ্টিসীমা খুবই সীমিত। সামান্য দূরে কী আছে সেটা তারা দেখতে পায় না। চোখের সামনে ছোটোখাটো বস্তুও তাদের দৃষ্টি আটকে দিতে যথেষ্ট। ওপাশে কী আছে তারা বুঝতে পারে না। অন্যদিকে একজন মেষপালকের দৃষ্টিসীমা ভেড়ার তুলনায় বহুগুণে বিস্তৃত, বিপদ আসার অনেক আগেই সে ভেড়াগুলোকে সতর্ক করে দিতে পারে।

নবী এবং তাদের অনুসারীদের বিষয়টিও ঠিক এমন। বিপদ ঘটার আগেই নবীরা তাদের উম্মাহকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন, কেননা তাদেরই আছে অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমার এবং তোমাদের মধ্যে তুলনা হলো এই, আমি আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছি এবং তোমরা আগুনের আলো দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছ আর এতে লাফ দিচ্ছ। আমি তোমাদের কাপড় টেনে, তোমাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে সেই আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি আর তোমরা তখন আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য আমার কাছ থেকে নিজেদেরকে ছুটিয়ে নিচ্ছ।'[13]

সাধারণ মানুষের সাথে নবীদের পার্থক্য হলো এই, নবীরা বিপদ আঁচ করতে পারেন কিন্তু আমরা তা পারি না। হতে পারে ভেড়াদেরকে রক্ষা করার জন্য মেষপালক

---

[12] ইবন মাজাহ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ২৭৭২।

[13] রিয়াদুস স্বলেহীন, অধ্যায় ১, হাদীস ১৬৩ (মুসলিম)।

তাদেরই কাউকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলো। তবে এখানে আঘাত করা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের ভালোর জন্যই আঘাত করাটা দরকার। তাই যখনই আল্লাহর নবীগণ উঠে দাঁড়ান আর মানুষকে কঠিনভাবে সতর্ক করেন, তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা খুব রূঢ় কিংবা আবেগবর্জিত। বরং প্রকৃতপক্ষে তারা উম্মাহর ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান। রাসূল ﷺ একদিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করছি।' হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, নবীজির ﷺ কণ্ঠস্বর তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল, বাজারের লোকেরা পর্যন্ত মসজিদ থেকে রাসূলের ﷺ কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল।

পঞ্চমত, সাধারণ জীবনযাপন। মেষপালকদের জীবন সহজ, সরল, সাদাসিধে। তার তেমন কোনো বিষয়পত্র নেই। মার্সিডিজ বেনজ, টেলিভিশন কিংবা ফ্রিজ নেই। যদি সে ধনী ব্যক্তিও হয়, মেষ চড়ানোর সময় বিলাসি জিনিসগুলো সঙ্গে নেওয়ার সুযোগ নেই। তাদেরকে হালকাভাবে চলাফেরা করতে হয় যাতে পশুদের দেখাশোনা করা যায়। তারা খুব সাধারণ খাবার খায় এবং তাদের বাসস্থানও বৈচিত্র্যহীন। সাদেকী জীবন যাপন তাদের বৈশিষ্ট্য, আর নবীদের ক্ষেত্রেও তা-ই।

ষষ্ঠত, মেষপালনের অভ্যাস মানুষকে বিভিন্ন পরিবেশে মানিয়ে নিতে শেখায়। রৌদ্রতপ্ত গরম, মুষলধারে বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া বা জমে যাওয়া ঠাণ্ডাতেও মেষপালককে প্রথমে তার পশুপালকে রক্ষা করতে হয় এবং সবশেষে নিজেকে সামলাতে হয়। রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনেক ভ্রমণ করতে হতো, দাওয়াহ এবং জিহাদের জন্য বিভিন্ন রকম আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সপ্তমত, আল্লাহর সৃষ্টির কাছাকাছি থাকা। এটা মানুষকে পৃথিবীর কৃত্রিমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, প্রকৃতির নির্মলতার কাছাকাছি নিয়ে যায়। যখন কেউ মরুভূমিতে আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে পড়ে থাকে, তা তাকে মেকি দুনিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কৃত্রিমতাপূর্ণ জীবন যাপন করতে করতে মন ও মগজে, চিন্তায়-চেতনায় একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়। ইট-পাথরের এই পৃথিবীতে প্রায় সবকিছুই কৃত্রিম, সবকিছুই সৃষ্টির স্বাভাবিক বিন্যাসের বিরুদ্ধে। মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে, প্রকৃতি মানুষের অস্তিত্বে মিশে আছে। এই কৃত্রিমতাভরা পৃথিবী মানুষকে আল্লাহর বিশাল সৃষ্টির ব্যাপারে উদাসীন করে রাখে। সে সাধারণভাবে চিন্তা করতে ভুলে যায়। দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলার অনেক সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন। সূর্য, চাঁদ, তারা, জান্নাত, পাহাড়-পর্বত, নদী, গাছপালা, গরু, মশা, মেঘ, বৃষ্টি কত কিছু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আল্লাহর সৃষ্টি হচ্ছে আয়নার মতো, যেখানে আল্লাহর গুণগুলো প্রতিফলিত হয়। আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকানোর মত করে তাকালেই আল্লাহর গুণ সম্পর্কে জানা যায়। একজন নবী এভাবেই আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতেন।

নবীগণ মেষপালক হওয়ার মাধ্যমেই এমন দরকারি সব শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। উট, গরু বা ছাগল নয়, তাঁরা ছিলেন মেষ পালক। উট বা গরুর তুলনায় ভেড়া অনেক বেশি দুর্বল। সহজেই শিকারীর ফাঁদে পড়ে। তাদের জন্য প্রয়োজন অত্যধিক যত্ন ও সুরক্ষা। শয়তানের ব্যাপারে মানুষ এই ভেড়াগুলোর মতোই দুর্বল। শয়তান মানুষকে অতি সহজেই প্রলুব্ধ করতে পারে, আক্রমণ করতে পারে। রাসূল ﷺ যখন শয়তান হতে সাবধান করতে চাইতেন, তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেন, 'তোমরা দলবদ্ধভাবে থাকো, কারণ নেকড়ে দলছুট ভেড়াকেই কামড়ে খায়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ মেষপালনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন নেকড়ে কেবলমাত্র সেই ভেড়াকেই আক্রমণ করে যে দল থেকে আলাদা হয়ে গেছে, পুরো দলকে সে কখনো আক্রমণ করে না।

এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। ভেড়ার পালকরা সাধারণত উট বা অন্যান্য পশুপালকের চেয়ে বেশ আলাদা স্বভাবের হয়। ভেড়ারা নরম-প্রকৃতির প্রাণী, স্নেহের কাঙাল। তাদেরকে দয়া-মায়া দিয়ে পালতে হয়, কঠোর আচরণ করা যায় না। এমনি করে মেষপালকেরাও খুব সদয় ও দয়ালু হওয়ার শিক্ষা পায়। আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে মেষপালনের অনুশীলন করান যেন তাঁরা তাদের অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারেন।

মেষ বা ভেড়ার ক্ষেত্রে যেমন, উটের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটা সত্যি। উট খুবই উদ্ধত প্রাণী। উটের প্রতি নরম হলেই সে সরলতার সুযোগ নেবে। উটকে তাই খুব কঠোরভাবে শাসন করতে হয়, এ কারণে উট পালকরা রূঢ় আর কর্কশ স্বভাবের হয়।

মানুষ তার পেশা দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিক্ষকদের আচরণ পিতৃসুলভ হয়ে থাকে। ডাক্তাররা তাদের লেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আবার অন্যভাবে বলা যায়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব মানুষের পেশাকে প্রভাবিত করে, কারণ মানুষ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পেশা নির্বাচন করে আর সেই পেশা বেছে নেওয়ার ফলে তার ওই বৈশিষ্ট্যগুলো আরো প্রকটভাবে তার মাঝে বিকশিত হয়। মুসলিমদের তাদের কাজের ধরন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মাথায় রাখতে হবে যে, তাদের পেশা ও কাজ তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে।

ইবনে হাজার ছিলেন সালাফ আস-সলেহীনদের সময়কার একজন প্রসিদ্ধ আলিম। তিনি তাঁর হাদীসের শারহ (ব্যাখ্যা) নিয়ে লেখা বই, "ফাতহ আল-বারি"–তে উল্লেখ করেন,

"নবুওয়াতের পূর্বে নবীদের মেষপালক হিসেবে কর্মরত থাকার পেছনে হিকমাহ হলো, তারা পশুর পালকে চালাতে দক্ষতা অর্জন করতেন, কেননা পরবর্তীতে তাদেরকে নিজ নিজ জাতির পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে। পশুপালন একজন মানুষকে সহনশীল ও দয়ালু হওয়ার শিক্ষা দেয়, ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। যখন একজন মেষপালক তার পশুর পালকে এক স্থানে জড়ো করে, কিংবা পুরো পালকে এক জায়গা থেকে আরেক

জায়গায় নিয়ে যায়; তখন তাকে তাদের সকলের বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। সেই সাথে নজর রাখতে হয় যেন কোনো শিকারী পশু তাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে। এমনি করে সে একটি জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে। ভেতর-বাহির সবরকম শত্রুর হাত থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। মেষপালক হওয়ার মাধ্যমে এভাবেই নবীরা তাদের জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় ধৈর্যধারণ করা শিখেছেন, বিভিন্ন ঘরানার মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে শিখেছেন, আর শিখেছেন দুর্বলদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে আর ক্ষমতাসীনদের গুঁড়িয়ে দিতে। আল্লাহ কেন গরু বা উটের বদলে ভেড়ার পালক হিসেবে তাঁর নবীদেরকে নিয়োজিত করেছেন? এর কারণ হলো ভেড়ারা খুবই দুর্বল প্রাণী। তাদের অতিরিক্ত যত্ন ও দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য পশুর তুলনায় ভেড়ার পালকে সামলে রাখা অত্যন্ত কঠিন। কেননা তারা খুব সহজেই এদিক-ওদিক হেঁটে হারিয়ে যেতে পারে। আর সমাজে মানুষের অবস্থানও ঠিক একই রকম। আর তাই এটা মহান আল্লাহর আযযা ওয়াজালের পরম প্রজ্ঞা যে তিনি নবী-রাসূলদেরকে একইভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।"

সমসাময়িক আরেকজন লেখক এক্ষেত্রে মন্তব্য করেন,

"দ্বীন ইসলাম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে সেইসব চিন্তাবিদ, নির্ভীক, মেধাবী মানুষদের দ্বারা, যারা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। দুশ্চরিত্র মানুষদের সাথে থেকে কেউ ইসলামকে নিজের মাঝে ধারণ করতে পারে না। মুসলিমদের জন্য এটা খুবই জরুরি যে তারা মানুষের স্বভাবজাত সৎগুণকে নিজের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করবে। এর প্রমাণ রয়েছে খলিফা উমার ইবন খাত্তাবের জীবনে, তিনি লোকদেরকে কষ্টসহিষ্ণু এবং কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হতে শেখান । চলন্ত ঘোড়ায় উঠতে বলেন। এটা এজন্য যেন লোকজন দীর্ঘ (আরাম-আয়েশের) জীবনের আকাঙ্ক্ষা না করে এবং বদঅভ্যাস (যেমন আলস্য) যেন তাদের পেয়ে না বসে। এর মানে এই নয় যে শহুরে জীবন ছেড়েছুঁড়ে চলে আসতে হবে। বিষয়টা হলো, সেসব (দুনিয়াবী) বিষয় ত্যাগ করতে হবে যেগুলো নিজের মাঝে থাকলে ইসলামের জন্য কষ্ট স্বীকারের ইচ্ছেটুকু নষ্ট হয়ে যায়।"

এই মন্তব্যটি রাসূলুল্লাহর ﷺ পেশা হিসেবে মেষপালন বেছে নেওয়া এবং প্রাথমিক জীবনে তাঁর মরুভূমিতে বেড়ে ওঠা নিয়ে। এই কাজগুলোর ফলে রাসূলুল্লাহর ﷺ মধ্যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের অভ্যাস গড়ে ওঠে। নবুওয়াতের মিশনের জন্য তাঁকে উপযুক্ত করে তোলে। রাসূলুল্লাহর ওফাতের কয়েক বছর পর তাঁর সাহাবি উমার যখন খলিফা, এই বিশ্বের সেরা জিনিসগুলোর কর্তৃত্ব হাতের মুঠোয় নিয়ে বসা, তখনও তিনি সেসব স্পর্শ করেন নি। খুব সহজ-সরল-সাধারণ জীবন যাপন করেছেন, মুসলিমদেরও সতর্ক করেছেন তারা যেন আরাম-আয়েশের জীবনে অভ্যস্ত না হয়ে রুক্ষ ও কঠোর জীবনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়। ইসলাম এমনই এক দ্বীন, এমনই এক বার্তা, যা মেনে চলতে গেলে মু'মিনকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, আর তাই প্রস্তুত থাকতে হবে। নাহয় সামান্য চাপেই সে বেসামাল হয়ে পড়বে।

দাওয়াহ ইসলামের এমন একটি ইবাদাহ যার জন্য কষ্ট স্বীকারের মানসিকতা থাকা চাই। একজন দাঈ যদি কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার ইচ্ছা ও ধৈর্যধারণ করতে না পারেন, তাহলে তিনি কখনোই আন্তরিকতার সাথে মন-প্রাণ দিয়ে দাওয়াতের কাজে নিজেকে ঢেলে দিতে পারবেন না।

হিলফুল ফুদ্বুল

রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রাথমিক জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো 'হিলফুল ফুদ্বুল' চুক্তি।

এর পেছনের একটা গল্প আছে। ইয়েমেনের যাবিদ নামের এক এলাকা থেকে একজন লোক ব্যবসা করতে মক্কায় আসে। তার ব্যবসায়ের পণ্যসামগ্রী সাহম গোত্রের এক স্বনামধন্য ব্যক্তি আল আস ইবন ওয়াইল কিনে নেয়, টাকা পরিশোধ করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞাও করে। কিন্তু কিছু সময় পর গড়িমসি আরম্ভ করে। লোকটাকে পাওনা বুঝিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইয়েমেনি লোকটি মক্কায় ভিনদেশী, আল-আস আশা করেছিল যে লোকটি কিছুদিনের মধ্যে চলে যাবে, সেই সুযোগে আল-আস তার টাকা আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা করে।

কিন্তু ইয়েমেনি লোকটি এত সহজে চলে গেল না। সে হক্ব আদায় না করে নড়বে না। মক্কায় মানুষের ভীড়ের মাঝে গিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা শুরু করলো। 'হে মক্কাবাসী, আমি তোমাদের দেশে এসে যুলুমের শিকার হয়েছি, অন্যায়ের শিকার হয়েছি, হে লোকসকল, তোমরা কে আছ যে আমার পাশে দাঁড়াবে, তোমরা কি তোমাদের দেশে এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে?' তার আবেগী কথা শুনে কুরাইশের কিছু গোত্র জড়ো হয়ে একটা চুক্তি করলো। চুক্তির কথা ছিল, মক্কার দুর্বল ও নিপীড়িত মানুষদের অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

চুক্তিতে অংশ নেওয়া গোত্রগুলোর একটি ছিল নবীজির ﷺ পরিবার। নবীজি ﷺ সেই সময় কিশোর, কিন্তু আবদুল মুত্তালিব তাঁকেও সভায় নিয়ে যান। সভা অনুষ্ঠিত হয় আবদুল্লাহ ইবনে জাদানের বাড়িতে। সে ছিল খুবই উদার প্রকৃতির মানুষ, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। মানুষের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার। তার সম্মানে সে বাড়িতেই তারা সভার আয়োজন করলো। সভায় চুক্তি হলো যে, তারা সকলে একত্রিত হয়ে মজলুমদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার হবে। এ ঘটনা নবুওয়াতের আগেই ঘটেছিল আর চুক্তিটাও মুশরিকদের মধ্যকার একটি চুক্তি। রাসূল ﷺ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে জাদানের বাড়িতে যে চুক্তি সম্পাদিত হলো, আমি এক পাল ভালো পশুর বিনিময়ে হলেও সেই চুক্তিতে থাকার সুযোগ হাতছাড়া করতাম না। আর যদি ইসলামের পরে এমন ঘটনা ঘটতো তখনও আমি বিষয়টিকে স্বাগত জানাতাম।'

অর্থাৎ যদি ইসলাম আসার পরে এমন কোনো চুক্তি করার সুযোগ আসতো, রাসূল ﷺ সেই চুক্তিতে সানন্দে অংশ নিতেন, এমনকি যদি এই ধরনের চুক্তি কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তবুও। এখানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে, তা হলো, মুসলিমরা সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে, চাই সেই ন্যায় একজন মুসলিমের পক্ষে বা কোনো অমুসলিমের পক্ষে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মুসলিমরা হক্কের পক্ষ, নিপীড়িত মানুষের পক্ষ, মজলুমের পক্ষাবলম্বন করবে।

মুহাম্মাদ ﷺ মারা যাওয়ার অনেক বছর পরে একটি ঘটনার সূত্র ধরে আবারো হিলফুল ফুদ্বুল এর নামটি চলে আসে। ঘটনাটা ঘটেছিল হুসাইন ইবন আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ এবং আল ওয়ালিদ ইবনে উকবা ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে। ওয়ালিদ ছিল মদীনার গভর্নর, সে তার ক্ষমতার জোরে অন্যায়ভাবে হুসাইনের কিছু সম্পত্তি নিয়ে দখল করে নেয়। হুসাইন ﷺ ওয়ালিদের কাছে গিয়ে বললেন, 'শোনো, হয় তুমি আমার প্রাপ্য আমাকে ফেরত দিবে নয়তো আমি মসজিদের দিকে গিয়ে হিলফুল ফুদ্বুলের ঘোষণা দিব। লোকদেরকে আমি হিলফুল ফুদ্বুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিব।'

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ﷺ সে সময় ওয়ালিদের সাথেই ছিলেন। হুসাইনের মুখে হিলফুল ফুদ্বুলের কথা শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'তবে আমিও আল্লাহর নামে শপথ করছি, যদি হুসাইন হিলফুল ফুদ্বুলের ডাক দেয়, আমি আমার তরবারি উন্মুক্ত করবো এবং তার পক্ষ নেব। যতক্ষণ সে ন্যায় বিচার না পাচ্ছে, আমরা যুদ্ধ করতে থাকবো। সে ন্যায়বিচার পেলে তবেই আমরা থামবো, নতুবা যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবো।'

এই কথা পরে আরও কিছু মানুষের কানে গেল। তারাও উত্তেজিত হয়ে একই রকম বিবৃতি দিলো। ওয়ালিদ বুঝলো পরিস্থিতি মোটেও সুবিধার নয়, তাই সে তড়িঘড়ি করে হুসাইনের প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেয়। এই ঘটনার শিক্ষণীয় দিক হলো– মুসলিমরা কখনো কারো প্রতি জুলুম সহ্য করে না। তৎকালীন সময়ে মুসলিমরা একজন মুসলিম নেতা ওয়ালিদ ইবনে উকবার অধীনে ইসলামি ব্যবস্থার মধ্যেই বসবাস করতো, তবুও তারা হক্কের জন্য তাদের নেতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল ।

শাইখ মুহাম্মাদ গাজ্জালী এই ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'এই চুক্তি (হিলফুল ফুদ্বুল) আমাদের সামনে একটি বিষয় তুলে ধরে, রাত যত গভীর হোক না কেন, শাসক যতই অত্যাচারী হোক না কেন, উন্নত চরিত্র সবসময়ই কিছু না কিছু মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। তারা সুবিচার এবং ন্যায়ের জন্য উঠে দাঁড়াবে। আল্লাহ তাআলা ভালো কাজে সহযোগিতা করাকে একজন মুসলিমের উপর একান্ত কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।'

> **"...সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর।**

নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" (সূরা মায়িদা, ৫: ২)

যে কোনো মুসলিম দলের জন্য হিলফুল ফুদুল বা এ ধরনের কোনো চুক্তিতে অংশগ্রহণ বৈধ, কেননা, এ সকল চুক্তির আসল উদ্দেশ্যই হলো জুলুমের অপসারণ যা পালনের মাধ্যমে ইসলামি একটি দায়িত্বের বুনিয়াদ দৃঢ় হয়। মুসলিমদের জন্য অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের সাথে যুলুমের অপসারণ কিংবা যালিমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার উদ্দেশ্যে চুক্তি করা বৈধ, যদি সেখানে ইসলামের জন্য এবং মুসলিমদের জন্য কোনো কল্যাণ থেকে থাকে। যেহেতু রাসূল ﷺ ইসলামের আগমনের পরেও এই ধরনের চুক্তিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, সুতরাং তা মুসলিমদের জন্যেও বৈধ।

নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন

খাদিজার ﷺ সাথে বিয়ে

যুবক বয়সে নবীজির ﷺ জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো খাদিজার ﷺ সাথে বিয়ে। খাদিজা ﷺ মক্কার বিখ্যাত এক নারী, সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা। তাঁর আগেও বিয়ে হয়েছিল। খাদিজার ﷺ নিজস্ব ব্যবসা ছিল। সে সময় ব্যবসার কাজে প্রায়ই ইয়েমেন ও সিরিয়া যাতায়াত করা লাগতো। তিনি ব্যবসার কাজ সামলাবার জন্য বিভিন্ন লোক ভাড়া করতেন, নিজে ঘরের বাইরে গিয়ে ব্যবসা করতেন না। কুরাইশের লোকেরা শীত ও গ্রীষ্মে বছরের দুই সময়ে সফরে বের হতো একবার ইয়েমেনে, আরেকবার শামে। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল মক্কার সে সময়ের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

> **"কুরাইশদের নিরাপত্তার জন্য,**
> **শীত ও গ্রীষ্ম সফরে তাদের নিরাপত্তার জন্য।"** (সূরা কুরাইশ, ১০৬: ১-২)

নবীজির ﷺ সততা ও সত্যবাদিতার কথা তখন মক্কার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর কথা শুনে খাদিজা ﷺ তাঁকেই ব্যবসার কাজে নিয়োজিত করলেন। মুহাম্মাদ ﷺ যখন শামে সফরের উদ্দেশ্যে বের হলেন, খাদিজা ﷺ তাঁর দাস মায়সারাহকে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন। তাঁরা দুজন শামে ব্যবসা শেষ করে ফিরে এলেন।

মায়সারাহ খাদিজার ﷺ কাছে তাদের সফরের বর্ণনা দিতে এসে মুহাম্মাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি বলেন, 'এই মানুষটার সততা ও বিশ্বস্ততা মুগ্ধ হওয়ার মতো!' খাদিজা ﷺ নবীজির ﷺ কথা যত শুনছেন, ততই তাঁর প্রতি আগ্রহ বোধ করছেন। নবীজির ﷺ চারিত্রিক গুণাবলি এমনই ছিল যে সবাইকে টানতো। খাদিজা ﷺ, মক্কার একজন বিত্তশালী মহিলা, এক সাধারণ কর্মচারীর অসাধারণ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদিজার ﷺ প্রস্তাব মেনে নিয়ে বিয়ের জন্য সম্মতি জানালেন। বিয়ের সময় নবীজির ﷺ বয়স ছিল পঁচিশ, আর খাদিজার ﷺ বয়স ছিল চল্লিশ। দুজনের বয়সের পার্থক্য পনেরো বছর, কিন্তু বয়সের এই সুবিশাল ফারাক তাদের বৈবাহিক জীবনে কোনো আঁচ ফেলতে পারে নি।

খাদিজার ﷺ অনন্যতা

খাদিজা ﷺ বেঁচে থাকা অবস্থায় নবীজি ﷺ আর কোনো বিয়ে করেননি। নবীজির ﷺ বেঁচে থাকা সন্তানদের প্রত্যেকেই ছিলেন মা খাদিজার ﷺ সন্তান। তাদের ছয় সন্তান– যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা, আল কাসিম আর আবদুল্লাহ। কেবল ফাতিমা বাদে বাকি সবাই নবীজির ﷺ জীবদ্দশাতেই মারা যান। ফাতিমা ও আলী ﷺ

থেকেই নবীজির ﷺ বংশের ধারা প্রবাহিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদিজাকে ﷺ প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। খাদিজার ﷺ সাথে তাঁর বন্ধন, বিশ্বাস, প্রতিশ্রুতি মৃত্যুর পরেও ভাঙেনি। তিনি সবসময় তাঁকে মনে করতেন, তাঁর কথা বলতেন। আর এজন্য নবীজির ﷺ অন্য স্ত্রীরা মৃত খাদিজাকে ﷺ নিয়েও ঈর্ষা বোধ করতেন! তবুও নবীজিকে ﷺ খাদিজার ﷺ স্মরণ থেকে থামানো যেতো না। খাদিজার ﷺ জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ ভালোবাসা, আকর্ষণ, মমতা ও সম্মান ছিল সবচাইতে বেশি। কারণ তিনি খাদিজাকে ﷺ সবসময় নিজের পাশে পেয়েছেন। যখন সবাই রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তখন সান্ত্বনা আর আশার কথা শুনিয়েছেন খাদিজা ﷺ । তিনি নবীজিকে ﷺ পরম মমতায় আগলে রেখেছিলেন।

খাদিজার ﷺ পর নবীজির ﷺ সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন আ'ইশা ﷺ। কিন্তু এই আ'ইশাও ﷺ খাদিজার ﷺ প্রতি ঈর্ষা বোধ করতেন। বুখারি ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, আ'ইশা ﷺ বলেন, 'আমি খাদিজা ছাড়া নবীজির ﷺ আর কোনো স্ত্রীকে নিয়ে এতটা ঈর্ষা অনুভব করিনি! এটা এজন্য নয় যে আমি তাকে কোনোদিন দেখিনি, বরং এটা এজন্য যে নবীজির ﷺ তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন।'[14]

নবীজি ﷺ মাঝে মাঝে একটা ভেড়া জবাই করে বলতেন, 'এই ভেড়ার মাংস খাদিজার ﷺ বান্ধবীদের জন্য পাঠিয়ে দাও।' নবীজি ﷺ যে কেবল খাদিজার ﷺ নাম বারবার উল্লেখ করতেন তাই নয়, তিনি খাদিজা ﷺ মারা যাবার পরেও তাঁর বান্ধবীদের সাথে সৌহার্দ্য বজায় রেখেছেন। এটা তিনি করতেন খাদিজার ﷺ প্রতি ভালোবাসা থেকে। এমনটা করতে দেখে আইশা বেশ ঈর্ষা বোধ করতেন, একদিন বলেই ফেললেন, 'শুধু খাদিজা আর খাদিজা!' তখন নবীজি ﷺ বললেন, 'মহান আল্লাহ তাআলাই আমার অন্তরে খাদিজার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছেন।'[15] এই ভালোবাসার নিয়ন্ত্রণ রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে ছিল না, এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলাই তাঁর অন্তরে খাদিজার ﷺ জন্য বিশেষ স্থান তৈরি করে দিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে আছে, আ'ইশা ﷺ বলেন, 'এমন অনেক দিন হয়েছে যে, খাদিজার প্রশংসা না করে নবীজি ﷺ ঘর থেকে বের হোন নি! একদিন এভাবে তিনি খাদিজার প্রশংসা করছিলেন। আমি আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলাম, 'তিনি কী এমন ছিলেন? তিনি তো একজন বয়স্ক মহিলা মাত্র। তাঁর চেয়েও উত্তম নারী দিয়ে কি আল্লাহ তাআলা আপনার স্ত্রীর স্থান পূরণ করে দেননি?'

---

[14] তিরমিযী, অধ্যায় তাকওয়া এবং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা, হাদীস ১২৩।

[15] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় সাহাবিদের মর্যাদা, হাদীস ১০৮।

এ কথা শোনামাত্র নবীজি ﷺ রেগে যান। রাগত স্বরে বলেন, 'না, আল্লাহর শপথ, তিনি খাদিজার চাইতে উত্তম আর কাউকেই আমার জীবনে আনেননি। যখন সবাই আমাকে অস্বীকার করেছে, তখন সে আমার ওপর আস্থা রেখেছে। যখন সবাই আমাকে মিথ্যুক ডেকেছে, তখন সে আমাকে বিশ্বাস করেছে। যখন সবাই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন সে, তাঁর সবকিছু দিয়ে আমাকে স্বস্তি দিয়েছে। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে আমার ওপর রহমত দিয়েছেন, আমাকে তাঁর থেকে সন্তান দান করেছেন।'

কেউ খাদিজার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করামাত্র নবীজি ﷺ রেগে যেতেন। নবীজির ﷺ চরিত্রের এই দিকটি থেকে একটি ব্যাপার বোঝা যায়, আর তা হলো–আপন মানুষদের জন্য নবীজির ﷺ কদর। তিনি সবসময় তাদেরকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। খাদিজা ﷺ মারা যাবার বহুবছর পরেও তিনি তাঁকে স্মরণ করতেন। হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব, মুসআব ইবন উমাইর, খাদিজা ﷺ –এদের সবাইকে তিনি স্মরণ করতেন। মৃত্যুর ঠিক আগে নবীজি ﷺ একটি কাজ করেছিলেন। তিনি উহুদের শহীদ সাহাবাদের ﷺ কবর যিয়ারত করতে যান। নবীজির ﷺ ৭০ জন সঙ্গী সেই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। তাই যখনই নবীজি ﷺ বুঝতে পারেন যে, তাঁর হাতে আর বেশিদিন বাকি নেই, তিনি সেখানে গিয়ে তাদের সবার জন্য দুআ করলেন, এবং দুআর মাঝে বললেন, 'শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে।'

নবীজি ﷺ তাদেরকে অসম্ভব ভালোবাসতেন, নিজের পাশে তাদের অভাব অনুভব করতেন। তাই আল্লাহর কাছে দুআ করেন, যেন আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাঁকে তাদের সাথে মিলিত করে দেন। তিনি তাঁর কোনো সঙ্গীকে ভুলে যাননি। তাদেরকে আজীবন স্মরণ রেখেছেন। তেমনি করেই মনে রেখেছেন নিজের স্ত্রী খাদিজার ﷺ কথা, যিনি তাঁর দুঃসময়ের সঙ্গী। তিনি নিয়মিত খাদিজার ﷺ জন্য দুআ চাইতেন, ঘুরেফিরে তাঁর কথাই বলতেন।

খাদিজা ﷺ আসলেই ছিলেন একজন বিশেষ ব্যক্তি। তিনি বেঁচে থাকতে একবার জিবরীল ﷺ নবীজির ﷺ কাছে এসে বললেন, 'এখন খাদিজা আপনার কাছে আসবেন। তিনি আপনার খাবার নিয়ে আসছেন। যখন তিনি আসবেন, তাঁকে বলবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে সালাম দিয়েছেন। সেই সাথে বলবেন যে, আমিও তাঁকে সালাম জানিয়েছি।'

খাদিজার ﷺ মর্যাদা এতোটাই অসামান্য ছিল যে স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে সালাম দেওয়ার জন্য জিবরীলকে ﷺ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর জিবরীল ﷺ নিজের পক্ষ থেকেও তাঁকে সালাম জানিয়েছেন। এরপর জিবরীল ﷺ বলেন, 'খাদিজাকে জান্নাতের বাড়ির সুসংবাদ দিন!'

খাদিজা ﷺ হলেন জান্নাতী রমণী। পৃথিবীর বুকে সবচাইতে মর্যাদাসম্পন্ন চারজন নারীর একজন হলেন মা খাদিজা ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'দুনিয়ার মাঝে শ্রেষ্ঠ নারী

চারজন। মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ এবং আসিয়া ইবন মুযাহিম।' এই চারজনের মাঝে সেরা হলেন, মারইয়াম। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সূরা আলে-ইমরানে বলেন,

> "আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও পবিত্র করেছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৪২)

এরপর দ্বিতীয় স্থানে আছেন খাদিজা। তারপর ফাতিমা এবং চার নম্বরে আসিয়া বিনতে মুযাহিম। এই চারজনের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের মাঝে দুইজন ছিলেন নবীদের মা বা নবীদের বড় করেছেন– মারইয়াম এবং আসিয়া। মারইয়াম ছিলেন নবী ঈসার মা আর আসিয়া নবী মূসাকে লালনপালন করেন। খাদিজা ছিলেন একজন নবীর স্ত্রী এবং ফাতিমা একজন নবীর কন্যা।

এই চার নারীর মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

এক, তাদের নিরেট ঈমান। তাদের ঈমান ছিল শক্তিশালী। অন্তর ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে কোনোকিছুই হৃদয়ে সন্দেহের জন্ম দিতে পারতো না। তাদের প্রবল ঈমানকে টলাবার সাধ্য কারো ছিল না। তাদের ঈমান মূলত ইয়াকীনের পর্যায়ে ছিল। দেখা জগতের তুলনায় অদেখা জগৎটার প্রতিই তাদের বিশ্বাস ও আস্থা বেশি ছিল–যে গায়েবকে তারা কখনও দেখেননি বা শোনেননি, সেই "গায়েব" জগৎটাই ছিল তাদের বেশি প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত।

যেমন ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া, তাঁর কী-ই না ছিল! একজন নারী দুনিয়ার যা কিছু চাইতে পারে সে সবই তাঁর ছিল। সম্পদ, ক্ষমতা, 'টাকাওয়ালা' স্বামী, ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য নিয়োজিত চাকর-চাকরানীর দল। অথচ তিনি এ সবকিছু আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে চমৎকার এক স্থানে, রানীর হালে থাকার সুযোগ দিয়েছেন আর আসিয়া বলেছেন তিনি এসবের কিছুই চান না, তিনি চান কেবল জান্নাতের একটি ঘর।

> "আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের জন্যে ফির'আউনের স্ত্রীর এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলেছিল, হে আমার রব, আপনার কাছে জান্নাতে আমার জন্যে একটি ঘর নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরআরউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।" (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬: ১১)

আসিয়া দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব চাননি। তিনি ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে মুক্তি

চেয়েছেন। এটাই দেখিয়ে দেয় তার ঈমান কত প্রবল, কত গভীর। অত্যন্ত নীতিহীন এবং কলুষিত সমাজের একজন বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ সব কিছু থেকে নিজেকে পবিত্র রেখেছিলেন এবং তাঁর হৃদয়কে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন। বাকি তিন জন নারীর ক্ষেত্রেও তা বলা যায়।

দুই, তাদের সবার মধ্যে দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষ করা যায় তা হলো তারা প্রত্যেকে ছিলেন ভালো স্ত্রী বা ভালো মা। নারীবাদীরা এ বিষয়টি ভালো চোখে নাও দেখতে পারে। এই চার নারী কিন্তু তাদের ক্যারিয়ার, সংস্কার কার্যক্রম, আন্দোলন কিংবা জ্ঞানের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেননি। আসিয়া ﷺ এবং মারইয়াম ﷺ এই দুইজনের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিল দুই শ্রেষ্ঠ নবী, মূসা ﷺ এবং ঈসা ﷺ। খাদিজার ﷺ অনন্যতার পেছনে রয়েছে তাঁর স্বামী নবী মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি তাঁর সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থন। তিনি বড় ব্যবসায়ী ছিলেন সত্যি, তবে এজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ নন, তিনি শ্রেষ্ঠ কারণ–যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তখনই তিনি তাঁর স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে স্বস্তি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে মা খাদিজা ﷺ ছিলেন একজন চমৎকার স্ত্রী।

ফাতিমাও ﷺ এমন একজন ব্যতিক্রমী স্ত্রী। একবার আলী ﷺ শুনলেন রাসূল ﷺ কিছু দাস পেয়েছেন, তিনি ও তাঁর স্ত্রী ভাবলেন নবীজির ﷺ কাছে একটা দাস চাইবেন। নবীজিকে ﷺ ঘরে পাওয়া গেল না, তারা মা আ'ইশার ﷺ কাছে বিষয়টি জানিয়ে ফিরে আসেন। রাসূল ﷺ ঘরে ফিরে সব কথা শুনলেন। আলী ও ফাতিমার বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

এই হাদীসটি আলী ইবন আবি তালিব ﷺ নিজে বর্ণনা করেছেন, তাঁর ভাষায়–

"নবীজি ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন। আমরা তখন শুয়ে ছিলাম। তাঁকে দেখামাত্র আমরা শোয়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূল ﷺ বললেন, যেমন ছিলে থাকো। তিনি এসে আমার আর ফাতিমার মাঝে বসলেন, আমরা দুজনেই তাঁর গা ঘেষে বিছানায় শুয়ে আছি।"
রাসূল ﷺ তাঁর মেয়ে ফাতিমাকে এত ভালবাসতেন যে তিনি একবার বলেছিলেন, 'ফাতিমা আমারই অংশ, কেউ যদি তাঁকে কষ্ট দেয়, সে আমাকেও কষ্ট দেয়। কেউ যদি তাঁকে আনন্দ দেয়, তাতে আমিও আনন্দিত হই।' রাসূলুল্লাহর ﷺ সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ফাতিমাই বেঁচে ছিলেন আর তিনি তাঁকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর মেয়ের জন্য সবচেয়ে ভালোটাই চাইতেন। তিনি চাইলেই পারতেন একজন ভৃত্য তাদের ঘরে নিযুক্ত করতে, কিন্তু তিনি তা করেননি।

তিনি বললেন, "তোমাদের দেওয়ার জন্য দাস থেকেও ভালো কিছু আমার কাছে আছে। তোমরা রাতে ঘুমুবার আগে, সুবহানআল্লাহ তেত্রিশ বার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার এবং আল্লাহু আকবর তেত্রিশ বার করে পড়বে। এটা তোমাদের জন্য

একটা ভৃত্য রাখা অপেক্ষা উত্তম।" রাসূল ﷺ জানতেন তাঁর কন্যা হচ্ছেন সেরাদেরও সেরা। তিনি জানতেন কাজ করতে করতে ফাতিমার হাতগুলো রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল, তিনি জানতেন তাঁর হাতের চামড়াগুলো খসখসে হয়ে গিয়েছিল, তারপরেও তিনি তাঁকে তাসবীহ উপহার দিয়েছিলেন, ভৃত্য নয়।

আলী ইবন আবি তালিবের ﷺ থেকেই তাঁর স্ত্রীর বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'ফাতিমা খুবই কঠোর পরিশ্রম করতেন, যাঁতাকলে কাজ করার কারণে ওঁর হাত রুক্ষ, খসখসে হয়ে যায়। কুয়া থেকে পানি তুলতে তুলতে ওঁর ঘাড়ে দাগ পড়ে যেতো, ঘর পরিষ্কার করতে করতে ওঁর পোশাক ময়লা হয়ে পড়ত।' এই ছিল পৃথিবীর সেরা মানুষটির কন্যার অবস্থা। আর এর কারণেই তিনি ছিলেন চার সেরা নারীর একজন। জ্ঞান বা মেধার বিবেচনায় আ'ইশা ﷺ ছিলেন খাদিজা ﷺ ও ফাতিমার ﷺ থেকে অনেক অনেক এগিয়ে, তথাপি তিনি ফাতিমা বা খাদিজার ﷺ সমান সম্মাননা অর্জন করেননি।

নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন নিয়ে সমালোচনার জবাব

নবীজি ﷺ প্রথম বিয়ে করেছিলেন পঁচিশ বছর বয়সে। ন্যায়নীতিহীন একটি সমাজে থেকেও এই পঁচিশ বছর পর্যন্ত তিনি সৎ ও পবিত্র হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। নবুওয়াত পাওয়ার আগেও তাঁর জীবনে নারীঘটিত কিছু ছিল না। কিন্তু ইসলামবিদ্বেষীরা নবীজির ﷺ নামে নানারকম কুৎসা রটনা করেছে, তারা নবীজির ﷺ বিয়েকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। আ'ইশাকে অল্পবয়সে বিয়ে করা, বারো জন স্ত্রী রাখা – এসব নিয়ে তারা নবীজিকে ﷺ নিয়ে নানারকম অপবাদ দেয়। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে মুসলিমদের সঠিক ধারণা রাখা অত্যন্ত জরুরি।

প্রথমত, নবীজির ﷺ জীবনকালে মক্কার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। নারী-পুরুষের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক, মেলামেশা, ব্যভিচার এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আ'ইশা ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায় যে, সেই সময় নারী-পুরুষের মাঝে চার ধরনের সম্পর্ক প্রচলিত ছিল। একটা ছিল এখনকার সাধারণ বিয়ের মতো। দ্বিতীয় প্রকার ছিল পতিতাবৃত্তি – মক্কায় কিছু বাড়ির ওপর বিশেষ ধরনের চিহ্ন থাকতো, এগুলো ছিল পতিতালয়। তৃতীয় সম্পর্ক ছিল এমন, একজন নারী দশজন পুরুষের সাথে এক এক করে শয্যাশায়ী হবে, এরপর গর্ভধারণ করলে, তার ইচ্ছা মতো তাদের যেকোনো একজনের দিকে নির্দেশ করবে এবং সেই লোককেই বাচ্চার সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে নিতে হবে। চতুর্থ ধরনের সম্পর্ক ছিল এমন, একজন লোক তার স্ত্রীকে অভিজাত ঘরের কোনো লোকের সাথে যিনা করার জন্য পাঠাবে, যাতে করে তাদের সন্তান উন্নত বংশের হয়। এরকম নীতিবিবর্জিত সমাজে থেকেও নবীজি ﷺ নারীদের সাথে কোনো সম্পর্কে জড়াননি। পঁচিশ বছর পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন কুমার।

দ্বিতীয়ত, পঁচিশ বছর বয়সে এসে তিনি বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। সে সময় এমন একজন নারীকে বেছে নেন, যিনি ছিলেন তাঁর চাইতে পনেরো বছরের বড়। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন একজন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত মহিলা। নবীজি ﷺ উচ্চবংশের যুবক ছিলেন, চাইলেই নিজের জন্য মক্কার যেকোনো নারীকে বাছাই করতে পারতেন। তিনি চাইলেই নিজের চেয়ে ছোট অল্প বয়সী কোনো তরুণীকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি এমন একজন নারীকে বিয়ে করলেন যিনি তার চেয়েও পনেরো বছরের বড়।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজার ﷺ সাথে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত সংসার করেন। একজন পুরুষ যুবক বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্তই সাধারণত নারীদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এই বয়সটাতে পুরুষের চাহিদা থাকে সর্বাধিক। কিন্তু নবীজি ﷺ তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত কেবলমাত্র এক স্ত্রী নিয়েই সংসার করেছেন। যতদিন পর্যন্ত খাদিজা ﷺ বেঁচে ছিলেন, ততদিন অন্য কোনো বিয়ে করেননি এবং খাদিজাকে ﷺ নিয়েই তিনি অত্যন্ত খুশি ছিলেন। সুতরাং নবীজি ﷺ নারীদের ব্যাপারে দুর্বল বা তিনি নারীলোভী ছিলেন– এই ধরনের কথা শুধু ভিত্তিহীনই নয়, বরং নির্ভেজাল মিথ্যাচার।

চতুর্থত, খাদিজা ﷺ মারা যাবারও দুই-তিন বছর পর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ একাই জীবনযাপন করেন। এর পর আরেকজন বিধবা, সাওদাহকে ﷺ বিয়ে করেন। সাওদার স্বামী মারা যাওয়ায় তিনি তাঁকে বিয়ে করেন। সাওদাহ বেশ বয়স্ক ছিলেন। একটা সময় তিনি নবীজিকে ﷺ তাঁর ভাগের রাতগুলো আ'ইশার সাথে কাটানোর অনুমতি দেন, এর কারণ ছিল তাঁর বার্ধক্য।

নবীজি ﷺ এর পরবর্তীতে আরও কিছু বিয়ে করেন। তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরেই তিনি বেশিরভাগ বিয়ে সম্পন্ন করেন। তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর নয়জন বিধবা স্ত্রী ছিল। প্রশ্ন আসতে পারে কেন নবীজি ﷺ জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে এতগুলো বিয়ে করলেন, যখন নিজের যুবাবয়সে মাত্র একজন বিধবাকে বিয়ে করেই তিনি সুখী বিবাহিত জীবন লাভ করেছিলেন। শেষ বয়সে তাঁর এতগুলো বিয়ে করার কারণ কী?

প্রথমত, বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন। রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের মিশন ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। তিনি যা কিছুই করেছেন, এমনকি নিজের বৈবাহিক জীবনেও যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেগুলো কেবলমাত্র ইসলামের ভালোর কথা চিন্তা করেই নেওয়া। শুধুমাত্র নিজের খেয়ালখুশি বা চাহিদা মেটানোর জন্য কোনো কাজ করেননি। তিনি বেশ কিছু বিয়ে এই কারণেই করেছিলেন, যাতে করে অন্যান্য গোত্র ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়। যেমন, জুওয়াইরিয়্যাহকে বিয়ে করার ফলস্বরূপ বনু মুসতালিক গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, সাহাবীদের ؓ দেখাশোনা করার জন্য–যেমন, সাওদাহকে ؓ তিনি বিয়ে করেছিলেন, সাওদাহ ছিলেন বিধবা।

তৃতীয়ত, ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের ؓ সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত করা। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সাহাবীদের ؓ সম্পর্ক ছিল ভাইয়ের মতো। তিনি ইসলামের এই ভ্রাতৃত্বের সাথে পারিবারিক বন্ধন যুক্ত করে সম্পর্ক আরো মজবুত করতে চেয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই সাহাবী আবু বকর ؓ ও উমারের ؓ মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর উসমানের ؓ সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। যখন সেই মেয়ে মারা গেলেন, তখন আরেক মেয়েকেও উসমানের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনিও মারা যান। তখন নবীজি ﷺ বলেন, 'আমার যদি আরো মেয়ে থাকতো, তাহলে আমি তাদেরকে একের পর এক করে উসমানের কাছেই বিয়ে দিতাম।' আলী ইবন আবি তালিবের ؓ সাথে তিনি ফাতিমার ؓ বিয়ে দেন। এমনি করে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ চার সাহাবীর ؓ সাথেই নবীজির ﷺ পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

চতুর্থত, দ্বীনের শিক্ষা পরিপূর্ণ করার জন্য নবীজির ﷺ একাধিক বিয়ের প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহ জানা ও মানা মুসলিমদের কর্তব্য। দেশ পরিচালনা, শিক্ষকতা, ইমামতি, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক, স্বামীর দায়িত্ব প্রত্যেকটি বিষয়ে নবীজির ﷺ সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। তিনি আমীর হিসেবে কেমন ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কেমন ছিলেন, কিংবা শিক্ষক ও ইমাম হিসেবে কেমন ছিলেন– এগুলো বলার জন্য শত শত সাহাবী ؓ ছিলেন। কিন্তু নবীজির ﷺ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানাতে পারবে, এমন সাহাবির সংখ্যা নগণ্য। রাসূলুল্লাহর ﷺ সন্তানদের মাঝেও একজন বাদে সবাই মারা যান। রাসূলুল্লাহর ﷺ পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় তাঁর স্ত্রীদের বর্ণনা থেকে।

নবীজির ﷺ যদি কেবলমাত্র একজন স্ত্রী থাকতো, তাহলে অনেক সমস্যা হতো। একাধিক স্ত্রী থাকার কারণে অনেকগুলো সুবিধা হয়েছে। প্রথমত, একজনের পক্ষে সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার মনে করে রাখা খুব দুরূহ ব্যাপার। আর যদি কয়েকজন স্ত্রী থাকে, তখন একজন ভুলে গেলেও অন্য কেউ সে বিষয়টা স্মরণ করতে পারবেন। এছাড়াও যদি শুধুমাত্র একজন বর্ণনা করে, তাহলে তার কথাকে সহজেই বাতিল করে দেওয়া যায়, কেননা মাত্র একজন কথাগুলো বলছে, যার আর অন্য কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। একটা মাত্র উৎস হলে, তার বক্তব্য দুর্বল বলে প্রমাণ করে দিতে পারলেই সবগুলো হাদীসকে বাতিল করে দেওয়া যেতো। সেক্ষেত্রে তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

কাফেররা সবসময় চায় ইসলামের উপর আঘাত হানতে। তারা আবু হুরাইরাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য কতভাবে যে আক্রমণ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এর কারণ হলো, আবু হুরাইরাকে বাতিল প্রমাণ করতে পারলে তাঁর থেকে বর্ণিত পাঁচ হাজার হাদীসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেওয়া সম্ভব। নবীজির ﷺ একাধিক স্ত্রী থাকায়, তাদের থেকে বর্ণিত

হাদীসগুলোর সত্যতা আরো বেশি জোরালো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ পারিবারিক জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুন্নাহ সম্পর্কে অবহিত করে। আর এই সুন্নাহগুলো সবার জন্য প্রযোজ্য। সবাই শিক্ষক, ইমাম বা আমীর না হলেও প্রত্যেকেই একটি পরিবারের সদস্য। তাই পরিবারে রাসূল ﷺ কীরূপ আচরণ করেছেন সেটা জানার গুরুত্ব অপরিসীম, আর সেটা একমাত্র স্ত্রীদের পক্ষেই জানানো সম্ভব। এই বিশাল পরিমাণ জ্ঞানের উৎস তাঁর স্ত্রীদের থেকে পাওয়া গেছে। তাদের বক্তব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার জানা সম্ভব হয়েছে। তিনি কীভাবে খেতেন, ঘুমোতেন, বসতেন, কীভাবে স্ত্রীদের সাথে রাত কাটাতেন, কীভাবে তাদের সাথে আচরণ করতেন, দাসদের সাথে তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল, এসব বিষয়ে বহু হাদীস উম্মুল মুমিনীনদের মাধ্যমে জানা যায়।

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল নবী মুহাম্মাদকে ﷺ প্রেরণ করেছেন কুরআনের জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে, ইসলামের শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ হিসেবে। তাই তাঁর সুন্নাহ সকলের কাছে পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি। এই কারণেই তাঁকে সাধারণ নিয়ম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। চারজন বা কম সংখ্যক স্ত্রীর বদলে অধিক স্ত্রী দান করা হয়। এসবই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিকল্পনার অংশ। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনকে হেফাজত করেছেন এবং নবীজির ﷺ সব সুন্নাহ পরবর্তী সকল প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

নবীজির ﷺ যে দুটি বিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়, সে দুটি হলো আ'ইশা ﷺ এবং যাইনাব বিনতে জাহশের ﷺ সাথে বিয়ে। এই দুটো বিয়ের দিকেই লোকেরা সবচেয়ে বেশি আঙ্গুল তোলে। কারণ, আ'ইশার সাথে যখন নবীজির ﷺ বিয়ে হয়, তখন আ'ইশার ﷺ বয়স মাত্র ছয় বছর। এই বিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে আ'ইশার ﷺ বয়স নয় বছর হওয়ার পর। ওদিকে যাইনাবের সাথে নবীজির ﷺ বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণ যাইনাব ছিল নবীজির ﷺ পালক সন্তান যায়িদের স্ত্রী। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে বিয়েগুলো নিয়ে মানুষের মনে এত প্রশ্ন, ক্ষোভ, আপত্তি–সেই দুটো বিয়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি আদেশপ্রাপ্ত ছিল। নবীজির ﷺ অন্য কোনো বিয়ে ওয়াহীর মাধ্যমে নির্দেশিত ছিল না, শুধুমাত্র এই দুটি ছিল ব্যতিক্রম। সূরা আল আহযাবে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল যাইনাবকে বিয়ে করার জন্য রাসূলুল্লাহকে ﷺ নির্দেশ দেন,

> "অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাঁকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ৩৭)

আ'ইশার ﷺ সাথে বিয়ের নির্দেশও ওয়াহীর মাধ্যমে এসেছিল। নবীজি ﷺ স্বপ্নে এই নির্দেশনা পান। সহীহ বুখারিতে এই স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আ'ইশাকে বলেছেন, 'জিবরীল আমার কাছে এলেন। আমি দেখতে পেলাম তুমি একটি সিল্কের কাপড়ে জড়ানো। যখন আমি কাপড়টি সরিয়ে তোমাকে দেখলাম, জিবরীল বললেন, এই হলো তোমার স্ত্রী–দুনিয়ায় এবং আখিরাতে।' নবীজি ﷺ দু'বার একই স্বপ্ন দেখেন। নবী-রাসূলদের স্বপ্নও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী। অর্থাৎ এভাবেই আল্লাহ তাআলা নবীজিকে ﷺ আ'ইশার ﷺ সাথে বিয়ের নির্দেশ দেন।

আজকাল দুই ধরনের লোক নবীজির ﷺ বিয়ে নিয়ে আক্রমণ করে, দুর্বল ঈমানের মুসলিম আর অমুসলিম। দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা অবাক হয় এই ভেবে যে, *নবীজি ﷺ কীভাবে এমন কাজ করতে পারলেন?* তাদের জন্য উত্তর হলো–এটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ তাআলা যা-ই আদেশ দেন না কেন, একজন মুসলিম হিসেবে তা মেনে নিতে হবে, এটা নিয়ে সন্দেহ বা সংশয় প্রকাশ করলে কিংবা প্রশ্ন তুললে মুসলিম থাকা যাবে না। নবীজির ﷺ সাথে আ'ইশার ﷺ বিয়ে সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম, এটি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু নবীজির ﷺ জন্য এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হুকুম ছিল। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো অধিকার একজন মুসলিমের নেই।

আর যেসব অমুসলিম নবীজির ﷺ চরিত্র নিয়ে বাজে কথা বলে, তাদের মূল সমস্যা আসলে নবীজি ﷺ ও আ'ইশার ﷺ বিয়ে নিয়ে নয়। তাদের সমস্যা হচ্ছে, তারা মুহাম্মাদকে ﷺ আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করে না। আ'ইশার ﷺ সাথে নবীজির ﷺ বিয়ে একটি অজুহাত মাত্র। নবীজি ﷺ যদি আ'ইশাকে বিয়ে নাও করতেন, তবুও এই ইসলাম বিদ্বেষীরা কোনো না কোনো বিষয় খুঁজে নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতো। কারণ তারা নবীজিকে ﷺ আল্লাহর রাসূল হিসেবেই মানে না। তাই তাঁর সম্পর্কে ভুল ধরার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। অমুসলিমদের সাথে নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়াটাই তাই অর্থহীন। যখন মক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ নানাভাবে আক্রমণ করছিল, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিছু আয়াত নাযিল করেন,

> **"তাদের কথাবার্তায় আপনার যে দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি খুব ভালভাবেই জানি। কিন্ত তারা তো নিশ্চয়ই আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এই জালিমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।"** (সূরা আনআম, ৬: ৩৩)

তারা ব্যক্তি মুহাম্মাদকে ﷺ অস্বীকার করেনি বরং তারা আল্লাহর বাণীকেই অস্বীকার করেছে। নবীজির ﷺ সাথে তাদের আক্রমণাত্মক আচরণের কারণ ছিল এটাই যে তিনি আল্লাহর রাসূল। নবীজির ﷺ চরিত্রের জন্য আসলে তারা তাঁকে আক্রমণ করে না, বরং নবীজি ﷺ ইসলামের বার্তা প্রচারের মিশনে নেমেছেন দেখেই তাঁকে নিয়ে তাদের এতো ক্ষোভ।

নবীজির ﷺ সাথে আ'ইশার ؓ বিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। সত্যি বলতে, নবীজির ﷺ সাথে আ'ইশার বিয়ে হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা মুসলিমদের ওপর অনেক বিশাল নিআমত দান করেছেন। যারা আ'ইশার অল্প বয়সে বিয়ে নিয়ে সংশয় পোষণ করে, তারা মূলত বুঝতেই পারে না যে, এই বিয়ে না হলে মুসলিম উম্মাহর ওপর কী দুর্যোগ আপতিত হতো! আ'ইশা ؓ ছিলেন একজন আলিমা, প্রচণ্ড মেধাশক্তির অধিকারী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও অনুসন্ধানী প্রকৃতির।

আ'ইশার ؓ বয়স খুব কম ছিল এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুসুলভ, তাই তিনি নবীজিকে ﷺ প্রশ্ন করতে পারতেন। কিন্তু অন্য সাহাবীরা ؓ নবীজির ﷺ প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান থেকে এভাবে প্রশ্ন করতে পারতেন না। এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন অবশ্যই ছিল, যে নবীজির ﷺ কাছে তাঁর বক্তব্যগুলো নিয়ে জানতে চাইতে পারে। তাই আ'ইশার স্ত্রী হওয়াটা জরুরি ছিল।

নবীজির ﷺ এক সাহাবী, আমর ইবন আস ؓ বলেন, 'আমি নবীজির ﷺ সাথে বছরের পর বছর একসাথে থেকেছি। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে কেমন ছিলেন; আমি বলতে পারবো না। কারণ তাঁর প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণে আমি কখনো তাঁর চোখের দিকে সরাসরি তাকাইনি।' যেখানে নবীজির ﷺ সাহাবীরা ؓ তাঁর দিকে তাকানোর পর্যন্ত সাহস পেতেন না, সেখানে আ'ইশা খুব খোলাখুলিভাবে নবীজির ﷺ সাথে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে আ'ইশা ؓ অনেক বেশি শিখতে পেরেছিলেন। তিনি ইসলামের বড় মাপের আলিমদের একজন। সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁর অবস্থান চতুর্থ। ইসলামের যেকোনো ফিক্বহের গ্রন্থে আ'ইশার উল্লেখ পাওয়া যাবে। সুতরাং নবীজির ﷺ আ'ইশাকে বিয়ে করা সত্যিকার অর্থেই মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক বড় নিআমত।

আ'ইশা ؓ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ আর কোনো কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। আর আ'ইশাই ছিলেন নবীজির ﷺ একমাত্র কমবয়সী স্ত্রী। তিনি ছাড়া নবীজির ﷺ বাকি সব স্ত্রী হয় বিধবা ছিলেন কিংবা তালাকপ্রাপ্তা, বয়সেও সবাই পূর্ণবয়স্ক ছিলেন। তাই আ'ইশার ؓ সাথে নবীজির ﷺ বিবাহ ছিল একটি ব্যতিক্রমী বিয়ে।

নবীজি ﷺ অন্যান্য যে বিয়েগুলো করেছিলেন, সেগুলোর প্রেক্ষাপটও জানা প্রয়োজন। উম্মে হাবিবা ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ আরেকজন স্ত্রী। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবিসিনিয়াতে হিজরত করেন। কিন্তু তাঁর স্বামী ইসলাম থেকে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়, ফলে তাঁকে অনেক দুর্দশা আর কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের কন্যা। পরবর্তীতে তাঁর স্বামী মারা গেলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন উমাইয়া আদ দামরীর মাধ্যমে নাজ্জাশির কাছে একটি চিঠি লিখে পাঠান। এই পত্রে লেখা ছিল যে, নাজ্জাশি যেন নবীজির ﷺ সাথে উম্মে হাবিবার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

উম্মে হাবিবাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ে করেছিলেন তাঁর প্রতি সহানুভূতি থেকে। এই কারণে তিনি হাজারো মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও নবীজি ﷺ তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর সকল দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। আরেকটা কারণ ছিল, এই বিয়ের মাধ্যমে ইসলামের সবচেয়ে একগুঁয়ে শত্রু আবু সুফিয়ানকে ইসলামের কাছাকাছি নিয়ে আসা, ইসলামের প্রতি তাদের অবস্থানকে নমনীয় করে তোলা।

অদ্ভুত বিষয় হলো, ইসলামের ঘোরতর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আবু সুফিয়ান নবীজির ﷺ সাথে নিজের মেয়ের বিয়ের কথা শুনে খুশি হয়ে ওঠে! সে বলে ওঠে, 'মুহাম্মাদের চেয়ে উত্তম আর কে আছে!' এর কারণ ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ বংশমর্যাদা। বনু হাশিম গোত্রের একজন সদস্যের সাথে তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে জেনে সে আনন্দিত হয়ে উঠেছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তার বিরোধ ছিল আদর্শিক বিরোধ, দ্বীন নিয়ে দ্বন্দ্ব, কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন তাদের চাইতে অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বংশের অধিকারী, তাই তিনি তার মত কম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করায় তার অন্তর নরম হয়ে পড়ে।

আরেকটি বিয়ে ছিল উম্মে সালামার সাথে। তিনিও আবিসিনিয়াতে হিজরত করেছিলেন। এরপর তিনি মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর স্বামী আবু সালামা মারা যাবার পরে নবীজি ﷺ উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন। এভাবে নবীজি ﷺ মৃত সাহাবাদের ؓ স্ত্রীদেরকে বিয়ে করার মাধ্যমে তাদের দেখাশোনার ভার গ্রহণ করতেন। এইসব সাহাবিয়াত ছিলেন বয়স্কা, বৃদ্ধা নারী। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বিয়ে করেছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন মুসলিম উম্মাহর পিতা, মুসলিম উম্মাহর তত্ত্বাবধায়ক। সাহাবীদের ؓ সাথে রক্তের সম্পর্ক না থাকুক, তিনি ছিলেন তাদের সবচেয়ে আপনজন। সাহাবীদের ؓ ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, কষ্টে, প্রয়োজনে, দুঃসময়ে সবসময় পাশে থেকেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কাবা পুনর্নির্মাণ

মুহাম্মাদের ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। একবার আল-কাবা বন্যাকবলিত হয়। আল-কাবার অবস্থান একটি নিচু উপত্যকায়, পর্বতরাজির মাঝে। বন্যার ফলে কাবার কাঠামোতে ফাটল ধরে। তাই কুরাইশগণ কাবাকে পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করে। আল-কাবা মোট চার বা পাঁচবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। ইবরাহীম ؑ এবং আদম ؑ–এই দুইজনের মধ্যে কে সর্বপ্রথম আল-কাবা নির্মাণ করেছিলেন তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতানুসারে ইবরাহীম-ই ؑ প্রথম তা নির্মাণ করেন।

যারা বলেন যে আদমই ؑ প্রথম নির্মাণকারী তারা এর পক্ষে কুরআনের যুক্তি পেশ করেন। কেননা কুরআনে বলা আছে,

> “এবং স্মরণ করো যখন ইবরাহীম ؑ ও ইসমাঈল ؑ কাবার ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।” (সূরা বাকারাহ, ২: ১২৭)

তাঁরা বলেন যে, ইবরাহীম ؑ কাবাঘর গোড়া থেকে নির্মাণ করেননি, তিনি যা করেছিলেন তা হলো ভিত্তি উত্তোলন, অর্থাৎ সেখানে ইতিমধ্যে উত্তোলন করার মতো কিছু ছিল। তাই তাঁরা বলেন যে, নবী আদমের ؑ সময়েই আল-কাবার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাস এটাই যে ইবরাহীম ؑ আল-কাবা নির্মাণ করেছেন। তবে যে নবীই সর্বপ্রথম তা করুক না কেন আল-কাবার পবিত্রতা নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

বেশ কয়েকজন নবী-রাসূল আল্লাহর ঘর পরিদর্শন করেছেন। হাদীস থেকে জানা যায়, হুদ ؑ, সালেহ ؑ এবং নূহ ؑ আল-কাবা পরিদর্শন করেছিলেন। এছাড়াও জানা যায় ঈসা ؑ যখন পুনরায় পৃথিবীর বুকে প্রত্যাবর্তন করবেন তখন তিনি হজ্ব করবেন। সুতরাং, এটি হয় আদম ؑ অথবা ইবরাহীম ؑ নির্মাণ করেছেন কিন্তু আল্লাহকে স্মরণের জন্য এটিই প্রথম নির্মিত ঘর।

> “নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত – বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক।” (সূরা আল-ইমরান, ৩: ৯৬)

মক্কা বন্যাপ্লাবিত হওয়ায় কাবা ঘর দ্বিতীয়বার নির্মাণের প্রয়োজন হয়। কুরাইশগণ এটিকে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিল, তাই কাবা ঘরের পুরনো ইমারতটি ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন পড়লো, কিন্তু তারা কেউই এই পদক্ষেপটি নিতে সাহস পাচ্ছিল না। তারা তাদের সব যন্ত্রপাতি নিয়ে আল-কাবার চারপাশে অপেক্ষা করছে, কিন্তু কেউই সামনে গিয়ে এটি ভাঙ্গার কাজটি শুরু করতে চাচ্ছিল না, সেই সময়ে মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা আল-কাবাকে এতটা শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো। তারা সত্যি সত্যিই আল্লাহকে ভয় পেত; তারা বিশ্বাস করতো যে এটি ভেঙ্গে ফেললে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। অতঃপর তাদের মধ্যে একজন বললো যে, সে এই কাজটি শুরু করবে, তাই পরদিন ভোরে সে তার পুত্রদের নিয়ে আল-কাবার পাথরসমূহ সরাতে শুরু করলো আর বলতে থাকলো, ‘হে আল্লাহ! তুমি ভয় পেয়ো না। আমরা তোমার ভালো চাই।’

এখানে লক্ষণীয়, আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস–তারা ভাবত যে, এসব বলে তারা আল্লাহকে শান্ত করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছু জানেন, মানুষ কোন কাজটা কেন করছে তা তাকে মুখে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তিনি অন্তরের খবর রাখেন। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো ঠিকই কিন্তু তাঁর গুণাবলিকে অনুধাবন করতে পারতো না।

এরপর আল-কাবার দেয়ালগুলোকে নামিয়ে ফেলা হয়। তখন মক্কার অদূরে অবস্থিত লোহিত সাগর বন্দরে রোমের একটি জাহাজ নোঙর করে। তারা সেই জাহাজের কিছু কাঠ নিয়ে আসে, ওই জাহাজে আগত এক রোমান নির্মাতার সাহায্যে আল-কাবার পুনর্নির্মাণ সম্পন্ন করে। জাহাজ থেকে নিয়ে আসা ওই কাঠ দিয়েই প্রথমবারের মত আল-কাবার ছাদ নির্মিত হয়েছিল। কুরাইশগণ খুব ভালভাবেই জানত যে সুদের অর্থে ভালো কিছু নেই। আর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে শুধুমাত্র হালাল অর্থ দিয়েই আল-কাবার নির্মাণকাজ সম্পাদিত হবে। সেই সময় পতিতাবৃত্তি বহুল প্রচলিত ব্যবসা হওয়া সত্ত্বেও তারা সুদ অথবা পতিতাবৃত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ এই কাজে কোনোভাবেই ব্যবহার করবে না বলে মনস্থ করে। মানুষ সেই সময় থেকেই জানত যে এভাবে অর্জিত অর্থে কোনো কল্যাণ নেই অথচ তারপরেও তারা অর্থ উপার্জনের খাতিরে তাদের ক্রীতদাস মেয়েদেরকে দিয়ে পতিতাবৃত্তিসহ আরও বিভিন্ন রকম কাজ করাতো। অর্থের সংকুলান না হওয়ার কারণে তারা আল-কাবার একটি দিক কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিল। কাবাকে আয়তাকার না বানিয়ে বর্গাকার বানিয়েছিল। কাবার যে অংশটি তারা আর বানাতে পারেনি সেই অংশটিই এখন আল-হিজর বলে পরিচিত। কাবার দুটো ফটক ছিল, তারা বানিয়েছিল একটি আর তারা এর দোরগোড়াকে উঁচু করে বানিয়েছিল, তাই এখন-কাবার দরজার কাছে যেতে হলে উপরে উঠতে হয়।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এক হাদীসে স্ত্রী আ'ইশাকে ﷺ বলেছিলেন, 'তুমি কি জানো না যে তোমাদের সম্প্রদায়ের আল-কাবা নির্মাণের ব্যয় বহনের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল ছিল না? তোমাদের সম্প্রদায় নওমুসলিম না হলে অমি আল-কাবাকে ভেঙে এর পূর্ব ও পশ্চিমদিকে একটি করে দরজা নির্মাণ করতাম। আমি আল-হিজরকে আল-কাবার অন্তর্ভুক্ত করতাম।'

রাসূল ﷺ মক্কাতে প্রবেশের পরপরই আল-কাবাকে তার প্রকৃত ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু এরপর তিনি আ'ইশাকে ﷺ বলেন, 'আমি এই কাজটি করবো না শুধু এই কারণে যে কুরাইশরা সবেমাত্র মুসলিম হয়েছে। তাদের ইসলাম এখন ভঙ্গুর, ঈমান দুর্বল, আর এখন যদি অমি কাবাকে পুনর্নির্মাণ করি, তা তাদের অনুভূতিকে আঘাত করবে।'

শিক্ষা

দাঈদেরকে সমসাময়িক মানুষদের মানসিকতাকে বিবেচনায় রাখতে হবে। রাসূল ﷺ কাবার পুনর্নির্মাণ করতে আগ্রহী ছিলেন, তবু তিনি তা করেননি কারণ তিনি সেখানকার মানুষদের ঈমানে কোনোরূপ আঘাত করতে চাননি। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেছেন, 'তুমি যদি মানুষকে এমন কোনো কথা বলো যা তাদের বোধগম্য নয়, তাদের স্বল্পবুদ্ধি বা ঈমানের কারণে তা তারা বুঝতে পারে না, তখন তা তাদের জন্য ফিতনা হতে পারে।' এমন হতে পারে যে, একটি বিষয় সম্পূর্ণ সত্য এবং বৈধ–কিন্তু

সেটা শোনার জন্য মানুষ এখনো প্রস্তুত নয়, তখন সে বিষয়ক তথ্য উল্টো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের সম্প্রদায় (কুরাইশ) আল-কাবার দরজা উঁচু করে নির্মাণ করেছে যাতে তারা কে এর ভিতরে গেল আর কে বের হলো তা তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।' এটি ছিল ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের একটি বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যদি আমি একে আবার বানাতাম তাহলে এর দরজাটি নিচু করে দিতাম আর দুইটি দরজা বানাতাম যাতে মানুষ একটি দিয়ে প্রবেশ করে অপরটি দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার পুনর্নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। কুরাইশরা কাবার পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করার পর কালো পাথর বসানোর বিষয়টি সামনে এলে সমস্যা বেঁধে যায়। সবাই কালো পাথর যথাস্থানে রাখার মর্যাদা পেতে চায়। বনু আব্দুদ দার গোত্র তার সমস্ত লোকজনকে এক করে রক্তে পূর্ণ একটি পাত্র নিয়ে কাবার সামনে উপস্থিত হয়। পাত্রটি সবার সামনে রেখে তারা তাতে হাত ডুবিয়ে আবার হাত বের করে নেয়। এর দ্বারা তারা সবাইকে বুঝিয়ে দেয় যে, যদি তাদেরকে পবিত্র কালো পাথর হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে স্থাপনের সম্মান না দেয়া হয় তবে তারা এর জন্য যুদ্ধ করে মরতে প্রস্তুত। অন্যেরাও দমবার পাত্র ছিল না! এই দৃশ্য দেখে উল্টো আরেক গোত্র তাদের রক্তের পাত্র এনে একইভাবে যুদ্ধের অঙ্গীকার করে। অন্যান্য গোত্রও একই রকম অঙ্গীকার করলো। চার পাঁচদিন যাবত এই নিয়ে ঝগড়া চলতে থাকে। অবশেষে তাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উমাইয়া বললেন, 'আসুন আমরা সকলে এই সিদ্ধান্তে সম্মত হই যে, আগামীকাল ভোরে মাসজিদুল হারামের দরজা দিয়ে যিনি প্রথম প্রবেশ করবেন তাঁর ফয়সালা আমরা সবাই মেনে নেব।'

পরদিন ভোরে মুহাম্মাদ ﷺ সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে বলে, 'ইনি তো সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত! আমরা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দিলাম।' তারা মাসজিদুল হারামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিবে বলে সম্মত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ হওয়ায় তারা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ও খুশি হয়েছিল, কারণ তারা জানত যে, তিনি কখনোই পক্ষপাতিত্ব করবেন না। আর তাই তারা তাঁর হাতে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে একটা চাদর আনতে বলেন। এরপর নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ উঠিয়ে তা সেই চাদরের মাঝখানে রাখেন। অতঃপর বিদ্যমান গোত্রসমূহের নেতাগণকে সেই চাদরের কিনারা ধরতে বলেন। তারা সবাই একই সময়ে চাদরটি উঁচিয়ে ধরলো; এভাবে প্রত্যেকটি গোত্রই পবিত্র কালো পাথর হাজরে আসওয়াদ উত্তোলনে অংশ নেয়। যখন তারা সবাই পাথরটি উঁচিয়ে ধরে তার নির্ধারিত জায়গায় নিয়ে যায় তখন মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে

স্থাপন করেন। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহই ﷺ হাজরে আসওয়াদকে তার নির্ধারিত জায়গায় স্থাপন করেন। এভাবে দ্বিতীয়বারের মতো কাবা নির্মিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন যে, যদি কুরাইশরা সেই সময়ে নওমুসলিম না হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই আল-কাবাকে ইবরাহীমের عليه السلام দেওয়া ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করতেন। এর বেশ কয়েক বছর পর আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়ের মক্কার আমীর পদে আসীন হন। আ'ইশা رضي الله عنها তাঁর খালা হওয়ার সুবাদে তিনি এই হাদীস সম্পর্কে জানতেন। আবদুল্লাহ ইবন আয যুবাইরের মা আসমা বিনত আবি বকর رضي الله عنها ছিলেন আ'ইশার رضي الله عنها বোন। আবদুল্লাহ ইবন আয যুবাইর আল কাবাকে তার মূল ভিত্তির ওপর ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তৎকালীন মুসলিমগণ পূর্বের ন্যায় আর নও মুসলিম ছিলেন না, তারা ততদিনে পরিণত হয়েছেন। আয যুবাইর তখন কাবাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন কারণ বনু উমাইয়্যাহর সাথে যুদ্ধে কাবায় একবার আগুন ধরে যায়। আল হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আস সাকাফি মক্কা অবরোধ করেছিল, ওই সময় আবদুল্লাহ ইবন আয যুবাইর এবং বনু উমাইয়্যাহর মধ্যে সিরিয়াতে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আবু উমায়েরের সেনাবাহিনী প্রধান মক্কা অবরোধ করেছিল, তাদের নিক্ষিপ্ত গোলাবারুদের দ্বারা কাবা অগ্নিদগ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ক্ষতিটুকু কাবার ইমারতকে না ভেঙেও মেরামত করা যেতো। কিন্তু আয যুবাইর এই পরিস্থিতির সুযোগ ব্যবহার করে কাবাকে তার মূল ভিত্তির উপর ফিরিয়ে আনেন। তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস অনুযায়ী কাবাকে পুনর্নির্মাণ করেন। রাসূলের ﷺ ইচ্ছানুযায়ী কাবার দরজাকে নিচে নামিয়ে আনেন, পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে একটি করে দরজা নির্মাণ করেন এবং হিজরের দিকে কাবাকে প্রসারিত করেন।

আবদুল্লাহ ইবন আয যুবাইর সেই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। আল হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ মক্কা দখল করে। তৎকালীন খলিফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান রাসূলুল্লাহর ﷺ সেই হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাই তিনি কাবাকে আবার আবদুল্লাহ আয যুবাইরের আগে যেভাবে কুরাইশগণ নির্মাণ করেছিল, সেভাবে করার হুকুম জারি করেন। বনু উমাইয়্যাহর খিলাফাহর পর বনু আব্বাস খিলাফত লাভ করে, তারাই ছিল খলিফার রাজপরিবার। বনু আব্বাসের একজন খলিফা কাবাকে তার মূল ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণের কথা ভাবছিলেন। তিনি ইমাম মালিকের সাথে এই ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করেন। ইমাম মালিক খলিফাকে বলেন, 'আমরা কাবাকে রাজা-রাজড়াদের হাতের পুতুলের মতো ক্ষণে ক্ষণে আকৃতি পরিবর্তনের পক্ষপাতী নই। যদিও এটিকে হযরত ইবরাহীমের দেওয়া ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণের কথা ও পরিকল্পনা রাসূলুল্লাহরও ﷺ ছিল, কিন্তু এটা এভাবেই থাকুক এবং আমরা আর এর পরিবর্তন সাধন করবো না।' এটি ইমাম মালিকের দেওয়া একটি অন্যতম বিচক্ষণ পরামর্শ ছিল। খলিফাও সেটি তখন মেনে নিয়েছিলেন। বর্তমানে যে কাবা রয়েছে তা কুরাইশগণের ভিত্তির ওপরই নির্মিত।

আলহামদুলিল্লাহ, এতে ভালোই হয়েছে। যদি কাবাকে ইবরাহীমের عليه السلام দেওয়া তাঁর

আসল ভিত্তির উপর নির্মাণ করা হতো, তাহলে মুসলিমরা কাবার অভ্যন্তরে ইবাদত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু যেহেতু এটাকে কমিয়ে ফেলা হয়েছিল, তাই অর্ধবৃত্ত দিয়ে ঘেরা অংশটি প্রকৃতপক্ষে কাবারই অংশ। তাই ওই অংশে ইবাদাত করা যেন কাবার অভ্যন্তরেই ইবাদত করা। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার অভ্যন্তরে ইবাদত করেছেন। সময়ের সাথে সাথে কাবার উচ্চতাকে বাড়ানো হয়েছে বটে কিন্তু এর জায়গার পরিবর্তন হয়নি। যে পাথরগুলো দিয়ে কাবা নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলো সেইসব পাথরের অবশিষ্টাংশ যা ইবরাহীম ﷺ ব্যবহার করেছিলেন, তবে সবগুলো নয়, কিছু পাথর পরবর্তীতে কুরাইশ এবং অন্যেরা সংযোজন করেছে।

এটিই সেই কালো পাথর যা ইবরাহীম ﷺ ব্যবহার করেছিলেন। এই পাথরটি ঘিরে অনেক গল্প কাহিনি প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে এটি জান্নাতে তৈরি হয়েছে। তিরমিযীর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কালো পাথরটি আসলে সাদা ছিল যা পরবর্তীতে পাপী আদম সন্তানদের স্পর্শের কারণে কালো রঙ ধারণ করেছে। অন্য হাদীসে এসেছে এই পাথরটি স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয়। এটি কাবার একমাত্র অংশ যাকে চুম্বন করা হয় এবং দূর থেকে যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়। কেউ কেউ আবার ইয়েমেনি কোণের দিকেও ইঙ্গিত করে থাকে, কিন্তু তা সঠিক নয়। কাবা প্রদক্ষিণ করার সময় ইয়েমেনি কোণকে স্পর্শ করা যেতে পারে কিন্তু সেটির দিকে ইঙ্গিত করা কিংবা অভিবাদন করা ঠিক না। এটি শুধুমাত্র পবিত্র কালো পাথরকেই করা উচিত।

হেরা গুহায় নির্জনাবাস

নবী কারীম ﷺ মক্কা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতের গুহায় সময় কাটাতে চলে যেতেন। তিনি সাথে কিছু খাবার ও পানীয় নিতেন এবং হেরা পর্বতের নির্জনতায় আল্লাহর ইবাদাত করতেন। তখন হেরা পর্বতের গুহা থেকে কাবাকে দেখা যেতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে দিনরাত আল্লাহর ইবাদাত করতেন। তিনি আল্লাহকে চিনতেন। এই সময়টা ছিল আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবার জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ এক সুবর্ণ সুযোগ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, কেননা ধ্যান ও গভীর চিন্তা অন্তরকে শুদ্ধ করে। সাঈদ হাওয়া এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

'তৎকালীন সময়ে হিদায়াত অন্বেষণকারী কিছু মানুষ এই ধরনের একাকীত্বে সময় কাটানোকে বেছে নিত, সেখানে তারা আল্লাহকে স্মরণ করতো এবং আল্লাহর ইবাদাত করতো। এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর স্মরণে নিমজ্জিত থেকে, অন্তরকে উদাসীনতা এবং নফসের খেয়াল-খুশির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা যেন হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে অন্তর হিদায়াতের আলোয় আলোকিত হওয়ার সুযোগ পায়। অনেকেই মনে করে, ঈমানী যাত্রার সূচনালগ্নে একজন মানুষের উচিত নির্জনতায় কিছু নিবিড় সময় কাটানো, কারণ আল্লাহর রাসূল নবুওয়াতের আগে এবং প্রারম্ভে এভাবেই নির্জন সময় কাটিয়েছিলেন।'

মুসলিমদের আল্লাহর যিকিরে কিছু সময় একাকী কাটানোর অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। যেমন ভোরের প্রথমাংশে, আসরের পর অথবা জুমু'আর দিনে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে। আলেমরা এই ধরনের একান্ত যিকিরের অনেক ফায়ায়েল বর্ণনা করেছেন। তবে এর মানে নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা নয়। লোকজনের সাথে মেলামেশা যেমন করতে হবে, তেমনি নিজের জন্য একান্ত কিছু সময়ও রাখতে হবে, দুটোর মাঝে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। নির্জনতার জন্য কিয়ামুল লাইল একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ। যখন সবাই গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত, তখন একাকী উঠে আল্লাহর ইবাদত করা। এই সময়টা বান্দার জন্য আল্লাহর সাথে একান্তে সময় কাটানোর অপূর্ব সুযোগ। আর এই সময়ে ইবাদাত করা বান্দার ইখলাস বা আন্তরিকতার পরিচয়ও বহন করে, কেননা এই সময়ে কেউ তাকে দেখছে না, শুধুই আল্লাহর জন্য সে সালাতে উঠে দাঁড়িয়েছে, লোক দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। অন্যান্য সালাত, যেগুলো জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়, সেসব ক্ষেত্রে এই সুযোগ নাও থাকতে পারে।

প্রাক-ইসলামি যুগে তাওহীদের অনুসারীরা

নবীজির ﷺ নবুওয়াতের আগের সময়টি ছিল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। কারো মাঝে সত্য-মিথ্যার তারতম্য করার ক্ষমতা বাকি ছিল না বললেই চলে। তবুও আনাচে-কানাচে তখনও দু একজন লোক ছিল যাদের মাঝে হক্ব ও বাতিলের বোধ বেঁচে ছিল। তাদের অন্তর তাদেরকে সত্যের দিকে, সরলপথের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

যায়িদ ইবন নাওফাল رضي الله عنه

যায়িদ ছিলেন কুরাইশ বংশের সন্তান। কিন্তু সত্যের সন্ধানে মক্কার বাইরে যাত্রা করেন। ইহুদিদের কাছে যান, তাদের কাছ থেকে ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে জানেন। সব জানার পরে, এই ধর্মের অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর তিনি যান খ্রিস্টানদের কাছে। খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জানার পরেও তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি জানতে পারলেন নবী ইবরাহীমের ﷺ দ্বীনের কথা, যে দ্বীনকে বলা হয়েছে 'হানিফিয়া' বা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদতের দ্বীন। তিনি ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে, একজন "হানিফি" হিসেবে তিনি শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন।

মক্কার শির্কের গভীর আঁধার-সাগরে যায়িদ ইবন নাওফাল একাই যেন স্রোতের বিপরীতে যাচ্ছিলেন। তিনি ছাড়া এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলার আর কেউ ছিল না। আসমা বিনতে আবু বকর رضي الله عنها বলেন, 'আমি দেখতাম যায়িদ ইবন নাওফাল কাবায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে ডাকতেন। তিনি বলতেন, 'হে কুরাইশ গোত্র, তাঁর শপথ যাঁর হাতে যায়িদের জীবন ও মরণ, আমি ছাড়া তোমাদের আর

কেউ-ই ইবরাহীমের দ্বীনকে অনুসরণ করছো না।' অথচ কুরাইশের লোকেরা খুব দাবি করতো যে, তারাই ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর আছে! যায়িদ আরও বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি যদি একটু জানতে পারতাম কোন পথ তোমার সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়, আমি সেই পথেই তোমার ইবাদত করতাম, কিন্তু আমি তো তা জানি না।'

যায়িদ ইবন নাওফাল সত্য বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু এই সত্যকে কীভাবে জীবনে প্রয়োগ করতে হয়, কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হয় – তা তাঁর জানা ছিল না। দ্বীন পালন করার জন্য তাঁর কাছে কোনো শরীয়াহ ছিল না। প্রত্যেক যুগেই যায়িদের মতো কিছু লোক থাকে যারা সত্যকে অনুধাবন করতে পারে। তারা বোঝে যে, সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ কেবলমাত্র একজন। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আল্লাহর ইবাদত করতে চায়, কিন্তু ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকে না। এমনকি, অনেক ধর্মান্তরিত মুসলিম ভাইবোনের পূর্ব অভিজ্ঞতা শুনলে জানা যায়, তাদের অনেকেই আগে থেকেই বুঝতে পারতেন যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তারা নিজে নিজেই বুঝতে পারতেন, কোনটা সঠিক এবং কোনটা ভুল। যায়িদ শুধুমাত্র তাঁর প্রকৃতিগত স্বভাবের মাধ্যমেই অনেক কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। ব্যাপারটি বিস্ময়কর! যেমন, তিনি কখনও কন্যাশিশু হত্যায় শরীক হতেন না। এই কাজটা থেকে সবসময় দূরে থাকতেন। এমনকি কোনো বাবা তার মেয়েকে হত্যা করবে শুনলেই তিনি সোজা সেই বাবার কাছে হাজির হতেন। বলতেন, 'একে আমার কাছে দিয়ে দাও, আমি ওর দেখাশোনা করবো। সে বড় হওয়ার পর তুমি চাইলে তাকে ফেরত নিতে পারো আর না হয় আমার কাছেই রেখে দিতে পারো।' এভাবে তিনি বহু মেয়েকে পালক নিয়েছিলেন।

মক্কায় জবাই হওয়া পশুর মাংস খেতেও যায়িদের আপত্তি ছিল। একবার রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে মাংস রাখা হলে তিনি তা খেতে আপত্তি জানান এবং পাশের জনকে দিয়ে দেন। এরপর সেই মাংস যখন যায়িদকে দেওয়া হলো, তিনি বললেন, 'আমি এই গোশত খাবো না। তোমাদের দেবতাদের জন্য যে পশু জবাই দিয়েছ সেখান থেকে আমি গোশত খাবো না।' যায়িদ কুরাইশদের লোকদের কাছে গিয়ে তাদের দেবতাদের জন্য পশু বলি দেওয়ার নিন্দা করতেন। তিনি বলতেন, 'এইসব ভেড়া আল্লাহর সৃষ্টি, তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তা থেকে জমিতে ফসল ফলান। তাহলে তোমরা কেন আল্লাহর এত নিআমতকে অস্বীকার করছো? কীভাবে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য দেবদেবীর নামে জবাই দিচ্ছো?'

নবীজির ﷺ নবুওয়াত লাভের আগেই যায়িদ ইবন আমর ইবন নাওফাল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র সায়িদ ছিলেন মুসলিম, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর ﵁ একজন। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে নিজের বাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন-

- বাবা তো নবুওয়াতের আগেই মারা গেছেন, তাহলে তাঁর দ্বীন কী ছিল?
- কিয়ামতের দিনে তোমার বাবা একাই একটা জাতি হিসেবে উপস্থিত হবে।

অর্থাৎ নবীজি ﷺ যায়িদ ইবন নাওফালের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। বিচার দিবসে যায়িদ একাই যেন একটি জাতি হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

হাশরের ময়দানে লোকেরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত থাকবে। প্রত্যেক জাতির সাথে থাকবে সেই জাতির জন্য প্রেরিত নবী ও রাসূল। মূসা ﷺ, ঈসা ﷺ, নূহ ﷺ, ইবরাহীম ﷺ, মুহাম্মাদ ﷺ, প্রত্যেকে তাদের উম্মাতসহ উপস্থিত হবেন। কিন্তু যেহেতু যায়িদ ইবন নাওফাল কোনো নবীর উম্মাতের অংশ ছিলেন না, তাই সেদিন তিনি একাই যেন একটি জাতি। বিচারের দিনে যায়িদ একাকী হয়েও একটি উম্মাহ হিসেবে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর মর্যাদা পাবেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে দাখিল করবেন, কেননা তিনি সত্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন, সত্যকে জানার পর এক আল্লাহর ইবাদত করেছেন, তাঁর পক্ষে যতটা করা সম্ভব ছিল ততটাই করেছেন।

ওয়ারাকাহ ইবন নাওফাল ﷺ

ওয়ারাকাহ ইবন নাওফাল মা খাদিজার ﷺ চাচাতো ভাই। ধর্মমতে খ্রিস্টান। শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, খ্রিস্টধর্ম নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন। তবে খ্রিস্টান হলেও তাঁর বিশ্বাস ছিল আল্লাহ এক, অর্থাৎ তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সে সময় খ্রিস্টধর্মের এমন কিছু অনুসারী ছিল যারা এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করতো, তারা ঈসাকে ﷺ রব আখ্যায়িত করতো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রথম ওয়াহী প্রাপ্ত হন, তখন খাদিজা ﷺ এই ওয়ারাকাহ ইবন নাওফালের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এর ঠিক পরপরই ওয়ারাকাহ মৃত্যুবরণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। লোকে বলাবলি করতে থাকে, ওয়ারাকাহর কী হবে? সে তো মুসলিম ছিল না, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবে। নবীজির ﷺ ওপর তখন ওয়াহী অবতীর্ণ হলেও, সেটা সবার কাছে প্রচার করার নির্দেশ আসেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ারাকাহ সম্পর্কে বলেন, 'আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি, তাঁর পরনে ছিল সাদা কাপড়। যদি তিনি জাহান্নামের অধিবাসী হতেন, তবে সাদা কাপড় পরে থাকতেন না।'

পরবর্তীতে তিনি ﷺ আরেকটি স্বপ্ন দেখেন। এবারে তিনি দেখেন, ওয়ারাকাহ জান্নাতে অবস্থান করছেন এবং তাঁর দুজন অভিভাবক রয়েছে। এই স্বপ্ন থেকে বোঝা যায়, ওয়ারাকাহ জান্নাতে যাবেন, কেননা তাঁর ঈমান সঠিক ছিল।

সালমান আল ফারিসী ﷺ

সালমান আল ফারিসীর কাহিনি খুবই চমকপ্রদ। তাঁর নিজের বর্ণনা থেকেই সেই কাহিনি সংরক্ষিত রয়েছে। সালমান আল ফারিসীর বৃদ্ধ বয়সের ঘটনা, একদিন ইবন আব্বাস ﷺ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর জীবনের গল্প শুনতে চাইলেন। তখন তিনি ইবন আব্বাসকে নিজের কাহিনি বলতে শুরু করলেন। তাঁর ভাষায়–

"আমি ছিলাম ইস্পাহানের (বর্তমান ইরান) এক ফারসি যুবক। আমাদের গ্রামের নাম জাইয়্যান। আমার বাবা সেই অঞ্চলের প্রধান। আমরা ছিলাম 'মাজুস' (Magian) ধর্মের অনুসারী। আমি অনেক কষ্ট সহ্য করে অত্যন্ত কঠোরভাবে সেই ধর্মের অনুসরণ করছিলাম। একজন ভালো মাজুস হওয়ার জন্য আমি কঠিন সাধনা করছি। এক সময় আমি 'আগুনের রক্ষক' হিসেবে উন্নীত হলাম।"

মাজুসি ধর্মাবলম্বীরা মঙ্গল ও অমঙ্গলের শক্তিতে বিশ্বাস করতো এবং আগুনের পূজা করতো। এটা ছিল শির্ক। আগুনের রক্ষক হওয়া সেই ধর্মের খুব উঁচু পদ ছিল। সালমানের ওপর সে দায়িত্ব এসে পড়ে। তাঁর কাজ ছিল আগুন জ্বালানো এবং কখনও যেন এটা নিভে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখা। প্রত্যেক গ্রামের মন্দিরেই এমন একটি করে আগুন জ্বালানো থাকতো। সেটা সর্বদা জ্বালিয়ে রাখার নিয়ম ছিল।

"আমার বাবার অনেক বড় ব্যবসা ছিল। একদিনের কথা। আব্বা একটা বাড়ি বানানোর কাজে সেদিন খুব ব্যস্ত। আমাকে বললেন ব্যবসার দিকটা দেখতে। আমার বাবা আমাকে এতো ভালোবাসতেন যে, তিনি আমাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতেন, ঘর থেকে বাইরে কোথাও যেতে দিতেন না। সেদিন ব্যবসার কাজে বাইরে পাঠানোর সময় আমাকে বাবা বললেন, শোনো বাবা, তুমি জানো তুমি আমার কতো প্রিয়। যদি তুমি ফিরতে দেরি করো, তাহলে চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে যাবো। এই বলে বাবা আমাকে কাজে পাঠালেন।
আমাকে এমনভাবে ঘরের মধ্যে রাখা হতো যেন আমি একটা বন্দী দাস। সেদিন খ্রিস্টানদের একটা গির্জার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাদের প্রার্থনার আওয়াজ শুনতে পেলাম। খুব কৌতূহলো হলো। কী ঘটছে জানার জন্য ভেতরে ঢুকতে চাইলাম। আমি কখনও বাড়ির বাইরে পা রাখি নি, পুরো বিষয়টাই আমার কাছে অভিনব, নতুন! বুঝতে পারলাম, মাজুসি ছাড়াও আরো ধর্ম রয়েছে।

গির্জার ভেতরে ঢুকবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি সবাই প্রার্থনা করছে। আমি তাদের প্রার্থনার ভঙ্গিমা দেখে মুগ্ধ! সেখানেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত থেকে গেলাম, ওদিকে বাবার কাজ কিছুই করা হলো না। বাবা আমার এত চিন্তিত হয়ে পড়েন যে আমাকে খোঁজার জন্য চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল। আমাকে দেখে বাবা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, তোমাকে কি আমি দেরি করতে নিষেধ করিনি? কী হয়েছিল?

- আমি খ্রিস্টানদের গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তাদের প্রার্থনা দেখার জন্য সেখানে ঢুকি। তাদের প্রার্থনার ব্যাপারে আরও জানতে গিয়ে আমি আপনার দেওয়া কাজের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

- দেখো বাবা, তাদের ধর্ম ভালো নয়। তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্মই সবচেয়ে সেরা।

- না, তাদের ধর্ম আমাদের চেয়ে উত্তম।"

ছেলের মুখে এ কথা শোনার পর তাঁর বাবা অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ছেলে নিজ ধর্ম বদলে ফেলবে এই আশঙ্কায় সে তাকে শেকল দিয়ে আটকে রাখলো।

গির্জায় ঢোকার পর সালমান একজনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'তোমাদের ধর্মের কেন্দ্র কোনটি?' লোকটি জবাব দিল, 'পবিত্র ভূমি, আশ-শাম (ফিলিস্তিন), লোকটা জবাব দিল।'

শেকলে বন্দী অবস্থায় সালমানের এই কথাটা মনে পড়ে গেল। অতি কষ্টে গির্জার লোকেদের কাছে একটা বার্তা পাঠাতে সক্ষম হলেন, 'যদি আপনারা আশ-শাম থেকে আগত কোনো কাফেলার সন্ধান পান, তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন।'

এক সময় সালমানের কাছে কাছে বার্তা এল, 'শামগামী কাফেলা এসে গেছে।' সেই দিনই সালমান আল ফারিসী কৌশলে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। অতঃপর এই কাফেলার সাথে পবিত্র ভূমি শামে গিয়ে পৌঁছান। এভাবেই সত্যের সন্ধানে তাঁর যাত্রার শুরু।

ধর্মের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকেই তিনি শিখতে চাইছিলেন। সিরিয়াতে গিয়েই খবর নিলেন এ ধর্মের সবচে জ্ঞানী ব্যাক্তি কে। সবাই বললো বিশপের কাছে যাও, গির্জার পুরোহিত।

বিশপের কাছে গিয়ে নিজের সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন সালমান। তাকে বললেন, আমি আপনার কাছ থেকে ধর্ম সম্পর্কে শিখতে চাই! বিশপ জবাব দিলেন, 'স্বাগতম! তুমি আমার সাথেই গির্জায় থেকে যাও।'

সালমান ফারিসী গির্জাতেই দিন কাটাতে লাগলেন। বিশপ কেমন ছিল বোঝার জন্য সালমান আল ফারিসীর একটা মন্তব্যই যথেষ্ট, তিনি বিশপ সম্পর্কে বলেন, "এই লোকটা অত্যন্ত অসৎ! মানুষদেরকে দান করতে উৎসাহ দিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দানের সব টাকা নিজের জন্য রেখে দিত। আমি তাকে খুবই ঘৃণা করতাম।"

অথচ এত ঘৃণা সত্ত্বেও তিনি সেই বিশপের সাথে রয়ে গেলেন। এর পেছনে কারণ ছিল তাঁর জ্ঞানার্জনের তীব্র স্পৃহা। দীর্ঘদিন এসব ব্যাপারে সালমান চুপ ছিলেন। বিশপ মারা যাওয়ার পর খ্রিস্টানরা যখন তার মৃতদেহ সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করতে চাইলো, তখন তিনি মুখ খুললেন। বললেন, এই বিশপ ছিল একটা অসৎ আর খারাপ লোক।

- তারা রেগে হৈ হৈ করে উঠলো। তোমার কত বড় সাহস, বিশপকে নিয়ে এসব কথা বলো?

- আমি তোমাদেরকে প্রমাণ দিতে পারি। সালমান আল ফারিসী তাদেরকে সেই স্থানে নিয়ে গেলেন, যেখানে বিশপ তার সমস্ত সম্পদ অর্থাৎ তার অনুসারীদের দেওয়া দানের মাল জমা করে রেখেছিল। সে সাত বাক্সভর্তি লুকোনো সোনা আর রূপা বের করলো।

সালমান ফারিসী বলেন, লোকেরা এতো রেগে গেলো যে, তারা শেষ পর্যন্ত ওই বিশপের মৃতদেহ ক্রুশবিদ্ধ করে তাতে পাথর ছুঁড়তে লাগলো।

এরপর তারা অন্য এক ব্যক্তিকে বিশপের স্থানে নিয়োগ করলো। তিনি এই ব্যক্তির সম্পর্কে বলেন, "আমি এমন চমৎকার মানুষ আর দেখিনি যে তার মতো এত যত্নের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে। লোকটা ছিলেন দুনিয়ার প্রতি বিমুখ আর আখিরাত নিয়ে উদগ্রীব, দিন-রাত জুড়ে কঠোর সাধনা করতেন।"

এই আলেমের সাথেই সালমান ফারিসী সময় কাটাতে লাগলেন। তার কাছ থেকে দীক্ষা নিলেন, দ্বীনের ব্যাপারে শিখলেন, এবং ইবাদত করতে থাকলেন। একসময় এই বৃদ্ধ আলেমের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

"মৃত্যুশয্যায় আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, আপনি তো আমার কাহিনি সবই জানেন যে, কীভাবে আমি সবকিছু পেরিয়ে এই ধর্মের শিক্ষা নিতে এসেছি। আপনার ওপর আল্লাহর হুকুম সমাগত, এখন আপনি কার কাছে আমাকে রেখে যেতে চান?

তিনি বললেন, বাবা, আমি যা করেছি সেরকম আর কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই। তবে মসুল অঞ্চলে একজন আছেন। তিনি ঠিক আমার মতোই ইবাদতে মশগুল থাকেন, তুমি তার কাছে যাও।"

সালমান তখন আশ-শাম (ফিলিস্তিন/সিরিয়া) থেকে যাত্রা করে সুদূর মসুলে হাজির হলেন। মসুলের পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজের সমস্ত কাহিনি আগাগোড়া খুলে বললেন। এরপর বললেন, শামের পুরোহিত আমাকে মসুলে পাঠিয়েছেন। আপনি কি আমাকে আপনার সাথে থাকার অনুমতি দিবেন?

পুরোহিত বললেন, 'অবশ্যই। তুমি আমার শিষ্য হতে পারো।'

এভাবে সালমান তার সাথে থাকতে লাগলেন। কিন্তু তিনিও ছিলেন বেশ বৃদ্ধ। তার মৃত্যুও ঘনিয়ে আসছিল। সালমান তার কাছেও একই প্রশ্ন তুললেন।

- আমি আপনার কাছে খ্রিস্টধর্ম শিখতে এসেছিলাম। কিন্তু এখন আপনার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আপনার মৃত্যুর পর আমি কার কাছে যাবো?

- আমাদের পথের অনুসারী আর কারো কথাই আমার জানা নেই। শুধুমাত্র একজন বাদে। তুমি নিসিবিসের (নুসাইবিন) বিশপের কাছে যাও।

সালমান নিসিবিস পৌঁছে সেখানকার পুরোহিতের কাছে সব খুলে বলেন। নতুন করে তাঁর জীবন শুরু হলো নিসিবিসে। কিন্তু এই লোকটিও তখন জীবনসায়াহ্নে। সালমানের উস্তাদদের যেন মৃত্যুর মেলা বসেছিল, সবাই মারা যাচ্ছিল একে একে। তাদের পরে ধর্মের অনুসরণ করার মতো আর কেউ ছিল না। নিসিবিসের পুরোহিত মৃত্যুর সময় বলে গেলেন, আম্মুরিয়ার আলেম পুরোহিতের কাছে যেতে। সালমান ফারিসী তুরস্কের দিকে পা বাড়ালেন। আম্মুরিয়া হচ্ছে বর্তমান বাইজেন্টাইন।

আম্মুরিয়ায় জ্ঞানার্জন ও ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি সালমান নিজের একটা ব্যবসা আরম্ভ করলেন। লাভের টাকায় কিছু ভেড়া আর গরুও কিনলেন। এই শিক্ষকেরও শেষ সময় এগিয়ে আসলে তিনি পরবর্তী শিক্ষকের ব্যাপারে উপদেশ চাইলেন। আলেম উত্তর দিলেন, 'বাবা, আমার জানামতে এমন কেউ নেই যার কাছে আমি তোমাকে পাঠাতে পারবো। কিন্তু এখন নবী আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি আসবেন আরবদের মধ্য থেকে। এরপর সেখান থেকে এমন এক স্থানে যাত্রা করবেন, যেখানে থাকবে খেজুর গাছের সমাহার আর তার দুইপাশে থাকবে পাথুরে ভূমি। তিনি কিছু সুস্পষ্ট চিহ্ন ধারণ করবেন। তিনি উপহারের খাবার খাবেন, কিন্তু দানের বস্তু ফিরিয়ে দিবেন। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নবুওয়াতের মোহর অঙ্কিত থাকবে। যদি পারো, সেখানে চলে যাও।'

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার আম্মুরিয়ার আলেমের বক্তব্য। তিনি সালমানকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের পথের আর কোনো অনুসারী জীবিত নেই। যারা ঈসার ﷺ দ্বীনকে সঠিকভাবে মেনে চলতেন, তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার নতুন বার্তা আসার সময় হয়ে গেছে। পৃথিবী এখন নতুন দিকনির্দেশনার জন্য অপেক্ষমান।

রাসূলুল্লাহর ﷺ তিনটি চিহ্নের কথাও সালমান ফারিসীকে বলা হয় -

এক, তিনি হবেন আরব। তিনি এমন এক স্থানে সফর করবেন, যেখানে অনেক খেজুর গাছ জন্মে আর সে ভূমির দুই পাশে হবে পাথুরে অঞ্চল।

দুই, তিনি লোকেদের সাদাকাহ গ্রহণ করেন না, কিন্তু উপহার নেন।

তিন, তাঁর পিঠে দুই কাঁধের মধ্যখানে অঙ্কিত মোহর। এটা হলো নবুওয়াত বা রিসালাতের চিহ্ন।

"আমি আরবে যাওয়ার পথ খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ কালব গোত্রের একদল বণিকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাদেরকে বললাম, 'আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো, বিনিময়ে আমার সব সম্পদ তোমাদের। আমার গাভী-ভেড়া সব তোমাদের। তোমরা শুধু আমাকে আরবে নিয়ে চলো!"

অসাধারণ এই যুবক, অসাধারণ তাঁর কাহিনি! সত্যের খোঁজে পথে পথে ফেরা জীবনের গল্প!

লোকগুলো তাকে সাথে নিতে রাজি হলো। কিন্তু আরবে পৌঁছানোর পর বিশ্বাসঘাতকতা করতেও পিছপা হলো না, মুহূর্তের মধ্যে চোখ উল্টে ফেললো–ওয়াদি আল কুরা নামক এলাকায় এসে সালমানকে দাস হিসেবে এক ইহুদি লোকের কাছে বিক্রি করে দিল। তখনকার দাসপ্রথাটা এমন ছিল যে একবার কেউ দাস হলে সেখান থেকে আর মুক্তির কোনো পথ নেই। দাস-দাসীর কথা না কেউ শোনে, না বিশ্বাস করে। তাই সে নিজেকে যতোই "স্বাধীন" বলে দাবি করুক, কেউ মানবে না। ইহুদি সেই লোক সালমানকে ওয়াদি আল-কুরায় নিয়ে গেলো।

"আমি জায়গাটি দেখে ভাবতে লাগলাম বোধহয় এই জায়গার কথাই পুরোহিত আমাকে বলেছিল। তখন আমার মালিকের এক জ্ঞাতিভাই এসে আমাকে তার কাছ থেকে কিনে নিল। সে ছিল বনু কুরাইযার অধিবাসী।" আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, এই বনু কুরাইযা গোত্রের লোকেরা বাস করতো মদীনায়! সালমান তার নতুন মালিকের সাথে মদীনায় গিয়ে পৌঁছালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন, এই জায়গাই তিনি খুঁজছিলেন। প্রচুর খেজুর গাছ আর দুইপাশে পাথুরে ভূমি। একদিকের অংশের নাম আল হাররা আর গারবিয়া, আরেক দিক হলো আল হাররা আশ-শাকিয়া। এভাবে প্রাকৃতিকভাবেই মদীনার দুইপাশের সীমান্ত সুরক্ষিত ছিল। দক্ষিণ দিকে ছিল গাছগাছালির দেয়াল।

"রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমন হলো। তিনি বছরের পর বছর মক্কায় কাটালেন, অথচ আমি এর কিছুই জানতে পারলাম না! দাসত্বের চাকায় পিষ্ট হয়ে আর কোনোদিকে খেয়াল করার অবস্থা ছিল না।" সালমান তখনও ইসলামের বার্তা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

একদিন আমি খেজুর গাছের ওপরে চড়ে আমার কাজ করছি। আমার মালিক গাছের নিচেই বসা। তার এক চাচাতো ভাই এসে রাগত স্বরে বলতে লাগলো, ইয়া মাবুদ, কায়লার বংশধরদের ওপর গযব পড়ুক! কোন এক মক্কার লোক নিজেকে নবী বলে দাবি করছে, আর তার জন্য ওরা কুবায় লোক জড়ো করছে।" আউস ও খাযরাজ গোত্র কায়লার বংশধর নামে পরিচিত ছিল।

সালমান বললেন, "কথাটা কানে আসামাত্র বুকের মধ্যে ধক করে উঠলো। আমি কাঁপতে শুরু করলাম, এতো বেশি কাঁপুনি হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল গাছ থেকে সরাসরি আমার মালিকের ওপর গিয়ে পড়বো!"

এই একটি মুহূর্ত! যার জন্য বছরের পর বছর ধরে সালমান ফারিসী অপেক্ষা করেছেন। ঘর ছেড়েছেন, পরিবার ছেড়েছেন, অজানা-অচেনা কতো জায়গায় ঘুরে ফিরেছেন। শুধু সত্য জানার আশায়। পারস্য ছাড়লেন, শামে গেলেন, সেখান থেকে তুরস্ক, তারপর

ইরাক, শেষমেষ আরবে এসে পৌঁছালেন। আর আরব ভূমি ছিল পুরো দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন একটি এলাকা। এর পার্শ্ববর্তী পারস্য আর রোমের থেকেও বহু বহু দূরে। এই দূর পরবাসে সালমান একটা দাস হয়ে থেকে গেলেন শুধুই সত্য জানার জন্য। চিন্তা করা যায়, তিনি কী পরিমাণ একাকী বোধ করেছেন, ঘরের জন্য তাঁর মন কতোটা আনচান করেছে!

অবশেষে তিনি তাঁর আরাধ্য সংবাদটি শুনলেন।

"আমি দ্রুত গাছ থেকে নেমে এলাম, ওই লোকের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। আমার মালিক আমার ঘাড়ে ধরে টেনে এনে মুখের ওপর ঘুষি বসালো। বললো, এত কিছু তোর জানার দরকার নেই। যা, কাজে যা। সেদিন সন্ধ্যার দিকে কিছু খাবার প্রস্তুত করে নিয়ে আমি কুবার দিকে রওনা হলাম। কুবা এলাকাটা মদীনার বাইরে। পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললাম, আমি শুনেছি আপনি খুব সজ্জন, অচেনা অসহায় লোকদেরকে আপনি নিজের সঙ্গী বানিয়ে নেন! আমি কিছু খাবার সাদাক্বাহ করতে চাই, আমার মনে হয় আপনিই এটার সবচেয়ে উপযুক্ত। এই বলে তাঁর হাতে খাবারগুলো দিয়ে দিলাম।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারগুলো নিলেন। এরপর তাঁর সঙ্গীদেরকে সেখান থেকে খেতে বললেন, কিন্তু নিজে তাদের সাথে খেতে বসলেন না।" এটা ছিল প্রথম চিহ্ন – নবীজি ﷺ নিজের জন্য দানের বস্তু গ্রহণ করেন না।

"পরদিন ফের সেখানে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিমধ্যে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে শুরু করেছেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, গতবার আপনাকে বলেছিলাম খাবারগুলো দান করতে চাই, কিন্তু আপনি সেখান থেকে খাননি। তাই এবার আমি আপনাকে এই খাবারগুলি উপহার হিসেবে দিয়ে সম্মানিত করতে চাই। এই বলে তাঁর দিকে খাবারগুলো বাড়িয়ে দিলাম। তিনি এবার তাঁর সাথীদের খেতে ডাকলেন, নিজেও তাদের সাথে যোগ দিলেন।

"এরপর আবারও তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি সে সময় মদীনার গোরস্থানে ছিলেন। একটু আগেই একজনের জানাযা হয়েছে। আমি নবীজীর ﷺ কাছে গিয়ে কুশল বিনিময় করলাম। তাঁর চারপাশে ঘুরে পিঠের চিহ্ন দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি কোনো একটা চিহ্নের কথা জানতে পেরে সেটা খোঁজার চেষ্টা করছি। তিনি নিজের পিঠ উন্মুক্ত করে দিলেন। তাঁর গায়ের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে দেওয়ামাত্র আমার চোখের সামনে সেই চিহ্নটি স্পষ্ট হয়ে গেলো–রিসালাতের মোহর! নবীজির ﷺ সামনে মাটিতে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম! তাঁর পায়ে চুমু দিতে লাগলাম। আমি কান্নায় ভেসে যাচ্ছিলাম।"

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উঠে দাঁড়াতে বললেন।" কেননা নবীজি ﷺ নিজের

জন্য কারো সিজদা নিতেন না। এরপর তিনি সালমানকে তাঁর কাহিনি শোনাতে বললেন। সালমান নবীজীকে ﷺ সব খুলে বললেন।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি নিজের এই কাহিনি আমার সাহাবীদেরকেও শোনাও।"

সালমান ফারিসী বলেন, "হে ইবনে আব্বাস, আমি আমার কাহিনি ঠিক সেভাবেই তাদেরকে শুনিয়েছি, যেভাবে আমি আজ তোমার কাছে বর্ণনা করছি।"

"দাস হওয়ার কারণে আমি বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ কোনোটাতেই অংশগ্রহণ করতে পারিনি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একদিন ডেকে বললেন, সালমান, নিজেকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করো।' দাসপ্রথা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দাস মনিবের সাথে চুক্তি করতে পারত। দাস একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করবে এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা কামাতে পারলে, সে নিজেকে দাসত্ব থেকে ছুটিয়ে নিতে পারে। সালমান ফারিসী তাঁর মালিকের কাছে মুক্তির আবেদন করলেন। তাঁর মালিক বললো, "আমার জন্য তিনশ খেজুর গাছ লাগাবে, আর এই তিনশ গাছের একটাও যেন নষ্ট না হয়। আর সেই সাথে আমাকে চল্লিশ আউন্স স্বর্ণ দিতে হবে, তাহলে তুমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে।"

নবীজির ﷺ কাছে ছুটে গিয়ে সালমান তাঁর মালিকের এই অসম্ভব দাবির কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'চিন্তা করো না।' সাহাবাদের ﷺ ডেকে বললেন, 'তোমাদের ভাইকে সাহায্য করো।'

সালমান ফারিসী বলেন, "এরপর সাহাবীদের কেউ তিরিশটা খেজুরের বীজ নিয়ে এলো, কেউ আনলো, কেউ বিশটা, কেউ দশটা, যে যেমন পারছিল আনছিল। এমনি করে আমার তিনশটা বীজ যোগাড় হয়ে গেল।"

নবীজি ﷺ বললেন, 'যখন তোমার কাছে ৩০০টা বীজ হয়ে যাবে, তখন সেগুলোর জন্য গর্ত খুঁড়বে, কিন্তু আগেই বীজ বপন কোরো না, আমার সাথে দেখা করে যেও।'

সালমান তিনশটা গর্ত খুঁড়লেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা অনুযায়ী সেগুলো সেভাবেই রেখে তাকে বলতে গেলেন। সালমান বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের বরকতময় হাত দিয়ে সেই তিনশটি বীজ একটি একটি করে বপন করলেন। সেই তিনশ গাছের একটা গাছও (ফল দেওয়ার আগে) মরেনি।'

এরপর বাকি থাকে চল্লিশ আউন্স স্বর্ণ। কীভাবে এই স্বর্ণের যোগাড় হবে সে ব্যাপারে সালমানের কোনো ধারণাই ছিল না। একদিন রাসূলুল্লাহকে ﷺ কিছু স্বর্ণ দেওয়া হলো। তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাদের পারস্যের সেই ভাই কোথায়?'

সাহাবীরা ﷺ সালমানের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। সালমান এলে নবীজি ﷺ তাঁকে বলেন, 'এই নাও স্বর্ণ, এটা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নাও।'

- ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এতটুকু স্বর্ণ দিয়ে কী হবে?

- এটা নাও, এটাই যথেষ্ট হবে।

সালমান বলেন, "মাপতে গিয়ে দেখি, ওই এক রত্তি স্বর্ণের ওজন ঠিক চল্লিশ আউন্স! আমি সেই স্বর্ণের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্ত, স্বাধীন হলাম! এরপর নবীজির ﷺ সাথে সব জিহাদে আমি অংশগ্রহণ করেছি, একটিও বাদ দেইনি।" [16]

সালমান আল ফারিসী প্রথমবারের মতো খন্দকের যুদ্ধে যোগ দেন। শত্রুদের জন্য মাটি খুঁড়ে পরিখা তৈরি করার চমকপ্রদ বুদ্ধিটা তিনিই দিয়েছিলেন।

শিক্ষা

সালমান ফারিসী তাঁর জীবনের শুরুতে দ্বীনের শিক্ষা নিয়েছিলেন সিরিয়ার পুরোহিতের কাছে। সালমান তার সম্পর্কে বলেন, 'আমি তার সাথে ছিলাম, কিন্তু সে ছিল অসৎ এক লোক। মানুষের থেকে দান-খয়রাত চাইতো, এরপর সেগুলো গরিবদের মধ্যে না বিলিয়ে নিজের জন্য জমা করে রাখতো। এভাবে সাত বাক্স ভরা সোনা আর রূপা তার কাছে জড়ো হলো! তার এইসব কাজ দেখার পর আমি তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতাম।' – একজন মানুষ সত্য জানার জন্য পথে পথে ঘুরছে। অথচ শেষমেষ সে এমন এক লোকের সন্ধান পায়, যে বাইরে "আলেম" সাজলেও ভেতরে ভেতরে অসৎ। সত্য জানার প্রতি বিতৃষ্ণা এনে দেওয়ার জন্য যা কিছু দরকার, তার সবকিছুই সেই পুরোহিতের স্বভাবে উপস্থিত ছিল। কিন্তু সালমান ফারিসী ছিলেন নিজের লক্ষ্যে অবিচল, দৃঢ়। তাঁর সত্যকে খুঁজে বের করার আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, এসব দেখেও তিনি সত্য খোঁজার ব্যাপারে বিরত হননি।

আজকাল দেখা যায় যে, মুসলিমদের কাজের কারণে লোকেরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। লোকে বলে, মুসলিমদের আচরণের জন্যই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে না। এই কথাটি কিছু অংশে সত্য হলেও পুরোপুরি সঠিক নয়। কেউ যদি সত্যপথ খুঁজে বের করার জন্য সত্যিই আন্তরিক হয়, তবে তার বোঝা প্রয়োজন যে, সমাজের সবাই সত্যের অনুসারী নাও হতে পারে। তাই কোনো ব্যক্তি বা দল ভুল মানেই এটা না যে, সেই ধর্মও ভুল। সালমান ফারিসী একটা অসৎ লোকের দেখা পাওয়ার পরেও সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টধর্মকে বাতিল মনে করেননি। বরং তিনি সত্যকে জানার জন্য আরো উঠেপড়ে লেগেছেন। সেই লোকের সাথেই থেকে গিয়ে, আরও ভালো কিছুর সন্ধান করেছেন। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে তাঁর এই ধৈর্যের পুরস্কার দিয়েছেন। সালমান পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠ আলেমদের থেকে ইলম অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন।

---

[16] সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৯।

লোকেরা সেই দুর্বৃত্ত পুরোহিতের বদলে এমন একজনকে সেখানে নিয়োগ দেয়, যাকে দেখে সালমান বলেছিলেন, মুসলিমদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার আগ পর্যন্ত তার দেখা সবচেয়ে উত্তম লোক ছিলেন তিনি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মুহাম্মদে বলেছেন,

> **"আর যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন আর তাদের প্রদান করেন তাকওয়া।"** (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১৭)

পুরো ঘটনাটি থেকে আরো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা যায়:
প্রথমত, যারা হিদায়াতের খোঁজে থাকে, তাদেরকে হিদায়াত দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহর হিদায়াত পাওয়ার জন্য নিজেদেরকেও পরিশ্রম করতে হবে। যখন কেউ আল্লাহর জন্য কষ্ট করবে, ত্যাগস্বীকার করবে; তখন তার পুরস্কার হবে অসামান্য। যদি কেউ আল্লাহর দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাঁর দিকে দৌড়ে আসবেন। কিন্তু মানুষকে প্রথম ধাপটি নিতে হবে। সালমান ফারিসী ধীরে ধীরে ঠিকই ইসলামকে খুঁজে পেয়েছিলেন, যদিও তিনি প্রথমে ছিলেন এমন একটি জায়গায় যা ইসলাম থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত।

দ্বিতীয়ত, কারো ভুল কাজ যেন আমাদেরকে দমিয়ে না দেয়। ধর্ম তাদের অসৎ কাজের উৎস নয়—সালমান ফারিসী এটা বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই একজন অসৎ লোকের কারণে সেই ধর্মকেই অবিশ্বাস করা শুরু করে দেননি। একটা পুরোহিত খারাপ বলেই তিনি আশা হারিয়ে ফেলেননি। সত্য জানার আগ্রহ যেন মানুষের ভুল কাজ নিয়ে আমাদের বিতৃষ্ণা বা ঘৃণাকেও ছাপিয়ে যায়, এটা খুব দরকার।

তৃতীয়ত, মুসলিমদেরকে নতুন মুসলিমদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখার দায়িত্ব মুসলিম সমাজের। মুহাম্মাদ ﷺ স্বয়ং সালমানকে সাহায্য করেছেন, সাহাবীদেরকেও ﷺ সহযোগিতা করতে বলেছেন। নতুন ইসলাম গ্রহণ করার পরে বেশিরভাগ সময়েই আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়। নওমুসলিমদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করাও এক ধরনের দাওয়াহ। খালি মুখের কথায় দাওয়াহ হয় না। যারা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের দায়িত্ব নেওয়াও এর অন্তর্গত।

সাহাবীদের ﷺ জীবনের দিকে লক্ষ করলে দেখব, নতুন মুসলিমদের অনেকেরই সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। বিলাল ﷺ ছিলেন একজন দাস, আবু বকর ﷺ তাঁকে মুক্ত করেন। প্রথম যুগের অনেক মুসলিমই দাস ছিল। এই রকম অবস্থায় বড় ধরনের সহযোগিতার দরকার পড়ে। এই সহযোগিতাটুকু না দিলে তাদের দ্বীন গ্রহণের প্রাথমিক সময়টা এত কঠিন হয়ে পড়ে, যে অনেকসময় তারা দ্বীন থেকেই সরে যায়। আমেরিকায় একটা পরিসংখ্যানে জানা যায়, বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণের নতুন মুসলিমরা শেষ পর্যন্ত ইসলাম ছেড়ে দেয়। ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরকে ঘর থেকে

বের করে দেওয়া হয়। পরিবারের আপন মানুষগুলো পর হয়ে যায়। তাদের সামাজিক অবস্থান বদলে যায়। তাই এরকম পরিস্থিতিতে তাদের অনেক সহানুভূতি ও সহযোগিতার প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কয়েকটি ব্যাপার চলে আসার আগেই তোমরা ভালো কাজ করে নাও। দারিদ্র্য তোমাকে বিস্মরণ করিয়ে দেওয়ার আগেই সৎ কাজ করো।' যখন লোক খালি পেটে থাকে, তখন আধ্যাত্মিকতা, ইলম অর্জন– এসবের প্রতি সে আকর্ষণ বোধ নাও করতে পারে। তাই মানুষের প্রয়োজনের দিকে নজর রাখাও দাওয়াহ দেওয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

নবুওয়াহ, দাওয়াহ এবং প্রতিক্রিয়া

নবুওয়াতপ্রাপ্তি

রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা পর্বতের গুহায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। নিশ্চুপ, নিমগ্ন, নিবিষ্ট মনে আল্লাহর ইবাদত করতেন। চারপাশের সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন। হঠাৎ একদিন জিবরীল ﷺ তাঁর কাছে হাজির হলেন। জিবরীল ﷺ সম্পর্কে উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'কুচকুচে কালো কেশ আর ধবধবে শুভ্র পোশাক পরা এক লোক, তাঁর মাঝে ভ্রমণের কোনো ছাপ নেই।' অর্থাৎ তিনি মাঝে মাঝেই মানুষের বেশ ধরে আসতেন। কিন্তু সেদিন, ওয়াহী আনার সেই প্রথম দিনে কোনো মানুষের রূপে নয়, নিজের রূপেই মুহাম্মাদের ﷺ সামনে নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রকাণ্ড সেই সত্তা, আচ্ছন্নকারী আবির্ভাব। কয়েকশ পাখা দিগন্ত ঢেকে ফেলেছে, তাতে শোভা পাচ্ছে নাম-না-জানা অগণিত মণিমুক্তো আর প্রবাল।

মুহাম্মাদের ﷺ কাছে এসে বললেন, 'ইক্বরা' –তিলাওয়াত করো। ইক্বরা শব্দটার দুটি অর্থ আছে। তার মধ্যে একটি হলো, পড়া এবং আরেকটি তিলাওয়াত করা। এই প্রেক্ষিতে অর্থটা ছিল 'তিলাওয়াত করো।'

মুহাম্মাদ ﷺ উত্তরে বলে উঠলেন, 'আমি তো পড়তে জানিনা!'

জিবরীল তখন মুহাম্মাদকে ﷺ শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন, এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ইক্বরা।'

মুহাম্মাদ ﷺ আবারও বললেন, 'আমি তো পড়তে জানিনা!'

পুনরায় জিবরীল তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে বললেন, 'ইক্বরা।'

এভাবে একবার, দুবার, তিনবার করার পর অবশেষে তিনি কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, এগুলো ছিল সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত।

"পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার প্রতিপালক মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন জ্ঞানের), যা সে জানতো না।" (সূরা আলাক, ৯৬: ১-৫)

জিবরীলের ﷺ সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রথম সাক্ষাৎ এমনই ছিল। পুরো ঘটনার

আকস্মিকতায় নবীজি ﷺ বিহ্বল হয়ে পড়েন। ঘরে ফিরে এসেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী খাদিজাকে ﵂ বলেন, 'জাম্মিলুনি, জাম্মিলুনি'–আমাকে চাদর দিয়ে মুড়ে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে মুড়ে দাও! নবীজি ﷺ তখনও ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। তাঁর শীত করছিল। মা খাদিজা ﵂ তাঁকে চাদরে ঢেকে দিলেন, কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হলে তিনি খাদিজার ﵂ কাছে সব কথা খুলে বললেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ছিল। তিনি জ্বিন, আত্মা, জাদু ইত্যাদি বিষয় মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তাঁর সাথে যা ঘটেছে, সেগুলোর সাথে জাদুকরদের জাদুর মিল আছে ভেবেই তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সব শুনে খাদিজা ﵂ তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন,

'না, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনও ত্যাগ করবেন না! আপনি ন্যায়পরায়ণ, আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায় করেন, অসহায়দের সাহায্য করেন, মেহমানদারি করেন। আপনার সাথে যা ঘটেছে তা কখনোই শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না।'[17]

রাসূলুল্লাহর ﷺ উত্তম আচার-আচরণ ও কাজের জন্য খাদিজা ﵂ নিশ্চিত জানতেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে অবশ্যই হেফাজত করবেন।

খাদিজা ﵂ তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবন নাওফালের কাছে নবীজিকে ﷺ নিয়ে যান। ওয়ারাকাহ আইয়ামে জাহেলিয়াতে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁর কাছে বাইবেলের কিছু পাণ্ডুলিপিও ছিল, সেগুলো থেকে তিনি পড়াশোনা করতেন। খাদিজা ﵂ তাঁর কাছে মুহাম্মাদের ﷺ পুরো ঘটনা খুলে বললেন। ওয়ারাকাহ বললেন, 'যিনি এসেছিলেন তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরীল ﵇–মূসা নবীর কাছে তিনিই এসেছিলেন।'

ওয়ারাকাহ তৎক্ষণাৎ বুঝে যান যে নবীজির ﷺ কাছে আসলে জিবরীল ﵇ এসেছে। যেমনি করে তিনি মূসার কাছে ওয়াহী নিয়ে আসেন, ঠিক সেভাবেই রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছেও ওয়াহীসহ আগমন করেছেন। ওয়ারাকাহ মূসা নবীর সাথে নবীজির ﷺ ঘটনার সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছিলেন। তিনি নবীজিকে ﷺ কিছু কথা বলেন। কথাগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলেন, 'হায়! যদি আমি সে সময় তরুণ থাকতাম যখন তোমার ক্বওম তোমাকে বের করে দেবে!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ অবাক হয়ে বললেন, 'আমার ক্বওম আমাকে আমার দেশ থেকে বের করে দিবে? তা কী করে হয়!' প্রশ্নটা তখনকার পরিস্থিতিতে খুবই স্বাভাবিক–রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় একজন সম্মানিত ও প্রশংসিত ব্যক্তি, মক্কার সম্ভ্রান্ত গোত্র বনু হাশিমের সন্তান। না তিনি কখনো কারো সাথে ঝগড়া করেছেন, না কোনো বিবাদে লিপ্ত

---

[17] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪।

হয়েছেন। তাঁর মতো মানুষকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হবে–এটা চিন্তারও বাইরে। উপরন্তু, মক্কার সামাজিক ঐতিহ্যই ছিল এমন যে, কাউকে তার কওম থেকে বের করে দেওয়াটা চরম ঘৃণিত কাজ হিসেবে ধরা হতো। গোত্রতান্ত্রিক সেই সমাজে গোত্রভিত্তিক একতাই ছিল মরুভূমির চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ায় বেঁচে থাকার একমাত্র হাতিয়ার। আর তাই গোত্রের লোকেদের মাঝে বিরাজ করতো বিশ্বাসের এক অটুট বন্ধন।

ওয়ারাকাহ বলেন, 'যারাই তোমার মতো এই ওয়াহী লাভ করেছে, তাদের সবার সাথে লোকেরা শত্রুতা করেছে, তাদেরকে ঘরছাড়া করেছে।' এই একটি মন্তব্য দ্বারাই ওয়ারাকার অগাধ জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি ইতিহাস জানতেন। খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সত্যের সাথে মিথ্যার সংঘর্ষের পরিণতি কী হতে পারে। তিনি জানতেন যে মুহাম্মাদ ﷺ যতোই প্রশংসার পাত্র হন না কেন, যখনই তিনি মানুষকের ইসলামের পথে ডাকতে আরম্ভ করবেন, তখন তাঁর সাথে এমনটাই ঘটবে। ওয়ারাকাহ ইবন নাওফালের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তাঁর প্রতিটি অনুমান ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ পরবর্তী জীবনের জন্য সতর্কবার্তা। তিনি নবীজিকে ﷺ এটাই বুঝিয়ে দিলেন যে এই কাজ কোনো সহজ কাজ নয়।

ইক্বরা: জ্ঞানভিত্তিক এক উম্মাহ

মুহাম্মাদের ﷺ ওপর অবতীর্ণ কুরআনের প্রথম শব্দটি ছিল "ইক্বরা।"–এর তাৎপর্য হলো, আমরা মুসলিমরা সেই উম্মাহ যে উম্মাহ অধ্যয়ন করে, গবেষণা করে এবং সর্বোপরি দ্বীনের ইলম বা জ্ঞানার্জন করে। এই একটি শব্দ একটি নিরক্ষর জাতির মাঝে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে তৈরি করেছিল বিশ্ববরেণ্য আলেমসমাজ। সে সময় নবীজির ﷺ অনুসারীরা ছিল নিরক্ষর, কিন্তু এই শব্দগুলো তাদেরকে লিখতে ও পড়তে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহ বিশ্বের উচ্চ শিক্ষিত ও জ্ঞানী জাতিতে পরিণত হয়েছে। এই উম্মাহর মাঝে যে পরিমাণ আলেম তৈরি হয়েছে, তা অতুলনীয়! মুসলিম উম্মাহর আলেমদের গুণাগুণ লক্ষ করলে দেখা যাবে, তারা অনন্য–তাদের সাথে অন্য কোনো জাতির বিদ্বানদের তুলনাই হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, ইমাম বুখারি–আড়াই লক্ষেরও বেশি হাদীস তাঁর ছিল মুখস্থ। কিংবা ইমাম শাফেঈ–যিনি বলেছিলেন, 'আমি যখন কোনো বই খুলি তখন আমি তার একটা পাতা ঢেকে রাখি, কারণ আমি একটা পাতার সাথে আরেকটা পাতার তথ্য মিলিয়ে ফেলতে চাই না।' তাদের ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, ফটোগ্রাফিক মেমোরি, ছবির মতো করে সব তথ্য মনে রাখতে পারার ক্ষমতা। অথবা শাইখ আল ওয়াফা ইবন আকীল, যিনি তিনশ গ্রন্থের একটি বিশ্বকোষ লেখেন। অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা এখন আর নেই। ওটার মূল পাণ্ডুলিপি বাগদাদ লাইব্রেরি থেকে লুট করে নেওয়া হয়। এটাই

ছিল "ইক্বরা" শব্দের শক্তি, যা পুরো উম্মাহর এতটা পরিবর্তন এনে দেয়।

রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল একটু ভিন্ন। তিনি লিখতে বা পড়তে জানতেন না। তাঁর কাছে এই শব্দটির মানে ছিল 'তিলাওয়াত করুন', অর্থাৎ তিলাওয়াত করুন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণীর পুনরাবৃত্তি করুন।

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁর রাসূলকে ﷺ নিরক্ষরই রাখতে চেয়েছেন, এটি ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবীজির ﷺ জন্য হুকুম। সূরা আল আনকাবূতে আছে,

> **"এবং আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই আপনার উপর সন্দেহ আরোপ করতো।" (সূরা আনকাবূত, ২৯: ৪৮)**

আল্লাহ তাআলাই বলছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের আগে কোনো কিতাব পাঠ করেননি, তাঁর মাঝে লেখার বা পড়ার যোগ্যতা ছিল না। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। সাধারণ মুসলিমদের জন্য পড়তে জানাই হচ্ছে জ্ঞানার্জনের চাবিকাঠি। কিন্তু নবীজির ﷺ জন্য সত্যি বলতে, লিখতে-পড়তে পারাটা জরুরি ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং জিবরীল থেকে শিক্ষা নিচ্ছিলেন। সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে যে জন জ্ঞানার্জন করছেন, তাঁর জন্য বই থেকে শেখার মতো আসলেই কিছু নেই। আর তাই, তাঁর জন্য ইক্বরা শব্দটির অর্থ হলো "তিলাওয়াত করুন", কিন্তু উম্মাহর জন্য এর অর্থ হলো, 'পড়ুন।' মুসলিমদেরকে লিখতে ও পড়তে শিখতে হবে।

> **"নুন। কসম কলমের এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার।"(সূরা কালাম, ৬৮: ১)**

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো কিছু নিয়ে শপথ করেন, তার অর্থ হলো সেই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ কলমের নামে শপথ করেছেন। বদরের যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী মুশরিকদের এই মর্মে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা দশজন মুসলিমকে লিখতে ও পড়তে শেখাবে। এসব থেকে বোঝা যায় ইসলাম জ্ঞানার্জনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে।

এই উম্মাহ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পারদর্শী এক উম্মাহ, যদিও দুর্ভাগ্যবশত আজ এই উম্মাহ তার দায়িত্ব পালনে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। ইলম অর্জনের ব্যাপারে উম্মাহর বর্তমান প্রজন্মের এই অনীহা যেন পরবর্তী প্রজন্মেও প্রসারিত না হয় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। একবার বাচ্চাদের মধ্যে একটা জরিপ চালানো হয়। বিষয়বস্তু ছিল–কারা পড়তে ভালোবাসে আর কারা পড়তে ভালোবাসে না। জরিপের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাচ্চাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে তারতম্যের কারণে কিছু বাচ্চা পড়তে ভালোবাসছে, আর অন্যেরা পড়তে অপছন্দ করছে সেগুলো খুঁজে বের করা।

ফলাফলে দেখা গেল যেসব শিশুরা পড়তে পছন্দ করে, তাদের মাঝে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

এক, তাদের বাবা-মা'রাও পড়তে ভালোবাসে। শিশুর বিকাশের প্রথম বছরগুলোই তার অনুকরণ করার সময়। একটা শিশু যখন তার বাবা-মাকে বই পড়তে দেখে, তখন তারা পড়তে না জানলেও আপনা-আপনি বই বা ম্যাগাজিন নিয়ে খেলতে শুরু করে। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তাই বাড়িতে শিশুদের সামনে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা গেলে তাদের জন্য বই পড়ার দৃষ্টান্ত তৈরি করা সম্ভব।

দুই, যদি তারা বই-পুস্তক সমৃদ্ধ কোনো জায়গায় বেড়ে ওঠে, অর্থাৎ যেখানে প্রচুর বই কিংবা লাইব্রেরি আছে। অর্থাৎ তাদের জন্য বই খুব সহজলভ্য, এসব ক্ষেত্রে বড় হলেও তারা পড়তে ভালোবাসে।

তিন, তাদের নিজস্ব লাইব্রেরি থাকলে।

চার, তাদের বাবা-মা যদি তাদেরকে প্রায়ই বইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে থাকেন।

পাঁচ, তারা এমন ধরনের শিশু যারা টেলিভিশন খুব কম দেখে কিংবা একেবারেই দেখে না।

বাবা-মায়েদের জন্য তথ্যগুলো অতীব জরুরি। লক্ষণীয় হচ্ছে, বাচ্চাদের বই পড়ার অভ্যাস বাড়ানোর অর্থ এই নয় যে, আজেবাজে গল্পের বই পড়বে বা যা-খুশি তা-ই পড়বে। কিছু বই আছে যেগুলো মানসিক বিকাশের সময়ে পড়া হলে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেমন মদীনার প্রাথমিক যুগে এমন একটি ঘটনা আছে, রাসূল ﷺ দেখলেন উমার ইবন খাত্তাব ﷺ তাওরাতের পাতা উল্টাচ্ছেন। রাসূল ﷺ রেগে গেলেন, উমারকে এই কাজের জন্য কঠিনভাবে তিরস্কার করলেন। তবে তাওরাত পড়ার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল সাময়িক। মুসলিমরা পরবর্তীতে নিজেদের আদর্শে বলীয়ান হলে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে বনী ইসরাইলের কিতাব পড়তে নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছি। তোমরা এসব গল্পে বিশ্বাসও করবে না, অবিশ্বাসও করবে না।' অন্য কথায়, এইসব কিতাবে এমন কিছু কথা আছে, যেগুলোর সত্যতা কুরআন বা হাদীস দিয়ে যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই, সেগুলোকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই করা ঠিক হবে না।

যেকোনো পাঠ্যসূচি এমনভাবে সাজানো উচিত যেন তা ছাত্রদের জন্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। রাসূল ﷺ জানতেন, প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের হাতে তাওরাত চলে গেলে তা তাদের স্বাভাবিক শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি করবে। ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, 'তুমি যদি মানুষের সাথে এমন কথা বলো যা তাদের বোধশক্তির বাইরে, তাহলে সেটা তাদের জন্য ফিতনা হতে পারে।' কিছু জ্ঞান হচ্ছে কাজের আর কিছু অনর্থক। রাসূল ﷺ প্রায়ই আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী

জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করছি, এবং আমি সেই জ্ঞান থেকে পানাহ চাই যে জ্ঞান কোনো কাজে আসে না।' সূরা আল বাক্বারাহতে আছে, দুজন ফেরেশতা, হারুত এবং মারুত দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন মানুষকে জাদুর বিষয়ে শিক্ষা দিতে, যা ছিল ঈমানবিনাশী জ্ঞান।

সংক্ষেপে এই ছিল রাসূলের ﷺ কাছে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতের মর্মার্থ।

ওয়াহী: আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ঐশী বাণীর বিভিন্ন রূপ

ইবনুল কায়্যিম ওয়াহীর বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি অসাধারণ একজন আলিম, ইবনে তাইমিয়ার ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি বলেন, প্রথম প্রকারের ওয়াহী হলো সত্য স্বপ্ন। এই উপায়েই রাসূল ﷺ প্রথম ওয়াহী লাভ করা শুরু করেন। জিবরীল কর্তৃক ওয়াহী নাযিলের পূর্বে টানা ছয় মাস ধরে রাসূল ﷺ নিয়মিত স্বপ্ন দেখতেন। রাতের বেলায় যে স্বপ্ন দেখতেন, পরদিন দিনের বেলায় সে স্বপ্ন সত্যি হতো, এইভাবে চলেছিল প্রায় ছয় মাস!

ওয়াহীর প্রথম প্রকার: স্বপ্ন

রাসূল ﷺ বলেছেন, যেসব স্বপ্ন সত্য, সেগুলো নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। রাসূল ﷺ এর নবুওয়াতের জীবন ছিল তেইশ বছর দীর্ঘ, আর তিনি সত্য স্বপ্ন দেখেছেন ছয় মাস ধরে। তেইশ বছর সময়টাকে ছয় মাস দিয়ে ভাগ করলে অনুপাত দাঁড়ায় ১: ৪৬, ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন কেবল নবীরা নন, যে কেউই দেখে থাকে। পার্থক্য হলো এই–নবীদের স্বপ্ন এক ধরনের ওয়াহী হিসেবে বিবেচিত, অন্যদেরটা তা নয়। সাধারণ মানুষদের দেখা স্বপ্নের ব্যাপারে রাসূল ﷺ তিনটি প্রকারভেদ বলেছেন,

১) **সত্য স্বপ্ন:** এ ধরনের স্বপ্ন সত্যি হয় অথবা যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সে ব্যাখ্যা অনুসারে এই স্বপ্ন সত্যি হয়।

২) **শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন:** রাসূল ﷺ বলেন, 'এই স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে এবং সে তোমাদের ক্ষতি করতে চায়।' রাসূল ﷺ বলেন, 'যদি এমন স্বপ্ন দেখ, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না।' কারণ, শয়তান চায় আমরা খারাপ স্বপ্ন দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ি আর মানুষকে বলে বেড়াই। রাসূল ﷺ বলেছেন এসব স্বপ্নের কথা কাউকে না বলতে, আর সেগুলো ভুলে যেতে।

৩) **সাধারণ স্বপ্ন:** এমন স্বপ্ন যা নিয়ে মানুষ দিনের বেলা ভাবে এবং রাতের বেলায় তা স্বপ্নে দেখতে পায়, এ স্বপ্নগুলো বস্তুত নিজের ভাবনার প্রতিফলন, যা নফস থেকে আসে।

ওয়াহীর দ্বিতীয় প্রকার

এই প্রকার হলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে রাসূলের ﷺ ওপর ওয়াহী নাযিল হয় কিন্তু জিবরীল ﷺ সরাসরি মুহাম্মাদের ﷺ সামনে হাজির হন না। যেমন রাসূল ﷺ বলেন, সেই মহান আত্মা (জিবরীল) আমাকে জানিয়েছেন, 'নির্দিষ্ট করে রাখা সময়ের আগে কারো মৃত্যু ঘটবে না। তাই আল্লাহকে ভয় করো এবং বিনীতভাবে তাঁর কাছে চাও। অধৈর্য হয়ে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে চলে যেও না। আল্লাহর আনুগত্য করা ছাড়া আল্লাহর নিআমত অর্জন করা সম্ভব নয়।'

ওয়াহীর তৃতীয় প্রকার

এই প্রকারের ওয়াহী নাযিলের সময় ফেরেশতা মুহাম্মাদের ﷺ সামনে মানুষের আকৃতি নিয়ে হাজির হন। এর উদাহরণ হলো হাদীসে জিবরীল, জিবরীল ﷺ মানুষের বেশে এসেছিলেন আর তাঁকে মুহাম্মাদ ﷺ এবং অন্যরা দেখেছিলেন।

ওয়াহীর চতুর্থ প্রকার

ফেরেশতা ঘন্টার মতো শব্দ করে আসতেন। এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন আবির্ভাব। জিবরীল তখন রাসূলকে ﷺ শক্ত করে চেপে ধরতেন, শীতের দিনেও নবীজির ﷺ ঘাম ছুটে যেতো। জিবরীল ﷺ তাঁর ওপরে উঠে বসতেন, তাই রাসূল ﷺ অস্বাভাবিক ভার অনুভব করতেন। আর সেই সাথে শুনতেন ঘন্টা বাজার আওয়াজ পেতেন, সম্ভবত সেটি ছিল জিবরীলের পাখার কম্পনের শব্দ। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, 'যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর আদেশ প্রেরণ করেন, তখন ফেরেশতারা এতটাই বিনয়াবত হয়ে পড়ে যে তাদের পাখাগুলো কাঁপতে থাকে এবং সেই পাখা কাঁপার শব্দ শুনতে পাথরের ওপর চেইন টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজের মতো শোনায়।'

জিবরীল ﷺ যখন এই রূপে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকটে আসতেন, তখন রাসূলুল্লাহর ﷺ ওজন বেড়ে যেতো। দেখা যেতো, তিনি উটের উপর বসে আছেন, আর জিবরীল এসেছেন, তখন প্রবল চাপের ফলে বাধ্য হয়ে উট পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ত। যাইদ ইবন হারিসা ﷺ বলেন, "একদিন নবীজি ﷺ বসে ছিলেন। আমার পায়ের উপর তাঁর হাঁটু রাখা ছিল। এমতাবস্থায় ওয়াহী নাযিল হওয়া শুরু হয়। আমি তখন নবীজির ﷺ হাঁটুর তীব্র চাপ অনুভব করি। আমার উরু যেন প্রচণ্ড চাপে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল।"

ওয়াহীর পঞ্চম প্রকার

এই প্রকারের ওয়াহী নাযিলের সময় ফেরেশতা তার স্বরূপে আগমন করেন। এরকম দু'বার হয়েছিল। সূরা নাজমে এর উল্লেখ আছে।

"নিশ্চয় সে তাঁকে আরেকবার দেখেছিল, দূরদিগন্তের সিদরাহ-গাছের

কাছে...” (সূরা নাজম, ৫৩: ১৩-১৪)

জিবরীলের ﷺ পাখা এত বড় ছিল যে সেগুলো দিগন্ত ছেয়ে ফেলত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন জিবরীল তার স্বরূপে আসতেন, 'তিনি যেদিকেই তাকাতেন, সেদিকেই জিবরীলের পাখা দেখতে পেতেন।'

ওয়াহীর ষষ্ঠ প্রকার

এই প্রকারের ওয়াহীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে সরাসরি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে কথা বলেছেন, কোনো মাধ্যম ছাড়াই। এটা হয়েছিল আল-মিরাজের সময়। মূসার ﷺ সাথেও আল্লাহ এভাবে কথা বলেছিলেন। এই ছয় ভাবেই নবীজির ﷺ কাছে ওয়াহী নাযিল হয়েছে। এক এক সময় এক এক ভাবে। নবীজির ﷺ কাছে জিবরীল তাঁর নিজ রূপে কেবল দুবারই এসেছিলেন।

অগ্রগামী মুসলিমগণ

খাদিজা ﷺ ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম। তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত নবীজিকে ﷺ সাহায্য-সহযোগিতা করে যান। ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দাস হলেন যাইদ ইবন হারিসা, ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম শিশু হলেন আলী ইবন আবি তালিব এবং ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ হলেন আবু বকর সিদ্দীক ﷺ। তবে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ কে তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন আবু বকর ﷺ, কেউ বলেন আলী ইবন আবি তালিব ﷺ। ইবন হাজার আল-আসকালানী এ মতবিরোধটি সমাধানের চেষ্টা করেন, তাঁর মতে, ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ আবু বকর ﷺ, কেননা, আলী ইবন আবি তালিব বড়ই হয়েছেন নবুওয়াতের ঘরে, তিনি মক্কার কুরাইশদের ধর্ম গ্রহণই করেননি। ছোটবেলা থেকেই তিনি মুসলিম হিসেবে বড় হয়েছেন, তাই তাঁর অমুসলিম অবস্থা থেকে মুসলিম হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আবু বকর ﷺ দাসদেরকে মুক্ত করা ছাড়াও নানানভাবে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি ছিলেন অনেক ধনী এবং কুরাইশদের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ দান করার জন্য তিনি অনেক নন্দিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজের প্রভাবশালী লোকেদের একজন। সমস্ত সম্পদ ইসলামের উপকারে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। তাঁর সব সম্পদ, জ্ঞান ঢেলে দিয়েছিলেন নবী করীমের ﷺ সেবায়। তিনি ছিলেন ইসলামের একজন মিশনারী। আর এ কারণেই তাঁকে বলা হয় *'সিদ্দীক'*, তিনি ছিলেন মু'মিন পুরুষদের মধ্যে প্রথম জন। সিদ্দীক মানে যে বিশ্বাস করেছে। লোকেরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ অবিশ্বাস করেছিল, আর আবু বকর ﷺ তাঁকে বিশ্বাস করেছেন। বলা হয়ে থাকে, ইসলাম গ্রহণের সময়ে প্রত্যেকেই অন্তত মুহূর্তের জন্যে হলেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছে, কিন্তু আবু বকরের ﷺ ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। যখনই

তাঁর সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়, তিনি সেটা সাথে সাথে গ্রহণ করেন, তাঁকে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হয়নি। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সামনে হাজির হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সেই স্বাধীন পুরুষ যিনি সর্বাগ্রে মুহাম্মাদকে ﷺ আল্লাহর রাসূল হিসেবে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেন, তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মিরাজের ঘটনায় সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন, তিনি হলেন সেই মুসলিম যিনি রাসূলের ﷺ হিজরতের বিপদসংকুল সময়ে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবীদের ﷺ মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি আপন ছিলেন তা নিয়ে একটি হাদীস আছে: আবু দারদা বর্ণনা করেন, একবার আবু বকর এবং উমারের মধ্যে ঝগড়া হয়। এই দুইজন ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ সবচে কাছের মানুষ, তাঁর উপদেষ্টা। আলী ইবন আবি তালিব ﷺ বলেন, 'আমি দেখেছি, রাসূল ﷺ যখনই কোথাও যেতেন, আবু বকর ও উমারকে সাথে করে যেতেন, কোথাও থেকে আসলে তাদের সাথে করে আসতেন, যখন তিনি বসতেন তাঁর এক পাশে থাকতো আবু বকর আর আরেক পাশে উমার।'

কিন্তু তারপরেও রাসূলুল্লাহর ﷺ বিশেষ টান ছিল তাদের প্রতি যারা ইসলামের একেবারে প্রথম যুগে মুসলিম হয়েছিলেন। কাজেই যখন আবু বকরের সাথে উমারের ঝগড়া হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের নিকট আমাকে পাঠিয়েছেন আর তোমরা আমাকে বলেছিলে–আপনি মিথ্যা বলছেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল আবু বকর, সে আমাকে বলেছিল–আপনি সত্য বলছেন, সে নিজেকে ও তার ভাগ্যকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল, এরপরেও কি তোমরা আমার এই বন্ধুকে শান্তিতে থাকতে দেবে না? দেবে না শান্তিতে থাকতে?'

প্রকাশ্য দাওয়াতের শুরু

ইসলামের প্রারম্ভিক দাওয়াহ ছিল গোপন পর্যায়ে, কুরআনে আল্লাহ এই আদেশ করেছেন।

> **"আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।" (সূরা আশ-শুআরা, ২৬: ২১৪)**

এই আয়াতটি যখন নাযিল হলো তখন মুহামাদ ﷺ বেরিয়ে পড়লেন এবং আস-সাফা পাহাড়ে উঠে বলে উঠলেন, "ওয়া সুবাহা!" – ওয়া সুবাহা বলাটা সে যুগে ঘন্টা বা সাইরেন বাজানোর মতো একটি বিষয় ছিল। খুব গুরুতর কোনো ঘটনা হলে এই কথাটি বলা হয়। কাজেই যারাই তাঁর ডাক শুনতে পেল, তারা তার দিকে চলে গেল এবং যারা যেতে পারছিল না তারা অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিল তিনি কী বলেন তা শুনে আসার জন্য।

যখন সবাই একত্রিত হলো, রাসূল ﷺ তাদেকে জিজ্ঞেস করলেন,

- আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পেছনে এক সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা করছে তোমাদের অতর্কিতে হামলা করার জন্য, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?

- আমরা তো কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।

- আমি এসেছি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে, যদি তোমরা বিশ্বাস না করো, তাহলে তা তোমাদের উপর আপতিত হবে।[18]

রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাগুলোই ছিল কুরাইশদের প্রতি ইসলামের প্রথম দাওয়াহ। লক্ষণীয়, তাঁর কথাগুলো খুব সোজাসাপ্টা এবং পরিমিত। এভাবে কথা বলার কারণ হলো আল্লাহ নবীদেরকে আদেশ করেছেন স্পষ্ট বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। তাদের দায়িত্ব হলো 'বালাঘুল মুবীন', এর অর্থ হলো, ইসলামকে মানুষের সামনে অস্পষ্টভাবে, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে, এদিক-ওদিক করে, রাখ-ঢাক রেখে, কিছুটা গোপন করে, কিছুটা প্রকাশ করে, মধু-মাখাভাবে উপস্থাপন করা যাবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজকে আমরা যখন মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছি, আমাদের দাওয়াতে শ্রোতাদের মনে বিভ্রান্তির জন্ম হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাওয়াতে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখেননি। তাঁর কথা শুনে শ্রোতারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, যদি তারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাহলে তারা জান্নাতে যাবে আর অবিশ্বাস করলে জাহান্নাম।

যাই হোক, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে ডাকলেন এবং তারা ভাবলো নিশ্চয়ই খুব জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ডাকা হচ্ছে। বিষয়টি আসলেই গুরুত্বপুর্ণ ছিল কিন্তু তা অনুধাবনের ক্ষমতা সকলের ছিল না। তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব বলে উঠলো, 'তোমার সারা দিন মাটি হোক, এই কথা বলতে তুমি আমাদের ডেকেছ?' আবু লাহাব খুবই বিরক্ত ও রাগান্বিত হলো। কারণ তাকে তার কাজ ছেড়ে এসে এসব কথা শুনতে হয়েছিল। ব্যবসার ব্যস্ত সময়ে কেনাবেচা ছেড়ে রাসূলের ﷺ কথা শোনা ছিল তার জন্য নিতান্তই অগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আবু লাহাবদের মতো লোকদের কাছে কাজ ফেলে জীবন, মৃত্যু, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কথা শোনা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। সে ছিল প্রচণ্ড দুনিয়াবী, ওই সময়টা তার কাছে নিছকই টাকা কামানোর সময়। এমন ভাবনা তার একার নয়, মুসলিমদের মধ্যেও তার মতো অনেকেই আছে। তারা ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলাকে স্রেফ সময় নষ্ট জ্ঞান করে, তারা শুধু সেই কাজে ও কথায় মন দেয় যা তাদেরকে দুনিয়াতে উপকার করবে। কিন্তু দুনিয়ার পরের জীবনে কী তাদের উপকারে আসবে সেটা জানার সময় তাদের হয়ে ওঠে না।

সূরা লাহাবের প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

---

[18] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬।

> **"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের উভয় হাত, আর সে নিজেও ধ্বংস হোক! তার ধন-সম্পদ ও যা সে অর্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসবে না।" (সূরা লাহাব, ১১১: ১-২)**

আল্লাহ তাআলা বলছেন তার এই সম্পদ, অর্থ কোনো কাজেই আসবে না। যারা দুনিয়ার পেছনে ছুটে বেড়ায়, দুনিয়া তাদের কোনো কাজে আসবে না, যদি না তারা ইসলামের আলোকে জীবনযাপন করে। এই সূরাটি কুরআনের অলৌকিকত্বের একটি প্রমাণও বটে। কেননা, এই আয়াতে বলছে, আবু লাহাব ও তার স্ত্রী জাহান্নামে যাবে। এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন তারা বেঁচে ছিল, যদি তারা কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চাইতো, তারা মুসলিম হয়ে গেলেই তা করে ফেলতে পারতো, কেননা কুরআন বলেছে তারা জাহান্নামী হবে আর তারা মুসলিম হয়ে গেলে এই কথা মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু না, তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাফের ছিল আর সে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে।

ইক্বরা, ক্বুম, ক্বুম

মুহাম্মাদের ﷺ উপর নাযিলকৃত সর্বপ্রথম আয়াতগুলো হলো সূরা আল আলাক্বের এই ক'টি আয়াত (৯৬: ১-৬)

> **"পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার প্রতিপালক মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন জ্ঞানের), যা সে জানতো না।"**

এগুলো হলো কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম আয়াতসমূহ। এই একটি ঘটনা রাসূলের ﷺ জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এর পর কিছুদিন ওয়াহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ যেন তাঁর ওপর ওয়াহী নাযিলের এই বিষয়টিকে ভালবাসতে পারেন, যেন এর অভাব বোধ করতে থাকেন–সেজন্য এই কিছুদিনের বিরতির দরকার ছিল। বাস্তবিকও তার এই অভাববোধ এতটা তীব্র আকার ধারণ করে যে, তিনি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সূরা আল আলাক্বের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর নাযিল হয় সূরা মুযযাম্মিল এবং সূরা আল মুদ্দাসসিরের কিছু আয়াত। যদিও এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এ সূরা দুটির মধ্যে কোনটি আগে নাযিল হয়েছে, তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের ওয়াহীতে এ দুটো সূরা থেকেই আয়াত নাযিল হয়েছে।

দাঈ–যারা ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, তাদের জন্য এই আয়াতগুলো একটি নির্দেশিকা বা ম্যানুয়াল বুক হিসেবে কাজ করে। এই তিনটি ওয়াহীকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ইক্বরা, ক্বুম, ক্বুম। এই আয়াতগুলোই প্রথম যুগের মুসলিমদেরকে

দাওয়াহর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়।

প্রথম আদেশটি হলো "ইক্বরা"। এর মাধ্যমে তিলাওয়াত ও শেখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী আদেশটি এসেছে সূরা আল মুযযাম্মিলের দুই নম্বর আয়াতে, কুমিল লাইলা ইল্লা কালীলা–রাতে নামাজ পড়ো। আর সবশেষে সূরা আল মুদ্দাসসিরের দ্বিতীয় আয়াত, কুম ফা আনযির–যা রাসূলুল্লাহকে ﷺ আদেশ দিচ্ছে, উঠে দাঁড়ান এবং অন্যদেরকে সতর্ক করুন। কাজেই প্রথম শিক্ষা হলো, পড়াশুনা করা, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা। পরবর্তী ধাপ নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করা, এবং তার পরের ধাপ হলো অন্যদেরকে জানানো।

ইবনুল কায়্যিম বলেন, 'দ্বীন নিজে শেখা, অন্যকে শেখানো আর আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লের বার্তা প্রচার–এই তিনটি ধাপ পার না করে কেউ পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করতে পারে না।' প্রথম ধাপ হলো "ইক্বরা", অর্থাৎ জানা, আর নিজে জানার পরেই কেবল অন্যকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এর পরের ধাপ "কুম ফা আনযির"– উঠুন, সতর্ক করুন। আর নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানোর সাথে সাথে যে বিষয়টি অত্যাবশ্যক, তা হলো ইবাদাহ–নফল ইবাদাহ, যেমন ক্বিয়ামুল লাইল। প্রথম যুগের মুসলিমদের জন্য বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ক্বিয়ামুল লাইল বাধ্যতামূলক ছিল। পরবর্তীতে এই আদেশ মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া অন্য সকলের জন্যে রদ বা রহিত করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর আমরণ ক্বিয়ামুল লাইল বাধ্যতামূলক ছিল। নিজে শেখা, অপরকে শেখানো এবং ইবাদত করা, প্রতিটি বিষয় একে অপরের পরিপূরক। একটি পরিপূর্ণ মুসলিম ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয় একত্রে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

ইসলামের বার্তা মানুষের কাছে প্রচার করা, তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার, এ ধরনের কাজ অন্তরকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে, আর তাই প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগীর, মধ্যরাতে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এই ইবাদত-বন্দেগীই একজন দাঈর অন্তরকে নরম করে, আর তাকে পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। যিকরের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। ইবনুল কায়্যিম তাঁর শিক্ষক শাইখ ইবন তাইমিয়্যা সম্পর্কে বলেন, 'প্রতিদিন ফজর সালাতের পর তিনি বের হয়ে পড়তেন, চলে যেতেন দামাস্কাসের সীমান্তবর্তী বিস্তৃত মাঠগুলোতে। সেখানে বসে তিনি আল্লাহর নাম নিতেন–সূর্যোদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত যিকর করতে থাকতেন। আমরা একদিন কৌতূহল মেটাতে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন প্রতিদিন এমন করেন? জবাবে ইবন তাইমিয়্যা বললেন, এটা হলো আমার সকালের নাস্তা, আমার আত্মার খাদ্য, এটা ছাড়া আমার শরীর অবসন্ন হয়ে যাবে। এটাই আমাকে সারাদিনে চলার শক্তি যোগায়–যদি সকালে আমি আমার রসদ না পাই, তাহলে সারাটা দিন আমি দুর্বল হয়ে থাকবো।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ক্বিয়ামুল লাইলের মাধ্যমেই দৃঢ়তা লাভ করেছিলেন। আর আল্লাহ তাআলা প্রথম যুগের মুসলিমদের ওপরেও এটি ফরয করে দিয়েছিলেন, কেননা

তাদেরকে এমন কিছু পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছিল, যা আর কাউকে করতে হয়নি। তাদেরকে যে তীব্র বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা উম্মাহর পরবর্তী আর কাউকে ভোগ করতে হয়নি। এজন্যই তাদেরকে এই নিবিড় প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তারা ছিলেন ইসলামের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় দল–দ্বীন ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর। তাদের ওপর ভিত্তি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং তাদের দৃঢ় হওয়া জরুরি ছিল। এই প্রশিক্ষণ যারা লাভ করেছেন তারা সংখ্যায় ছিলেন অল্প, একশো'রও কম। কিন্তু এই প্রশিক্ষণ ও তারবিয়াহ্ তাদেরকে এমন প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত করে যে, তারা যেখানেই যেতেন, সেখানেই প্রভাব বিস্তার করে ফেলতেন। মানুষের মনে তৎক্ষণাৎ তাদের ছাপ পড়তো। আনসারগণ মুসলিম হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ দাওয়াহর শেষার্ধে, কিন্তু যেহেতু মুহাজিররা প্রথম থেকেই তাদের সাথে ছিলেন, আনসাররা তাদের সাহচর্যে এসে অনেক কিছু দ্রুত শিখে ফেলেন। মুহাম্মাদ ﷺ আনসার ও মুহাজিরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন তৈরি করে দেন, তার মাধ্যমে দুইপক্ষই লাভবান হয়, আনসাররা মুহাজিরদের কাছ থেকে দ্বীনের আদর্শ ও জ্ঞান লাভ করেন এবং অপরদিকে মুহাজিররা আনসারদের কাছে থেকে তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং সামাজিক সহায়তা পান। মুহাজিরদের ভেতর এমন একটি আলো ছিল, যা দ্বারা চারপাশের সবাই আলোকিত ও প্রভাবিত হতো। সুতরাং দাওয়াতের পাথেয় হিসাবে অবশ্যই এ তিনটি শব্দ মনে রাখতে হবে: ইক্বরা, ক্বুম, ক্বুম।

প্রকাশ্য দাওয়াতের পর মক্কার প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহর ﷺ দাওয়াহর জবাবে কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া ছিল বহুমাত্রিক। এক এক পর্যায়ে তারা এক এক রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। সামগ্রিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যেতে পারে:

১। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ
২। অপমান
৩। চরিত্রহননের চেষ্টা
৪। ইসলামের বার্তাকে বিকৃত করা এবং কুৎসা রটানো
৫। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আপোস করা বা সমঝোতার চেষ্টা করা
৬। প্রলোভন
৭। চ্যালেঞ্জ
৮। চাপ প্রয়োগ
৯। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা
১০। নির্যাতন-নিপীড়ন
১১। গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-ফুরকানে বলেন,

> "তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, এ-ই কি সে যাকে আল্লাহ 'রাসূল' করে প্রেরণ করেছেন?" (সূরা ফুরকান, ২৫: ৪১)

তারা বলতো–আল্লাহর কাছে কি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার জন্য এর চেয়ে যোগ্য কেউ ছিল না? তারা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা, তাঁকে ব্যঙ্গ করা, ছোট করা কোনো কিছুই বাদ দেয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন কুরাইশের সবচেয়ে অভিজাত পরিবারের সন্তান, সুঠাম দেহ, উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁকে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি সম্ভ্রম তৈরি হয়। তারপরও কুরাইশরা তাঁকে নিয়ে মজা উড়াতো, কারণ তিনি ধনী ছিলেন না, ক্ষমতাও ছিল না। মানুষ সাধারণত ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে বেশি প্রভাবিত হয়–যার ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা-প্রতিপত্তি আছে, তার ব্যাপারে সবার বেশি আগ্রহ থাকে। বনী ইসরাঈল তাদের নবীর ﷺ কাছে গিয়ে বলেছিল, 'আমরা চাই আপনি আমাদের উপর একজন রাজা নিয়োগ করেন, যেন আমরা জিহাদ করতে পারি।' তাদের ওপর রাজা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল তালুতকে। কিন্তু তাকে তাদের পছন্দ হলো না। তালুত বিত্তশালী বা 'পয়সাওয়ালা' ছিলেন না। তাই বনী ইসরাঈলও তাকে মেনে নিল না। তাদের মনে হয়েছিল রাজা হওয়ার উপযুক্ত আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের মাঝেই আছে, যারা তালুতের চাইতে বেশি বিত্তবান। মক্কায় রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে এই আচরণেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বার তাইফে যান, এক লোক তাঁকে বলেছিল, 'তবে কি আল্লাহ নবী হিসেবে তোমার চাইতে ভালো আর কাউকে খুঁজে পায়নি?' এভাবেই তারা নবীজিকে ﷺ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো।

অপমান

কুরাইশের লোকেরা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ অপমান করতো, তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করতো। একদিন কাবার পাশে কুরাইশদের কিছু নেতা বসে ছিল। আবু জাহেল তাদের কাছে এসে বললো, 'আজকাল তোমরা নাকি মুহাম্মাদকে মাটির সাথে মুখ ঘষাঘষি করার সুযোগ দিচ্ছ? আমি যদি তাঁকে এমন করতে দেখি (অর্থাৎ সালাত আদায় করতে দেখি), তাহলে তাঁর গলায় পাড়া দিয়ে মুখটা ধুলোর মধ্যে ঘষে দিব।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক তখনই সালাত আদায় করতে এলেন। নবীজি ﷺ সালাত পড়ছেন, আর আবু জাহেল এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। মুখে যত বড় হুমকি দিয়েছে, তার বাস্তবায়ন হবে তো?

আবু জাহেল হেঁটে মুহাম্মাদের ﷺ কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মুহাম্মাদ ﷺ তখন

সিজদারত। উপস্থিত সবাই বিস্মিত চোখে দেখলো আবু জাহেল উল্টে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর দু-হাত মুখের ওপর এনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাড়াচ্ছে, যেন সে কোনো ভয়াবহ বিপদে পড়েছে আর হাত নাড়িয়ে কিছু একটা থামানোর চেষ্টা করছে। আবু জাহেল ফিরে আসার পর অন্যরা তাকে ঘিরে ধরলো। জিজ্ঞেস করতে লাগলো,

- তোমার হঠাৎ কী হলো?

- কী হলো মানে? তোমরা কী বলতে চাও? তোমরা কি দেখোনি কী হয়েছে?

- না আমরা কিছু দেখিনি। ওখানে তো কিছুই ছিল না! আমরা শুধু দেখলাম যে তুমি উল্টে পড়ে গেলে আর হাত নাড়তে লাগলে।

- আমার সামনে একটা গর্ত ছিল, আর ছিল আগুন, বাতাস এবং আতঙ্ক। আবু জাহেল জবাব দিল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'সেগুলো ছিল ফেরেশতা। সে যদি আমার দিকে আর একটুও এগিয়ে আসতো, তাহলে তারা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।'[১৯]

অন্য আরেকদিনের ঘটনা, উকবা ইবন আবু মুআইত একদিন কাবার পাশে রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখতে পেল। নবীজির ﷺ কাপড়ে হেচকা টান মেরে সেটা তাঁর গলায় পেঁচানো শুরু করলো, যেন তাঁকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা যায়। আবু বকর ﷺ ছুটে আসলেন। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন উকবাকে। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা কি একটা মানুষকে শুধু এই জন্য মেরে ফেলবে কারণ সে বলে–আমার রব হলেন আল্লাহ?'

পৃথিবীতে অনেকেই আছে যারা অপমানিত বা অপদস্থ হলেও কিছু মনে করে না, তাদের আত্মসম্মানবোধ নেই, বোধবুদ্ধিও কম। কিন্তু আল্লাহর নবীরা খুব স্পর্শকাতর ছিলেন। তারা সম্মানী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ। আবু জাহেল বা উকবা ইবন আবু মুআইতের আচরণগুলো নবীজিকে ﷺ খুব কষ্ট দিত, তবু তিনি উপেক্ষা করে যেতেন। তাদের বাজে কথার উত্তর দিতেন না, হাতাহাতিতেও যেতেন না। শুধু তাঁর দাওয়াতের মিশন অব্যাহত রাখার দিকে নিবদ্ধ হয়ে থাকতেন।

এরকম আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সহীহ বুখারিতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার পাশে সালাত আদায় করছিলেন, পাশেই কুরাইশদের কয়েকজন নেতা বসা। এমন সময় তাদের কাছে আসলো আবু জাহেল। বললো, 'অমুক তো একটা উট জবাই করেছে, ওটার নাড়িভুঁড়িগুলো এনে মুহাম্মাদের গায়ে ঢালতে পারবে কে?' তাদের মধ্যকার সবচেয়ে জঘন্য লোকটাই সাড়া দিল, এই জঘন্য লোকটি হলো উকবা ইবন আবি মুআইত। সে উঠে গিয়ে উটের নাড়িভুঁড়ি যোগাড় করে আনলো। এরপর ঘাপটি মেরে

---

19 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৪।

বসে থাকলো কখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় যান সেই আশায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ সিজদায় যাওয়া মাত্র নাড়িভুঁড়ির দলা চাপিয়ে দিল তাঁর পিঠের ওপর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থির হয়ে সিজদাতেই পড়ে থাকলেন, যেন তাঁর সাথে কিছুই হয়নি। মেয়ে ফাতিমা ﵂ দূর থেকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে বাবার কাছে ছুটে আসলেন। বাবার কাঁধে চেপে থাকা ময়লা-আবর্জনাগুলোকে দু হাতে সরিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সালাহ শেষ হলো। তিনি কুরাইশদের কিছুই বললেন না। শুধু জোরে জোরে একটি দুআ করলেন–

> *"হে আল্লাহ, শাস্তি দাও আবু জাহেল, উতবা ইবন রাবিআ, শায়বা ইবন রাবিআ, আল-ওয়ালিদ ইবন উতবা, উমাইয়া ইবন খালাফ, আর উকবা ইবন আবি মুআইত কে।"* [20]

এভাবে একে একে সাত জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাম ধরে দুআ করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, যদিও হাদিসের বর্ণনাকারী সপ্তম জনের নাম মনে করতে না পারায় এখানে শুধু ছয়টি নাম বলা হলো। আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ ﵁ বলেন, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি, এই সাত জনের প্রত্যেককে বদরের যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছে।'

আল্লাহ নবীজির ﷺ দুআ কবুল করেছিলেন।

চরিত্রহননের চেষ্টা

কুরাইশরা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বিভিন্ন আজেবাজে নামে ডাকতো।

> **"তারা বলে, ওহে, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, তুমি তো আলবৎ একজন উন্মাদ।" (সূরা হিজর, ১৫: ৬)**

উন্মাদ বা পাগল ডাকার পাশাপাশি জাদুকর, মিথ্যুক এসব বলেও সম্বোধন করতো। কুৎসা রটানোর জন্য যা মুখে আসতো, বলতো। কিছুই বাকি রাখেনি। তারা চাচ্ছিলো রাসূলুল্লাহর ﷺ নামে কুৎসা রটিয়ে, তাঁর ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে দিতে। লোকে যেন তাঁর কথায় পাত্তা না দেয়। তাহলেই ইসলামের প্রচার-প্রসার থেমে যাবে। এভাবে চরিত্রহননের মাধ্যমে তাঁর নিয়ে আসা ইসলামের বার্তাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছিল কুরাইশরা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> **"আমি অবশ্যই জানি, তারা যা বলে তা আপনাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তারা তো আপনাকে অস্বীকার করে না, বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার**

---

[20] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬।

তারা বস্তুত ব্যক্তি মুহাম্মাদকে ﷺ প্রত্যাখ্যান করে নি– মনের গভীরে তারা বিশ্বাস করতো যে মুহাম্মাদ ﷺ সত্যি কথাই বলছেন কিন্তু তারপরও তারা তাঁর বিরোধিতা করেছে। কারণ তাদের সমস্যা ছিল ইসলাম। নিজেদের ধর্ম বাদ দিয়ে ইসলামকে তারা কোনো ক্রমেই মেনে নিতে চায়নি। ওয়ারাকা ইবন নওফালের সতর্কবাণীই যেন সত্যি হয়ে উঠছিল। নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকে, তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলেছিলেন, 'তোমাকে তোমার দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।' সেদিন এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ চমকে উঠেছিলেন, তিনি জানতেন মক্কার লোকেরা তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ওয়ারাকাহ অমোঘ বাণীর মত বলেন, 'যে ব্যক্তিই দ্বীনের এই বার্তা নিয়ে এসেছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে।'

মক্কার বাজারগুলো তখন কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা কেনাকাটার জায়গা নয়, বরং এগুলো তাদের জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও বটে। সেখানে কাব্যচর্চা চলতো, চলতো বক্তৃতার চর্চা। সেরা কবিতাকে সসম্মানে ঝুলানো হতো আল-কাবার দেয়ালে। এগুলোকে বলা হতো আল-মুয়াল্লাকাত, বা ঝুলানো কবিতা।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এই বাজারগুলোতে এসেই দাওয়াহ দিতেন, সাধারণ জনতাকে বোঝাতেন ইসলামের কথা। ইমাম আহমেদ বর্ণনা করেছেন যে রাবিআ ইবন হাদ্দাদ বলেন,

"আমি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ জুলমাজায বাজারে দেখেছি। তিনি লোকদের ডেকে বলছিলেন, তোমরা বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে নতুন নতুন লোকের দেখা হতো আর তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করতেন।

হঠাৎ এক লোক তাঁর পিছু নিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যার সাথেই কথা বললেন, সেই লোক পেছন পেছন গিয়ে তাকে বলে আসতো, এই লোককে (অর্থাৎ মুহাম্মাদকে ﷺ) বিশ্বাস কোরো না, সে একটা মিথ্যুক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম এই লোকটি কে, তারা আমাকে বললো, সে তাঁর চাচা আবু লাহাব।"[21]

রাবিআ ইবন হাদ্দাদ মক্কার অধিবাসী ছিলেন না। তাই তিনি আবু লাহাবকে চিনতেন না। এই ঘটনা বলে দেয় মুহাম্মাদের ﷺ জন্য দাওয়াতের কাজ চালিয়ে কী ভয়াবহ দুঃসাধ্য ছিল–তিনি যা কিছুই করতেন, আবু লাহাব সেটা ভেস্তে দিত। সাধারণত

---

[21] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১।

কাজের ফল মানুষের মনে লেগে থাকার উৎসাহ জাগায়। আর্থিক প্রতিদান, সমাজের কাছে স্বীকৃতি, নেতাকর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া সহায়তা ইত্যাদি–অন্তত কিছু একটা বিনিময়ের আশা নিয়েই মানুষ খাটতে থাকে। আশানুরূপ বিনিময় না পেলে মানুষের কাজের ইচ্ছা মরে যায়, প্রেরণা থাকে না, একসময় সে ক্ষান্ত দেয়। প্রতিদানের আশা না করেই কোনো কাজ করে যাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আর নবী-রাসূলরা ব্যতিক্রম। তারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে লাগাতার কাজ করে গেছেন, যদিও তারা বিনিময়ে কিছুই পাননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নূহের ﷺ কথা। তিনি দিনরাত তাঁর জাতির কাছে দাওয়াহ দিয়েছেন–গোপনে এবং প্রকাশ্যে, কিন্তু বলার মতো কোনো সাড়া তাদের মাঝে পাননি। চোখের সামনে বিরোধিতাকারী এক জাতিকে নিয়েও তিনি দাওয়াহ করে গেছেন সুদীর্ঘ নয়শ পঞ্চাশ বছর।

এমন আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। হাজ্জের মৌসুম সবে শুরু, আল-ওয়ালিদ ইবন মুগীরা সে সময় কুরাইশদের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বি। সে কুরাইশ নেতাদের নিয়ে মিটিং ডাকলো। বললো, হাজ্জের মৌসুম আসছে, আরবের প্রতিনিধিরা কিছুদিন পরেই এখানে জমায়েত হবে। আসো সবাই মিলে (মুহাম্মাদের বিষয়ে) একটি সিদ্ধান্তে আসি। এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের মধ্যে যেন কোনো মতভেদ না থাকে। তার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, মুহাম্মাদের ব্যাপারে একটা হেনস্থা করা। হাজ্জের সময় মক্কায় অনেক লোকের সমাগম হবে, আর মুহাম্মাদও এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না, তাদের কাছে ইসলামের বার্তা নিয়ে যাবে, তাই মুহাম্মাদের ﷺ ব্যাপারে তারা সবাইকে কী বলবে সে বিষয়ে সর্বসম্মত বক্তব্যে পৌঁছানো জরুরি ছিল। একেকজন একেক রকম কথা বললে কোন লাভ হবে না। কেউ বলবে সে মিথ্যুক, কেউ বলবে গণক, কেউ বলবে জাদুকর–এভাবে না করে বরং সবাই মিলে একই অপবাদ দিলে লোকে বেশি বিশ্বাস করবে।

কুরাইশরা ওয়ালিদ ইবন মুগীরাকে বললো, "আপনিই বলেন কী করা যায়। আপনি যেটা বলবেন, আমরা সেটাই সবাইকে বলবো।"

- আমি তোমাদের মুখে শুনতে চাই, ওয়ালিদ জবাব দিল।

- আমরা বলবো যে, সে একজন জ্যোতিষী।

- না, সে জ্যোতিষী নয়। আমি জ্যোতিষী দেখেছি, তাঁর মধ্যে জ্যোতিষীদের বৈশিষ্ট্য নেই, সে তাদের মতো অন্তঃসারশূন্য কথা বলে না।

- তাহলে আমরা বলবো যে, সে পাগল, বদ্ধ উন্মাদ।

- আমি পাগলও দেখেছি এবং তাদের প্রকৃতিও দেখেছি, সে তাদের মতো অপ্রকৃতস্থ আচরণ করে না, অসংলগ্ন কথাও বলে বেড়ায় না। সে উন্মাদ নয়, উন্মাদ কাকে বলে আমরা জানি।

- তাহলে আমরা বলবো যে, সে একজন কবি।

- না, না, সে কোনো কবি নয়। আমরা সব রকম ছন্দের কবিতাই চিনি, সে যা বলে তা

কোনো কবিতা না।

- তাহলে আমরা বলি যে, সে একজন জাদুকর।

এই প্রস্তাবেও ওয়ালিদ রাজি হলো না, বললো–সে কোনো জাদুকরও নয়, আমরা জাদুকর দেখেছি আর তাদের জাদু-কৌশল দেখেছি। সে ঝাঁড়ফুক করে না, জাদুটোনাও করে না।

কুরাইশের নেতারা একে একে সম্ভাব্য সকল অপবাদ পেশ করলো। কিন্তু ওয়ালিদ ইবন মুগীরা বললো, না, এগুলো বলে কোনো লাভ হবে না।

- তাহলে, আপনি বলে দিন আমরা তাঁর ব্যাপারে কী বলবো।

ওয়ালিদ অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললো,

'আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁর কথা বড়ো মিষ্টি, কী যেন গভীর তাৎপর্য আছে তাঁর কথায়। তোমরা তাঁকে নিয়ে যেটাই বলো না কেউ তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে না। তবে তাঁর সম্পর্কে এ কথা বলতে পারো, তিনি একজন জাদুকর। তিনি যেসব কথা পেশ করেছেন তা স্রেফ জাদু। তাঁর কথা শুনলে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী এবং গোত্র ও তার সদস্যের মাঝে বিরোধ লেগে যায়।'[22]

কুরআনে আল্লাহ এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন,

> **"সে (সত্য গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা) চিন্তাও করেছিল, তারপর আবার নিজের গোঁড়ামিতে ডুবে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। তার উপর অভিশাপ, কেমন করে সে (সত্য জানার পরেও) বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নিল! তার উপর আবারও অভিশাপ, সে কীভাবে এমন সিদ্ধান্ত নিল! সে একবার (উপস্থিত লোকদের দিকে) চেয়ে দেখলো, (অহংকার ও দম্ভভরে) সে ভ্রু কুঁচকালো এবং মুখটা বিকৃত করে ফেললো। অতঃপর সে পেছনে ফেরলো এবং অহংকার করলো। এরপর বললো, এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদুবিদ্যার খেল ছাড়া কিছু নয়। এটা তো মানুষের কথা।" (সূরা মুদদাসসির, ৭৪: ১৮-২৫)**

ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা

আন নযর ইবন হারিস পারস্য গিয়ে গল্প শিখে আসতো। সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে সে লোকদের ডেকে ডেকে বলতো, 'আমার কাছে আসো, আমার কাছে আসলে আরও ভালো ভালো কাহিনি শুনতে পাবে।' সে লোকজনকে বলতো, মুহাম্মাদের ﷺ বার্তা আসলে কেচ্ছা-কাহিনি দিয়ে ভরা, ওসব হচ্ছে গল্পকথা–কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহর নবীদের সাথে আসলেই কী হয়েছিল তা কি কেউ জানে? মুহাম্মদ যা বলছে

---

[22] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২২।

সেসব বানোয়াট রূপকথার গল্প। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> **"আর তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা – এসব সে লিখিয়ে নিয়েছে, আর এগুলো তার কাছে পাঠ করা হয় সকালে ও সন্ধ্যায়।" (সূরা ফুরকান, ২৫: ৫)**

আপস এবং সমঝোতা

কুরাইশের লোকেরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে আপোসের চেষ্টাও করেছিল। নবীজির ﷺ কাছে এসে বললো–আসুন, আমরা একটি চুক্তি করি। আমরা এই শর্তে রাজি যে, আপনি এক দিন আমাদের দেব-দেবীর ইবাদত করবেন, আর আমরা পর দিন আল্লাহর ইবাদত করবো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন যে তিনি কখনোই এমন কিছুতে রাজি হবেন না। তারা কিছুক্ষণ পর আবার তাঁর কাছে ফিরে আসলো। এবার বললো–আপনার জন্য এবার আগের বারের চেয়েও ভালো প্রস্তাব আছে। আপনি এক দিনের জন্য আমাদের দেবদেবীর ইবাদত করেন, তাহলে আমরা এক সপ্তাহ যাবৎ আল্লাহর ইবাদত করবো।

- না, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন।

এরপর আবার ফিরে এসে তারা আরেকটি প্রস্তাব দিলো। বললো, 'ঠিক আছে, আমরা নাহয় এক মাস ধরে আল্লাহর ইবাদত করবো, আপনি শুধু আমাদেরকে একটি দিন হলেও দিন।'

রাসূলুল্লাহর ﷺ সেই এক জবাব, 'না', আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

> **"তারা চায় আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।" (সূরা কালাম ৬৮: ৯)**

কুরাইশদের ধর্ম ছিল মানবরচিত, তাদের নিজহাতে তৈরি, তারা চাইলেই আপোস করতে পারতো, যখন খুশি ধর্মকে নিজের মন মত বদলে নিতে পারতো। তাদের জন্য এটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে কোনো বিকল্প ছিল না। এমনকি তারা যদি বলতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র এক দিন দেব দেবীকে পূজার বিনিময়ে, তারা সারা বছর আল্লাহর ইবাদত করবে, তারপরও নবীজির ﷺ সামনে দ্বীনকে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এই ধরনের আপোস বা সমঝোতা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **"বলুন, হে কাফিররা, তোমরা যার ইবাদাত করো, আমি তার ইবাদাত**

করিনা। এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদত করছ আমি তার ইবাদাতকারী হবো না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।" (সূরা কাফিরুন, ১০৬: ১-৬)

কুরাইশের লোকেরা আরও নানাভাবে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনোটাই কাজে দিলো না। দিনে দিনে তারা আরও ক্ষেপে গেল, কিন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ এক কথা–তিনি কেবল একজন রাসূল, আল্লাহর পাঠানো একজন দাস মাত্র–আল্লাহর দ্বীনের উপর হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার তিনি রাখেন না।

প্রলোভন এবং চ্যালেঞ্জ

এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবন আব্বাস[23]। কুরাইশ নেতারা কাবার পাশে মিলিত হলো। বললো–আমরা সবরকম উপায়ে প্রচেষ্টা চালাবো, মুহাম্মাদকে এবার কোনো অজুহাত দেওয়ার সুযোগ দেবো না। তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ ডেকে পাঠালো।

নবীজির ﷺ মনে বড়ো আশা কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের ডাক পেয়ে খুব খুশি হলেন, ভাবলেন হয়তো তাদের মন বদলেছে, হয়তো তারা ইসলামের প্রতি একটু নরম হয়েছে!

নবীজি ﷺ ছুটতে ছুটতে হাজির হলেন। তারা বললো–হে মুহাম্মাদ! তোমার সাথে মিটমাট করার উদ্দেশ্যে আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তাদের বক্তব্যের শুরুটা এমনই ছিল, সুন্দর, আশা জাগানিয়া। কিন্তু এরপরই তারা গা-জ্বালা করা কথাবার্তা বলতে শুরু করলো,

'আল্লাহর কসম, তুমি যা করলে, আর কোনো আরব লোক তার কওমের জন্য তোমার মত এত যন্ত্রণা আনে নি। বাপ-দাদার বিরোধিতা, আমাদের ধর্মের সমালোচনা, আমাদের রীতিনীতি নিয়ে উপহাস, দেব-দেবীকে অভিশাপ দেওয়া সবই তুমি করেছো। আমাদের সমাজটাকে বিভক্ত করে ফেলেছো তুমি। তোমার সাথে আমাদের সম্পর্কে ফাটল ধরানোর জন্য আমাদের অপ্রিয় কোনো কাজ করতে বাদ রাখোনি।'

এরপর শুরু হলো নানা রকম প্রলোভন দেখানো। তারা বললো,

'মুহাম্মাদ! অর্থের আশাতেই যদি তুমি এই বাণী প্রচার করে থাকো, তাহলে আমরা তোমার জন্য যত লাগে সম্পদের ব্যবস্থা করবো, তোমাকে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী বানিয়ে দেব। তুমি যদি ক্ষমতার আশায় এ ধর্ম নিয়ে এসে থাকো, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা হিসেবে বেছে নিতে পারি। আর তুমি যদি নারীর লোভে এসব কাজ করে থাকো, তাহলে আমরা তোমার জন্য কুরাইশের সবচেয়ে সেরা

---

[23] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬।

দশ নারীকে বাছাই করে আনবো, এরপর তাদের প্রত্যেককে তোমার সাথে বিয়ে দেব। যদি তোমার ওপর শয়তান ভর করে থাকে, তাহলে আমরা তোমার সুস্থতার জন্য যা কিছু লাগে ব্যয় করবো, এমনকি যদি তাতে আমাদের সমস্ত সম্পদও দিয়ে দিতে হয়, তাও দেব। আমাদেরকে শুধু বলো তুমি কী চাও।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে শান্তকণ্ঠে বললেন,

'তোমরা যা কিছুই বলেছো, তার কিছুই আমি চাই না। অর্থকড়ি, মানমর্যাদা কিংবা তোমাদের ওপর ক্ষমতা লাভের আশায় তোমাদের কাছে ইসলামের বার্তা নিয়ে আসিনি। আল্লাহ তোমাদের কাছে আমাকে একজন রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার উপর তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাকে আদেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে সুসংবাদ দিতে ও সতর্ক করতে। আমি তোমাদের কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি মাত্র। তোমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছি যে, যা আমি তোমাদের কাছে হাজির করলাম, তোমরা তা গ্রহণ করে নিলে তোমাদের জন্যই মঙ্গলজনক–এই দুনিয়া ও আখিরাতে দু জগতেই। আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করবো, যতক্ষণ না তিনি আমার এবং তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।'

তারা তাঁকে বললো,

"তুমি যদি আমাদের কোনো প্রস্তাবই মানতে না চাও, তাহলে শোনো, আমাদের দেশ অনেক সংকীর্ণ, আমরা খুবই দরিদ্র, আর আমাদের জীবনযাত্রাও দুর্বিষহ। এক কাজ করলে কেমন হয়, যে রব তোমাকে পাঠিয়েছে, তাঁকে গিয়ে তুমি একটু বলো যেন সে এই পর্বতগুলো সরিয়ে দেয়, এগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে সমতল করে একটু ফাঁকা স্থান তৈরি করে দিলেই চলবে। আর তুমি এটা কেন তাঁকে বলছো না মক্কার মধ্যে কয়েকটি নদী প্রবাহিত করে দিতে? যেমন করে সিরিয়া আর ইরাকে নদী আছে, সেরকম। আমরাও তো অন্যদের মতো নদী চাই! আর হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার, আমরা চাই যে, তুমি তোমার রবের কাছে গিয়ে বলো, সে যেন আমাদের কয়েকজন পূর্বপুরুষকে মৃত থেকে জীবিত করে দেয়। কুসাই ইবন কালবের প্রাণও ফিরিয়ে এনো কিন্তু, তিনি তো অনেক জ্ঞানী লোক ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি যা বলছো তা কি সত্য নাকি মিথ্যা। মুহাম্মাদ, তুমি যদি এটুকু করতে পারো আর আমাদের বাপ-দাদারা যদি তোমার কথা মেনে নেয়, তাহলে আমরা তোমাকে অনুসরণ করবো।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবারও শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন,

'এ কারণে আমাকে পাঠানো হয়নি। আমি রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কেবল সেটাই এনেছি, যা সহকারে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমার তোমাদেরকে যা জানানোর ছিল তা জানিয়েছি, যদি তোমরা তা গ্রহণ করো, তাহলে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর, এই দুনিয়া এবং আখিরাতে। আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে আমাকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় থাকতে

হবে যেন তিনি আমাদের মধ্যে বিচার করে দেন।'

তারা বিদ্রূপ করতেই থাকলো,

'আচ্ছা, তাহলে এক কাজ করো, তুমি তোমার রবকে বলো একজন ফেরেশতা পাঠাতে, যে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে তুমি সত্য বলছো। আর তোমার রবকে বলো যেন আমাদের জন্য কিছু দূর্গ, বাগান, সোনা ও রুপার খনি দান করে, আর হ্যাঁ, আরেকটা কাজ করলে কেমন হয়–তুমি তাঁকে বলো যেন সে তোমার প্রয়োজনটাও পূরণ করে দেয়, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি আমাদের মতো করে জীবিকা মেটানোর চেষ্টা করছো।'

তারা এই বলে উপহাস করছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ যদি আল্লাহর এত প্রিয় বান্দা হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে কেন অন্য সবার মতো অর্থ উপার্জন করতে হচ্ছে! তাই তারা বলছিলো যে, আল্লাহর কাছ থেকে ধনসম্পদ নিয়ে আসতে। যেন তিনি যে আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দা–সে কথা প্রমাণিত হয়। এসব কথাতেও রাসূলুল্লাহর ﷺ ধৈর্যচ্যুতি হলো না বা তিনি উত্তেজিত হলেন না, তিনি এতটুকুই বললেন,

'আমি এসব কিছুই করবো না। আমি আমার রবের কাছে এসব জিনিস চাইতে যাবো না। এসব কারণে আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়নি। আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য। যদি তোমরা আমার উপস্থাপিত বার্তা স্বীকার করে নাও, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে তা তোমাদের জন্যই লাভজনক। আর যদি তোমরা তা অস্বীকার করো, তাহলে আমি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি এই বিষয়টি আমার রবের হাতে ছেড়ে দিলাম যতক্ষণ না তিনি আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।'

তারা বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমার রবকে বলো তুমি আমাদেরকে যে শাস্তির প্রতিজ্ঞা করছো, সেই শাস্তি প্রেরণ করতে।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'এটা আল্লাহর হাতে, যদি তিনি চান তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন।'

তারা টিটকারি মেরে বললো, 'আরে মুহাম্মাদ, তোমরা রব কি জানে না যে আমরা তোমাকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি? সে কেন তোমাকে উত্তর দিতে সাহায্য করছে না? আমরা ভালোই জানি কে তোমাকে এইসব শিক্ষা দিচ্ছে, তোমাকে তোমার এই কুরআন শেখাচ্ছে ইয়ামামার এক লোক, তার নাম আর-রহমান। আর আমরা সেই আর-রহমানের কথায় কখনোই বিশ্বাস স্থাপন করবো না।'

কুরাইশরা হঠাৎ করে 'আর-রহমান' নামক ব্যক্তির গল্প ফেঁদে বসে। তাদের মাঝে একজন বললো, 'যাও, যাও, গিয়ে আল্লাহর কন্যা ফেরেশতাদের ইবাদত করো।'

আরেকজন বললো, 'আমরা তোমাকে ততক্ষণ বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না তুমি আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে হাজির করছো।' তারা সবাই মিলে রাসূলুল্লাহকে ﷺ উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে তাঁকে অপমান করে সে স্থান থেকে চলে গেল।

সবাই চলে যাওয়ার পর তাদের মাঝে একজন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ফিরে আসলো, তার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন উমাইয়া। তার ফিরে আসা দেখে মনে হয় যেন তার মুহাম্মাদের জন্য খারাপ লাগছে, হয়তো সে ক্ষমা চাইবে। সে নবীজির ﷺ কাছে এসে বললো,

'মুহাম্মাদ, তোমার লোকেরা তোমার কাছে সেরা সেরা প্রস্তাব পেশ করেছে, আর তুমি– তুমি তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছ। তোমাকে কোনো অলৌকিক ঘটনা (মু'যিজা) দেখাতে বললো, সেটাতেও তোমার আপত্তি। তারপর বলা হলো, তুমি যেন তাদের ওপর আযাব নিয়ে আসো, সেটাও তুমি পারলে না। এবার আমি তোমাকে একটা কথা বলি–আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না তুমি একটা মই নিয়ে আসো যেটা সরাসরি ওই আকাশ পর্যন্ত যায়। তুমি মই বেয়ে ওপরে উঠবে আর আমি তোমাকে দেখবো। তারপর তুমি আল্লাহর কাছে পৌঁছে তাঁকে বলবে সে যেন তোমার ব্যাপারে (প্রমাণস্বরূপ) একটি পত্র লিখে দেয়; সেখানে লেখা থাকবে যে, তুমি তার নবী, আর এর ওপর থাকবে তার স্বাক্ষর। এরপর চারজন ফেরেশতা সেই পত্র সঙ্গে করে নিচে নেমে আসবে, আর তারাও সাক্ষ্য দিবে যে তুমি আল্লাহর রাসূল। সত্যি কথা কী জানো, তুমি যদি এতকিছু করেও ফেলো, আমার মনে হয় এরপরও আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো না।'

এই ছিল রাসূলের ﷺ চারপাশের পরিবেশ এবং মানুষগুলোর অবস্থা ও তাদের মানসিকতা। এ ধরনের লোকদের তিনি দাওয়াহ করছিলেন।

চাপ প্রয়োগ

কুরাইশরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। তাঁকে দমিয়ে রাখতে সম্ভাব্য সকল পথেই হেঁটেছে তারা। এক পর্যায়ে নবীজির ﷺ চাচা আবু তালিবকে কাজে লাগিয়ে তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের প্রয়াস চালায়। আবু তালিবের ছেলে আক্বীলের মুখেই এর একটি বিবরণ পাওয়া যায়।

'একদিন কুরাইশের লোকেরা বাবার কাছে এসে খুব হৈ চৈ লাগিয়ে দিলো। বললো, তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদ, আমাদের সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে, দশ পদের ঝামেলা বাঁধাচ্ছে। তাঁকে বলে দিও–আমাদের থেকে সাবধান, তাঁকে যেন ধারেকাছেও আর না দেখি। বাবা আমাকে ডেকে বললেন, মুহাম্মাদকে ডেকে আনো। আমি ভাইকে খুঁজতে

বেরোলাম। একটা কেনাসের[24] মধ্যে তাঁকে খুঁজে পেলাম।"

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বাবার সাথে দেখা করতে এলেন। বাবা বললেন, লোকেরা তোমার নামে অভিযোগ এনেছে। তুমি নাকি তাদের সভায় বাধা দিচ্ছো, কী সব ঝামেলা পাকাচ্ছো, তুমি কেন এসব করছো?"

আবু তালিব মুহাম্মাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলছিলেন না। হুকুম দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ভাতিজাকে ডাকেননি, বরং ভাতিজার জন্য যা ভালো হবে বলে মনে হয়েছে, তেমনটাই পরামর্শ দেওয়ার জন্য ডেকেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন–চাচা, আপনি কি সূর্য দেখতে পাচ্ছেন?

- হ্যাঁ।

- এই সূর্যের তাপ থেকে আমাকে রক্ষা করতে আপনি যতোটা অপারগ, আমার এ দাওয়াতী কাজ থামিয়ে দিতেও আমি ততোটাই অপারগ।'[25]

ইসলাম ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন, জীবনের মিশন। এই মিশন থেকে সরে আসার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। অপেক্ষাকৃত দুর্বল একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও আমি এ কাজ থেকে বিরত থাকবো না, যতক্ষণ না স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা এই বিষয়ের ফয়সালা করে দেন, অথবা আমার মৃত্যু হয়।' তাঁর চাচা ভাতিজার কথার উত্তরে বলেন, আমার ভাতিজা, তুমি সত্য বলেছো। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। এগিয়ে যাও এবং নিজের মিশন পূর্ণ করো। আবু তালিব বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ভাতিজাকে এই কাজ থেকে বিরত রাখা যাবে না। তাই তিনি নবীজিকে ﷺ সবরকম ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে সম্মত হন।

কুরাইশরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ আটকানোর জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা চালাতে থাকে। কুরাইশদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর কিছু সাহাবীকে ﷺ আবিসিনিয়াতে হিজরত করার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশরা আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশির সাথে যোগাযোগ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। তারা তড়িঘড়ি করে তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে তাঁকে বলে তিনি যেন তার দেশে হিজরত করা মুসলিমদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠান।

সে সময় মুসলিমদের অবস্থা করুণ। রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা– কোনো বিচারেই তৎকালীন মুসলিমরা কুরাইশদের সমকক্ষ বা হুমকিস্বরূপ ছিল না।

---

[24] কেনাস অর্থ: একটি ছোট্ট ঘর বা তাঁবু।

[25] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২।

তারপরও কুরাইশরা এই নিরীহ মুসলিমদের পেছনে লেগে ছিল। কারণ তারা চাইছিল ইসলামকে যেন গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা যায়। তারা বুঝতে পেরেছিল ইসলামকে যদি শুরুতেই দমন করা না হয় তাহলে একসময় তাদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে।

হিংসা-বিদ্বেষ

হিংসার কথা বলতে প্রথমেই আসে কুরাইশদের বিখ্যাত নেতা ওয়ালিদ ইবন মুগীরার নাম। রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির বিষয়টি তার কোনোভাবেই সহ্য হচ্ছিল না। সে বলেছিল, 'আল্লাহ যদি কাউকে নবী বানাতেই চান, তাহলে আমাকে কেন নবী হিসেবে বাছাই করা হলো না? আমি জ্ঞানীগুণী লোক, বয়সেও মুহাম্মাদের চাইতে বড়।' একই সুরে কথা বলেছিল তাইফের আরেক লোক। হিজায অঞ্চলে সবচেয়ে প্রখ্যাত এলাকা এ দুটোই ছিল—মক্কা আর তাইফ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আয যুখরুফে তাদের এ কথা উল্লেখ করেছেন,

> **"আর তারা বলে, এই কুরআন কেন দুই জনপদের (মক্কা ও তাইফ) মধ্যে কোনো এক প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হলো না?" (সূরা যুখরুফ, ৪৩: ৩১)**

তাইফ থেকে আল মুগীরা ইবন শুআইবা একবার মক্কা বেড়াতে এলো। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তার প্রথমবার সাক্ষাতের ঘটনা সে নিজেই বর্ণনা করেছে—

'আমি আবু জাহেলের সাথে মক্কার পথ ধরে হাঁটছি, এমন সময় দেখি মুহাম্মাদ। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। আবু জাহেলকে বলে উঠলেন,

– কেন তুমি আমার অনুসরণ করছো না? কেন আল্লাহর ওপর বিশ্বাস আনছো না? কেন ইসলাম গ্রহণ করছো না?

– মুহাম্মাদ, তুমি কবে আমাদের দেবতাদের অপমান করা বন্ধ করবে? তুমি যদি চাও আমরা তোমার মিশন সম্পন্ন করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিই, তবে আমরা তোমার জন্য সে সাক্ষ্য দিয়ে দেবো। আর আমি যদি জানতাম যে তুমি সত্য বলছো, তাহলে তো কবেই তোমাকে অনুসরণ করতাম।

আবু জাহেলের এ উত্তর শোনার পর মুহাম্মাদ ﷺ সেখান থেকে চলে যান। এরপর সে আমার দিকে ফিরে বলে,

মুগীরা, আমি জানি মুহাম্মাদ সত্যি কথাই বলছে, কিন্তু কী যেন একটা আমাকে আটকে রেখেছে। কুসাইরের লোকেরা যখন বললো, আমরা আন-নাদওয়ার (কুরাইশদের সংসদ সভা) কর্তৃত্ব চাই, আমরা কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলাম। তারা বললো, আমরা হিজাবার (কাবা ঘর) মালিকানা চাই, সেটাও দিয়ে দিলাম। তারা বললো, আল্লিলবার (যুদ্ধের

পতাকা) দায়িত্ব চাই, সেটাও দিলাম। এরপর তারা রিফাদা আর সিক্বায়ার দায়িত্ব নিতে চাইলো (হাজ্জযাত্রীদের জন্য খাবার ও পানির ব্যবস্থা করা), আমরা তাও তাদেরকে করতে দিলাম। এবার যখন আমরা তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমানে-সমান চলে এসেছি, এখন তারা বলছে, আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন, আমরা এর সাথে কীভাবে প্রতিযোগিতা করবো? আল্লাহর কসম, আমরা কোনোদিনও তাঁকে মেনে নেব না।'[26]

নবুওয়াতের এই পুরো বিষয়টি আবু জাহেলের কাছে নিছক পারিবারিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। দুই পরিবারে প্রতিযোগিতা চলছে, কার হাতে ক্ষমতা যাবে সেটাই আবু জাহেলের মূল চিন্তা। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল আর সবকিছুতে টেক্কা দিতে পারলেও নবুওয়াতের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ টেক্কা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সে ঠিক করলো কিছুতেই নবীজির ﷺ পরিবারকে জিততে দেওয়া যাবে না। নবীজির ﷺ পরিবার এই একটি দিকে তার পরিবারের থেকে এগিয়ে আছে–এটা সে কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারছিল না। তার মনে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ বিষিয়ে উঠছিলো, আর এটাই আবু জাহেলের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনে পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনিতেও ঘুরেফিরে একটা রুঢ় বাস্তবতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়–সমাজের ক্ষমতাধর লোকেরাই নবী-রাসূলদের ব্যাপারে সবচাইতে বেশি বিরোধিতা করে। কেননা এক আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে তারা তাদের ক্ষমতার আসন হাতছাড়া করতে চায় না।

অত্যাচার-নিপীড়ন

নবুওয়্যাতের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহকে ﷺ অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, ক্ষয়-ক্ষতি এ সবকিছু সহ্য করতে হলেও, অত্যাচার-নির্যাতন কখনো সহ্য করতে হয়নি। এটি ছিল আল্লাহ আযযা ওয়াজালের পক্ষ থেকে নবীজির ﷺ জন্য একটি বিশেষ সুরক্ষা। প্রথমে আল্লাহ তাআলা নবীজির ﷺ চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তাঁকে নিরাপত্তা দান করেন। আবু তালিবের মৃত্যুর পরেও আল্লাহ তাঁকে নিরাপদ রেখেছেন; তবে তাঁর অনুসারী মুসলিমরা নানা রকম অত্যাচার আর নিপীড়নের শিকার হয়। এসব ঘটনা নবীজির ﷺ মনে গভীর দাগ কাটতে থাকে। তিনি ছিলেন তাঁর সাহাবীদের ﷺ জন্য অন্তঃপ্রাণ। সাহাবীদের ﷺ ওপর অত্যাচার তাঁকে প্রচণ্ড পীড়া দিত, তিনি তাদের কষ্ট সইতে পারতেন না।

একটি বর্ণনায় ইবন ইসহাক বলেন, 'কুরাইশরা মুসলিমদেরকে লোহার পাতে মুড়ে কড়া রোদের নিচে রেখে দিত, যেন তাদের শরীরগুলো সূর্যের উত্তাপে ঝলসে যায়।' সীমাহীন অত্যাচারের মুখেও যে সাহাবী সর্বাধিক দৃঢ়তার পরিচয় দেন, তিনি হলেন বিলাল ﷺ। তাঁকে যতই অত্যাচার করা হতো, তিনি যেন ততোই দৃঢ় হতেন। তাঁকে

---

[26] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৯।

প্রশ্ন করা হয়–এত নির্যাতন সত্ত্বেও আপনি কীভাবে 'আল্লাহ এক, আল্লাহ এক' (আহাদ, আহাদ) বলতে পারতেন?

বিলাল ﷺ বলেন, কারণ আমি খেয়াল করেছি যখনই আমি 'আল্লাহ এক' বলে চিৎকার দিয়ে উঠি, ওরা আরও ক্ষেপে যায়, আরও বেশি অত্যাচার করে, তাই এটাই বারবার বলতাম।

ইবন ইসহাক্ব বলেন, 'বিলাল আল্লাহর কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।' বস্তুত আল্লাহ ছাড়া তাদের হৃদয়ে আর কিছুই স্থান পেতো না।

নানান মাত্রা আর ধরনের অত্যাচার বহাল থাকে। নির্যাতিতদের তালিকায় শুধু দাস সাহাবীরা ﷺ নয়; বরং সম্ভ্রান্ত বংশের অনেক সাহাবীও ﷺ যুক্ত হন। কুরাইশ বংশের অভিজাত পরিবার বনু উমাইয়ার সন্তান উসমান ইবন আফফান যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁকে মারাত্মক রোষের শিকার হতে হয়। কুরাইশরা তাঁকে কার্পেটে মুড়ে তাঁর গায়ের ওপর লাফাতো। পায়ের চাপায় পিষে দিতো যেন তাঁকে।

মুসলিম দাসদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা ছিল ভয়াবহ। আবু জাহেল তার অধীনস্থ দাস সুমাইয়া ﷺ, তাঁর স্বামী ইয়াসির, ছেলে আম্মারের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। ইয়াসির আর সুমাইয়া দুজনেই আবু জাহেলের হাতে শহীদ হন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, আবু জাহেল সুমাইয়ার ﷺ গোপনাঙ্গে বর্শা দিয়ে আঘাত করে।

বাবা-মায়ের ওপর এই পাশবিক নির্যাতনের দৃশ্য সহ্য করা কোনো সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আম্মারকে এই ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছিল। সে চোখের সামনে দেখলো বাবা আর মা'কে অত্যাচার করতে করতে মেরে ফেলা হলো। নিজের ওপর শারীরিক নির্যাতন তো আগে থেকেই ছিল, তার ওপর বাবা-মায়ের মৃত্যু তাঁকে পাগল করে দিলো। শারীরিক অত্যাচার, মানসিক নির্যাতন সব মিলিয়ে ভয়াবহভাবে বিপর্যস্ত সাহাবী আম্মারের ﷺ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে নবীজির ﷺ বিরুদ্ধে কিছু কথা। একটা সময় যখন সব ব্যথা থেকে নিষ্কৃতি পান, তাঁকে অনুশোচনা ঘিরে ধরে। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছুটে যান নবীজির ﷺ কাছে। নবীজি ﷺ, যিনি সুখে-দুখে সর্বদা তাদের পরম আশ্রয়। পুরো ঘটনা খুলে বললেন তাঁর কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন।

> **"যদি কোনো মুসলিম মাত্রাছাড়া অত্যাচারের কবলে পড়ে মুখে ঈমানের বিপরীতে কিছু কথা বলেও ফেলে, তবে সে কথার জন্য তাঁকে মাফ করে দেওয়া হবে, যদি তার অন্তরে ঈমান অটুট থাকে। কেননা আল্লাহ তাআলা কারো ওপর সাধ্যের বেশি বোঝা চাপান না।" (সূরা নাহল, ১৬: ১০৬)**

ইসলামের বিরুদ্ধে আবু জাহেলের বাড়াবাড়ি সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে ছিল

দুর্বৃত্তদের নেতা, চরম ইসলামবিদ্বেষী। অপকর্ম আর দুষ্কৃতিতে তার কোনো জুড়ি নেই। সবাইকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে, মুসলিমদের অত্যাচার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। এত একনিষ্ঠভাবে শত্রুতার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। ইবন ইসহাক্বের বর্ণনায়,

'আবু জাহেল-ই হলো সেই পাপিষ্ঠ যে কুরাইশদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফুসলে দিতো। প্রভাবশালী বা উচ্চবংশীয় কোনো ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কথা তার কানে আসামাত্র সে তাকে অপমান করার জন্য বলতো, তুমি তোমার বাবার ধর্ম পরিত্যাগ করেছো, তোমার বাবা তোমার চেয়ে ঢের ভালো ছিল। বুড়ো আঙুল দেখাই আমরা তোমার এই ছাইপাশ আদর্শ আর মূল্যবোধকে। আমরা তোমাদেরকে বিভক্ত করে দেবো, মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো তোমাদের সব খ্যাতি, মান-ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকতে দেবো না। কোনো ব্যবসায়ী লোক মুসলিম হয়ে গেলে তাকে বলতো, আল্লাহর কসম, আমরা তোমার সাথে সব রকম ব্যবসা বয়কট করবো, তোমাকে শেষ করে দেবো। আর যদি ইসলাম গ্রহণকারী মানুষটি হতো সহায়-সম্পদহীন দুর্বল কোনো ব্যক্তি, তবে সে নিজে তো তাকে মারধোর করতোই, সেই সাথে অন্যদেরকেও মারধোর করার জন্য ডেকে আনতো। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আবু জাহেলকে শাস্তি দিক, তাকে ধ্বংস করুক!'[27]

উমার ইবন খাত্তাব ﵁ ইসলাম গ্রহণের আগে কট্টর ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর একজন দাসী ছিল, তিনি তাঁকে অনেক মারধোর করতেন। পেটানোর মাঝখানে কখনও থেমে বলতেন, 'মনে কোরো না তোমার ওপর খুব দয়া এসেছে দেখে আমি তোমাকে পেটানো থামিয়ে দিলাম। তোমাকে মারা বন্ধ করেছি কারণ আমি এখন ক্লান্ত, তা না হলে আরো পেটাতাম।'

হত্যার পরিকল্পনা

পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম চিরতরে মুছে দেওয়ার জন্য কুরাইশরা প্রথমে রাসূলুল্লাহর ﷺ ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চেয়েছিল। বলেছিল–এই লোকটা উন্মাদ, জাদুকর, এর কথার কোনো দাম নেই। কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত নবীজিকে ﷺ জানে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। আবু তালিব বেঁচে থাকতে তাদের সাহস এতোটা বাড়ে নি। তারা জানতো যে, নবীজিকে ﷺ হত্যা করলে আবু তালিবের হাত থেকে তাদের মুক্তি নেই। কিন্তু আবু তালিব মারা যাওয়ার পর এসব ষড়যন্ত্র করতে আর কোনো বাধা থাকলো না। তারা নবীজিকে ﷺ হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটে। একের পর এক চাল চালে, কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে সুরক্ষিত রাখেন। হিজরতের বিবরণে এরকম একটি ঘটনা পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

---

[27] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৭।

“কাফিররা যখন আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে আপনাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা বের করে দেবে – তখন তারা যেমন আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, আল্লাহও তেমনি পরিকল্পনা করেছিলেন। আর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।” (সূরা আনফাল, ৮: ৩০)

নবীজির ﷺ প্রতিক্রিয়া

বুখারিতে বর্ণিত আছে, খাব্বাব ইবন আরাত رضي الله عنه নামের এক সাহাবী একবার রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যান। নবীজি ﷺ কাবার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। খাব্বাব তাঁর কাছে গিয়ে বললেন–ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, আপনি কেন আমাদের জন্য দুআ করছেন না?

খাব্বাবের رضي الله عنه জীবনের নিদারুণ কষ্টের মুহূর্তগুলোর একটি ঘটনা এরকম: উমার ইবন খাত্তাব رضي الله عنه তখন খলীফা। একদিন তিনি মুসলিমদের মাক্কী জীবনের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য তাদের জড়ো করলেন। দেখতে দেখতে খাব্বাবের رضي الله عنه পালা এলো। তিনি মুখে কিছু বললেন না, শুধু পরনের জামাটা খুলে সবার সামনে পিঠ মেলে দাঁড়ালেন। উমার رضي الله عنه তাঁকে দেখে যেন আঁতকে উঠলেন, বললেন, ‘তোমার কী হয়েছিল, খাব্বাব? এমন কিছু আমি কখনও দেখিনি!

খাব্বাবের رضي الله عنه পিঠ জুড়ে ছিল গভীর গভীর গর্ত। তিনি বললেন, ‘মাক্কী জীবনের ঘটনা। কুরাইশরা পাথর নিয়ে এসে সেগুলোকে আগুনে পোড়াতো। পাথরগুলো যখন পুড়ে লাল হয়ে যেতো, তখন রৌদ্রতপ্ত বালিতে জ্বলন্ত পাথর রেখে আমাকে তার ওপর ছুঁড়ে ফেলতো। তপ্ত পাথরে আমার মাংস ঝলসে যেতো। আমি আমার নিজের মাংস পোড়ার শব্দ শুনতাম, চর্বি পোড়ার গন্ধ পেতাম।’

প্রকৃতপক্ষেই খাব্বারের رضي الله عنه কাছে নালিশ করার জন্য যথেষ্ট যুক্তি ছিল। কিন্তু তিনি নালিশ করেননি। মুসলিমদের ওপর যে সীমাহীন কষ্ট এসে পড়েছে, সে কষ্ট কমানোর দুআ করতে বলেছেন শুধু–“ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, আপনি কেন আমাদের জন্য দুআ করছেন না?”

কিন্তু নবীজি ﷺ রেগে গেলেন, সোজা উঠে বসলেন, রাগে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি খাব্বাবকে বললেন,

> *‘তোমাদের আগে এমনও মু’মিন বান্দা ছিল, লোহার চিরুনি দিয়ে যাদের হাড় থেকে মাংস খুবলে আনা হতো, করাত দিয়ে যাদের মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত চিরে দু’ভাগ করে ফেলা হতো, কিন্তু তবুও তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করা যায়নি। আর তোমরা তাড়াহুড়া করছো। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর দ্বীনকে বিজয় দান করবেন। আর অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন*

একজন মুসাফির সানা থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত সফর করবে, কিন্তু তার মনে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় থাকবে না।'[28]

খাব্বাবের ﷺ ঘটনা থেকে শিক্ষা

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন। যত কষ্ট-দুর্ভোগ-অত্যাচার সহ্য করতে হোক না কেন, হার মানা যাবে না।

২. প্রকৃতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির যেমন কিছু ধরাবাঁধা সূত্র আছে, তেমনি দ্বীন কায়েমেরও কিছু নির্দিষ্ট সূত্র আছে যেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঠিক করে রেখেছেন। দুনিয়ার বুকে দ্বীনকে কায়েম করার জন্য মুসলিম উম্মাহকে একে একে সেই নির্ধারিত পথের প্রতিটি ধাপ পাড়ি দিতে হবে; এর কোনো ব্যতিক্রম বা শর্টকাট নেই। বহু আগের যুগের মু'মিনরা যে কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন, সাহাবীদেরকেও ﷺ সেই একই পথ পার করতে হয়েছে। আমাদেরও সে পথই পাড়ি দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ চেয়েছিলেন তাঁর উম্মাহ হবে সবার সেরা। তাই পূর্ববর্তী জাতিরা যদি দ্বীন কায়েমের পথে ধৈর্যশীল হয়ে থাকে, তবে তাঁর উম্মাহ যেন আরও বেশি ধৈর্যের পরিচয় দেয়। পূর্ববর্তী জাতিরা যদি শক্তিশালী হয়ে থাকে, তবে এই উম্মাহ যেন তারচেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়–এটাই ছিল নবীজির ﷺ চাওয়া। তিনি চাইতেন যে কিয়ামতের দিনে তাঁর উম্মাহ-ই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই মুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করা।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন আর এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা সানা থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করতে পারবে আর তাদের মনে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় স্থান পাবে না। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, রাসূল ﷺ ছিলেন মক্কার অধিবাসী, তিনি মক্কার কথা না বলে ইয়েমেনের এই বিশেষ দুটি স্থানকে বেছে নিলেন কেন? মক্কার লোকেদের জীবনেই তো তেমন নিরাপত্তা ছিল না, তাহলে মক্কা উল্লেখ করে বোঝানো কি যেতো না যে, পরবর্তী সময়ে মক্কায় নিরাপত্তা আসবে। হাদীসে মক্কার কথা উল্লেখ না করে ইয়েমেনের কথা বলার বিশেষ কারণ আছে। সেই অতীত থেকে আজ পর্যন্ত ইয়েমেনে গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। রাসূলের ﷺ সময় পুরো ইয়েমেনজুড়ে প্রচুর সশস্ত্র গোত্র ছিল। তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ ও হানাহানিতে লিপ্ত থাকতো। তারা প্রত্যেকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। রাসূলুল্লাহর ﷺ যুগে যখন ইসলামের আলো ইয়েমেনে প্রবেশ করলো, তা পুরো সমাজকে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন করে তুললো। ইসলামের সৌন্দর্যই এটা। যেকোনো কিছুই ইসলামের স্পর্শে নিরাপদ ও প্রশান্তিময় হয়ে ওঠে। এখন মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, শরীয়াহর শাসন উঠে গেছে আর সেজন্যই সেই একই সানা থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত অঞ্চলটি আজ আবারও ইয়েমেনের সবচেয়ে অনিরাপদ স্থানে

---

[28] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০।

পরিণত হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া এ দুটো স্থানের আশেপাশে সফরের কথা চিন্তায় আনাও নির্বুদ্ধিতার শামিল। এতেই বোঝা যায়, একমাত্র ইসলামের ছায়াতলেই রয়েছে সত্যিকার শান্তি।

কথার লড়াই

কুরাইশদের সাথে নবীজির ﷺ প্রজ্ঞাপূর্ণ বোঝাপড়ার একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনি আছে।[29] একবার কুরাইশের লোকেরা একত্র হয়ে ঠিক করলো, 'চলো, এমন একজনকে খুঁজে বের করি যে জাদু আর কবিতা রচনায় পারদর্শী। সে আমাদের হয়ে মুহাম্মাদের সাথে মোকাবেলা করবে।' তারা উতবা ইবন রাবিয়াকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। উতবা ইবন রাবিয়াহ মহা ধুরন্ধর লোক, কথার মারপ্যাঁচে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। উতবা নবীজির ﷺ কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা মুহাম্মাদ, বলো তো কে উত্তম– তুমি নাকি আবদুল মুত্তালিব?'

খুবই চতুরতাপূর্ণ প্রশ্ন। তৎকালীন আরব সমাজে মৃত পূর্বপুরুষদের অত্যধিক সম্মান করা হতো। আর রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিবারকে সমগ্র মক্কার লোক সম্ভ্রমের নজরে দেখতো। আবদুল মুত্তালিব বা তাঁর মতো মানুষের বিপক্ষে কথা বলবে এমন সাহস কারো ছিল না। সেই সমাজে পূর্বপুরুষদের হেয় করে কথা বলাটাই ছিল এক ধরনের অপরাধ। তাই উতবা যখন নবীজিকে ﷺ তাঁর বাবা আবদুল্লাহ এবং দাদা আবদুল মুত্তালিবের কথা জিজ্ঞেস করলো, নবীজি ﷺ চুপ করে রইলেন। সুযোগ পেয়ে উতবা বলে উঠলো,

'দেখো, তুমি যদি বলো এই মানুষগুলো তোমার চেয়ে উত্তম, তাহলে শুনে রাখো, যে দেব দেবীদের নামে তুমি বাজে বকছো, ওরাও তো তাদেরই উপাসনা করতো। আর তুমি যদি নিজেকে তাদের চেয়ে ভালো মনে করো তাহলে তোমার কী বক্তব্য আছে পেশ করো। আমরাও শুনি তোমার কী বলার আছে। তবে আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমার চেয়ে বড়ো মূর্খ আমরা জন্মেও দেখিনি, যে কিনা তার আপন জাতির এত ক্ষতি করে। তুমি আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছো, দ্বন্দ্ব বাড়াচ্ছো, আমাদের ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ করছো। তোমার জন্য আমরা আরবদের চোখে ছোট হয়ে গেছি, লোকের মুখে মুখে রটে বেড়াচ্ছে–কুরাইশদের মাঝে নাকি জাদুকর আছে।'

অদ্ভুত ব্যাপার হলো–কুরাইশদের মাঝে জাদুকর আছে এই গুজব সৃষ্টির জন্য উতবা রাসূলুল্লাহকে ﷺ দায়ী করছে, অথচ এই গুজব শুরুতে কুরাইশ নেতারাই রটায়। তারাই মুহাম্মাদকে ﷺ জাদুকর ডাকতে শুরু করে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের নিজেদের কাজে নিজেরাই লজ্জায় পড়ে যায়। উতবা বলে, 'আল্লাহর কসম, দেখে মনে হচ্ছে যেন আমরা এক গর্ভবতী নারীর কান্নার জন্য বসে আছি, এরপরই আমরা একে

---

[29] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৩।

অপরের বিরুদ্ধে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকবো যতোক্ষণ না আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই।' তার কথার অর্থ ছিল, ইসলামের কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ বেঁধে যাবে, আর সেজন্য মুহাম্মাদ ﷺ দায়ী।

এরপর উতবা প্রস্তাব দিল, মুহাম্মাদকে ﷺ উচ্চ মর্যাদা, ধনসম্পদ - তিনি যা চান তা-ই দেওয়া হবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবীজিকে ﷺ লোভ দেখিয়ে আপস-সমঝোতার মাধ্যমে ইসলামকে পঙ্গু ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ উতবার এসব বকবকানি মন দিয়ে শুনেছেন, কথার মাঝখানে তাকে একবারও বাধা দেননি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট শ্রোতা। আর তাই উতবার কথাগুলো অর্থহীন হলেও তিনি শান্তভাবে তার সব কথা শুনে গেলেন। উতবা একসময় থামলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদুস্বরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

- উতবা, তোমার কথা কি শেষ হয়েছে?

- হ্যাঁ শেষ, উতবা জবাব দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ থেকে উতবার কথার কোনো জবাব দিলেন না, বরং কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করতে শুরু করলেন...

> "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। হা-মীম। এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত, আরবী কুরআন, সেই লোকদের জন্য যারা জানে।" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ১-৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করতেই থাকলেন, করতেই থাকলেন। এরপর এই আয়াত এলো যেখানে বলা হয়েছে, (৪১: ১৩)

> "অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মতো।" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ১৩)

এই আয়াতটি পাঠ করামাত্র উতবা হাত বাড়িয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ মুখে চাপা দিয়ে তাঁকে থামাতে গেলো। কেননা এই আয়াতে কাফেরদেরকে তাদের অপরাধের জন্য শাস্তির হুমকি দেওয়া হচ্ছিলো আর উতবা মনে মনে ঠিকই জানতো যে, মুহাম্মাদ ﷺ সত্যবাদী। তিনি যা উচ্চারণ করবেন, তার প্রতিটি বর্ণ অক্ষরে অক্ষরে ফলবে। সে মরিয়া হয়ে বললো, 'আমাদের সম্পর্কের কসম লাগে, থামো, তুমি থামো!'

উতবা কুরাইশের লোকেদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'মুহাম্মাদ যখন কুরআন পড়তে শুরু করলো, সে যে কী বলছিল আমি আগামাথা কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু একটা ব্যাপার বুঝেছি, আদ ও সামূদ জাতির ওপর যেমন আযাব এসেছিল, আমাদের ওপরও তেমন আযাব আসবে। এমনটাই সে হুমকি দিয়েছে।' কুরাইশের লোকেরা বললো, 'দূর হও! সে তোমার সাথে স্পষ্ট আরবি ভাষায় কথা বললো তবু তুমি তাঁর

কথা বুঝতে পারলে না?' উতবা উত্তর দিলো, 'আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তাঁর কথা বুঝতে পারছিলাম না।'

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ একেক পরিস্থিতি একেকভাবে মোকাবেলা করেছেন। অনেক সময়ই তিনি সরাসরি কুরআনের আয়াত দিয়ে মানুষের কথার জবাব দিয়েছেন। এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, দাওয়াহ্ দেওয়ার সময়ে কুরআনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা একটি উত্তম পদ্ধতি, কেননা আল্লাহ্ আযযা ওয়াজালের কথাই উত্তম দাওয়াত।

মক্কার বাইরের লোকেদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

দামাদ আল আযদী: জ্বিন ছাড়াতে এসে ইসলাম গ্রহণ

দামাদ আল আযদী ছিল দক্ষিণ আরবের বাসিন্দা। সে মক্কায় এসে একটা গুঞ্জন শুনতে পেলো, 'এক লোককে জ্বিনে ধরেছে।' লোকেরা আসলে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথাই বলছিল। দামাদ আল আযদী ছিল ওঝা, সে জ্বিন তাড়াতে পারতো। খুব আন্তরিক ভাবে সাহায্যের নিয়তে সে নবীজির ﷺ কাছে গিয়ে বললো, 'শুনেছি আপনাকে নাকি জ্বিনে ধরেছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই, আপনি যদি চান তো আমি জ্বিন তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি।' সুস্থসবল লোকের জন্য কথাটা বেশ অপমানজনক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরক্ত বা রাগ কোনোটাই হলেন না। প্রচণ্ড ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ এই মানুষটি বুঝতে পারলেন যে লোকটি নিশ্চয়ই তাঁর সম্পর্কে কিছু উল্টোপাল্টা শুনেছে। খুতবার দুআ পড়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন:

'সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁরই সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ তাআলা যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আল্লাহ তাআলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইবাদতের যোগ্য ইলাহ নেই, আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই।'

আরবিতে এই দুআটি শুনতে যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই শ্রুতিমধুর। দামাদ আল আযদী এই দুআ শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলো। শেষ হওয়ামাত্র উঠলো–'মুহাম্মাদ! আপনি কি এই কথাগুলো আরেকবার বলবেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় দুআটি পড়ে শোনালেন।

দামাদ বললো, 'এমন কথা এর আগে আমি কোনো দিন শুনিনি! কী চমৎকার কথা– যেন সাগরের গভীরে যেয়ে আঘাত হানবে।' অর্থাৎ এ কথাগুলো এমন যা নিশ্চিত মানুষকে প্রভাবিত করবে।

- তবে এসো, আমার কাছে বায়াত (আনুগত্যের শপথ) করো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানালেন,

এক মুহূর্ত দেরী না করে দামাদ বললো,

- আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

- তুমি কি তোমার (গ্রামের) লোকেদের জন্য বায়াহ দেবে?

- আমি আমার লোকেদের জন্যেও বায়াহ দেবো।

এর খানিকক্ষণ আগেই লোকটি রাসূলুল্লাহকে ﷺ সুস্থ করতে এসেছিল, অথচ রাসূলুল্লাহই ﷺ তাঁকে জাহেলিয়াতের রোগ থেকে সুস্থ করে তোলেন। এর অনেক বছর পরের কথা। রাসূলুল্লাহর ﷺ পাঠানো সেনাবাহিনী সেই গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের নেতা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি এই গ্রামবাসীর থেকে কিছু নিয়েছো?' একজন বলে উঠলো–হ্যাঁ, আমি তাদের থেকে একটা শক্তসমর্থ উট ছিনিয়ে নিয়েছি।' সেনাবাহিনীর নেতা এ কথা শুনে বললেন, 'ওদেরকে উটটা ফেরত দিয়ে দাও, কেননা তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হয়েছে।'[30]

আমর ইবন আবসা ﷺ: সত্যের খোঁজে মক্কায়

সহীহ মুসলিমে আমর ইবন আবসা ﷺ নামের এক সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তিনি ছিলেন আরবের অধিবাসী। আমর ইবন আবসার ﷺ নিজ মুখেই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনি বর্ণনা করেছেন:

'জাহেলিয়াতের সময় থেকেই আমার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমার সমাজের লোকেরা যে ধর্মের অনুসরণ করছে তা মিথ্যা, ভ্রান্ত। তাদের মূর্তিপূজায় আমি কোনোদিনও বিশ্বাস করিনি। আমি মন থেকে জানতাম–এই ধর্ম সঠিক নয়। হঠাৎ একদিন শুনলাম মক্কার এক ব্যক্তি নতুন ধর্ম প্রচার করছে। এ খবর শোনামাত্র আমি আমার উটের পিঠে চড়ে গোপনে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। (সে সময় মক্কার পরিস্থিতি এতো কঠোর ছিল যে মক্কার বাইরের কেউ মুহাম্মাদের ﷺ সাথে প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ করতে পারতো না।) আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

- কে আপনি?

- আমি একজন নবী।

- এর অর্থ কী?

- এর অর্থ আমি আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছি।

- তিনি আপনাকে কী দিয়ে পাঠিয়েছেন?

- তিনি আমাকে এই বার্তা সহকারে পাঠিয়েছেন যে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে, তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করা যাবে না এবং সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করে দিতে হবে

---

[30] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২।

- আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ দূরদর্শী ছিলেন। তিনি মক্কার এই বিপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে আমরকে ﷺ টেনে আনতে চাইলেন না। বললেন, 'তুমি এখন আমার অনুসরণ করতে পারবে না, তুমি কি আমার অবস্থা দেখছো না? তোমার লোকেদের কাছে ফিরে যাও, যখন শুনবে যে আমি বিজয়ী হয়েছি–তখন আমার সাথে এসে দেখা কোরো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে তিনি জয়ী হবেন। এখানে তিনি আমরকে ইসলাম গ্রহণে নিষেধ করেন নি, বরং গোপনে ইসলাম পালন করতে বলেছেন।

'আমি চলে এলাম। এরপর থেকে আমি মুহাম্মাদের ﷺ ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতাম। মুসাফিরদের কাছে জিজ্ঞেস করতাম – মুহাম্মাদের কী খবর? এরপর একদিন শুনলাম যে মুহাম্মাদ ﷺ মদীনায় হিজরত করেছেন এবং তিনি বিজয়ী হয়েছেন। এ কথা শুনেই আমি মদীনায় রওনা দিলাম। নবীজির ﷺ কাছে পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

নবীজির ﷺ সাথে আমরের প্রথমবার সাক্ষাৎ হওয়ার পর বহু বছর কেটে যায়। প্রথম বার খুবই স্বল্প সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ তো কাউকে ভুলে যান না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ চিনেছি, তুমি হলে সেই ব্যক্তি যে মক্কায় আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলে।'

নেতৃত্বদানের জন্য এই গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন নেতাকে অবশ্যই তাঁর অনুসারীদেরকে খুব ভালোভাবে চিনতে হবে। নবী সুলাইমানের ﷺ মাঝেও এই গুণের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। যখন তাঁর পক্ষীবাহিনী থেকে মাত্র একটি পাখি অনুপস্থিত ছিল, তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে হুদহুদ পাখি সেখানে নেই।

এরপর আমর ইবন আবসা ﷺ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিন। আমাকে সালাত নিয়ে কিছু বলুন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে সালাত আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করলেন। এরপর আমর ﷺ বললেন, 'আমাকে ওযু করা শেখান।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ওযু করা শিখিয়ে দিলেন। এভাবেই একটা সাধারণ মানুষের মনেও রাসূলুল্লাহ ﷺ অসাধারণ স্থান করে নিয়েছিলেন। অদ্ভুত মোহনীয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাসূলুল্লাহ–মুহাম্মাদ ﷺ।

আবু যার ﷺ: গিফারের বাতিঘর

ইসলামের ইতিহাসের অনন্য এক নাম আবু যার গিফারী ﷺ। কী ছিল তাঁর ইসলামে আসার কাহিনি? ইমাম আহমেদ থেকে বর্ণিত হয় আবু যারের ভাষ্য:

'আমরা ছেড়ে চলে এলাম আমাদের গিফার শহর। ছোট থেকে যেখানে বড়ো হয়েছি, শেষপর্যন্ত সেই গিফার ছাড়তে বাধ্য হলাম। মা আর ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম

নতুন কোনো গন্তব্যের আশায়। গিফারের লোকেরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছিল। পবিত্র মাসেও তাদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকে! আশহুরুল হারামের এই অপমান আর সহ্য করা যায় না।'

আশহুরুল হারাম হলো সেই চার মাস, যেগুলোকে আরবের লোকেরা পবিত্র মাস বলে গণ্য করতো। এ সময় তারা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকতো। আরবের সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য, এই চার মাসে কোনোপ্রকার হত্যা বা খুনোখুনি করা যাবে না। এই চার মাসের মর্যাদা কেউ ক্ষুণ্ণ করবে না। তবে গিফারের লোকেরা ব্যতিক্রম। লুটপাট, হানাহানি করাই তাদের পেশা। এসব পবিত্র মাস বা প্রচলিত নিয়মনীতির ধার ধরতো না তারা। কাফেলা আক্রমণ, চুরি, হত্যা, এগুলোই ছিল তাদের কাজ। তাদের অপকর্মের ফলে সারা আরব জুড়ে তাদের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলাম গ্রহণের আগেও আবু যার ﷺ স্বগোত্রের এই অপরাধপ্রবণ জীবন পছন্দ করতেন না। সবার কাছে যা পানিভাত, আবু যার গিফারীর কাছে সেটাই গর্হিত অপরাধ। তিনি যেন নিজ ভূমে পরবাসী। তাই এক সময় পরিবারসহ গিফার ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথমে দেখা করলেন তাঁর চাচার সাথে। তাঁর চাচা অন্য গোত্রের সদস্য। আবু যারের ভাষায়, 'চাচা আমাদের প্রতি খুবই দয়ালু এবং যত্নবান ছিলেন।' কিন্তু তাদের প্রতি চাচার এই বিশেষ যত্নআত্তি ও মেহমানদারি বাকি আত্মীয়-স্বজনদের সহ্য হচ্ছিল না, তারা তাদেরকে হিংসা করতো। একদিন সুযোগ বুঝে আবু যারের চাচার কানে বিষ ঢেলে দিলো। বললো, আপনি যখন এখানে থাকেন না, সেই সুযোগে আবু যারের ভাই উনাইস আপনার স্ত্রীর সাথে দেখাসাক্ষাত করে, আপনার বউয়ের ব্যাপারে তার বেশ আগ্রহ।' চাচা আগে-পিছে কিছু বিবেচনা না করে সোজা আবু যার ও তার ভাই উনাইসের কাছে হাজির হলো। তাদেরকে এইসব বিষাক্ত কথা শুনিয়ে ছাড়লেন। আবু যার তার চাচার মুখে এসব কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন। বললেন, 'চাচা, আপনার দীর্ঘদিনের যত্নআত্তি আর উত্তম আচরণ–সবই আজ বরবাদ হয়ে গেল। আপনি কীভাবে পারলেন আমাদের বিরুদ্ধে এমন একটা অভিযোগ তুলতে! আপনার এত দয়ার আর কোনো মূল্য থাকলো না।' এই বলে তারা শীঘ্রই গোছগাছ করে চাচার বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন।

'চাচা আমার কথায় খুব দুঃখ পেলেন, উনার চিন্তাশক্তি ফিরে এলো। উনি এসব কথা তোলার জন্য আফসোস করতে লাগলেন। কাপড়ে মুখ ঢেকে খুব কাঁদছিলেন চাচা। কিন্তু আমাদের রাগ কমলো না, এমন অভিযোগের পর থাকা যায় না, তাই সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে সেখান থেকে চলে এলাম।'

এরপর আবু যারের পরিবার মক্কার কাছাকাছি একটি অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। আবু যার বর্ণনা করেন, 'আমার ভাই উনাইস ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় যায়। সেখানে তার সাথে এক লোকের দেখা হয়। সে নিজেকে নবী দাবি করছিল। উনাইস ফিরে এসে বললো, আমার সাথে আজ এক লোকের সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনি এক নতুন দ্বীন প্রচার

করছেন। তিনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেন। আমি বললাম, আরে, আমি তো ইতিমধ্যেই অন্য সকল প্রকার মূর্তি ও দেব দেবীর পূজা বাদ দিয়েছি। তিন বছর যাবৎ কেবল এক আল্লাহ তাআলার ইবাদত করছি।'

আবু যারের মতো মানুষগুলোর ফিতরাহ ছিল বিশুদ্ধ, তাদের জন্মগত স্বভাব ও প্রকৃতিই তাদেরকে বলে দিত যে, কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল। আবু যারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'তুমি কীভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করতে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমাকে যে দিকে ফিরে দুআ করার নির্দেশ দিতেন, আমি সেদিকেই ফিরে দুআ করতাম। আল্লাহ আমাকে যে ভাবে দুআ করতে বলেন, আমি সেভাবে দুআ করতাম। আর আমি রাতভর দুআ করে যেতাম যতক্ষণ না ঘুম এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে নেয় আর এরপর সূর্যের আলোয় আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি।'

আবু যার তাঁর ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলেন, 'সেই মানুষটি কী শেখান?' উত্তরে উনাইস আবু যারকে ইসলামের কিছু শিক্ষার কথা বলেন। তিনি নবীজির ﷺ কাছ থেকে সেগুলো শিখেছিলেন। এরপর আবু যার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকেরা তাঁর সম্পর্কে কী বলে?'

- লোকেরা বলে সে একজন জাদুকর, গণক, মিথ্যাবাদী।

- নাহ, তুমি আমার কৌতূহল মেটাতে পারছো না! আমি নিজেই যাবো তাঁর সাথে দেখা করতে। লোকেরা তাঁর ব্যাপারে যা বলে, তা সত্য নাও হতে পারে।

আবু যার মক্কার 'সিএনএন' বা 'বিবিসি'-র ওপর ভরসা করে থাকেননি। তিনি নিজে গিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। 'আমি মক্কায় পৌঁছে যাকে প্রথমে সামনে পেলাম, তাকেই জিজ্ঞেস করে বসলাম, তুমি কি আমাকে মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে? – কথা নেই, বার্তা নেই, সেই লোক সজোরে চিৎকার করে কুরাইশদের জড়ো করে ফেললো! কুরাইশরা এসে আমার ওপর অতর্কিত মারতে শুরু করলো। পাথর, নুড়ি, হাতের কাছে যে যা পাচ্ছিলো তাই নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়তে থাকে, একসময় আমি জ্ঞান হারাই। যখন জ্ঞান ফিরলো, আমার তখন নুসুব আহমারের মতো অবস্থা!'

নুসুব আহমার হলো সেই পাথর যার ওপর কুরাইশরা তাদের দেব দেবীর নামে পশু বলি দিতো, ফলে পাথরটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে থাকতো। মার খাওয়ার পর আবু যারের শরীরের অবস্থা হয়েছিল ওই পাথরের মত।

'আমি যমযম কূপের কাছে গিয়ে সেখান থেকে পানি খেলাম, আর যমযমের পানি দিয়ে গায়ের রক্ত ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করলাম। এরপর আমি কাবার পাশে গেলাম।' ইমাম আহমেদের বর্ণনায় আছে যে আবু যার ﷺ সেখানে তিরিশ দিন অবস্থান করেন। কেননা তিনি জানতেন না কোথায় রাসূলুল্লাহর ﷺ দেখা পাওয়া যাবে। আবু যার

বলেন, 'পুরো সময়টাতে আমার কাছে যমযমের পানি ছাড়া আর কোনো খাবার ছিল না।' খাবার ছাড়া ত্রিশ দিন বেঁচে থাকা সম্ভব কিনা সে কথা আজকের চিকিৎসকেরাই ভালো বলতে পারবে। তবে মজার ব্যাপার হলো, আবু যার বলেন, 'সে সময় আমার ওজন বাড়তে থাকে, আমার স্বাস্থ্য এত ভালো হয়ে গেলো যে, আমার পেটে ভাঁজ পড়ে যায়!'

'একদিন দেখতে পেলাম দু'জন মহিলা, কাবার চারপাশে তাওয়াফ করছে। প্রত্যেক চক্করে চক্করে তারা ইসাফ আর নাইলা পাথরকে স্পর্শ করছিল।' ইসাফ আর নাইলা নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত। তারা ছিল প্রেমিক-প্রেমিকা, বিয়ে করেনি। একদিন দুজনে কাবার পাশে দেখা করে আর আল্লাহ তাআলার ঘরের পাশে তারা পরস্পরের সাথে যিনা করার ইচ্ছা করে! ওই অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাথরে পরিণত করেন। অথচ, কালের পরিক্রমায়, মক্কার মুশরিকরা তাদের এই মূর্তিগুলোর উপাসনা শুরু করে। এভাবেই শয়তান মানুষকে অন্ধকার থেকে আরও গভীর অন্ধকারের দিকে ধাবিত করে, খারাপ কাজগুলোকে তাদের সামনে অতি মোহনীয় মোড়কে সুন্দর হিসেবে উপস্থাপন করে।

মূর্তি পূজার সূচনাও হয় এভাবে। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম যে মানুষগুলোর মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল, তারা আদতে খারাপ লোক নয়, বরং সৎকর্মশীল মানুষ ছিলেন। নূহের ﷺ জাতি থেকে যখন নেককার লোকেদের মৃত্যু হলো, তখন শয়তান এসে মানুষদের বলতে থাকে, 'তোমরা তাদের মূর্তি তৈরি করলেই তো পারো, ওদের মূর্তি দেখে তোমাদের আল্লাহর কথা, ভালো কাজ করার কথা মনে পড়বে।' ফলে লোকেরা 'ভালো নিয়তে' তাদের মূর্তি গড়ে শয়তানের প্রথম পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এর কয়েক প্রজন্ম পরে সবাই যখন ভুলে গেল এই মূর্তি কেন তৈরি করা হয়েছিল, কী এদের উদ্দেশ্য। তখন শয়তান এসে বললো এই মূর্তিগুলোই পূজা করতে। এভাবে আস্তে আস্তে তারা মূর্তিপূজা আরম্ভ করে।

তবে আবু যার বরাবরই মূর্তিপূজার ঘোরবিরোধী। তিনি কাবার পাশে এমন মূর্তিপূজা দেখে আর চুপ থাকতে পারলেন না। মহিলা দুটোর দিকে মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, 'তোমরা পাথরদুটোর একটিকে আরেকটির সাথে সঙ্গম করিয়ে দিলেই তো পারো।' মহিলাদের মুখে কোনো কথা নেই। হতে পারে তারা তাঁর কথা বোঝেইনি, অথবা এমনও হতে পারে যে, তারা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে কেউ তাদের দেবতাদের নামে এরকম বাজে কথা বলতে পারে। তারা কোনো উত্তর না দিয়ে তাওয়াফ করতে থাকে। আবু যার যখন দেখলেন তাঁর কথায় মহিলাদের কোন ভাবাবেগ নেই, তিনি তারচেয়েও বাজে একটি মন্তব্য করলেন। এবারে মহিলাদের আর কোনো সন্দেহ রইলো না। তারা নিশ্চিত হয়ে গেল লোকটা আসলেই তাদের দেব দেবীদের সম্পর্কে এসব বাজে বকছে। ওমনি দু'জন চিৎকার করতে করতে দৌঁড়ে মক্কার রাস্তায় চলে গেল। ছুটতে ছুটতে একেবারে হাজির হলো মুহাম্মাদ ﷺ ও আবু বকরের ﷺ সামনে।

মুহাম্মাদ ﷺ তাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমাদের?'

- ওই যে, ওখানে ... ওখানে একটা মুরতাদ!

- কী করেছে সে?

- সে কথা মুখে আনার মতো নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটির সাথে দেখা করতে চললেন। তিনি সেখানে আবু যারকে পেলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

- তুমি কোথা থেকে এসেছো?

- আমি এসেছি গিফার গোত্র থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মমতার সাথে তাঁর হাত আবু যারের কপালে রাখলেন। আবু যার বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত–সত্যের অনুসন্ধানে কেউ একজন গিফার থেকে মক্কায় চলে এসেছে!' কেননা গিফারে আইন-কানুন মানার কোনো বালাই নেই, পবিত্র মাসকে পর্যন্ত তোয়াক্কা করে না। সেই গিফারের একজন মানুষ কিনা সত্যধর্মের খোঁজে মক্কায় চলে এলো! বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! অথচ যেখানে মক্কার কুরাইশরা ধর্মে-কর্মে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও সত্য দ্বীনের ব্যাপারে এগিয়ে এলো না।

'আমার কাছে মনে হলো যে, আমি গিফার থেকে এসেছি এটা শুনে হয়তো উনার পছন্দ হয়নি তাই তিনি আমার কপালে হাত দিয়েছেন। আমি হাত বাড়িয়ে কপাল থেকে উনার হাত সরাতে গেলাম। সাথে সাথেই আবু বকর ؓ আমার হাতে বাড়ি মেরে নামিয়ে দিলেন, বললেন–হাত নামিয়ে নাও।' এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তাঁর কথোপকথন শুরু হয়।

আবু যার অনুসন্ধানী ব্যক্তি ছিলেন। যার-তার, যে কোনো কথা মেনে নেওয়ার লোক নন। আপন ভাই যখন নবীর সন্ধান এনেছিল, তিনি তার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সত্যের ব্যাপারে আবু যারের সহজাত একটা বোধ বরাবরই কাজ করতো। অন্যায়কে তিনি কোনোদিনও সহ্য করতে পারেন নি। ভিটেমাটি ছেড়েছেন, সত্যের সন্ধানে সুদূর মক্কায় এসেছেন, মার খেয়েছেন–তবু সত্যের প্রতি আগ্রহ দমেনি। কথোপকথনের এক পর্যায়ে আবু যারের অন্তরের সকল প্রশ্নের অবসান হলো। যে সত্যের সন্ধানে তিনি এতোদূর এসেছিলেন, আজ যেন সেই সত্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। সেই চিরন্তন সত্যের সামনে তিনি মাথানত করে দিলেন। আবু যার ইসলাম গ্রহণ করলেন। আজ থেকে তিনি মুসলিম!

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু যারকে ؓ উপদেশ দিলেন, 'তোমার ঈমানের কথা কারো কাছে প্রকাশ কোরো না।' কিন্তু প্রবল উৎসাহে আবু যার পরদিনই মক্কার কুরাইশদের সামনে

চিৎকার করে উঠলেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ﷺ।' এই কাজের ফল কী হতে পারে সেদিকে নজর দেওয়ার যেন সময়ই নেই।

'শাহাদাহ শোনামাত্র কুরাইশরা আমাকে ছেঁকে ধরলো, এমনভাবে এলোপাতাড়ি মারতে লাগলো যে আরেকটু হলে আমি সেদিনই মারা পড়তাম। কিন্তু ঠিক তক্ষুণি আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব এসে পড়লেন বলে সে যাত্রা রক্ষা পেলাম। তিনি বললেন, তোমরা জানো এই লোক কোথাকার? এই লোক গিফার গোত্রের। এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমাকে রেখে পালিয়ে গেল।

আবু যার অপ্রতিরোধ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও তিনি একই কাজ করলেন। প্রতিদিনই মক্কার লোকেরা তাঁকে মারধোর করতো, আর আব্বাস এসে বলতেন যে এই লোক গিফার থেকে এসেছে। আব্বাস বলতেন, 'তোমরা কি জানো যে এই লোক তোমাদের হাতে মারা পড়লে কী হবে? তোমাদের কোনো কাফেলা আর নিরাপদে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছাবে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর আবু যারকে رضي الله عنه বললেন, 'তুমি তোমার লোকদের কাছে ফিরে যাও, তাদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দাও। যখন শুনবে আমি বিজয়ী হয়েছি তখন আমার সাথে দেখা করতে এসো।'

আবু যার رضي الله عنه রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে খুব অল্প সময় কাটিয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ থেকে খুব বেশি কিছু শেখার সুযোগ হয়তো সেভাবে হয়নি। হয়তো তিনি হাতেগোণা কিছু আয়াত ও হাদীস শিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেগুলোকে সম্বল করেই গিফারে ফিরে যান তিনি। সেখানকার লোকেদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ দিতে শুরু করেন। আর দেখতে দেখতে গিফারের লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করেন, তত দিনে আমার গোত্রের প্রায় অর্ধেক লোকই মুসলিম। আমরা ঠিক করলাম যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করতে যাবো, আর তখন গোত্রের বাকি অর্ধেকও বলে উঠলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসলে আমরাও তাঁর সাথে দেখা করতে যাবো। আমরাও তখন ইসলাম গ্রহণ করবো।' এভাবে এক এক করে পুরো গিফার গোত্রই মুসলিম হয়ে যায়।

অতঃপর একদিন মদীনায় নবীজি ﷺ দিগন্তে ধূলোর মেঘ দেখতে পান। দেখে মনে হচ্ছিল কোনো সৈন্যদল আক্রমণ করতে আসছে। কয়েকজন সাহাবী رضي الله عنهم নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে উদ্যত হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, 'নাহ, সম্ভবত আবু যার আসছে।' রাসূলুল্লাহর ﷺ ধারণা সত্য হলো। বস্তুত এই ধুলিমেঘ ছিল আবু যারের বাহিনীর। তিনি তাঁর পুরো গোত্রকে সাথে নিয়ে নবীজির ﷺ কাছে বায়াত দিতে মদীনায় আসছিলেন।

সে যুগে গিফার এবং আসলাম এই দুই গোত্রের মাঝে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আসলামের লোকেরা আবিষ্কার করলো গিফারের সব লোক মুসলিম হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়,

তারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে বায়াতও দিয়ে ফেলেছে! তারা অবিলম্বে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললো, 'আমরাও মুসলিম হবো!' রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, 'গিফার! আল্লাহ যেন তাদের মাফ করে দেন। আসলাম! আল্লাহ যেন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত করেন।' পুরো দু-দুটো গোত্রের মুসলিম হয়ে যাওয়া–এই বিশাল ঘটনার পেছনে ছিলেন একজন মাত্র লোক, আবু যার গিফারী ﷺ। তিনি অনেক বড় আলেম ছিলেন না, তাঁর অনেক বেশি বুজুর্গিও ছিল না। পরবর্তীতে অনেক ইলম অর্জন করলেও, ইসলাম গ্রহণের পর পর খুব অল্পসংখ্যক আয়াতই জানতেন। কিন্তু এই সীমিত জ্ঞান সম্বল করেই তিনি এগিয়ে যান। এর পেছনে ছিল তাঁর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা।

এভাবেই আবু যারের ﷺ মাধ্যমে গিফার ও আসলামের সমস্ত লোক মুসলিম হয়ে যায়।[31] আরবের যে লোকগুলো কখনো মুসলিম হবে বলে আশাও করা যায়নি, তারাই ইসলাম গ্রহণ করে।

আবু যারের ﷺ কাহিনি থেকে শিক্ষা:

১. যে ব্যক্তি সরলপথের খোঁজ করে, আল্লাহ তাকে হেদায়েত দেন। আবু যার সত্য জানার প্রচেষ্টায় আন্তরিক ছিলেন, তাই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, অন্তত একটি আয়াত জানলেও তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

৩. আবু যার ছিলেন খুবই সাহসী। সত্য কথা অকপটে তিনি সবার সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন। মক্কায় একজন 'বিদেশী' হওয়া সত্ত্বেও কথা বলতে ভয় পাননি, কারণ তিনি নিজের মুসলিম পরিচয় নিয়ে গর্বিত ছিলেন।

৪. আবু যারের কাছ থেকে শিক্ষণীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কোনো কথার সত্যতা যাচাই করা । মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ জাদুকর বা মিথ্যাবাদী বলে সবার কাছে প্রচার করেছিল। কিন্তু তাদের দেখাদেখি আবু যার সে কথায় বিশ্বাস করে ফেলেননি। বরং তিনি নিজচোখে সত্য যাচাই করতে মক্কায় এসেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। মুসলিমদের উচিত মিডিয়ার কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য বোঝার চেষ্টা করা।

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হাদীসে বলেছেন, 'কোনো ভালো কাজকেই ছোটো মনে

---

[31] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯।

করো না। এমনকি যদি তা হয় তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে এক চিলতে হাসি।' কোনো ভালো কাজকেই নগণ্য ভাবা যাবে না, কেননা বিচারের দিনে একটি ছোটো কাজও হয়তো অনেক ব্যবধান গড়ে দেবে। আবু যার ﷺ ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি জানতেন–তা কিন্তু না, তিনি অল্পই জানতেন। আর তিনি নিজের গোত্রে ফিরে গিয়ে যা জানতেন, তা দ্বারাই ইসলামের দাওয়াহ দেন–এর বেশি কিছু করেন নি। হয়তো তখন তাঁর কল্পনাতেও আসেনি যে, তাঁর পুরো গোত্র তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম হয়ে যাবে, এমনকি তাদের দেখাদেখি আসলাম গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু দাঈদের কাজ এটাই। তারা বীজ বুনবে, চারাগাছ জন্ম দেবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। হাদীসে আছে, 'কোনো ব্যক্তি হয়তো তেমন চিন্তা-ভাবনা না করেই এমন একটি ভালো কথা বলে ফেলবে, যার কারণে আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং তাঁর জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে দেবেন। আর কোনো ব্যক্তি হয়তো এমন একটা কথা বলে বসবে যা আল্লাহর রাগের কারণ হবে, ফলে আল্লাহ তার সেই কথার জন্য তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।'

প্রথম হিজরত: আবিসিনিয়া

হাবাশা অর্থাৎ আবিসিনিয়াতে দু'বার হিজরত হয়েছিল। প্রথমবার বারো জন পুরুষ ও চার জন মহিলার একটি ছোট দল সেখানে হিজরত করে। এটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের ঘটনা। আর দ্বিতীয়বার বেশ বড়সড় একটি দল হিজরত করে। সে দলে ছিল তিরাশি জন পুরুষ এবং আঠারো-উনিশ জন মহিলা।

প্রথম দলটি আল-হাবাশাতে পৌঁছে গুজব শুনতে পায় যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলিম হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্ন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আন-নাজমের আয়াতগুলো কুরাইশদের লোকদের পড়ে শোনালে সেই আয়াতগুলো তাদেরকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। তিনি শেষ আয়াতে পৌঁছানো মাত্রই সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এই শেষের আয়াতটি ছিল সিজদাহ'র আয়াত। সে সময় নবীজি ﷺ আর মুসলিমদের সাথে সাথে কাফেররাও সিজদা দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরাইশের লোকেরা মুসলিম হয়ে গেছে। ফলে হাবাশা থেকে মুসলিমরা মক্কায় ফিরে আসেন। এসে বুঝতে পারেন যে, এ খবর মিথ্যা।

সাহাবীদের ﷺ কষ্ট আর যন্ত্রণা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা হাবাশাতে চলে গেলেই পারো, কেননা সেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা আছেন। তিনি কারো সাথে জুলুম করেন না।' এই রাজা হলেন আন-নাজ্জাশী, খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। নবীজির ﷺ পরামর্শ অনুযায়ী সাহাবারা ﷺ দ্বিতীয়বারের মতো হাবাশায় হিজরত করেন। সবার আগে উসমান ইবন আফফান, তাঁর স্ত্রী নবীকন্যা উম্ম কুলসুমকে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন। তাঁরা চলে গেলে দ্বিতীয় দলটিও মক্কা ত্যাগ করে। কিন্তু মক্কার লোকেরা তাদেরকে এত সহজে ছেড়ে দেয়নি।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমরা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনোদিক দিয়েই মক্কার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল না। তারপরও কুরাইশরা মুসলিমদের পিছু নিলো। আন-নাজ্জাশীর কাছে দূত পাঠালো যেন সে আবিসিনিয়ার মুসলিমদেরকে তাদের হাতে হস্তান্তর করে দেয়। এই মিশনের জন্য মনোনীত করা হয় আমর ইবন আস এবং আবদুল্লাহ ইবন রাবিআ অথবা আমর ইবন রাবিয়াকে । ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র আমর ইবন আস একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ, কুরাইশদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। দেশ-বিদেশের বহু লোকের সাথে তার পরিচয়, রাজাবাদশা এবং বড় বড় লোকদের সাথে তার ওঠাবসা। কূটকৌশল আর কথার লড়াইয়ে তুখোড়। তাই এ কাজের জন্য কুরাইশরা তাকেই বেছে নেয়।

আমর ইবন আস নাজ্জাশীর দরবারে গেলো। কথা ছিল, সে প্রথমে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করবে। তাদের প্রত্যেককে কিছু 'উপহার' দিয়ে–সোজা বাংলায় ঘুষ দিয়ে, তারপর নিজের প্রস্তাবনা তুলবে। তার কথার সারমর্ম হবে এরকম: মক্কার কিছু মূর্খ লোক পালিয়ে তোমাদের দেশে ঢুকেছে, আমরা চাই তোমরা তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও। অর্থাৎ তাঁর পরিকল্পনা ছিল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কথাবার্তা বলে আগেভাগেই সব ঠিক করে রাখবে। এরপর নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাতের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেবে। তাহলে নাজ্জাশীর সাথে যখনই সে মুসলিমদের বিষয়ে কথা তুলবে, তখন এই ঘুষখোর কর্মকর্তারা আমরের পক্ষে সায় দেবে। আমর ঠিক এই কাজটাই করলো। কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সাথে দেখা করে তাদেরকে উপহার দিয়ে কথাবার্তা বলে রাখলো, বললো, 'নাজ্জাশীর সাথে দেখা করার আগেই যদি তোমরা এই (মুসলিম) লোকগুলোকে আমাদের হাতে হস্তান্তর করতে পারো, তাহলে আমি আরও খুশি হবো।' কারণ মুসলিমদের কথা নাজ্জাশীর মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে এই ঝুঁকি নিতে চায় নি। মূলত তারা কুরআনের আয়াতকে ভয় পেতো। তাই চাচ্ছিলো না যে মুসলিমদের সাথে রাজার দেখা হোক।

এরপর আমর গেলো নাজ্জাশীর সাথে দেখা করতে। বললো, 'আমাদের ভেতর কিছু গণ্ডমূর্খ আছে। ওরা আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদের ধর্ম তো ত্যাগ করেছেই, আপনার ধর্মও তারা গ্রহণ করেনি...', এভাবে আরও নানা রঙ্গচঙ্গে উত্তেজক কথা বলে নাজ্জাশীকে বিভ্রান্ত করতে চায়, ক্ষেপিয়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। তারপর বললো, 'আমি চাই আপনি ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন।' এসময় নাজ্জাশীর বাদ বাকি কর্মকর্তারাও আমর ইবন আসকে সমর্থন করছিল।

আন-নাজ্জাশী বললেন, 'না, যারা আমার দেশে আশ্রয় নিয়েছে আমি তাদের কথা না শুনে অন্য কারো হাতে তাদেরকে তুলে দেবো না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ কারণেই মুসলিমদেরকে হাবাশায় হিজরত করতে বলেছিলেন। কেননা তিনি জানতেন আন-নাজ্জাশী একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা, তিনি তাঁর আদর্শকে সব কিছুর ওপরে স্থান দেন।

নাজ্জাশী মুসলিমদের ডেকে পাঠান। তাদেরকে বলা হলো যে, মক্কার আমর ইবন আস

নাজ্জাশীর সাথে দেখা করেছে। এখন নাজ্জাশী তোমাদের সাথে দেখা করতে চান। এ কথা শুনে মুসলিমরা শুরা (পরামর্শ) করে। সিদ্ধান্ত হয় যে, জাফর ইবন আবি তালিব মুসলিমদের মুখপাত্র হবেন। যা সত্যি তিনি সেটাই বলবেন। তারা নাজ্জাশীর দরবারে এলে নাজ্জাশী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোন ধর্মে বিশ্বাসী? তোমরা তোমাদের দেশের লোকেদের ধর্ম ত্যাগ করেছো, আবার আমাদের ধর্মও গ্রহণ করোনি। তোমরা পৃথিবীর কোনো ধর্মই মানছো না। তোমরা কারা?'

জাফর উত্তরে যা বলেন, তাঁর পুরো বক্তব্য উম্মে সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে। আল্লাহর রাসূলের ﷺ চাচাতো ভাই জাফর ﷺ বলেন,

'হে রাজা! আমরা ছিলাম মুশরিক। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত পশুর মাংস খেতাম, আতিথেয়তার থোড়াই-কেয়ার করতাম, অবৈধ কাজকে বৈধ করে নিতাম, একে-অপরের রক্ত ঝরাতাম। আমরা ভালো-মন্দের তোয়াক্কা করতাম না। আর তাই আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে আমাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন নবী প্রেরণ করেছেন, যাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনোকালেই আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর ইবাদতে আর কাউকে শরীক না করতে। তিনি আমাদেরকে আত্মীয়ের হক আদায় করতে আদেশ করেছেন, অতিথিদের সম্মান করতে বলেছেন আর শিখিয়েছেন মহান রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা ও রোজা রাখার কথা তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করার কথা। তিনি আমাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। যেন আমরা আমাদের রবের একত্ববাদের ঘোষণা দিই, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি আর তিনি ছাড়া আর যত মূর্তি, পাথর আছে, যেগুলোকে আমাদের বাপদাদারা পূজা করেছে, সেগুলো ভেঙে ফেলি। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার আদেশ দেন, লোকের আমানত রক্ষা করতে বলেন, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ও আতিথেয়তার নিয়ম মেনে চলতে নির্দেশ দেন। হারাম কাজ, অবৈধ কাজ, একে-অপরের রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি আমাদেরকে সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেন। মিথ্যা বলা, এতিমের সম্পদে ভাগ বসানো, সতী-সাধ্বী নারীর নামে কুৎসা রটাতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের বলেন আল্লাহর ইবাদত করতে, ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করতে।'

এভাবে জাফর ﷺ আন-নাজ্জাশীর কাছে একেবারে অল্প কথায় ইসলামের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। জাফর ﷺ ইসলামের এমন সব সুন্দর শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন, যা সৎ গুণসম্পন্ন যেকোনো লোক ভালো বলে মানতে বাধ্য। তিনি নাজ্জাশীর কাছে এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে, ইসলাম কোনো খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় না, কোনো অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং এর প্রতিটি হুকুম-আহকাম, প্রতিটি শিক্ষাই কল্যাণকর। এর মাঝেই তিনি ইসলামের চারটি স্তম্ভের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল সংক্ষিপ্ত, পরিমিত। সবশেষে জাফর বলেন,

'আর তাই আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি, তাঁকে বিশ্বাস করেছি, তিনি আল্লাহর থেকে যা কিছু দিকনির্দেশনা এনেছেন, সেগুলোকে মেনে চলেছি। আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি, কাউকে তাঁর সাথে শরীক করি না। আল্লাহ তাআলা যেগুলো হারাম করেছেন, আমরাও সেগুলোকে হারাম হিসেবে মানি আর তিনি যেগুলোর অনুমতি দিয়েছেন, আমরাও সেগুলোকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করে নিই। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা আমাদের সাথে সীমালঙ্ঘন করে। আমাদের ওপর অত্যাচার করে। তারা চায় আমাদেরকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে, আমাদেরকে জাহেলী যুগের মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে নিতে। তারা চায় আমাদের দিয়ে সেই সব হীন কাজ করাতে যেগুলোকে আমরা আগে সঠিক মনে করতাম। যখন তারা আমাদের ওপর জোর-জুলুম করতে লাগলো, দীন পালনে একের পর এক বাধার সৃষ্টি করতে শুরু করলো, তখন আমরা আমাদের দেশ ত্যাগ করলাম, অন্য সবার ওপর আপনাকে পছন্দ করলাম। আমাদের আশা ছিল যে আমরা আপনার আতিথেয়তা পাবো, আর আমরা আশা রাখি আপনার এ রাজ্যে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে আসবে না।'[32]

জুলুম-নির্যাতনের কথায় নাজ্জাশীর মন নরম হয়ে পড়ে। তাঁর মনে পড়ে যায় ঈসা ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের সাথেও কী পরিমাণ অন্যায়-অত্যাচার করা হয়েছিল। তিনি নিজেও খুব ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। জাফরের বক্তব্যের সমাপ্তিটা ছিল সবচেয়ে চমৎকার এবং উপযুক্ত। তাঁর সব কথা শেষে নাজ্জাশী প্রশ্ন করলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের কাছে যা এনেছেন, তাঁর কিছু কি তোমরা এনেছো?' তিনি কুরআনের আয়াত শুনতে চাচ্ছিলেন। জাফর ইবন আবি তালিব কুরআনের কয়েকটি আয়াত তাঁকে পড়ে শোনালেন। তিনি কুরআন থেকে যেকোনো অংশই তিলাওয়াত করতে পারতেন, কিন্তু বিচক্ষণ জাফর সূরা মারইয়ামের থেকে পড়তে শুরু করলেন, তিলাওয়াত করলেন প্রথম আটাশটি আয়াত।

> **"কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটা আপনার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি। যখন সে তাঁর রবকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে, সে বলেছিল, হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে, বার্ধক্যে মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। হে আমার রব! আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হই নি। আমি আমার স্বগোত্রের দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, (অপরদিকে) আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে এক জন উত্তরাধিকারি দান করুন।" (সূরা মারইয়াম, ১৯: ১-৬)**

নাজ্জাশী জাফরের তিলাওয়াত শুনে কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি কান্নায় ভিজে গেল। আর তাঁর সব সভাসদরাও এতো করে কাঁদলো যে তাদের বাইবেলগুলো ভিজে গেলো। সেটি ছিল এক আবেগঘন, হৃদয়গ্রাহী ক্বিরাত!

আন-নাজ্জাশী কুরাইশদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, মুসলিমদের হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালেন। কুরাইশ প্রতিনিধিরা চলে গেলো। যাওয়ার সময় আমর ইবন আস হুমকি দিয়ে গেলো যে করেই হোক মুসলিমদের সে মক্কায় ফিরিয়ে আনবে, তাদেরকে শেষ করে ছাড়বে। আমর ইবন আসের সঙ্গী তাকে বললো, 'এমন করে বোলো না, এরা তো তোমাদেরই আত্মীয়। নাজ্জাশী যদি এদেরকে ফিরিয়ে দিতে রাজি না-ই হয়, তাহলে বাড়াবাড়ি না করে দেশে ফিরে যাও।' কিন্তু আমর ইবন আস বললো, 'না, আমি কালই আবার আসবো, রাজাকে শুনিয়ে যাবো যে, মুসলিমরা ঈসাকে দাস বলে।'

আমর ইবন আস পরদিন আবার এসে নাজ্জাশীকে বললো, মুসলিমরা ঈসাকে ﷷ আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করে না, তাঁকে নিছক দাস বলে বিশ্বাস করে। আমর ইবন আস ছিল সে সময় একজন মুশরিক, নবী ঈসাকে নিয়ে আদতে তার এত মাথাব্যথার কিছু নেই। তিনি খোদা হন বা নবী হন বা নিছক একজন দাসই হন–তাতে তার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সে এই বিষয়টাকে পুঁজি করে নিজের ফায়দা হাসিল করতে চাচ্ছিল। তাই সে ফিতনা তৈরি করছিল। আন-নাজ্জাশী এ কথা শুনে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক। তাঁর রাজ্যে এসব নিয়ে কোনো ফিতনা হোক সেটা তাঁর কাম্য ছিল না। তাই তিনি মুসলিমদের আবার ডাকলেন।

মুসলিমরা আগের সিদ্ধান্তেই অটল। তারা পূর্বের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন, যা-ই হোক না কেন, তারা সত্য কথাই বলবেন। এবারও আগের দিনের মত জাফর ইবন আবি তালিবই তাদের মুখপাত্র। দরবারে উপস্থিত হলে আন-নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ঈসা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কী?'

- তিনি আল্লাহর দাস, আল্লাহর নবী, আল্লাহর কালাম, জন্ম নিয়েছিলেন পবিত্র ও কুমারী নারী মারইয়ামের গর্ভে।'

- তাঁর সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য আর আমার বক্তব্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এই কথা শোনার সাথে সাথে বিশপেরা উত্তেজিত হয়ে পড়লো। কীভাবে আন-নাজ্জাশী এই ধরনের কথা বলতে পারলেন! আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান। তারা ঈসাকে ﷷ ঈশ্বর মনে করতো, তাই তারা ঈসার ﷷ ব্যাপারে মুসলিমদের বিশ্বাস শুনে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট, মুসলিমরা যে তাঁকে আল্লাহর দাস মনে করে এটা তারা মানতে পারলো না। আন-নাজ্জাশী উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'তোমরা যা খুশি বলতে পারো। আমি এই মানুষগুলোকে আমার রাজ্যে স্বাধীন ঘোষণা করলাম।'[33]

মক্কার প্রতিনিধিরা আবিসিনিয়ায় এলে আন-নাজ্জাশী প্রথমেই তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা আমার জন্য তোমাদের দেশ থেকে কী এনেছো?' আমর ইবন

---

[33] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৫।

আস বলেছিলেন, 'আমি আপনার জন্য চামড়ার তৈরি কিছু জিনিস এনেছি।' চামড়ার জিনিস ছিল আন-নাজ্জাশীর খুব পছন্দের। কিন্তু সেদিন, উম্মে সালামার ভাষায়, 'সেদিন আমর ইবন আস ও তার সঙ্গীরা অপমানিত হলো, কেননা আন-নাজ্জাশী তাদের বের করে দেন, এমনকি তাদের দেওয়া উপহারগুলিও ফেরত দেন।' আমর ইবন আসের সাথে আন-নাজ্জাশীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু আদর্শের প্রশ্নে তিনি বন্ধুত্বকেও প্রশ্রয় দেননি, বরং সত্যের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন।

আবিসিনিয়ার হিজরত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

এক. যেহেতু মুসলিমদের ওপর দ্বীন মেনে চলার কারণে শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছিল, তাই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা মক্কা থেকে পালিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের অনুমতি দেন। ইমাম হাজম বলেন, 'যখন মুসলিমদের সংখ্যা আর তাদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল, তখন আল্লাহ তাদের হিজরতের অনুমতি দেন।'

দুই. অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা সবার থাকে না। চাপের মুখে কিছু মানুষ তাদের ঈমান ধরে রাখতে পারে না। বিলালের মতো মানসিক শক্তি সবার থাকে না, খাব্বাব ইবন আরাতের মতো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সবাই যেতে পারে না। তাই কেউ যদি কোথাও তার দ্বীন নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভয় করে, তাহলে তার উচিত অন্য কোথাও চলে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'একজন ঈমানদারের পক্ষে এমন সাধ্যতীত কষ্ট নিজের ওপর চাপিয়ে নেওয়া উচিত নয়, যার কারণে তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়।' যদি কারো জন্য কোনোকিছুর ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে থাকে, তখন তার নিজেকে সেই পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না।

একবার এক লোক ডিমের আকারের এক খণ্ড খাঁটি সোনা নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে হাজির হয়ে বললেন, 'এটা আমার পক্ষ থেকে সাদাকাহ, আমার সহায়-সম্পদ বলতে এটুকুই আছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ মন খারাপ করে বললেন, 'তোমাদের কেউ কেউ তাদের সমস্ত সম্পদ সাদাকাহ করে ফেলো, তারপর বিপদে পড়ে আবার আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ চাননি এই মানুষটা তার সমস্ত দান করে পুরো নিঃস্ব হয়ে পড়ুক, বিপদে পড়ে সাহায্যের জন্য কারো কাছে হাত পাতুক। সামর্থ্য বুঝে দান করা উচিত। কিন্তু সীরাহ থেকে এটাও দেখা যায়, আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه একবার তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে দান করে দিয়েছিলেন আর রাসূল ﷺ সেই কাজের প্রশংসা করেন। দুটো একই রকম কাজের প্রতি তাঁর আচরণ ভিন্ন হওয়ার কারণ হলো, রাসূল ﷺ জানতেন যে, সবকিছু দান করে দিলেও আবু বকরের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা আছে যা ওই লোকের ছিল না। আবু বকর رضي الله عنه তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করে দেওয়ার পরেও কখনই ভিক্ষা চাওয়ার মতো নীচে নামবেন না।

সবাই আবু বকরের মতো নন। তাই যে কারো উচিত নয় নিজেদের এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেওয়া যা সামাল দেওয়ার সামর্থ্য তারা রাখে না।

তিন. হিজরত প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ কুতুবের একটা মন্তব্য আছে। তিনি বলেন, 'এটা বলা সমীচীন হবে না যে মুহাজিরদের সকলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে হিজরত করেন। কেননা এই মুহাজিরদের মধ্যে খুব প্রভাবশালী পরিবার থেকে আগত ও বিপুল সম্পদের মালিক অনেক সাহাবী ﵃ ছিলেন।' তাদের বেশিরভাগই ছিলেন কুরাইশ বংশের। জাফর ইবন আবি তালিব একজন কুরাইশ। আর তাদের কিছুসংখ্যক ছিলেন অল্পবয়স্ক যুবক, তারা নবী মুহাম্মাদকে ﷺ নিরাপত্তা দিতেন। তাদের কয়েকজন হলেন যুবাইর ইবন আওয়াম, আবদুর রহমান ইবন আউফ, উসমান ইবন আফফান প্রমুখ। মুহাজিরদের মধ্যে কুরাইশের অভিজাত পরিবারের কয়েকজন নারীও ছিলেন। যেমন উম্ম হাবিবা, তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। কুরাইশ নেতার কন্যা হিসেবে তিনি কখনও মক্কায় নির্যাতনের শিকার হননি, কেউ তার গায়ে স্পর্শ পর্যন্ত করার সাহস করেনি, তবু তিনি হিজরত করেছিলেন। কিন্তু কেন?

কারণ এই হিজরতের ঘটনা কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী পরিবারদের ধর্মীয় ও সামাজিক ভিত্তিতে ঝাঁকুনি দেয়। তাদের চোখের সামনে দিয়ে তাদের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও সম্ভ্রান্ত ছেলেমেয়েরা বিবেক ও ধর্মীয় কারণে আপন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর গোত্রীয় দেশকে পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছিল। কুরাইশ রাজবংশের জন্য এর চেয়ে বড় অপমান কিছু হতে পারে না। এই ঘটনার কারণে কুরাইশরা খুব বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়ে। আরবে কুরাইশদের উঁচু অবস্থানের কারণ ছিল তাদের উচ্চ মর্যাদা, মূল্যবোধ ও কাবার অভিভাবকত্ব, এ কারণে নয় যে তারা সামরিকভাবে শক্তিশালী। তাই মানুষ যখন দেখল সম্ভ্রান্ত লোকজন তাদের জান-মাল ও দ্বীনের নিরাপত্তার জন্য মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বিষয়টা কুরাইশদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো।

চার. আরেকজন গ্রন্থকার মুনির আল গাদওয়ানের মতে, রাসূল ﷺ মক্কার বাইরে দ্বিতীয় আরেকটি ঘাঁটি বানাতে চেয়েছিলেন। যদি মক্কায় কিছু ঘটে যায়, তাহলে অন্য কোথাও যেন মুসলিমরা তাদের দ্বীন নিয়ে টিকে থাকতে পারে। তাই যখন মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে গেলো, তখন থেকে মুসলিমরা দু'টো দলে আলাদা থাকতে শুরু করে। এক দল মক্কায় থেকে যায় আর আরেক দল হিজরত করে আবিসিনিয়ায়।

আল-হাবশার হিজরত ছিল এমন একটা হিজরত যেখানে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠের মাঝে মুসলিম সংখ্যালঘুরা বসবাস করে। এটি ছিল একটা খ্রিস্টান-প্রধান দেশ। কিন্তু পশ্চিমের ইতিহাসে দ্বিতীয় আর কোনো আন-নাজ্জাশীর দেখা মেলেনি। পশ্চিমে তাঁর মতো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্ব আর কখনো দেখা যায়নি। হয়ত এমন একটা সময় ছিল যখন পশ্চিমের আইন ও সংবিধান আন-নাজ্জাশীর ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি ছিল, কিন্তু বর্তমানকালে পরিস্থিতি প্রায় পুরোটাই বদলে গেছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আল-হাবাশা এবং মক্কীযুগ নিয়ে খুব বেশি বর্ণনা নেই। এর কারণ হলো:

১। মদীনায় হিজরতের আগে হাদীসের দলীল রাখা মুসলিমদের জন্য বৈধ ছিল না। কারণ, মুহাম্মাদ ﷺ চাইতেন না তাঁর কথাগুলো কুরআনের বাণীর সাথে মিশে যাক।

২। পূর্ববর্তী আলিমরা মদীনার ব্যাপারে যেরকম আগ্রহী ছিলেন সেই তুলনায় মক্কার ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহী ছিলেন না। কেননা ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত আইন কানুন বিধি বিধানের বেশিরভাগই তারা মাদানী জীবন থেকে শিখেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ মক্কী জীবনের প্রথম তের বছরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বেশি দরকার। কারণ আজকের বিশ্বে মুসলিমদের বড় একটা সংখ্যা সংখ্যালঘুদের মতোই বাস করছে। সংখ্যালঘুদের নিয়ে অনেক ফিকহ আছে যেগুলো মক্কী জীবনের প্রথম তের বছর থেকে শেখা প্রয়োজন।

কেন আবিসিনিয়া? ইরাক বা সিরিয়া কেন নয়?

প্রথমত, কারণ, রাসূল ﷺ নিজেই বলেছেন, 'আবিসিনিয়ায় যাও, সেখানে এক রাজা আছেন যিনি কাউকে অত্যাচার করেন না।' সুতরাং মুসলিমদের আল-হাবাশা যাওয়ার পিছনে একটা প্রধান কারণ ছিল আন-নাজ্জাশীর ন্যায়পরায়ণতা।

দ্বিতীয়ত, আল-হাবশার সাথে আরবদের ভালো সম্পর্ক ছিল। কুরাইশরা আবিসিনিয়ায় ব্যবসা করতো, তাই আরবদের সাথে আবিসিনিয়ার ইতিমধ্যে একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আবিসিনিয়ার সংস্কৃতির সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক আগেই পরিচিত ছিলেন, কেননা তাঁর প্রথম ধাত্রী উম্মে আইমান ছিলেন আল-হাবাশার। তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ যত্ন নিতেন আর তাঁকে বুকের দুধ খাওয়াতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, উম্মে আইমান রাসূলের ﷺ সামনে কিছু খাবার পরিবেশন করেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কী?' উম্মে আইমান জবাব দেন, 'এটা একটা আবিসিনিয়ান খাবার।'

উম্মে আইমানের সংস্কৃতি আর ভাষা ছিল আবিসিনিয়ান। তাঁর উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ আবিসিনিয়ান। ইবন সাদের মতে, তিনি "সালাম ইলাহি আলাইকুম" বলতে চাইলে সেটা "সালাম উল্লাহি আলাইকুম" হয়ে যেতো। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শুধু 'সালাম' বলতে বলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ পুরো জীবনে উম্মে আইমান তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর পালক পুত্র যায়িদ ইবন হারিসার সাথে বিয়ে দেন।

তৃতীয়ত, আবিসিনিয়ানরা ছিল খ্রিস্টান আর মুসলিমরা তাদেরকে কুরাইশ মূর্তিপূজক বা পারস্যের অগ্নিপূজারীদের তুলনায় খ্রিস্টানদেরকে আপন মনে করতো।

চতুর্থত, আন-নাজ্জাশী ও জাফরের যোগাযোগ করার ভাষা ছিল সম্ভবত আরবী। কিছু

বর্ণনায় এসেছে, আন-নাজ্জাশী হিজাজে কিছু বছর কাটিয়ে ছিলেন, তাই তিনি আরবীতে কথা বলতে পারতেন। যদিও তিনি আরবে থাকতেন না কিন্তু আরব ও আবিসিনিয়ানদের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে এটা অস্বাভাবিক নয় যে, আবিসিনিয়ানরা আরবী বলতে বা বুঝতে পারতো। যেহেতু নাজ্জাশী কুরআন তিলাওয়াতের সময় কুরআনের বাণী শুনে কাঁদছিলেন, তার মানে নিশ্চয়ই তিনি আরবী আয়াতের অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। একজন দোভাষী যদি আয়াতের অনুবাদ করে দিত তাহলে সেটা তার অন্তরে এতটা প্রভাব ফেলতে পারতো না।

আন-নাজ্জাশী মুসলিম হয়েছিলেন। তার ইসলামে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা সবার কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। তিনি জাফর ইবন আবি তালিব থেকে গোপনে ইসলাম শিখতেন। যখন আন-নাজ্জাশী মারা গেলেন, বুখারিতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আজকের দিনে আবিসিনিয়ার একজন পুণ্যবান মানুষ মারা গেছেন, আসো আমরা তাঁর জন্য দুআ করি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য জানাজার সালাত পড়েছিলেন। আন-নাজ্জাশীর মৃত্যুর সঠিক দিন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন, জিবরীল ﷺ তাঁকে এই মৃত্যুর ব্যাপারে জানিয়েছিলেন, যা প্রমাণ করে এটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর কাছে আন-নাজ্জাশীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।'

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমদের থেকে কী শেখার আছে

১। সাহাবাদের ﷺ মাঝে ছিল অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা। তারা তাদের নীতির উপর অটল ছিলেন। আদর্শের প্রশ্নে তারা কোনো আপস করেননি, যদিও তারা জানতেন এর ফলে তাদের বিপদ হতে পারে। আন-নাজ্জাশীর কাছে গিয়ে তাঁকে বলেন যে, তারা ঈসাকে ﷺ আল্লাহর বান্দা বলেই বিশ্বাস করেন, আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) হিসেবে নয়। আদর্শবান, ব্যক্তিত্বশীল মানুষের পক্ষে এটাই শোভা পায়। ব্যক্তিগত স্বার্থের আশায় তারা সত্যকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে না। সাবাহীরা দ্বীনের আদর্শ বুকে করে চলতেন, তারা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা কিছুই হোক–তারা সত্যটাই বলবেন। তাদের কাছে জীবনের চেয়েও দ্বীন ইসলামের মূল্য অনেক বেশি।

২। আবিসিনিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতির যে রীতিগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলো সাহাবীরা ﷺ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেগুলো গ্রহণ করেছেন। সে সময়ে আবিসিনিয়ানদের মধ্যে নাজ্জাশীকে সিজদা করা খুবই সাধারণ ও প্রচলিত ব্যাপার–যে লোকই তার সাথে দেখা করতে যাবে, সে-ই নাজ্জাশীকে সিজদা দিয়ে সম্মান জানাবে। আমর ইবন আস নাজ্জাশীকে বলে রেখেছিল, 'দেখবেন, এরা যখন আপনার সাথে দেখা করতে আসবে, তখন আপনাকে সিজদা করবে না।' আমর ইবন আস সঠিক বলেছিল, মুসলিমরা নাজ্জাশীর সাথে দেখা করতে এসে সিজদা করেন নি। আন-নাজ্জাশী খুব রেগে গেলেন, তাদের জিজ্ঞাসা করলেন সবার মতো তারা কেন সিজদা করলো না। তারা জবাব দিলেন, 'আমরা

আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করি না।’

এখন মুসলিমরা সামাজিকতা ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে বিভিন্ন হারাম ও বিদআতে অনায়াসে লিপ্ত হয়। অথচ আবিসিনিয়ার সাহাবীরা ﷺ ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে থেকেও ইসলাম নিয়ে সমঝোতা করেন নি, তারা অত্যাচারিত হয়েছেন, নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন, কিন্তু নবীজির ﷺ শিক্ষা ও সুন্নাহ থেকে তাদেরকে কেউ সরাতে পারে নি। সবাই করছে, আমরা না করলে কেমন দেখায় – এমনটা ভেবে সমাজের ‘সামাজিকতা’, ‘প্রচলিত প্রথা’ মেনে নেননি। একজন মুসলিমের এই শিক্ষাটাই বাস্তবে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

৩। আবিসিনিয়ার মুসলিমরা সংঘবদ্ধ ছিলেন এবং একক নেতার অধীনে ছিলেন। জাফর ইবন আবি তালিব এই দলটির নেতা। এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়, মুসলিমরা যেখানেই থাকুক তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। ইসলাম কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয় নয়, নিছক নামাজ-রোজা-হাজ্জ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ আধ্যাত্মিকতাসর্বস্ব ধর্ম নয় যে, যার যার খুশিমত ধর্ম পালন করবে। ইসলামের অনেক ইবাদতই সমবেতভাবে করতে হয় যা থেকে জামা’আতবদ্ধ থাকার গুরুত্ব বোঝা যায়।

৪। আবিসিনিয়ায় এই হিজরতের ঘটনা থেকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ ও সমাজের সাথে তাদের মেলামেশার ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। দ্বীন ইসলামে মুসলিম নারীদের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দাবি রাখে। প্রথম মুসলিম ছিলেন একজন নারী এবং প্রথম শহীদও ছিলেন একজন নারী। জিহাদের ময়দান, জামা’আতে, শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণে তাদের ভূমিকা ছিল। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন, যখন বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি–এই দুই চরমপন্থা চলে আসে। এক পক্ষের মানুষ মনে করে, নারী-পুরুষের মেলামেশা এবং হাসি-তামাশা-গল্প-আড্ডা-গান-বাজনায় কোনো সমস্যা নেই। আবার অন্য পক্ষের মানুষ মনে করে, নারীদের গলার স্বরও কারো সামনে প্রকাশ করা যাবে না। একারণে, নবীজির ﷺ সময়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃতির উপর আলোকপাত করা জরুরি।

এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে একটি ঘটনা বেশ উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি হাবাশায় হিজরতের সাথে সম্পর্কিত। সপ্তম হিজরীতে যখন মুসলিমরা আবিসিনিয়া থেকে মদীনাতে চলে আসেন, তখন জাফর ইবন আবি তালিবের স্ত্রী আসমা বিনত উমাইস ﷺ একদিন হাফসার ﷺ সাথে দেখা করতে তাঁর ঘরে যান। হাফসা ﷺ ছিলেন উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ মেয়ে, রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রী। উমার ইবন খাত্তাবও ﷺ তখন তাঁর মেয়ের সাথে দেখা করতে এলেন। ঢুকে দেখলেন সেখানে একজন মহিলা বসে আছে, মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন,

- ইনি কে?

- উনি হচ্ছেন আসমা বিনত উমাইস, হাফসা ﷺ উত্তর দিলেন।

- আচ্ছা, উনি কি সেই আবিসিনীয় মহিলা যিনি সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছেন, উমার এটা জিজ্ঞেস করলেন কারণ আবিসিনিয়া থেকে মদীনা আসতে সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়।

- হ্যাঁ, উনিই সেই মহিলা।

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ এরপর আসমাকে বললেন, 'আমরা আপনাদের আগে হিজরত করেছি তাই আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর আপনাদের থেকে বেশি হকদার।'

এই কথায় আসমা কিছুটা রেগে গেলেন। পাল্টা জবাব দিয়ে বললেন, 'না, তা হতে পারে না, আপনারা আমাদের চাইতে রাসূলের ﷺ বেশি ঘনিষ্ঠ নন। আপনারা তো আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে থাকতেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের খাইয়ে দিতেন, মূর্খদের শিক্ষা দিতেন। আর আমরা ছিলাম বহুদূরে, অপ্রিয় এক রাজ্যে। আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যাচ্ছি, আপনি যে কথা বললেন, সেটা আমি তাঁকে বলবো। দেখি উনি কী বলেন, আমি কিছুই বাড়িয়ে-চড়িয়ে বলব না।'

উমারের ﷺ কথা আসমার ﷺ পছন্দ হলো না। কেননা তাঁরা আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে দূরে থেকেছেন, নবীজি ﷺ তাদের আত্মীয়ের চেয়েও বেশি আপন, তাদের আশ্রয়স্থল, তাদের অভিভাবক, তাঁর থেকে দূরে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর ছিল। অন্যদিকে উমার এবং অন্যরা অন্তত রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গটা হলেও পেয়েছেন যা থেকে তারা বঞ্চিত ছিলেন। এই বিষয়ের দফারফা করতে তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেলেন এবং বললেন, 'উমার আমাকে এই এই বলেছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি উত্তরে কী বলেছো?' আসমা ﷺ তাঁর দেওয়া উত্তরটি রাসূলুল্লাহকে ﷺ শোনালেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন ঠিক তাঁর মনের কথাটি বললেন। 'তুমি ঠিকই বলেছো আসমা, আমার প্রতি উমার আর তার সঙ্গীদের হক্ব তোমাদের চেয়ে বেশি নয়। তারা একটি হিজরতের পুরস্কার পাবে আর তোমরা পাবে দুটি হিজরতের পুরস্কার।'

আসমা ﷺ অত্যধিক খুশি হয়ে গেলেন, খুশি হলেন আবিসিনিয়ার সাহাবীরা ﷺ। রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাটি যেন তাদের মন ভরিয়ে দিল। কতোটা খুশি হয়েছিলেন তারা? আসমা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই হাদীসটি বলার পর থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবারা ﷺ দলে দলে আমার কাছে আসতেন শুধুমাত্র এই একটি হাদীস শিখতে। দুনিয়াতে এই হাদীসের চেয়ে প্রিয় তাদের আর কিছুই ছিল না।'

এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে উমার ইবন খাত্তাব ﷺ একজন মহিলার সাথে কথা বলছেন। তাদের মধ্যকার কথোপকথন ছিল সরলসোজা, সাদাসিধে, 'ফরমাল'। এছাড়াও, আসমা পরবর্তীতে অন্যান্য পুরুষ সাহাবাদেরকে ﷺ এই হাদীস শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন ছিল চটুলতাবিবর্জিত, শিষ্টাচার সম্বলিত, সোজাসাপ্টা ও মার্জিত। তারা তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সর্বদা একটি গাম্ভীর্য

বজায় রাখতেন। সস্তা কৌতুক বা হাসি-তামাশা করতেন না। পারস্পরিক সম্মান ও দূরত্ব বজায় রেখে পরস্পর কথা বলতেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী আরেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উম্মে হাবিবা ﷺ। তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। মক্কার বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে হাবাশায় হিজরত করা ছিল তাঁর জন্য একটা বড় ত্যাগস্বীকার। আবিসিনিয়া তার কাছে অচেনা, অজানা এক রাজ্য, তবু তিনি দ্বীনের জন্য সব ছেড়েছুঁড়ে সেখানে হিজরত করেন। স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশ হিজরতের পর মুরতাদ হয়ে গেলো। ইসলামের পরিবর্তে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলো। উবায়দুল্লাহর জীবনে কখনোই তেমন স্থিরতা আসে নি, একবার এই ধর্ম, আরেকবার ওই ধর্ম, এভাবে তার জীবনের অনেকটা সময় পার হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর কিছুটা স্থিরতা এলেও শেষপর্যন্ত সে হাবাশা গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়। একজন মহিলার সবচেয়ে আপনজন তার স্বামী, স্বামীর দ্বারাই স্ত্রীরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। উম্মে হাবিবার ﷺ স্বামী মুরতাদ হয়ে যাওয়ায় তাকে কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজের দ্বীনকে বিসর্জন দেন নি। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়–সেটাই ছিল তাদের সংসারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। উম্মে হাবিবা ﷺ ছিলেন দৃঢ়চেতা, মানসিকভাবে শক্ত-সমর্থ-মজবুত একজন ব্যক্তিত্ব। শত বাধা সত্ত্বেও তিনি তাঁর দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পেরেছিলেন।

হিজরতের বিধান

১। যদি কোনো মুসলিম তার দেশে ইসলামের আবশ্যকীয় আহকাম যেমন সালাত, সাওম ইত্যাদি পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে সামর্থ্য থাকলে তার অন্য কোথাও চলে যাওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়।

২। যদি এমন হয় যে, কোনো দেশে বাস করতে গিয়ে একজন মুসলিমের এমন সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যা তার জন্য কষ্টকর, তখন সে চাইলে তার যন্ত্রণা লাঘব করার উদ্দেশ্যে অন্য ইসলামি ভূমিতে হিজরত করতে পারে, তবে সেটি বাধ্যতামূলক নয়।

৩। কোনো মুসলিমের হিজরতের কারণে যদি সে অঞ্চলে ইসলামের কোনো আনুষ্ঠানিক হুকুম বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা ঘটে–যার দায়িত্ব সে ছাড়া অন্য কেউ পালনের ক্ষমতা রাখে না, তাহলে তার জন্য সে অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করা নিষিদ্ধ।

অমুসলিম দেশে বসবাস করার ব্যাপারে বিধান

মুসলিম আলিমগণ এই ব্যাপারে একমত যে, কোনো মুসলিমের জন্য অমুসলিমদের মাঝে তাদের সমাজে বসবাস করা বৈধ নয়। একটি হাদীস এই ব্যাপারটি স্পষ্ট করে

বলছে, *'আমি সেই মুসলিমদের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নিব না, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে।'*

এটি হচ্ছে সাধারণ বিধান, তবে এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। আলিমরা সেসব নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন তারা বলেছেন, যদি কোনো মুসলিম অমুসলিম দেশে ইসলাম প্রচার করে এবং সেখানে স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে পারে, সেক্ষেত্রে তার জন্য অমুসলিম দেশে থাকা বৈধ হতে পারে। এছাড়া ব্যবসা অথবা জ্ঞানার্জনের জন্য অমুসলিম দেশে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করা যায়। সাধারণভাবে দাওয়াতী কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকা ছাড়া অমুসলিম পরিবেশে বসবাস করা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়, এর অন্যথা হলে গুনাহ হবে। তবে দাওয়াহ'র মানে এই নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই কাজ করতে হবে। দাওয়াহর অর্থ ব্যাপক–যেকোনো কাজ, যেটা ইসলামের বার্তাকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে, সেটাই দাওয়াহ। সেটা হতে পারে ত্রাণ, দান-সাদাক্বাহ, দাওয়াহ-সংক্রান্ত কাজকর্ম ইত্যাদি, মুসলিমদের শিক্ষা দেওয়াও দাওয়াতী কাজ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

মক্কায় সাহাবীদের ﷺ সাহসিকতার দৃষ্টান্ত

উসমান ইবন মাযউন ﷺ

তিনি ছিলেন একজন মুহাজির। প্রথম হিজরতের পর তিনি আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসতে চান। যেহেতু তিনি মক্কা ছেড়ে হিজরত করেছিলেন, তাই কারো পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস ব্যতীত মক্কায় নিরাপদে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। ওয়ালীদ ইবন মুগীরা তাঁকে নিরাপত্তা দান করলো। সে ছিল মক্কার বয়স্ক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন। ওয়ালিদ ইবন মুগিরার নিরাপত্তায় উসমান ইবন মাযউন মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কায় ফিরে এসে আবিষ্কার করেন যে,. তিনি ছাড়া অন্য সব মুসলিমরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে! নিজের নিরাপদ জীবন তাঁকে এতটুকু খুশি করলো না, মজলুম মুসলিমরা তাঁকে ঈর্ষান্বিত করে তুললো! তাঁর কাছে মনে হলো তিনি বাদে অন্য সবার গুনাহ মাফ হয়ে যাচ্ছে আর তিনি কিছুই করতে পারছেন না। তাই তিনি ওয়ালিদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন যে তাঁর নিরাপত্তার কোনো দরকার নাই, তিনি সেটা ফিরিয়ে দিতে এসেছেন। ওয়ালিদ বললেন,

- তুমি কেন এটা করছো?'

- আমি শুধু আল্লাহর নিরাপত্তা চাই, তোমার নিরাপত্তা চাই না।

- ঠিক আছে, যেহেতু আমি প্রকাশ্যে তোমাকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছি, সেহেতু এই নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণাও প্রকাশ্যেই দিতে হবে।

তারা কাবাঘরে গেলেন। আল-ওয়ালিদ ইবন মুগীরা বললো, 'উসমান ইবন মাযউন আমার নিরাপত্তা আর চায় না, সে ফিরিয়ে দিয়েছে।' উসমান ইবন মাযউন বললেন,

'হ্যাঁ, আমি ওয়ালিদ ইবন মুগীরাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সৎ লোক হিসেবে পেয়েছি, কিন্তু আমি একমাত্র আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে আসতে চাই।'

কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো উসমান ইবন মাযউন একটা জনসমাবেশে এসেছেন। সেখানে তখন আরবের বিখ্যাত কবি লাবীদ তার একটা কবিতা আবৃত্তি করছিল, *'আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই অসার!'* উসমান তাল মেলালেন, বললেন, *'ঠিক! ঠিক!'* ওই সমাবেশে অনেক লোক জমা হয়েছিল। কবি বলে চললো, *'আর সব সুখ তো ম্লান হয়ে যাবে!'* উসমান তার কবিতার মাঝপথে বাধা দিয়ে বললেন, *'না না, তুমি ভুল বলেছো, জান্নাতের সুখ কখনই ম্লান হবে না!'*

কবি লাবীদ একটা ধাক্কা খেল। সে তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, তার শ্রোতাদের মধ্যে কেউ এভাবে তার ভুল ধরিয়ে দেবে! কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বললো, 'কে এই লোক? তোমাদেরকে এভাবে হেয় করার সাহস সে কোথা থেকে পেল?' শ্রোতাদের মধ্যে কেউ একজন বললো, 'বাদ দিন, সে হচ্ছে এক মাথামোটা, মুহাম্মাদের ধর্ম অনুসরণ করে। এর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না।' উসমান ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন! তিনি এই কথার জবাব দিয়ে বসলেন। ব্যস, শুরু হয়ে গেলো তাদের মধ্যে হাতাহাতি-মারামারি। এক পর্যায়ে কুরাইশরা উসমানের চোখে ঘুষি মেরে বসে।

আল-ওয়ালিদ ইবন মুগীরা এই ঘটনা দেখলো। উসমানের কাছে এসে বললো,

– 'কী দরকার ছিল তোমার চোখের বারোটা বাজানোর? তুমি তো আমার নিরাপত্তার মধ্যেই ছিলে, কেন সেটা ফিরিয়ে দিতে গেলে?'

– ঈমানে বলীয়ান উসমান ইবন মাযউন তেজদীপ্ত গলায় বললেন,

– না, বিষয়টা তেমন না। আল্লাহর শপথ, আমি তো চাই আমার ভালো চোখটিও যদি আঘাত পাওয়া চোখের মতো হতো! সত্যি বলতে কী, আমি এমন একজনের নিরাপত্তায় আছি যিনি তোমার চেয়ে শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান।

– তুমি কি আমার নিরাপত্তার মধ্যে ফিরে আসতে চাও?

– নাহ, আমার প্রয়োজন নেই।[34]

একজন কাফের বা মুশরিক কিছু হারালে সেটা ক্ষতির খাতায় ফেলে দেয়, কষ্ট-ব্যথা-বেদনাকে ক্ষতি বাদে অন্য কোনো নজরে দেখার ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু একই ঘটনা একজন মুসলিমের জন্য সুসংবাদ। মার খেয়ে, ফোলা চোখ নিয়েও উসমান ইবন মাযউন ভাবছেন, ব্যথার বিনিময়ে কিছু গুনাহ মাফ হলো। এটাই মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গী।

---

[34] সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪।

আবু বকর ﷺ

আবু বকর সিদ্দিক ﷺ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেননি। মক্কায় তাঁকে বেশ কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল। তাই তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। আবু বকর ﷺ মক্কা ছেড়ে ইয়েমেন গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি সায়্যিদ আল হাবিশ গোত্রের কাছে যান। আল-হাবিশ মক্কার নিকটবর্তী একটা গোত্র। আবু বকর ﷺ সেখানে ইবনে দুগায়নার সাথে দেখা করলেন। ইবন দুগায়না তাকে বললো,

- আবু বকর, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

- আমার স্বজাতির লোকেরা আমাকে কষ্ট দিয়েছে, খুব খারাপভাবে আঘাত করেছে, একারণে আমি চলে আসতে বাধ্য হয়েছি।

- তোমার মতো একজন মানুষ তো তাঁর স্বজাতির একটা সম্পদ। এভাবে তো তুমি চলে আসতে পার না। তুমি দুঃখীদের সাহায্য করো, গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। তুমি মক্কায় ফিরে যাও, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দেব।

তিনি আবু বকরকে ﷺ সাথে করে মক্কায় আসেন এবং মক্কার সমস্ত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আবু বকর আমার নিরাপত্তার মধ্যে আছেন। আমি বুঝি না এরকম একজন মানুষকে তোমরা কীভাবে দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও? সে তোমাদের সম্পদ, তোমরা কীভাবে তাঁর মতো একটা মানুষকে তাড়িয়ে দিতে পারলে? আজকে থেকে তিনি এখানে থাকবেন এবং আমার নিরাপত্তার অধীনে থাকবেন।'

কুরাইশের লোকেরা ইবন দুগায়নার কাছে এসে বললো, 'ঠিক আছে আমরা তোমার নিরাপত্তা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমরা চাই না আবু বকর প্রকাশ্যে ইবাদত করুক। সুতরাং দয়া করে এটা নিশ্চিত করো যে, সে এই কাজ করবে না।' ইবন দুগায়না আবু বকরের ﷺ কাছে এসে বললো, 'তোমার স্বজাতির লোকেরা চায় না যে, তুমি তাদের কষ্ট দাও। সুতরাং প্রকাশ্যে সালাত আদায় কোরো না।' আগে আবু বকর ﷺ ঘরের বাইরে সবার সামনে ইবাদত করতেন। আ'ইশা ﷺ বলেন, 'আমার বাবা খুবই নরম মনের একজন মানুষ। কুরআন তিলাওয়াত করার সময় তিনি খুব কাঁদতেন।' নারী-পুরুষ-বালক সবাইকে আবু বকরের খুশু আকৃষ্ট করতো। এটা দেখে কুরাইশরা ক্ষেপে যায়। তাদের আশঙ্কা–আবু বকরের ﷺ প্রকাশ্য সালাত আদায় দেখে লোকেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে।

তাই ইবন দুগায়না আবু বকরকে ﷺ প্রকাশ্যে ইবাদত করতে মানা করেন। আবু বকর ﷺ রাজি হন। কিছুদিন আবু বকর ﷺ তাঁর বাড়িতে গোপনে ইবাদত করেন। কিন্তু এরপর তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে। তিনি তাঁর বাড়ির উঠোনে একটা মুসল্লা বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই যদিও তিনি বাড়ির ভিতরেই ইবাদত করছিলেন, কিন্তু

লোকজন সেটা বাইরে থেকে দেখতে পেত। আগের সেই সমস্যা আবার ফিরে এল। লোকজন জড়ো হয়ে তাঁর ইবাদত দেখতে লাগল। কুরাইশরা রেগেমেগে আবার ইবন দুগায়নার কাছে গেলো। বললো, 'আমরা তোমাকে বলেছি, আমরা চাই না সে প্রকাশ্যে ইবাদত করুক, কিন্তু সে তো সেটাই করছে!' ইবন দুগায়না আবু বকরের কাছে গিয়ে এ কথা তুললে আবু বকর ﷺ বললেন, 'থাক, আমি আপনার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার এর প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তায় থাকব।' শেষ পর্যন্ত তিনি ইবন দুগায়নার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিলেন।[35]

আবু বকরের ﷺ কাহিনি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। যখন ইবন দুগায়না তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, কেন তিনি দেশান্তরিত হচ্ছেন, তখন আবু বকর ﷺ বলেছিলেন, 'আমি আমার রবের ইবাদত করার জন্য হিজরত করতে চাই।' আবু বকর ﷺ হিজরত করেছিলেন শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, ব্যবসা বা অন্য কোনো দুনিয়াবী কারণে ভ্রমণ করেননি।

২। ইবন দুগায়না আবু বকর ﷺ সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা রাখতেন। পুণ্যবান মানুষ হিসেবে আবু বকরের বিশেষ খ্যাতি ছিল, তিনি অভাবীদের যত্ন নিতেন, দরিদ্রদের দান করতেন, সত্যের পক্ষ নিতেন। পৃথিবীর যেকোনো বিবেকবান মানুষ আবু বকরের গুণগুলোর কদর করতে বাধ্য। মুসলিমদের চরিত্র এমনই হওয়া উচিত। তারা যে দেশেরই হোক না কেন, তাদের মধ্যে এমন কিছু গুণ থাকা চাই যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে কদর করবে। এ সমস্ত গুণাবলির কারণেই ইবন দুগায়না আবু বকর সিদ্দিককে ﷺ নিরাপত্তার প্রস্তাব দিয়েছিল।

৩। আবু বকরের সালাত ছিল এক প্রকারের দাওয়াহ। প্রকাশ্যে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা এক ধরনের দাওয়াহ। যেমন হাজ্জ, সালাত, সাওম ইত্যাদি প্রকাশ্যে করা। মানুষকে দেখতে দেওয়া উচিত মুসলিমরা কীভাবে ইসলাম পালন করে। কুরাইশরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এ কারণেই। তারা জানত যে, প্রকাশ্যে ইবাদত করলে সেটা মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করবে। কেননা আল্লাহ তাআলা ইসলামের যেসব ইবাদাত ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হুকুম দিয়েছেন সেগুলো অনন্য, হৃদয়গ্রাহী।

৪। ইসলামের বার্তাকে প্রকাশ করে দেওয়া। মুসলিমরা যদি গোপনে ইবাদত করে তাতে আল্লাহর দুশমনদের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু ঘটতে দেখলেই তারা প্রতিরোধ করবে। তাই ঠিক সেটাই মুসলিমদের করা উচিত। এমন কাজ করা উচিত যাতে মানুষকে ভালো জিনিস দ্বারা আকৃষ্ট করা যায় যেন তারা মুসলিম হয়। আর ভালো অন্তর ভালো জিনিস দ্বারাই আকৃষ্ট হয়।

---

[35] সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭।

হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব ﷺ

হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব ﷺ ছিলেন একজন শিকারী। প্রায়ই মরুভূমিতে শিকারে বেরিয়ে পড়তেন আর ফিরে এসে অন্যদের কাছে শোনাতেন অভিযানের রোমহর্ষক সব কাহিনি। একদিন তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। সে সুযোগে আবু জাহেল রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে তাঁকে অভিশাপ দিতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরুত্তর। তিনি ﷺ সাধারণত মূর্খদের কথার জবাব দিতেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে মূর্খদের সাথে তর্ক না করার আদেশ করেছেন।

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পড়ে থাকা একজন মুসলিমের পক্ষে সাজে না। যে কথায় সাড়া দিতে গিয়ে দাওয়াহ আর দাওয়াহ থাকে না, ব্যক্তিগত রেষারেষিতে পরিণত হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, ইসলামের শত্রুরা ইসলামের ভুল-ত্রুটি খুঁজতে ব্যর্থ হয়ে দাঈর চারিত্রিক দোষত্রুটি উদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তাদের কথার জবাব দেওয়ার অর্থ হলো লক্ষ্য থেকে সরে যাওয়া, ইসলামের কথা বলার পরিবর্তে নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতেই অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়া। ফলে বক্তব্যের মূল বিষয় আর ইসলাম থাকে না। এ কারণে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে গিয়ে যদি কাউকে অপমানিত হতে হয়, তাহলে সেটা ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়। সেগুলো পাশ কাটিয়ে দাওয়াহ দিতে থাকতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> **"তাদের কথাবার্তায় আপনার যে দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি খুব ভালভাবেই জানি। কিন্তু তারা তো নিশ্চয়ই আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এই জালিমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।"** (সূরা আনআম, ৬: ৩৩)

আবু জাহেল এর আচরণ সেদিন সীমা ছাড়িয়ে যায়। হামযা ﷺ তখন মাত্র শিকার থেকে ফিরছিলেন। এক দাসীর মুখে শুনলেন, তাঁর ভাতিজাকে আবু জাহেল অপমানিত করেছে, ইসলাম নিয়েও আজেবাজে বকেছে। তাঁর খুবই মন খারাপ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভাতিজা। হামযা ﷺ সে সময় কাফির ছিলেন সত্যি, তবু রাসূল ﷺ তাঁর আত্মীয়, তাঁর ভাতিজা। ভাতিজা মুহাম্মাদের উপর আক্রমণকে হামযা নিজের অপমান হিসেবে নিলেন। দ্রুত হেঁটে আবু জাহেলের কাছে গেলেন। আবু জাহেল, তার সাঙ্গপাঙ্গ কুরাইশের অন্য সব নেতার সাথে কাবার সামনে বসে ছিল।

হামযার ﷺ হাতে তখনও শিকারের সরঞ্জাম। আবু জাহেলকে দেখামাত্র হাতের ধনুকটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে বললেন, 'তোমার কত বড় সাহস তুমি আমার ভাতিজাকে আঘাত করো? শুনে রাখো, আমি মুহাম্মাদের ধর্ম অনুসরণ করছি। সাহস থাকলে আমাকে মারো!'

আবু জাহেলের মাথা থেকে রক্ত পড়তে থাকে, তা দেখে বনু মাখযুম হামযার গায়ে হাত তুলতে উদ্যত হয়। বনু হাশিম উঠে দাঁড়ায় হামযার ﷺ পক্ষে। দুই গোত্রের

লোকেদের মধ্যে মারামারি বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলে আবু জাহেল মধ্যস্থতা করে। তাদেরকে থামিয়ে বলে, 'না, ছেড়ে দাও হামযাকে। আমিই তাঁর ভাতিজা মুহাম্মাদকে বিশ্রীভাষায় গালিগালাজ করেছি।'

হামযা ﷺ তখনো ইসলামের ওপর সত্যিকারের ঈমান আনেননি, দৃঢ় বিশ্বাস থেকে তিনি ইসলামের ঘোষণা দেননি, আবু জাহেলকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার জন্য জিদ করে কথার কথা বলেছিলেন। হামযা বাড়ি ফিরলেন। হঠাৎ তাঁর হুঁশ হলো, *'আরে! এটা আমি কী করলাম! ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম!'* কিছুক্ষণ পর যখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসলো, তিনি পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলেন এবং আবিষ্কার করলেন তিনি বেশ ভালো সমস্যার মধ্যেই পড়েছেন! তিনি মুসলিম হবেন নাকি কাফির থেকে যাবেন সেটা নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন। যদি তিনি তাঁর মুখের কথা ফিরিয়ে নেন, সেটা তাঁর জন্য অসম্মানজনক ব্যাপার, কেননা তিনি ইতোমধ্যে আবু জাহেলকে মুখের উপর বলে ফেলেছেন তিনি মুসলিম হয়ে গেছেন। চট করে মুখের কথা বদলে ফেলা সে সমাজে ভালো চোখে দেখা হতো না। অন্যদিকে তাঁর কথার ওপর স্থির থাকাও কঠিন, কারণ তিনি আগে কখনো ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা মাথাতেও আনেন নি।

তিনি সারারাত আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। বললেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে সত্য পথ দেখান! আমাকে বলে দেন আমি সত্যের উপর আছি কি না।' কুরাইশরা মুশরিক হলেও আল্লাহর ইবাদত করতো। যখন তারা দুআ করতো, তারা তা আল্লাহর কাছেই করতো, কিন্তু যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো কেন তারা অন্য প্রভুদের ইবাদত করতো, তারা বলতো এই মূর্তিগুলো হলো মাধ্যম। তারা আল্লাহর কাছে ইবাদাত পৌঁছিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তারা সংশয়ের মধ্যে ছিল।

পরদিন সকালের কথা, হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব ﷺ বলেন, 'সকালে উঠেই অনুভব করলাম আমার অন্তর ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় ভরে গেছে। তাই আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, আমি একজন মুসলিম।' প্রিয় চাচাকে পাশে পাওয়া ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে সবচেয়ে অসাধারণ মুহূর্তের একটি। হামযা ﷺ মুসলিম হলেন, মন থেকে মুসলিম হলেন। আবু জাহেল চেয়েছিল নবীজিকে ﷺ কষ্ট দিতে, অথচ তার এই অপকর্মের সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত হামযা ﷺ মুসলিম হয়ে গেলেন!

এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিকল্পনা। মানুষ কখনই জানতে পারবে না কোন কাজের পরিণতি ভালো আর কোন কাজের পরিণতি খারাপ। ইবনে ইসহাক্ব বলেন, 'হামযা জিদের বশে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ইসলামের ব্যাপারে সত্যিই আন্তরিক হয়ে যান।'

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ ছিলেন ইসলামের গোঁড়া শত্রু। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি মুসলিমদের নির্যাতন করতেন। একদিন আমর ইবন রাবিয়ার স্ত্রী লাইলার সাথে উমারের ﷺ দেখা হয়, উমার ﷺ তাকে বললেন, 'কোথায় চললে, উম্মে আবদুল্লাহ?'

- তোমরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছো, তাই আমার রবের ইবাদত করার জন্য অন্য দেশে চলে যাচ্ছি।

- তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমার ভ্রমণ নিরাপদ হোক।

উম্ম আবদুল্লাহ খুব অবাক হলেন – উমার ﷺ তো এমন সহানুভূতি নিয়ে মুসলিমদের সাথে কথা বলার পাত্র নন! ঘরে ফিরলে তাঁর স্বামীকে তিনি ঘটনাটি বললেন, তাঁর স্বামী হাসতে হাসতে বললেন,

- তুমি আশা করছো উমার মুসলিম হবে?

- হতেও তো পারে, কেন নয়?

- উমারের বাবার একটা গাধা আছে না? সেই গাধাটা মুসলিম হলেও হতে পারে কিন্তু উমার মুসলিম হবে না।[36]

উমার ﷺ সম্পর্কে কারোই উঁচু ধারণা ছিল না। জাহেলিয়াতের সময়ে উমার ﷺ কেমন ছিলেন–সে বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন:

"আমি মদ খেতে ভালবাসতাম। আমার কিছু মদ্যপায়ী সঙ্গী ছিল, তাদের সাথে প্রতি রাতে দেখা করতাম, আড্ডা মারতাম। এক সন্ধ্যায় বের হলাম, মদশালায় গিয়ে দেখি কেউ নাই। তখন রাত হয়েছে, ভাবলাম মদের দোকানে যাই, কিন্তু গিয়ে দেখি দোকানও বন্ধ। অনেক খুঁজেও সময় কাটানোর মতো কিছুই পেলাম না। তখন ভাবলাম, যাই দেখি, কাবাঘরে গিয়ে কাবার চারপাশে তাওয়াফ করি। তাওয়াফ করতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে আমি বাদে আরও একজন আছেন–মুহাম্মাদ! আমি আর তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তবে তিনি আমার উপস্থিতি টের পাননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জেরুসালেমের দিকে মুখ করে কাবায় সালাত আদায় করছিলেন। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে সামনের দিকে আসলাম। কাবার চাদরের আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে আছি। মুহাম্মাদ তখন আমার একদম সামনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু চাদরের কারণে আমাকে দেখতে পান নি। আমি এত কাছে যে তাঁর তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছি। তিনি সূরা আল হাক্কাহ থেকে তিলাওয়াত করছেন–কুরআন শুনে আমার বুক ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিজেকে

---

[36] সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০১।

বোঝালাম, এগুলো নিশ্চয়ই কোনো কবির কথা। এ কথা ভাবার পরেই সূরা আল হাক্কাহর পরের যে আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন তা হলো,

> **"এগুলো কোনো কবির কথা নয়, তোমাদের খুব অল্প লোকই সেটা বিশ্বাস করে থাকো।" (সূরা হাক্কাহ:৪১)**

আমি হতচকিত হয়ে গেলাম। নিজেকে বললাম, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো গণকের কথা। আর এরপরের আয়াতেই ছিল,

> **"এগুলো কোন গণকের কথা নয়, খুব কমই তোমরা স্মরণ কর।" (সূরা হাক্কাহ: ৪২)"**

একটি বর্ণনা অনুসারে এই ঘটনার পর উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।[37] অন্য মত অনুসারে, এই ঘটনা উমারকে ﷺ খুব নাড়া দেয়, তার অন্তরে কুফরের ভিত দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ ও মুসলিমদের প্রতি তাঁর ঘৃণা কমলো না। একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন, তিনি কুরাইশদের এই ঝামেলা দূর করবেন, দীর্ঘদিনের অনৈক্যের অবসান একমাত্র এক ভাবেই ঘটবে–যে করেই হোক, মুহাম্মাদকে ﷺ হত্যা করতে হবে। মক্কাকে "সাবেইন" (মুসলিমদের) হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

উমার ﷺ বদ্ধপরিকর। নবীজির ﷺ খোঁজ করা শুরু করলেন, খুঁজে পেলেই হত্যা। জানতে পারলেন দারুল আরকামে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চল্লিশ অনুসারীসহ আছেন। উমার ﷺ একাই চললেন, হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার। তিনি জানতেন মুহাম্মাদকে ﷺ হত্যা করতে গেলে তাকেও মেরে ফেলা হতে পারে, কিন্তু তিনি সেসব পরোয়া করেন না। রাস্তায় তাঁর এক আত্মীয় নাঈমের সাথে দেখা। নাঈম গোপনে মুসলিম হয়েছিলেন, উমার ইবন খাত্তাবের চোখ দেখেই নাঈম বুঝে গেলেন উমার খুব রেগে আছেন, নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটাবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

- কোথায় যাচ্ছো উমার?

- মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাচ্ছি, কোনো রাখঢাক না রেখে অকপটে নিজের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিলেন উমার।

পরিস্থিত গুরুতর দেখে নাঈম তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি করে বললেন,

- আগে তোমার নিজের বাড়িরই খোঁজ নাও, তারপরে মুহাম্মাদ!

- কেন? কী হয়েছে! আমার বাড়িতে আবার কী সমস্যা? উমার জানতে চাইলেন।

- যাও খোঁজ নিয়ে দেখ, তোমার আপন বোন মুসলিম হয়ে গেছে।

---

[37] সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫।

এই কথা বলে নাঈম রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাঁচালেও উমারের বোন আর তাঁর স্বামীকে বিপদে ফেলে দিলেন। উমারের ﷺ বোন ফাতিমা ﷺ ছিলেন সাঈদ ইবন যায়িদ ইবন আমর ইবন নুফাইলের ﷺ স্ত্রী। সাঈদ ﷺ ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। উমার এবার তাঁর গন্তব্য পরিবর্তন করে বোনের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। সেখানে তাঁর বোন ফাতিমা আর তাঁর স্বামী সাঈদকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন খাব্বাব ইবন আরাত ﷺ । খাব্বাব তাদেরকে ভাঁজ করা একটি কাগজ থেকে সূরা ত্ব-হা পড়ে শুনাচ্ছিলেন।

উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ পায়ের শব্দ শুনে খাব্বাব লুকিয়ে পড়লেন। ফাতিমাও চট করে কাগজটি নিয়ে লুকিয়ে ফেলেন। উমার ভিতরে এসে বললেন,

- কী সব আবোল-তাবোল বকছিলে তোমরা শুনি?

- কই! আমরা তো কিছু শুনিনি।

- আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু একটা তিলাওয়াত করতে শুনেছি। বলো সেটা কী ছিল। আমি শুনলাম তোমরা নাকি মুসলিম হয়ে গেছো?

এই কথা বলেই তিনি হঠাৎ সাঈদ ইবন যায়িদকে আঘাত করে বসলেন আর তাঁকে ঘুষি মারতে গেলেন। ফাতিমা স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে গেলেন, তাঁর মুখেও উমার ইবন খাত্তাব আঘাত করে বসলেন।

ফাতিমার মুখ থেকে রক্ত পড়তে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে উমার অপ্রস্তুত হয়ে যান, তাঁর খারাপ লাগতে থাকে, তিনি অনুতপ্ত হয়ে বোনের কাছে মাফ চাইলেন। ফাতিমা বললেন,

- হ্যাঁ, আমি ও আমার স্বামী দুজনই মুসলিম হয়েছি। তুমি যা খুশি করো।

- তোমরা যে কাগজটি পড়ছিলে, সেটা আমাকে দাও, উমার বললেন।

- না, দেব না। তুমি মুশরিক, তুমি নাপাক।

- ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি, আমি সেটা নষ্ট করবো না।

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ নিজেকে পরিষ্কার করে ফিরে আসলে তাঁর বোন তাঁকে ভাঁজ করা কাগজটি দিলেন। উমার কাগজ থেকে সূরা ত্ব-হা'র প্রথম আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

> "ত্ব-হা। আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে। এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমন্ডল ও সমুচ্চ নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমুন্নত হয়েছেন। নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। যদি তুমি উচ্চকন্ঠেও

কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ্ নেই। সব সৌন্দর্যমন্ডিত নাম তাঁরই।" (সূরা ত্ব-হা, ২০: ১-৮)

উমার ইবন খাত্তাব ﵁ তিলাওয়াত শেষ করে বললেন, 'কথাগুলো তো অসাধারণ!' খাব্বাব ইবন আরাত ﵁ এতক্ষণ লুকিয়ে ছিলেন, উমারের এই কথা শুনে বের হয়ে এলেন, বললেন, 'উমার! আশা করি আল্লাহ্ আপনাকে বেছে নেবেন। গতকাল আমি শুনেছি আল্লাহর নবী ﷺ দুআ করছিলেন, হে আল্লাহ্! যেকোনো একজন উমারকে পথ দেখান–উমার ইবন খাত্তাব অথবা উমার ইবন হিশাম। আমি আশা করছি আপনাকেই আল্লাহ্ নির্বাচন করেছেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র একদিন আগেই আল্লাহর কাছে এই দুআ করেছিলেন যে, আল্লাহ যেন দুইজন উমারের মধ্যে একজনকে পথ দেখান–উমার ইবন খাত্তাব অথবা উমার ইবন হিশাম (আবু জাহেল)। নবীজি ﷺ আল্লাহর কাছে এই দুইজনের একজনের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য দুআ করেছিলেন। উমার ইবন খাত্তাব ﵁ খাব্বাবকে বললেন, 'আমি মুসলিম হতে চাই। আমাকে মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে চলো।' খাব্বাব তাঁকে বললেন, 'আপনি দারুল আরকামে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করুন।' উমার ইবন খাত্তাব ﵁ দারুল আরকামে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের ﵃ নিয়ে গোপন বৈঠক করছিলেন। সে সময় মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলামের কোনো কার্যক্রম হতো না, তাই এই গোপন বৈঠকের আয়োজন।

সাহাবাদের ﵃ মধ্যে একজন উঠে দরজার ওপাশে উঁকি দিয়ে দেখে রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালেন উমার এসেছে। খানিকটা শঙ্কা, খানিকটা বিস্ময় মেশানো কণ্ঠে সেই সাহাবা ﵁ বললেন, 'উমার ইবন খাত্তাব বাইরে দাঁড়িয়ে! তাঁর সাথে তলোয়ার!' আরেকজন সাহাবী ﵁ সাহস করে প্রস্তাব দিলেন দরজা খোলা হোক। কিন্তু উমার ইবন খাত্তাবের ﵁ মুখোমুখি হওয়ার মতো সাহস সবার ছিল না। যার ছিল তিনি হলেন হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব। হামযা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, যদি উমার ভালো নিয়তে এসে থাকে তাহলে আমরা তাঁর সাথে সুন্দরভাবে বোঝাপড়া করে নেব। কিন্তু যদি সে খারাপ নিয়তে আসে, তাহলে তাঁর তলোয়ার দিয়েই তাকে মারবো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযাকে বললেন, 'সমস্যা নেই, আমি নিজেই দরজা খুলে ব্যাপারটা দেখছি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মাঝারী উচ্চতা ও মাঝারী গড়নের, অন্যদিকে উমার ইবন খাত্তাব ছিলেন দীর্ঘাকায়, সুঠামদেহী। বিশালদেহী উমারের পোশাক ধরে তাকে টেনে ভিতরে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'উমার! তুমি কবে এসব বন্ধ করবে? তুমি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাবের জন্য অপেক্ষা করছো?' উমার ইবন খাত্তাব বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি মুসলিম হতে এসেছি।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবর!' ঘটনাটি ঘটছিল দরজার সামনে। সাহাবারা ﷺ অন্য ঘরে থাকায় কিছুই দেখতে বা শুনতে পাননি। কিন্তু আল্লাহু আকবার শুনেই বুঝতে পারলেন যে, উমার মুসলিম হয়ে গেছেন। তাঁরা এই খবরে এত খুশি হলেন যে, জোরে জোরে তাকবীর দিতে লাগলেন - আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর![38] মক্কার লোকেরা তাদের তাকবীর শুনে ফেললো, সেদিনের মত সভা ভেঙে সবাই তাড়াহুড়ো করে সরে পড়লেন।

'উমারের মুসলিম হওয়া ছিল বিজয়, তাঁর মদীনায় হিজরত ছিল ইসলামের সহায় আর তাঁর শাসন ছিল রাহমাহ।'

আবদুল্লহা ইবন মাসউদের একটি কথায় বোঝা যায় উমার ইসলামের ইতিহাসে কতো উঁচু স্থান দখল করে আছেন। উমারের ﷺ ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের ইতিহাসে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া একটি ঘটনা। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, 'উমার মুসলিম হওয়ার আগে আমরা কখনও কাবাঘরের সামনে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতে পারতাম না।' তাঁর ইসলাম গ্রহণ পুরো মুসলিম সমাজের পরিস্থিতি বদলে দেয়। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ আরও বলেন, 'উমার মুসলিম হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা আমাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতাম। তিনি মুসলিম হওয়ার পর আমরা গর্বের সাথে আমাদের ইসলামের কথা বলে বেড়াতাম।'

সীরাতের এক বর্ণনায় এসেছে, যখন উমার মুসলিম হন, রাসূল ﷺ মুসলিমদের দুই সারিতে দাঁড় করান। এক সারির নেতা হামযা ﷺ, আরেক সারির নেতা উমার ﷺ, তাঁরা ইসলামের ঘোষণা দিতে দিতে মক্কার রাস্তায় প্রকাশ্যে হাঁটতে থাকেন, আর রাসূল ﷺ এই দুই সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে যান।

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ মুসলিম হওয়ার পর জানতে চান, 'মক্কার সবচেয়ে বড় মুখ কার? কে পারবে আমার ইসলাম গ্রহণের খবর সবার কাছে ছড়িয়ে দিতে?' উমার ইবন খাত্তাব ﷺ এই খবর চুপিসারে প্রকাশ করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন সবাই জানুক যে তিনি মুসলিম হয়েছেন। তাকে বলা হলো জামিল আজ-জুমাহির কথা, সে ছিল মক্কার মিডিয়া। মজার এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন উমারের ছেলে আবদুল্লাহ ইবন উমার, তাঁর ভাষায়:

'ঐসময় আমি বেশ ছোট, কিন্তু সেদিন যা দেখেছি তার সবই মনে করতে পারি। আমি বাবার পিছুপিছু গেলাম। বাবা জামিল আজ-জুমাহিকে বললেন,

– তুমি কি জানো আমি কী করেছি?

– কী করেছেন আপনি?

---

[38] সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩।

– আমি মুসলিম হয়েছি।

ব্যস, এতটুকুই। জামিল এই খবর শোনা মাত্র সাথে সাথে তার জোব্বা টেনে তুলে দৌড়ে কাবাঘরের দিকে গেল আর সবার সামনে গিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হে কুরাইশের লোকসকল! উমার সাবিঈন হয়ে গেছে! উমার সাবিঈন হয়ে গেছে!' সাবিঈন শব্দটা শুনে উমার তাকে শুধরে দিয়ে বললেন, 'আরে, সাবিঈন না, বলো আমি মুসলিম হয়েছি।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! জামিল তখন এই 'তাজা খবর' প্রচার করতে চারিদিকে পাগলের মত ছুটছে।

এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মানুষ সবদিক দিয়ে বাবাকে ঘিরে ধরলো। তারা তাঁকে মারতে লাগলো আর তিনিও তাদের সাথে মারামারি করতে লাগলেন। ঘণ্টাখানেক ধরে এভাবে চললো। সূর্য যখন একেবারে মাথার উপরে, তখন তারা ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দিল।'

উমার ইবন খাত্তাব ﷺ বাড়ি ফিরলেন, সেখানেও লোকজন তাঁর বাড়ি ঘেরাও করলো। তারা তাঁকে মেরেই ফেলবে। উমারের ﷺ ইসলাম গ্রহণ ছিল তাদের জন্য বিরাট ধাক্কা, তারা সহ্যই করতে পারছিল না বিষয়টা। তাঁর ঘরে এক লোক আসলো, তিনি উমারকে ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' উমার ﷺ বললেন, 'এরা আমাকে মেরে ফেলতে চায়।' লোকটি বললো, 'বিষয়টা আমি দেখছি, তারা তোমাকে মারবে না।' এরপর তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই মানুষটিকে তোমরা একা ছেড়ে দাও। তাঁর কি নিজের পছন্দমতো ধর্ম গ্রহণ করার অধিকার নেই? আমি তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছি।' এ কথা শুনে সবাই চলে গেল।

অনেকদিন পরের কথা, আবদুল্লাহ ইবন উমার তাঁর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বাবা, সেদিন আপনাকে যে লোকটা সাহায্য করেছিল তিনি কে ছিলেন?' উমার ﷺ বললেন, 'তিনি হলেন আল আস ইবন ওয়াইল।' আল আস ইবন ওয়াইল ছিলেন আমর ইবন আসের পিতা, তিনি মুসলিম ছিলেন না। উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ গোত্র খুব একটা শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু আল আস ইবন ওয়াইলের গোত্রের সাথে তাদের মিত্রতা ছিল।[39]

উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ ইসলাম গ্রহণ থেকে শিক্ষা

১। রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন থেকে একজন আদর্শ নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষ চিনতেন, তাই তিনি উমার ইবন খাত্তাব অথবা আবু জাহেলের হিদায়াত চেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন। উমার ইবন খাত্তাব এবং আবু জাহেলের এমন কিছু গুণ ছিল যে গুণগুলোর কারণে তারা বড় মাপের নেতা

---

[39] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬।

হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন। আবু জাহেলকে তার গোত্রের লোকেরা আবুল হাকাম বলে ডাকত, এর মানে হলো জ্ঞানের পিতা। কিন্তু অনেক বড় বুদ্ধিজীবি হওয়া সত্ত্বেও সে ইসলামে প্রবেশ করেনি, আর এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম দিয়েছিলেন আবু জাহেল, যার মানে মূর্খের পিতা। এ দুজন মানুষ ছিলেন দৃঢ়চেতা, নিজেদের আদর্শ ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। তারা যা বিশ্বাস করতেন, তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। তারা ছিলেন তেজী ও সাহসী, কঠিন পরিস্থিতিতে সবাইকে ছাপিয়ে উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাদের ছিল। আর তাদের মধ্যে এই গুণাবলির সমন্বয় দেখেই আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের জন্য দুআ করেছিলেন।

২। রাসূলুল্লাহর ﷺ চরিত্র থেকে নেতৃত্বের আরেকটি গুণ শেখার আছে। সেটি হলো মানুষ চিনতে পারা এবং তাদের সমস্যা বুঝে তাদের অন্তরের রোগের সঠিক চিকিৎসা করা। উমার ইবন খাত্তাবের ؓ অন্তর ছিল মুসলিমদের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ। তাই যখন উমার মুসলিম হন, রাসূল ﷺ জানতেন তাঁর সমস্যাটি আসলে কোথায় এবং সেই সমস্যার প্রতিকার কী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত উমার ইবন খাত্তাবের ؓ বুকে রেখে একটি দুআ পড়েছিলেন, 'হে আল্লাহ, তার অন্তরকে আপনি ঘৃণা থেকে মুক্ত করে দিন'–দুআটি তিনি তিনবার পড়েন।

৩। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলিয়াতে শ্রেষ্ঠ, তারা ইসলামেও শ্রেষ্ঠ, যদি তাদের দ্বীনের বুঝ থাকে।' এই কথার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকে যারা ভালো গুণের অধিকারী হয়, ইসলাম গ্রহণের পরে তারাই সবচেয়ে ভালো মুসলিম হতে পারে, যদি তাদের দ্বীনের বুঝ থাকে।

বয়কট

যখন কুরাইশরা আবিষ্কার করলো ঈমানদারদের মধ্যে কিছু লোক আবিসিনিয়া হিজরত করে সেখানে নিরাপদে আছে আর মক্কায় উমার ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা বুঝতে পারল যে ইসলাম দ্রুততার সাথে প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, নবীকে ﷺ মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই। মরিয়া হয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো। ইতিমধ্যেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বনু হাশিমকে অনুরোধ করেছিল যেন মুহাম্মাদকে তাদের হাতে হস্তান্তর করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই বনু হাশিম কুরাইশদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপর কুরাইশের বিভিন্ন গোত্র বনু হাশিম এবং বনু আল মুত্তালিব–এ দুটো গোত্রের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার ব্যাপারে চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। তবে আবু লাহাব রাসূলুল্লাহর ﷺ আপন চাচা ও একই গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও তাকে বয়কট করা হয় নি, কারণ সে নিজেও ইসলামের একজন প্রধান শত্রু।

মক্কী জীবনের সপ্তম বছরে মুহাররাম মাসে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের সাথে সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়। চুক্তিতে ঠিক হলো– তাদের সাথে কোনো বাণিজ্য করা হবে না, তাদের কাউকে কেউ বিয়ে করবে না অথবা তাদের কাছে কেউ বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তারা মুহাম্মাদকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হাতে হস্তান্তর করছে।

গোত্র দুটো চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখা। কুরাইশরা নিশ্চিত করতে চায় যেন বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের কাছে যেন কোনো খাবার না পৌঁছে। কুরাইশদের উদ্দেশ্য এই দুই গোত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা। কাবাঘরের ভিতরে বয়কট চুক্তির দলিল টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। তবে দুই গোত্রের মাঝে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কঠিন সময়েও তারা একে অপরের পাশে দাঁড়াতো। পরিস্থিতি বেশ মারাত্মক আকার ধারণ করে। বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিব গোত্রের নারী-পুরুষ-শিশু ক্ষুধায় কষ্ট পেতে থাকে। সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস সেই অবস্থা বর্ণনা করেন, 'আমরা এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে, গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকতে হতো।' বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের অধিকাংশ লোক মুসলিম ছিল না। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে পুরো গোত্রের উপর ছিল।

বয়কটের অবসান

বয়কট চুক্তির বিরোধিতায় যে লোকটি উঠে দাঁড়ান তিনি হিশাম ইবন আমর। তিনি ছিলেন বনু হাশিমের মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়। চুক্তি বাতিল করার পেছনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খাবারে বোঝাই একটি উট নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন, বনু হাশিম গোত্রের কাছাকাছি গেলে উটটি ছেড়ে দিতেন যেন সেটা চড়তে চড়তে পাহাড়ের নিচে বনু হাশিমের কাছে গিয়ে পৌঁছে, যেন খাবারগুলো তারা পায়।

একদিন যুহাইর ইবন আবি উমাইয়ার কাছে গিয়ে বললেন, 'যুহাইর! তোমার আপন মামারা নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছে, আর তুমি খেয়ে-পরে-আনন্দের মধ্যে বসে আছো কীভাবে? আমি শপথ করে বলছি, যদি এই মানুষগুলো আবুল হাকামের নিজের মামা হতো, সে তাদের সাথে কখনো এরকম করতো না।' যুহাইরও বনু হাশিমের মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। হিশাম তাঁকে বোঝালেন যে, আবু জাহেলের অন্যায় ও দ্বিমুখী নীতি মেনে নেওয়া তাদের ঠিক হচ্ছে না। যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া জবাব দিলেন,

- তুমি আমাকে দোষারোপ করছো? আমি একা একজন মানুষ, আমি কী করতে পারি বলো? আল্লাহর শপথ, যদি আমার পাশে আর একটি লোকও থাকতো, আমি এই নিষেধাজ্ঞার দলিল বাতিল করে আসতাম।

- বেশ, তোমার সাথে একজন আছে, হিশাম জানালেন।

- কে সে?

- আমি আছি তোমার সাথে।

- তাহলে চলো তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের করি।

হিশাম তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের করতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি দেখা পেলেন মুতইম ইবন আদীর, তাকে বললেন,

- মুতইম! তুমি কি বনু আল মানাফের দুই গোত্রের কষ্ট দেখে আনন্দিত হচ্ছো? কুরাইশদের চুক্তিটি তুমি দেখনি? আল্লাহর কসম, তুমি যদি আজকে তাদেরকে এই কাজ করতে দাও, তাহলে কালকে তারা তোমার সাথেও একই কাজ করবে।

- তা বুঝলাম, কিন্তু আমি এক্ষেত্রে কী করতে পারি? আমি তো একা।

- তোমার সাথে আমিও আছি।

- তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের করলে কেমন হয়?

- তৃতীয় জনকেও আমি পেয়েছি। সে হলো যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া।

- বাহ! তাহলে চতুর্থ কাউকে খুঁজে বের করা যাক।

চতুর্থজনকেও এভাবে খুঁজে পাওয়া গেল, তিনি হলেন আবুল বাখতারি। তিনিও এই চুক্তির বিরোধী ছিলেন। তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং তাদের পক্ষে আরো লোক খুঁজে বের করার কথা বললেন। এরপর হিশাম খুঁজে পেলেন পঞ্চমজনকে। তিনি হলেন জামা ইবন আসওয়াদ। তাঁরা পরিকল্পনা করে পরদিন রাতের বেলা আল হুজুমে দেখা করলেন এবং সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন পরদিন সকালে গিয়ে তাঁরা সমস্ত দলিল নষ্ট করে ফেলবেন। কিন্তু সেটা এমনভাবে করা হবে যেন কেউ বুঝতে না পারে যে ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত।

পরদিন সকালে যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া এক বিশেষ পোশাক পরে (জোব্বা) কাবাঘরে তাওয়াফ করলেন। সময়টি ছিল কুরাইশ নেতাদের সাক্ষাতের সময়। তাদের এই সমাবেশ হতো আন নাদওয়াতে। যুহাইর সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন,

'হে কুরাইশের লোকসকল! তোমাদের কি খুব আনন্দ হচ্ছে যে তোমরা ভালো খেয়ে-পরে আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছো, ওদিকে বনু হাশিম আর বনু মুত্তালিব দুর্দশার জীবন পার করছে? আল্লাহর শপথ করে বলছি, এই দলিল ছেঁড়ার আগ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হবো না।'

পূর্ব পরিকল্পনা মতে, ওই পাঁচজনের দ্বিতীয় ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ! আমিও কখনই ওই দলিলের সাথে একমত ছিলাম না।' এরপর তৃতীয়জন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি শপথ করে বলছি আমি এই দলিলের সাথে নেই এবং আমি এই ধরনের চুক্তির অংশ হতে চাইনা।' এরপর চতুর্থজন উঠে দাঁড়িয়ে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কথা বললো এবং সবশেষে হিশাম ইবন আমর উঠে দাঁড়িয়ে কথা বললেন।

তখন আবু জাহেল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'এই ঘটনা সাজানো, তোমরা রাতেই এসব পরিকল্পনা এটেঁছো।' কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়, বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, দলিলটি ছেঁড়ার জন্য আল মুতইম ইবন আদী কাবাঘরের দিকে ছুটে যান। তিনি আবিষ্কার করলেন সেই দলিলটি ইতিমধ্যেই উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র "আমাদের রবের নামে"–এই বাক্যটি ছাড়া!

দুই বা তিন বছর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকার পর এভাবেই নাটকীয়তার সাথে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষা

১। এই ঘটনায় থেকে শিক্ষণীয় হলো, সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে অনেক বড় অর্জন সম্ভব। মাত্র পাঁচজন লোক মিলে একটি ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছেন কেবল সাংগঠনিক গুণকে কাজে লাগিয়ে। অল্প কিছু মানুষের চেষ্টায় কুরাইশ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা রদ হয়ে যায়। এর সূচনা হয় হিশাম ইবন আমরের হাতে। তাঁর মাথাতেই প্রথম চিন্তাটি আসে। তিনি সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য সমমনা কিছু মানুষ যোগাড় করলেন। অতঃপর সকলে মিলে এই অন্যায্য চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটাতে সমর্থ হন। এক হয়ে কাজ করা কতটা জরুরি তা এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। মুসলিম ভাই ও বোনদের উচিত গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ানো এবং নিজ থেকে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহী হওয়া, যেমনটা করেছিলেন হিশাম ইবন আমর।

২। উইপোকার দলীল খেয়ে ফেলা একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করে তা হলো, আল্লাহর সৈনিকরা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এমনকি উইপোকাও আল্লাহর সৈনিক হতে পারে।

> "কেউ জানেনা আল্লাহর সৈনিকের ব্যাপারে কিন্তু একমাত্র তিনিই জানেন।"
> (সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪: ৩১)

মু'জিযা

রুকানার সাথে কুস্তি

রাসূলুল্লাহর ﷺ আরেকটি অলৌকিক ঘটনা হলো রুকানার সাথে কুস্তি। রুকানা ছিল মক্কার সবচেয়ে শক্তিশালী কুস্তিগীর, কখনও কোনো কুস্তিতে পরাজিত হয়নি। সে নবীজিকে ﷺ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, 'আপনি আমার সাথে কুস্তি লড়বেন?' সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। একজন কাফির হিসেবে রুকানার ইচ্ছা ছিল, রাসূলুল্লাহকে ﷺ লাঞ্ছিত করা–কুস্তি করতে গিয়ে মুহাম্মাদকে এক

হাত দেখে নেওয়া যাবে। পুরস্কার হিসেবে ঠিক হলো একশ ভেড়া। বাজি ধরা তখনও হারাম করা হয় নি। তারা লড়াই করা শুরু করলেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকানাকে ওপর থেকে নিচে ধরে মাটিতে ছুঁড়ে মারলেন। রুকানা বিশ্বাসই করতে পারছিল না এসব কী ঘটছে! সে উঠে দাঁড়িয়ে আবার লড়াই করতে চাইলো, রাসূল ﷺ পুনরায় তাকে হারিয়ে দিলেন। রুকানা তৃতীয়বার চেষ্টা করলো, সেবারও পরাজিত হলো।

নবীজি ﷺ শর্তে জিতে গেলেন। কিন্তু শর্তে জেতার চেয়েও অসামান্য ব্যাপার ছিল রুকানার ইসলাম গ্রহণ।

রুকানা বললো, 'হে মুহাম্মাদ, আপনার আগে কেউ আমার পিঠ মাটির সাথে লাগাতে পারেনি। আর এটাও সত্যি, এর আগে আপনার চেয়ে বেশি আর কেউ আমার চোখে এতটা ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই এবং আপনি আল্লাহর নবী।' রাসূল ﷺ শর্ত মোতাবেক একশ ভেড়া পেলেন কিন্তু তিনি সেগুলো রুকানাকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'ভেড়াগুলো রেখে দাও।' [40]

চন্দ্র বিদীর্ণ হলো

কুরাইশের লোকেরা নিদর্শন দেখানোর জন্য রাসূলুল্লাহকে ﷺ বারবার চাপাচাপি করছিল। কুরআন তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না, যদিও কুরআনের চেয়ে বড় অলৌকিক বিষয় আর কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলা জিবরীলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ওয়াহী পাঠালেন, 'যদি তারা নিদর্শন দেখতে চায়, আমরা তাদের জন্য চাঁদকে দুইভাগ করে দেব।' রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের ডেকে বললেন, 'চাঁদ দুই ভাগ হয়ে যাবে।' রাতের বেলা কাফিররা সবাই একত্রে জড়ো হলো । তারা সবাই তাদের চোখের সামনে দেখলো চাঁদ দুইভাগ হয়ে আবার জোড়া লেগে গেল। এটা ছিল একটা অদ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা। এই ঘটনা বুখারি, মুসলিম এবং কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

> **"কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।" (সূরা ক্বমার, ৫৪: ১-২)**

তারা অপবাদ দিলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জাদু করেছে, কিন্তু আদতে এটি কোনো দৃষ্টিবিভ্রম ছিল না। সংশয়বাদীরা এই ঘটনা নিয়ে নানান রকম সন্দেহ তুলে এই ঘটনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। যেমন তারা বলে, "চাঁদ দুই ভাগ হলে, পৃথিবীর অন্য

---

[40] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯।

প্রান্তের মানুষরা কীভাবে এই ঘটনা দেখলো না?” – বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়:

১। পৃথিবীটা বিভিন্ন সময়ের বলয়ের মধ্যে আছে; অর্ধেক পৃথিবীতে সে সময় দিন ছিল, আর বাকি অর্ধেকের ক্ষেত্রে এটা সম্ভবত অনেক রাতে ঘটেছিল তাই অনেকেই এটা দেখেনি।

২। অথবা হতে পারে বিশেষ বিশেষ এলাকাতে চাঁদটা তাদের কাছে দৃশ্যমান ছিল না কারণ সেটা ততক্ষণে অস্ত চলে গেছে। তাই যেখানে রাত ছিল সেখানের সবাই এটা দেখতে নাও পেতে পারে।

৩। সাধারণত মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। তাদের উপরে আকাশে কী ঘটছে তারা সাধারণত খেয়াল করে দেখে না, যদি না তাদের উপরে তাকিয়ে দেখতে বলা হয়। তাই অনেকে হয়তো চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার এই ঘটনা দেখেনি কারণ তারা উপরে কী হচ্ছে সে খেয়ালই রাখেনি।

৪। তখনকার দিনে দলিল লিখে রাখার চল ছিল না। ইতিহাসের অনেক ঘটে যাওয়া ঘটনা কেউ লিখে রাখেনি। তাই এই সম্ভাবনাও থেকে যায় যে, কিছু মানুষ এটা দেখেছে ঠিকই কিন্তু তারা সেটা লিখে রাখেনি। কিছু আলিম বলেছেন, ভারত এবং চীনে এই ঘটনা লিখে রাখা হয়েছিল। তারা বলেন, চীনের কিছু পুরনো দলিলে চাঁদ দু'ভাগ হওয়ার ঘটনা লিখে রাখা হয়েছিল। তারা এই ঘটনাকে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার কাজে প্রাসঙ্গিক ঘটনা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

৫। কিছু জ্যোতির্বিদ উল্লেখ করেছেন, চাঁদের মাঝ বরাবর একটা লম্বা দাগ কেটে গেছে, এ তথ্য যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এটা চাঁদ বিভক্ত হওয়ার স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে দেখানো যায়, যদিও এই তথ্যটি যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে।

প্রথম যুগের একজন আলিম আল খাত্তাবি বলেন, ‘চাঁদ বিভক্ত হওয়ার ঘটনাটি ছিল পূর্ববর্তী নবীদের নিদর্শনের তুলনায় একটা বড় মাপের নিদর্শন। এর কারণ ছিল, এটা বিশাল এলাকা জুড়ে দৃশ্যমান হয়েছিল এবং এটি ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম একটি ঘটনা। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।’

সূরা আর রুম

রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজমান ছিল। তারা ছিল সে সময়ের পরাশক্তি। ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, সম্ভবত পাকিস্তানের কিছু অংশ এবং এর উত্তর দিক ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আর তুরস্ক, পূর্ব-দেশীয় ইউরোপ, আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া ছিল বাইজেন্টাইন বা রোমান সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত। রোমানদের অবস্থা তখন বেশ শোচনীয়, পারস্য একের পর এক যুদ্ধে তাদের পরাজিত করতে থাকে। এরই মধ্যে সিরিয়ায় পারস্য ও রোমানদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে সংগঠিত হয় এবং তাতে রোমানরা পরাজিত হয়। মক্কার মানুষ এই খবর শুনে খুব খুশি হয়, আর মুসলিমরা দুঃখ পায়। কারণ, ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে পারস্যরা ছিল মক্কার পৌত্তলিকদের আপন, যেহেতু তারা অগ্নিপূজা করতো। অপরদিকে রোমানরা ছিল খ্রিস্টান বা আহলে কিতাব, তাদের বিশ্বাস মুসলিমদের কাছাকাছি ছিল। এই ঘটনার পর মুশরিকরা মক্কার চারদিকে ঘুরে ঘুরে মুসলিমদের বলতে লাগল, 'যেভাবে পারস্যরা রোমানদের হারিয়েছে, আমরাও সেভাবে তোমাদের হারাবো।' আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন একটি আয়াত নাযিল করেন,

> "আলিফ-লাম-মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" (সূরা আর-রুম, ৩০: ১-৫)

এখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াদা করেছেন যে রোমানরা দশ বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। আবু বকর ﵁ এই আয়াত শুনে আবু জাহেলের কাছে গেলেন। তাকে বললেন, 'তোমার সাথে বাজি ধরতে চাই যে, রোমানরা বিজয়ী হবে।' আবু জাহেল বললো, 'কত সময়ের মধ্যে বিজয়ী হবে?' আবু বকর ﵁ বললেন, 'দশ বছরের কম সময়ে।' বাজির পুরস্কার ঠিক হলো একশ উট। আবু বকর ﵁ যেকোনো কিছুর ওপর বাজি ধরতে রাজি, কেননা তিনি কুরআনের উপর ভরসা করে বাজি ধরেছেন।

সূরা আর রুমের এই আয়াতটি বলছে রোমানরা বিজয়ী হবে এবং মুসলিমরা সেদিন খুশি হবে কারণ আল্লাহ্ তাদের বিজয় দেবেন। আট বছর পর রোমানরা সত্যিই বিজয়ী হলো, অথচ মুসলিমদের কাছে রোমানদের বিজয় সেদিন খুবই গৌণ বিষয়। মুসলিমদের জন্য সেটি খুশির দিন ছিল সত্যি, কিন্তু সেটা রোমানদের কারণে নয়, অন্য কোনো কারণে। আসল ঘটনা হচ্ছে, যেদিন তারা রোমানদের বিজয়ের খবর পেলো, সেই দিনটি ছিল বদরের যুদ্ধে বিজয়ের দিন, কাফেরদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বিজয়ের প্রথম ইতিহাস। বলা বাহুল্য বদরের বিজয়ের সামনে অন্য সবকিছু ম্লান হয়ে যায়।

পৌত্তলিকরা বলতো তারা মুসলিমদের সেভাবেই পরাজিত করবে যেভাবে পারস্যরা রোমানদের পরাজিত করেছে, কিন্তু ঠিক উল্টোটাই ঘটল। রোমানরা বিজয়ী হলো এবং একই দিনে মুসলিমরাও বিজয়ী হয়। তবে অলৌকিকতার শেষ এখানেই নয়, এই আয়াতে বলা হয়েছে, বাইজেন্টাইন অর্থাৎ রোমানরা "*আদনাল আরদ*" এ পরাজিত হয়েছে। *আদনা* শব্দটির আরবিতে দুইটি অর্থ আছে, একটা অর্থ হলো সবচেয়ে কাছে

আর আরেকটা অর্থ হলো সর্বনিম্ন। পূর্ববর্তী আলিমরা মূলত এই শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছিলেন 'সবচেয়ে কাছে', কারণ আরবের সবচেয়ে কাছের দেশ ছিল আশ-শাম আর সেখানেই রোমানরা পরাজিত হয়েছিল। আবার অনেকে মনে করেন এই আয়াতের অর্থ সর্বনিম্ন, কেননা যে স্থানে এই যুদ্ধ হয়েছিল তা পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বনিম্ন স্থান। আল্লাহই ভালো জানেন।

দুঃখের বছর

মাক্কী জীবনের দশম বছরকে বলা হয় *আমুল হুযন* বা *দুঃখের বছর*। কুরাইশ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার প্রায় ছয় মাস পরের ঘটনা, যে মানুষটি এতদিন ধরে রাসূলুল্লাহর ﷺ সুখে-দুঃখে তাঁর পাশে ছিলেন, সেই আবু তালিব মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালিবের পাশে বসে তাকে বললেন,

> *'চাচা, আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। আপনি স্বীকার করে নিন আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমাকে এ কথাগুলো বলে যান যেন আমি শেষ বিচারের দিন আপনার পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিতে পারি, আপনার শাস্তি মওকুফের জন্য আমার রবের কাছে আবেদন করতে পারি। আপনি শুধু বলুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এ ছাড়া আমি আপনার কাছে আর কিছুই চাই না।'*

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কথাগুলো বলছিলেন তখন আবু তালিবের অপর পাশে বসা ছিল আবু জাহেল। পিছে লেগে থাকা বলতে যা বোঝায়, আবু জাহেল রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ঠিক তাই করতো, ইসলামের বিরোধিতায় সে ছিল আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। সমস্ত ইসলামবিরোধী কাজ ও ষড়যন্ত্রের মূল হোতা ছিল এই আবু জাহেল। রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরোধিতায় আবু জাহেল ছিল অদ্বিতীয়। সে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরোধিতা করে কাটিয়েছে।

আবু তালিবের এক পাশে রাসূল ﷺ এবং আরেকপাশে আবু জাহেল ও আবদুল্লাহ ইবন আবি উমাইর বসে আছে। আবু জাহেল বলে উঠল, 'আবু তালিব, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের দ্বীন ছেড়ে অন্য দ্বীনের ওপর মারা যেতে চাও? শেষ পর্যন্ত তুমি বাপের দ্বীন ত্যাগ করবে?' সে আবু তালিবকে *'ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল'* করার চেষ্টা করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যতই আবু তালিবকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন, আবু জাহেল ততই বাধা দিতে লাগল। আবু তালিব তাঁর জীবনের শেষ কথা বলার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলতে লাগল। অবশেষে আবু তালিব বললেন, 'আমি আমার পিতা আবদুল মুত্তালিবের দ্বীনের ওপরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবো।' এটিই ছিল মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ কথা।

আবু তালিব মারা গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে যাবো।' কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। বিষয়টি ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য খুবই কষ্টকর। রাসূলুল্লাহর ﷺ আট বছর বয়স থেকে আবু তালিব তাঁর দেখাশোনা করেছেন, নিজের কাছে রেখে বড় করেছেন, তাঁর ভরণপোষণ করেছেন। আবু তালিবের কাছেই রাসূলুল্লাহর ﷺ শৈশবকাল কেটেছে, বড় হওয়ার পরেও আবু তালিব রাসূলুল্লাহর ﷺ পাশে ছিলেন। বিয়াল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ সাহায্য করে গেছেন, কুরাইশদের ষড়যন্ত্র থেকে তাকে রক্ষা করেছেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ আট বছর বয়সে আবু তালিব সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন। নবীজির ﷺ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সে হাত সেভাবেই তাঁকে আগলে রাখে। আবু তালিব তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহকে ﷺ রক্ষা করার জন্য ব্যয় করেছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দেখলেন তাঁর প্রিয় চাচা কাফের হিসেবে মারা যাচ্ছে তখন তা মেনে নেওয়া তাঁর জন্য বেশ কষ্টকর ছিল। তিনি যখন আবু তালিবের জন্য দুআ করতে মনঃস্থির করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন,

> "নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক–একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।" (সূরা তাওবা, ৯: ১১৩)

রাসূলুল্লাহকে ﷺ আবু তালিবের জন্য দুআ করতে নিষেধ করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চাচার কথা ছিল, 'কুরাইশরা যদি আমাকে এ ব্যাপারে অপমান না করতো, তারা যদি না বলতো যে আমি মৃত্যুর ভয়ে কালিমা পাঠ করেছি, তবে তোমাকে খুশি করার জন্য আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতাম।' আবু তালিব জানতেন কালিমা পাঠ করলে মুহাম্মাদ ﷺ খুবই খুশি হবেন। কাফের হিসেবে নিজের প্রিয় চাচাকে মৃত্যুবরণ করতে দেখা নবীজির ﷺ জন্য কতটা কষ্টকর ছিল তা আবু তালিব বেশ ভালোভাবেই জানতেন। আবু তালিব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁর কালিমা পাঠ না করার কারণ ছিল কুরাইশদের কাছে মানসম্মান হারানোর ভয়। তখন আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন,

> "আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তাআলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।" (সূরা ক্বসাস, ২৮: ৫৬)

হিদায়াত শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে। কে হেদায়েত পাবে তা শুধু তিনিই নির্ধারণ করেন। এমনকি রাসূলুল্লাহরও ﷺ এ ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না। তাঁর কাজ ছিল কেবল আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কোনো ব্যক্তির অন্তরকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে, কোনো মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এ

কারণে ঈমান আনার ব্যাপারে কারো ওপর কোনো ধরনের জোরজবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা ইসলাম সমর্থন করে না।

> **“দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়েত গোমরাহি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনও ছিন্ন হওয়ার নয়, আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।” (সূরা বাক্বারাহ, ২: ২৫৬)**

কারোর অন্তরে কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কে কোন ধর্ম গ্রহণ করবে সে ব্যাপারে প্রত্যেককে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে আর এই ইচ্ছাশক্তিকে কে কীভাবে ব্যবহার করলো তার জন্য সবাইকে আল্লাহ তাআলার সামনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আবু তালিবের মৃত্যুতে যখন নবীজি ﷺ শোকাহত, তার মাত্র দুই মাস পরে মারা গেলেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা ﷺ। এক মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর মতো আরও একটি দুঃখময় ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় প্রিয় নবী মুহাম্মাদকে ﷺ। তাই এই বছরকে বলা হয় শোকের বছর। এই বছরটি ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর বছর, কারণ ওই সময় তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় দুইজন মানুষকে হারিয়েছেন। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁর দায়িত্ব পালনে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে আসছিলেন। খাদিজা ﷺ রাসুলুল্লাহকে যেমন মানসিকভাবে সমর্থন যুগিয়েছেন ঠিক তেমনি নিজের ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন। অন্যদিকে, আবু তালিব রাসূলুল্লাহকে ﷺ কুরাইশদের অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন, তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। যে দু’জন মানুষ সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে, তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন, তাঁরা হঠাৎ করেই চলে গেলেন এই দুনিয়া থেকে। শুধু তাই নয়, সে বছরে কুরাইশদের ইসলামবিরোধিতার মাত্রাও বেড়ে গেলো।

আবু তালিব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তেমন গুরুতর কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ইসলাম প্রচার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আবু তালিবের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষে আগের মতো দাওয়াতের কাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। কুরাইশদের বিভিন্ন কটূক্তি ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তিনি যখন ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ি যেতেন, তখন তাঁর পাশে থাকতেন খাদিজা ﷺ। তিনি তাঁকে সাহস ও স্বস্তি দিয়েছেন, জীবনের কঠিনতম মুহূর্তগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রিয় স্ত্রীকে পাশে পেয়েছিলেন। কিন্তু খাদিজার ﷺ মৃত্যুর পর তিনি একেবারেই একা হয়ে পড়েন। খাদিজার ﷺ মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় দুই-তিন বছর পর্যন্ত বিয়ে করেননি। তখন তিনি বেশ কঠিন সময়ের মধ্যে ছিলেন।

কেন এই পরিস্থিতিতে রাসূলকে ﷺ পড়তে হলো – এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেন, একসাথে এতগুলো ঘটনা ঘটার পেছনে আল্লাহ তাআলার হিকমাহ রয়েছে। তা হলো মুসলিমরা যেন আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করতে শেখে। আল্লাহ চেয়েছেন ইসলামের আহ্বানকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিমরা যেন আবু তালিব বা খাদিজার ﷺ দিকে চেয়ে না থাকে, বরং তারা যেন তাদের এই সংগ্রামে কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা ও আল্লাহর সাহায্যের দিকে চেয়ে থাকতে শেখে। সে কারণেই আল্লাহ তাআলা নবীজিকে ﷺ এমন এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি করেন যে পরিস্থিতিতে তাঁকে সাহায্য করার কেউ ছিল না।

আল ইসরা ওয়াল মিরাজ: কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি

রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কষ্টের সময়ের পরে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে অনন্য সাধারণ উপহার লাভ করেছেন। কষ্টের পরিমাণ যত বেশি হবে তার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অনুগ্রহের পরিমাণও অনেক বেশি হবে। এই অনুগ্রহ হলো আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা। আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনাটি বিভিন্ন হাদীসে এসেছে এবং প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে কিছু পার্থক্য এবং নতুনত্ব আছে। এই বইয়ে সংক্ষিপ্ত এই যাত্রার সার অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ বর্ণনায় মিরাজের রাত

'আমি তখন আল হিজরে (কাবার নিকটে অর্ধগোলাকার একটি জায়গা), আমার কাছে আসলেন একজন ফেরেশতা। তিনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করলেন, তারপর হৃৎপিণ্ডকে বের করে এনে ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পাত্রে রাখলেন। সেটিকে এই পাত্রে ধুয়ে আমার বক্ষে বসিয়ে দেওয়া হলো হলো। এরপর আমার সামনে এমন একটি জন্তু (বুরাক) উপস্থিত করা হলো যা আকৃতিতে ঘোড়ার চেয়ে ছোটো কিন্তু গাধার চেয়ে বড়। এই জন্তুটি যতদূর সম্ভব দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত এক লাফে চলতো।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ এই জন্তুটির অস্বাভাবিক দ্রুততা সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই জন্তুর দু'চোখ যতদূর যায়, সেই পরিমাণ দূরত্ব সে এক ধাপে অতিক্রম করে। অর্থাৎ এটি প্রচণ্ড দ্রুতগতিসম্পন্ন জন্তু ছিল। তার ওপর চড়লে মনে হবে পুরো পৃথিবীটা যেন গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে।

'জিবরীল আমাকে সেই জন্তুর ওপর উঠতে বললেন। এরপর তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে জেরুসালেম নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে আমি আমার বাহনটিকে মসজিদের গেটে বেঁধে ভিতরে প্রবেশ করলাম। তারপর সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করলাম।'

সেখানে ওইসময় অন্যান্য নবী-রাসূলগণও সালাত আদায় করেছিলেন এবং এই জামাতের নেতৃত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, তিনি ইমামের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'এরপর জিবরীল আমাকে আসমানের দিকে নিয়ে গেলেন। আমরা সবচেয়ে নিচের আসমানের দরজায় পৌঁছলাম, জিবরীল দরজায় টোকা দিলেন। দরজার প্রহরীরা জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করলো,

- আপনি কে?

- আমি জিবরীল।

- আপনার সাথে কে আছেন?

- মুহাম্মাদ ﷺ।

- তাঁকে কি আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে?

- হ্যাঁ।

- তাঁকে স্বাগতম, তাঁর আগমনে আমরা আনন্দিত।

প্রহরীরা আনন্দের সাথে গেট খুলে দিল। এখানে লক্ষণীয়, অনুমতি ছাড়া কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না, এমনকি রাসূলুল্লাহও ﷺ পারেননি। গেট খুলে দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেতরে প্রবেশ করলেন।

'আমি ভেতরে প্রবেশ করে পিতা আদমকে ﷺ দেখতে পেলাম। জিবরীল তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। জিবরীল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম ﷺ, তাঁকে সালাম দিন। আমি আসসালামু আলাইকুম বললাম। তিনি আমাকে ওয়া আলাইকুসসালাম বললেন। এরপর আদম বললেন, আমার পবিত্র পুত্রকে স্বাগতম। পবিত্র রাসূলকে ﷺ স্বাগতম।'

আদম ﷺ দেখা পেলেন তাঁর কোটি কোটি সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদের ﷺ। হাজার বছর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রের সাথে দেখা করার সুযোগ পাওয়া ছিল পিতা আদমের জন্য এক মহা আনন্দের ঘটনা। রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্যও সেই মুহূর্তটি অবশ্যই একটি অভূতপূর্ব আনন্দময় মুহূর্ত ছিল। কিন্তু তাদের আলাপচারিতার সময় ছিল বেশ অল্প, কেননা রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে সময় ছিল কম, তাঁর জন্য আরো অনেক কিছু অপেক্ষা করছিল। এরপর জিবরীল রাসূলুল্লাহকে ﷺ নিয়ে দ্বিতীয় আসমানের দিকে রওনা দেন। তাঁরা সেখানকার দরজায় পৌঁছলে আগের মতো প্রহরীরা তাদের পরিচয় জানতে চাইলো। পরিচয়পর্ব শেষে তারা দরজা খুলে দিল। নবীজি ﷺ বলেন, 'আমি ভিতরে প্রবেশ করে ঈসা ﷺ ও ইয়াহইয়ার ﷺ দেখা পেলাম। তাঁরা দুইজন ছিলেন আত্মীয়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন, 'আমি তাদের সাথে সালাম বিনিময় করলাম।' অর্থাৎ নবীরা একে অপরকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে অভিবাদন জানাতেন।

'এরপর তৃতীয় আসমানের দিকে রওনা দিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখা হলো ইউসুফের ﷺ সাথে।' ইউসুফ ﷺ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তাঁকে দুনিয়ার সৌন্দর্যের অর্ধেক দেওয়া হয়েছিল।' চতুর্থ আসমানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখা করলেন নবী ইদ্রিসের ﷺ সাথে। নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেন, 'আমরা এরপর পঞ্চম আসমানে গেলাম। সেখানে হারুনের ﷺ সাথে দেখা হলো। মূসা ﷺ ছিলেন ষষ্ঠ আসমানে। তাঁর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়।'

রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখে সালাম বিনিময় ও স্বাগত জানানোর পর মূসা ﷺ কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'এক যুবককে রিসালাতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার পরে, কিন্তু জান্নাতে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা আমার চেয়ে

বেশি হবে।' মুহাম্মাদের ﷺ আবির্ভাবের আগে অন্য যে কোনো নবীর চেয়ে মূসার অনুসারীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। বনী ইসরাইল ছিল সংখ্যার দিক থেকে অন্য সকল মুসলিম জাতি অপেক্ষা সর্ববৃহৎ। কিন্তু মুহাম্মাদের ﷺ উম্মাতের সংখ্যা বনী ইসরাইল থেকেও বেশি। একারণেই মূসা কাঁদছিলেন। মূসা ﷺ ও মুহাম্মাদের ﷺ মধ্যে উম্মাতের সংখ্যা নিয়ে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল কিন্তু এ প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনোরকম ঈর্ষাবোধ বা হিংসা ছিল না। তাদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ প্রতিযোগিতা ছিল, মূসা ﷺ ও মুহাম্মাদের ﷺ পরবর্তী কথোপকথন থেকে তা স্পষ্ট হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'এরপর আমাকে নেওয়া হলো সপ্তম আসমানে। সেখানে আমি আমার পিতা ইবরাহীমের ﷺ সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর সাথে সালাম বিনিময় করলাম। তারপর আমাকে দেখানো হলো *বাইতুল-মা'মুর*।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে ইবরাহীম ﷺ *বাইতুল-মা'মুরে* হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। *'বাইতুল-মা'মুর'* এর নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা *বাইতুল-মা'মুরের* শপথ নিয়েছেন। কাবাঘর যেমন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ঘর, *বাইতুল-মা'মুরও* তেমন। তবে সেখানে ইবাদাত করে ফেরেশতারা। মুসলিমরা যেমন কাবার চারপাশে তাওয়াফ করে তেমনি ফেরেশতারা *বাইতুল-মা'মুরে* আল্লাহর ইবাদত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, প্রতিদিন *বাইতুল-মা'মুরে* সত্তর হাজার ফেরেশতা যায়। তারা আর কোনোদিনই সেখানে ফিরে আসে না।

বাইতুল-মা'মুরের ফেরেশতাদের সংখ্যার কাছে দুনিয়ার মানুষের সংখ্যা কিছুই না। মহাবিশ্বের সর্বত্র, চার আঙুল পরপর ফেরেশতারা ছড়িয়ে আছে। তারা রুকু অথবা সিজদায় আল্লাহর ইবাদাত করছে। এই সুবিশাল সৃষ্টির কাছে মানবজাতির সংখ্যা অতি নগণ্য।

ইবরাহীমের ﷺ *বাইতুল-মা'মুরে* হেলান দিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার ঘটনাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তিনিই দুনিয়াতে কাবা নির্মাণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেলেন তখন তাঁকে ফেরেশতাদের ঘর *বাইতুল-মা'মুরে* বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি সেখানে *সিদরাতুল মুনতাহা* দেখেছি। আরো কিছু দূর গিয়ে আমি *সিদরাতুল মুনতাহায়* পৌঁছলাম।' *সিদরাতুল মুনতাহা* একটি গাছ। এটি আসমানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এরপরেই শুরু রয়েছে আখিরাতের জীবন, জান্নাত, আল্লাহ তাআলার 'আরশ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এই বিশ্বের শেষ প্রান্ত হলো *সিদরাতুল মুনতাহা*। একটার পর একটা করে মোট সাত আসমান, সবশেষে রয়েছে *সিদরাতুল মুনতাহা*। এরপরেই শুরু হয়েছে অন্য একটি জগৎ, আখিরাতের আবাস।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনতাহায় পৌঁছে দেখলেন এর নিচ থেকে চারটি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি জিবরীলকে এ নদীগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। জিবরীল বললেন, 'দুইটি নদী দৃশ্যমান আর বাকি দুইটি নদী লুকোনো। যে দুইটি নদী দেখা যায় সেগুলো হলো নীলনদ ও ইউফ্রেটিস। আর লুকোনো নদীগুলো জান্নাতের নদী।' দুনিয়ার নীলনদ ও ইউফ্রেটিস এতটাই পবিত্র যে এই দুইটার সমতুল্য নদী আসমানে রয়েছে। আর এই গাছটি জান্নাতের এত কাছে যে জান্নাতের দুইটি নদী এর নিচ দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে।

এই সাত আসমানের আকার সম্পর্কে বলা আছে–প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি ছোট্ট আংটির মতো, দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমানের তুলনায় মরুভূমিতে পড়ে থাকা আংটির মতো এবং এভাবে পরেরগুলোও। আর সপ্তম আসমান কুরসির তুলনায় মরুভূমিতে একটি ছোট্ট আংটির মতো।

সর্বনিম্ন আসমানের তুলনায় কুরসি কতটা বিশাল তার কোনো ধারণাই মানুষের নেই। আমরা যে দুনিয়ায় আছি তা সর্বনিম্ন আসমানের মধ্যে অবস্থিত, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **"আমরা সর্বনিম্ন আসমানকে নক্ষত্ররাজি দিয়ে সজ্জিত করেছি"**, অর্থাৎ সমস্ত নক্ষত্ররাজি সর্বনিম্ন আসমানে অবস্থিত, আর সমস্ত নক্ষত্ররাজির সর্বশেষ সীমানায় মানুষ এখনো পৌঁছতে পারেনি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সুবিশাল সৃষ্টি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এটি ছিল অসাধারণ এক সফর। *সিদরাতুল মুনতাহা* অতিক্রম করে সামনে যাওয়ার পর তিনি আরো ওপরে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটাই ছিল তাঁর ভ্রমণের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি ফিরে আসছিলাম, পথিমধ্যে মূসার ﷺ সাথে দেখা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনাকে কী বলেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতকে প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার হুকুম দিয়েছেন। মূসা বললেন, আপনার উম্মত তা পালন করতে পারবে না। আমি আপনার আগে অনেক লোককে দেখেছি এবং আমার ক্বওম বনী ইসরাইলের সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। মানুষের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যান, সালাতের সংখ্যা কমিয়ে দিতে বলুন যাতে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ রাসূলের কথা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'সালাতের সংখ্যা কিছু কমিয়ে দিন।' আল্লাহ তাআলা সালাতের সংখ্যা দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ নতুন নির্দেশ নিয়ে নিচে নেমে আসছিলেন। তাঁর সাথে আবার মূসার দেখা হলো। মূসা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?', রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে খুলে বললেন । তখন মূসা বললেন, 'আবার ফিরে যান। সালাতের সংখ্যা আরও কিছু কমিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলাকে বলুন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার আল্লাহ তাআলার কাছে গেলেন, আরও দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেওয়া হলো। ফিরতি পথে মূসা তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে

জানালেন যে, আল্লাহ তাআলা সালাতের সংখ্যা কমিয়ে তিরিশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মূসা ﷺ সালাতের সংখ্যা আরও কমিয়ে আনার জন্য ফিরে যেতে বললেন। মুহাম্মাদ ﷺ আবারও ফিরে গেলেন এবং আরও দশ কমিয়ে দেওয়া হলো। মূসা একথা শুনে আবারও ফিরে যেতে বললেন। এবার কমিয়ে দশ করা হলো। মূসার উপদেশ অনুযায়ী মুহাম্মাদ ﷺ আবার গেলেন। এবার কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হলো। তিনি ফিরে এসে মূসাকে ﷺ তা জানালেন। মূসা ﷺ বললেন, 'মুহাম্মাদ, মানুষ সম্পর্কে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, আমি বনী ইসরাইলের সাথে ছিলাম। আপনার উম্মাতের জন্য এটাও কষ্টকর হবে। আপনি আবার ফিরে যান এবং আরও কমিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলাকে অনুরোধ করুন।' মুহাম্মাদ ﷺ বললেন, 'আবার অনুরোধ করতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আমি আর পারব না।'

মুহাম্মাদ ﷺ ও মূসার ﷺ ব্যক্তিত্বের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যগুলো আছে। মূসা সালাতের সংখ্যা কমানোর জন্য আল্লাহ তাআলার সাথে তর্ক করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। মূসা-ই ﷺ হচ্ছেন সেই নবী যিনি আল্লাহ তাআলাকে বলেছিলেন যে তিনি আল্লাহকে দেখতে চান। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন যার সুযোগ অন্য নবীরা পাননি। তারপরও মূসা শুধু কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, আল্লাহর সাথে দেখাও করতে চাইলেন! এর ফলে কী ঘটেছিল তা কুরআনে আছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। আবার তিনিই মৃত্যুর ফেরেশতাকে ঘুষি মেরেছিলেন। এতে সেই ফেরেশতার চোখ ভালোভাবেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সমস্ত নবী-রাসূলগণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই ছিল। কিন্তু তাদের একেকজনের ব্যক্তিত্ব একেকরকম ছিল। এদিকে, মুহাম্মাদ ﷺ সালাতের সংখ্যা কমানোর জন্য যেতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। এসময় তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, 'এটাই আপনার উম্মাতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে, তবে এর জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্তের পুরস্কার দেওয়া হবে।'

সেই একই রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াতে ফিরে আসেন। এরপর তিনি উম্ম আয়মানের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তিনি বলেন, 'আমি রাতে জেরুসালেম গিয়ে ফিরে এসেছি।' উম্ম আয়মান বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, এ কথা আপনি কাউকে বলবেন না। কেউ আপনার কথা বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে যে এটা অবাস্তব ঘটনা।' উম্ম আয়মান রাসূলুল্লাহকে ﷺ ঠিকই বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু তিনি আশঙ্কা করছিলেন অন্য লোকেরা এই কথায় বিশ্বাস নাও করতে পারে। আর কুরাইশ মুশরিকরা তো এ কথা নির্ঘাৎ উড়িয়ে দিবে। যেখানে জেরুসালেমে যেতে প্রায় এক মাস সময় লাগে সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতের মধ্যেই সে জায়গায় গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং ওই এক রাতেই সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসেছেন এবং এরই মধ্যে সাত আসমান ঘুরে দেখেছেন। তাই উম্ম আয়মান তাঁকে এ ঘটনা সবাইকে বলতে মানা করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না, আমি এ ঘটনা সবাইকে জানাবো। লোকেরা যা-ই বলুক না কেন আমি সত্য ঘটনা প্রচার করতে পিছপা হবো

না। এটা আমার ওপর অর্পিত দায়িত্বের একটি অংশ। আমার দায়িত্ব হচ্ছে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া।'

এ বিশাল ঘটনার তাৎপর্য ও এই ঘটনা নিয়ে লোকেদের প্রতিক্রিয়া সামলে নেওয়া কতটা কঠিন হবে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর ﷺ ধারণা ছিল, তিনি জানতেন বিষয়টা সহজ হবে না। তিনি বেশ চুপচাপ ও চিন্তিত ছিলেন। কয়েকজনকে এ ঘটনাটি জানালেন। এক পর্যায়ে তা আবু জাহেলের কাছে পৌঁছে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মসজিদে, লোকজন কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে তা নিয়ে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন। আবু জাহেল তাঁর কাছে এসে বললো,

- মুহাম্মাদ, কোনো নতুন সংবাদ আছে নাকি?

- হ্যাঁ, আছে। ﷺ

- কী সেই খবর?

- আমি গত রাতে জেরুসালেম গিয়ে আবার সেই রাতেই ফিরে এসেছি।

- জেরুসালেম?

- হ্যাঁ, জেরুসালেম।

- মুহাম্মাদ, আমি যদি এখনই তোমার লোকদের এখানে ডেকে আনি তাহলে কি তুমি তাদের সামনে ঠিক এ কথাটাই বলতে পারবে যা আমাকে এইমাত্র বলেছো?

- হ্যাঁ, অবশ্যই পারবো।'

আবু জাহেল বেশ খুশি মনে কুরাইশদের ডাকতে লাগলো, এটা ছিল তার জন্য মুহাম্মাদকে ﷺ পাগল প্রমাণ করার 'সুবর্ণ সুযোগ', সে সবাইকে ডাকলো, 'হে কুরাইশের লোকেরা, এদিকে এসো, শুনে যাও।' সবাই উপস্থিত হলে সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললো, 'হে মুহাম্মাদ, তুমি কিছুক্ষণ আগে আমাকে যা বলেছো তা তোমার লোকদেরকে শুনাও দেখি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনোরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা অস্বস্তি ছাড়াই তাদেরকে বললেন, 'আমি গতরাতে জেরুসালেম গিয়ে ফিরে এসেছি।' উপস্থিত লোকেরা এ কথা শুনে হাসাহাসি করতে লাগলো, শিস বাজিয়ে, হাততালি দিয়ে অবজ্ঞা করতে লাগলো। এ ঘটনা তাদের জন্য নতুন এক 'বিনোদন' এর জন্ম দিল।

পরিস্থিতি খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো, চারপাশের মানুষেরা এ ঘটনা নিয়ে মজা করছে, হাসিঠাট্টা করছে, হাততালি দিচ্ছে। সেখানে তখন এমন কিছু লোক ছিল যারা নিয়মিত জেরুসালেমে যেতো। তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ মসজিদের বর্ণনা দিতে বললো, জেরুসালেমের বর্ণনা দিতে বললো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি জেরুসালেমের বর্ণনা দেওয়া শুরু করলাম এবং একসময় আমি আটকে গেলাম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে খুব বেশি সময় কাটাতে পারেননি। তাই তিনি ওই জায়গার খুঁটিনাটি বর্ণনা মনে করতে পারছিলেন না।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে জেরুসালেম দেখালেন এবং আমি এর বিস্তারিত বর্ণনা তাদেরকে শোনাতে লাগলাম, প্রতিটা পাথরের, প্রতিটা ইটের।' তখন লোকেরা অবাক হয়ে গেল, তারা স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, তিনি একেবারে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। তবে ইবন ইসহাকের আরেকটি বর্ণনায় অন্য একটি জিনিসও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ফিরে আসছিলেন তখন তিনি কুরাইশদের একটি কাফেলা দেখতে পান। সেই কাফেলাটি তাদের একটি উট হারিয়ে ফেলেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভ্রমণকালে উপরে ছিলেন, তাই তিনি তাদের হারানো উটটি দেখতে পেয়ে তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের হারানো উটটি এই জায়গাতে আছে।' কাফেলার লোকেরা বুঝতে পারছিল না যে এই আওয়াজ কোথা থেকে আসছে। এরপর তিনি নীচে নেমে তাদের পানির পাত্র থেকে পানি খেয়েছিলেন। এই কাফেলার বর্ণনা তাঁর মনে ছিল।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রমাণস্বরূপ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'তোমাদের অমুক কাফেলাটি তমুক স্থানে আছে, তারা তাদের উট হারিয়ে ফেলেছিল। আমি তাদের পাত্র থেকে পানি পান করেছিলাম। কাফেলাটির সামনে একটি উট ছিল।' এরপর তিনি সেই উটের বর্ণনা দিলেন এবং উটের ওপর কী কী ছিল তাও বলে দিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ দেওয়া তথ্য যাচাই করার জন্য তারা তখনই কাফেলার কাছে কিছু লোক পাঠালো। এটি তখনো মক্কার বাইরে ছিল। পরে তারা মিলিয়ে দেখলো যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা যা বলেছেন তার সবই সত্য। কাফেলার লোকেরা উট হারিয়ে ফেলেছিল এবং আকাশ হতে আগত একটি আওয়াজ শুনে তারা তা খুঁজে পেয়েছিল। এমনকি তাদের কাছে যে খাওয়ার পানি ছিল তার পরিমাণও কিছু কমে গিয়েছিল। এতসব নিদর্শন আর প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থিত করা সত্ত্বেও তারা এ ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। মিরাজের ঘটনাটি হজম করা সবার জন্য এতটাই কষ্টকর ছিল যে, বেশ কিছু দুর্বল ঈমানের মুসলিম মুরতাদ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই ধরনের মু'জিযা তাঁর নবীদেরকেই দেখিয়ে থাকেন।

আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১. রাসূলুল্লাহর ﷺ বক্ষ বিদীর্ণ করার ঘটনা দুইবার ঘটেছে। যখন তিনি হালিমা সাদিয়ার কাছে ছিলেন তখন প্রথমবার এ ঘটনা ঘটে। সে সময় তাঁর বয়স একদম কম ছিল। আর দ্বিতীয়বার ঘটে *আল ইসরা ওয়াল মিরাজের* সময়। এখানে *ইসরা* মানে হলো রাতের ভ্রমণ আর *মিরাজ* অর্থ আরোহণ করা।

২. মূসার ﷺ সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথোপকথন বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তাআলা যখন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন তখন মুহাম্মাদ ﷺ তা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মূসার ﷺ সাথে তাঁর দেখা হলে তিনি তাঁকে বলেছেন, 'আপনার উম্মত তা পালন করতে পারবে না।' মূসা ﷺ তাঁর দীর্ঘদিনের নবুওয়াতের অভিজ্ঞতা থেকে এ উপদেশটি দিয়েছিলেন। এটাই

অভিজ্ঞতার মূল্য, তাত্ত্বিক জ্ঞানই সবকিছু নয়। অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে। মূসা ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলেছিলেন, 'মানুষের ব্যাপারে আমার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে, আপনি নতুন। কিন্তু আমি আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছি বনী ইসরাইলের মতো এক কওমের সাথে। তাই বলছি আপনার উম্মাত এত সালাত আদায় করতে পারবে না। আপনি গিয়ে তা কমিয়ে আনুন।' মূসা ﷺ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই রাসূলুল্লাহকে ﷺ এরকম উপদেশ দিয়েছিলেন। মূসার নিজ জীবন থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

যখন মূসা তাঁর চল্লিশ দিনের সাওম শেষে আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলতে গেলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানালেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাইলীরা বাছুরের উপাসনা করছে। এই কথা শুনে তিনি খুব তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। কিন্তু যখন তিনি নিজ চোখে এই দৃশ্য দেখলেন, তখন তিনি রাগে ফেটে পড়েন আর আল্লাহর কাছ থেকে সদ্য পাওয়া ফলকগুলো হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলেন। এর কারণ হলো, কোনো কিছু শোনা আর দেখার মধ্যে পার্থক্য আছে।

আল্লাহ তাআলা যখন নবীজিকে ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করে দিলেন তখনও মূসা ﷺ বলেছেন যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করাও এই উম্মাতের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়বে। মূসা আসলে ঠিকই বলেছিলেন। বর্তমানে মুসলিমদের অধিকাংশই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও ঠিক মতো আদায় করে না। অনেকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী সালাত আদায় করে, অর্থাৎ কিছু আদায় করে আবার কিছু বাদ দেয়। আল্লাহ মূসার ওপর রহম করুন যিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য সালাতকে সহজ করে দিয়েছেন। যদি প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা লাগত তবে তা কতই না কষ্টকর হতো! মূসা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে নবী-রাসূলদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল তাতে কোনোরকম হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না, বরং তাঁরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখে মূসার কেঁদে ফেলার কারণ ছিল তিনি জানতেন রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসারীর সংখ্যা তাঁর অনুসারী থেকে অনেক বেশি হবে, কিন্তু তারপরও তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁর উম্মাতের সুবিধার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতিও তাঁর সহানুভূতিমূলক মনোভাব ছিল। আল্লাহ তাআলার সকল নবী একে অপরকে ভালোবাসেন। তাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা ছিল একে অপরকে ভালোবাসার প্রতিযোগিতা।

শেষ বিচারের দিনে বিভিন্ন নবী-রাসূলদের অনুসারীর সংখ্যা হবে বিভিন্ন রকম। কারো সাথে দশ জন অনুসারী থাকবে, আবার কারো সাথে পাঁচ জন, কারো সাথে মাত্র একজন, আবার কোনো নবী উপস্থিত হবেন একা। এমন নবী থাকবেন যিনি সারা জীবন ধরে মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করেছেন কিন্তু কেউই তাদের এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিয়ামতের দিন এক বিশাল জনসমুদ্র দেখে ভাববেন এটা তাঁর উম্মত, কিন্তু সেটি হবে মূসার উম্মাত, রাসূলুল্লাহর ﷺ উম্মতের সংখ্যা হবে আরো বেশি।

৩. আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা থেকে আরেকটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো সালাতের গুরুত্ব। ইসলামের সকল ইবাদাতের আদেশ নাযিল হয়েছে দুনিয়ার বুকে, জিবরীলের মাধ্যমে। কিন্তু একমাত্র সালাতের হুকুম আল্লাহ তাআলা সরাসরি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে একান্ত সাক্ষাতে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। মূসা ﷺ যখন তূর পর্বতের ওপর আল্লাহ তাআলার সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন তখন আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলের জন্য সালাতের বিধান নির্ধারণ করে দেন, অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলা সালাতের নির্দেশ তাঁর রাসূলকে ﷺ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

> **"আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" (সূরা ত্ব-হা, ২০: ১৪)**

আর ওই সময়েই মূসা ﷺ রিসালাতের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে রাসূল হওয়ার পরপরই মূসাকে সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও পরে সালাতের নির্দেশ। এতেই বুঝা যায় যে, সালাত মুসলিমদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত আদায় না করা।' এমনকি ঠিক সময়ে সালাত আদায় না করাও একটি গুনাহ।

> **"তাদের পর তাদের অপদার্থ বংশধরেরা এল। তারা সালাত নষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।" (সূরা মারইয়াম, ১৯: ৫৮)**

যারা সালাতকে অবহেলা করেছে অর্থাৎ সালাত আদায় করেনি আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা করেছেন। ইবন আব্বাস এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, এখানে ওইসব লোকদের কথা বলা হয়নি যারা কিনা সালাত একদমই আদায় করে না, বরং সেসব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা অর্ধেক সালাত আদায় করে। ইবন খাত্তাব বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি ফরয সালাত ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় তবে সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল, যদিও এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এই ব্যাপারে সবাই একমত যে সালাত ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এ বিধান থেকে কেউই পার পাবে না। আর্থিক সামর্থ্য বা সাথে যাওয়ার মতো (নারীদের ক্ষেত্রে) কেউ না থাকলে হজ্ব মাফ করে দেওয়া হয়, অসুস্থতা বা বয়সজনিত সমস্যার কারণে সাওম মাফ করে দেওয়া হয়েছে আর নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ না থাকলে কাউকে যাকাত আদায় করতে হয় না, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সালাত ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

কেউ যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারে তবে বসে আদায় করবে, বসে আদায় করতে না পারলে শুয়ে আদায় করবে, শুয়ে আদায় করতে না পারলে আঙুল দিয়ে ইশারায় সালাত পড়বে। আর যদি তাও করতে না পারে তাহলে চোখের ইশারায় সালাত আদায় করবে। অবস্থা যাই হোক না কেন সালাত আদায় করতেই হবে। যতক্ষণ জ্ঞান আছে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই, এমনকি যুদ্ধ

চলাকালীন সময়ও সালাত আদায় করতে হবে। সালাত হলো এমন একটি ইবাদত যা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কোনো অজুহাতই কার্যকর হবে না। মুসলিম আলিমগণ বলেছেন যে শত্রুপক্ষের ওপর নজরদারি করার সময় আঙুল দিয়ে ইশারায় সালাত আদায় করা যাবে।

৪. এ সফর আমাদেরকে পবিত্র ভূমি জেরুসালেমের গুরুত্ব জানিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ইসরা-তে বলেছেন,

> **"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত – যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।" (সূরা ইসরা, ১৭: ১)**

জেরুসালেমের কর্তৃত্বের ব্যাপারে মু'মিনদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমের ﷺ কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে, জেরুসালেমের অভিভাবকত্ব ইবরাহীমের ﷺ উত্তরসূরিদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই ওয়াদা বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন নবী-রাসূলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। মূসাকেও ﷺ জেরুসালেমের কর্তৃত্ব দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছিল, তবে তিনি সেটা তাঁর জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি, তাঁর উত্তরসূরি ইউশা ইবন নুনের জীবদ্দশায় জেরুসালেমের কর্তৃত্ব মু'মিনদের হাতে দেওয়া হয়। বনী ইসরাঈল যতদিন পর্যন্ত সত্য পথের অনুসারী ছিল ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই পবিত্র ভূমিতে অবস্থান করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল, নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিল, তাদেরকে খুন করতে লাগল, এমনকি ঈসাকে ﷺ হত্যা করার চেষ্টা চালালো তখনই আল্লাহ তাআলা তাদের কাছ থেকে জেরুসালেম কেড়ে নিলেন এবং এই পবিত্র ভূমির দায়িত্ব ইসমাইলের ﷺ উত্তরসূরিদের ওপর অর্পণ করলেন। আর এ কারণেই জেরুসালেম এখন মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মাতের ভূমি। যুগ যুগ ধরে নবী-রাসূলগণ যে বাণী প্রচার করেছেন, সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ সেই একই বাণীর বাহক। এখন তিনিই আদমের ﷺ সমস্ত সন্তানের নেতা। যে কারণে বনী ইসরাইলকে জেরুসালেমের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই একই কারণে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে জেরুসালেমের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণটি হলো তাওহীদ।

মূসা ﷺ যেমন তাঁর জীবদ্দশায় জেরুসালেম জয় করতে পারেননি কিন্তু তাঁরই অনুসারী ইউশার ﷺ সময় তা মুসলিমদের কর্তৃত্বে আসে, ঠিক তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় জেরুসালেম জয় করতে না পারলেও উমার ইবন খাত্তাবের ﷺ শাসনামলে তা মুসলিমদের অধীনে চলে আসে। জেরুসালেমের তৎকালীন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার সাহস করেনি, তবে মুসলিমরা যখন জেরুসালেমের গেটে পৌঁছল তখন তারা বললো, 'আমরা মুসলিমদের খলিফা ছাড়া অন্য কারো কাছে আত্মসমর্পণ করব না। চাবি নেওয়ার জন্য তাঁকেই এখানে আসতে

হবে।' এজন্য উমার ইবন খাত্তাব ﵁ জেরুসালেমের চাবি নেওয়ার জন্য মদীনা থেকে জেরুসালেমে এসেছিলেন।

৫. নবুওয়াতের দশম বছর ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য কষ্টের সময়, তাই এই সময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই ভ্রমণের সুযোগ দিয়েছেন। এ ভ্রমণে জিবরীল ﵇ ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। এ ভ্রমণে তিনি পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের সাথে দেখা করার সুযোগ পান। এ ভ্রমণ ছিল যেন সত্যিকারের এক বিস্ময়-রাজ্যে ভ্রমণ। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে শেষ পর্যন্ত তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-কাউসার নামে একটি নদী দেখেছিলেন। এটি তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এই নদী ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি এক বিশেষ উপহার। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি"–এর মানে হলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কষ্টের জন্য উত্তম পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন। একজন মুসলিম যত কষ্টের মধ্য দিয়েই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কষ্টের বিনিময়ে তার জন্য কিছু না কিছু বরাদ্দ করে রেখেছেন যা সে এই দুনিয়া অথবা পরকালে পাবে। সুতরাং একজন মুসলিমের কখনই ভেঙে পড়া উচিত না।

৬. আবু বকরের ﵁ মর্যাদা: কুরাইশের লোকেরা যখন আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল তখন আবু বকর ﵁ সেখানে ছিলেন না। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কেউ একজন তাঁর কাছে গিয়ে বললো, 'আপনি জানেন কী হয়েছে? মুহাম্মাদ ﷺ দাবি করেছেন যে, তিনি এক রাতের মধ্যেই জেরুসালেম গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন।' এরপর আবু বকর ﵁ বলেছিলেন, 'যদি তিনি একথা দাবি করে থাকেন–তাহলে তা অবশ্যই সত্য।' এরপর আবু বকর ﵁ যখন জানতে পারলেন যে মুহাম্মাদ ﷺ আসলেই এ দাবি করেছেন, তখনই তিনি এ ঘটনাকে বিনা দ্বিধায় সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

লক্ষণীয় হলো আবু বকরের ﵁ উক্তির প্রথম অংশ, 'যদি তিনি একথা বলে থাকেন...' –এই কথার মাধ্যমে হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। যে কেউ হাদীস বর্ণনা করলেই তা গ্রহণ করা যাবে না। বরং আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আসলেই তা বলেছেন কি না। মুসলিম ও আহলে কিতাবদের মধ্যে মূল পার্থক্য আসলে এখানেই। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের যা বলা হতো তাই তারা কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়া গ্রহণ করতো, যদিও তাদের প্রকৃত কিতাব আগেই পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মুসলিমদের রয়েছে আলাদা এক শাস্ত্র, যেখানে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে কার বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য তা বের করার জন্য হাজার হাজার ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে পড়াশোনা করা হয়।

৭. আবু বকরের উক্তির দ্বিতীয় অংশ, '...তাহলে তা সত্য', রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি আবু বকরের এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাসূল ﷺ যা-ই বলতেন তিনি তা-ই বিশ্বাস করতেন এবং এ কারণেই তাঁকে বলা হত 'আস সিদ্দীক'।

নবীজির ﷺ জীবনে সবচেয়ে বিষাদময় দিন - আত তাইফ

আবু তালিবের মৃত্যুর সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিরাপত্তার ঢালটি হারিয়ে ফেলেন। মক্কায় ইসলামি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তিনি মক্কার বাইরে দাওয়াতের কাজ সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে তাইফে যান। তাঁর সাথে ছিলেন যাইদ ইবন হারিসা رضي الله عنه। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাইফের নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী সাক্বীফের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারা ছিল তিন ভাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন, তাদের সমর্থন ও সাহায্য কামনা করলেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ আহ্বানে এই তিনজন লোকের প্রতিক্রিয়া ছিল রীতিমতো জঘন্য। প্রথমজন বললো, 'তুমি যদি আল্লাহর প্রেরিত নবী হয়ে থাকো তাহলে আমি কাবাঘরের গিলাফ ছিঁড়ে ফেলব।' কাবার গিলাফ তাদের কাছে খুবই পবিত্র ছিল। দ্বিতীয়জন বলেছিল, 'আল্লাহ্ কি তোমার চেয়ে ভালো আর কাউকে পেলেন না?' আর তৃতীয় ভাই বলেছিল, 'তোমার সাথে আমি কোনো কথাই বলবো না। যদি তুমি সত্যই নবী হয়ে থাকো, তাহলে আমি মনে করি না তোমার সাথে কথা বলার যোগ্যতা আমার আছে। আর যদি তুমি আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত রাসূল না হয়ে থাকো তাহলে তুমি মিথ্যাবাদী এবং আমার পক্ষে কোনো মিথ্যুকের সাথে কথা বলা সম্ভব না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দশদিন অবস্থান করলেন, দশদিন ধরে তিনি তাইফের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে যান এবং প্রত্যেককে দ্বীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু তাদের এক কথা, 'বের হয়ে যাও।' তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে, আপনারা যদি আমার আহ্বানে সাড়া না দেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। তবে আমি চাই আমাদের মধ্যে যে আলাপ হয়েছে তা আপনারা মক্কার লোকেদের কাছে গোপন রাখবেন।' [41]

কিন্তু এই সাক্বীফের লোকেরা ছিল এতটাই খারাপ যে তারা কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলেপেলেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা গালাগাল করতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যাইদ ইবন হারিসাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগল, তাদেরকে ধাওয়া করতে লাগল। তাঁরা দুইজন দৌড়াতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য যাইদ ইবন হারিসা رضي الله عنه নিজের শরীরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁরা একটি আবাদি জমিতে গিয়ে আশ্রয় নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ গুরুতর আহত। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। সাক্বীফের অধিবাসীদের পাথরের আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল, তাঁর পায়ের রক্তে জুতো ভিজে গিয়েছিল।

---

[41] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্রয় নেন মক্কার একটি বাগানে, তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে আঙ্গুর গাছের ছায়ায় বসলেন। তাঁর মন প্রচণ্ড খারাপ, তাইফে তিনি এভাবে প্রত্যাখ্যাত হবেন আশা করেননি। প্রচণ্ড কষ্ট আর মনোবেদনা থেকে তিনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুআ করলেন, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আর আবেগময় একটি দুআ, যা মুস্তাদআফিনের দুআ নামে পরিচিত।

'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতা সম্পর্কে অভিযোগ করছি। দয়ালু দাতা, তুমি দুর্বলদের রব, তুমি আমারও রব, তুমি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছ? আমাকে কি এমন কারও কাছে ন্যস্ত করছ, যে আমার সাথে রুক্ষ ব্যবহার করবে? নাকি কোনো শত্রুর হাতে ন্যস্ত করছ যাকে তুমি আমার বিষয়ের মালিক করে দিয়েছ? যদি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোনও দুঃখ নেই, আফসোসও নেই। তোমার ক্ষমাশীলতা আমার জন্য প্রশস্ত ও প্রসারিত কর। আমি তোমার ক্রোধ ও অভিশাপ থেকে তোমার সে আলোয় আশ্রয় চাই যা দ্বারা সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়। দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল বিষয় তোমার হাতে ন্যস্ত। সকল ক্ষমতা এবং শক্তি শুধু তোমারই। তোমার শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।' [42]

আল্লাহ তাআলা এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য সাহায্য পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় বেশ ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে সেই আবাদি জমির মালিকেরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তারা তাদের খ্রিস্টান ক্রীতদাস আদ্দাসকে আদেশ দিল যেন সে মুহাম্মাদকে ﷺ কিছু আঙ্গুর খেতে দেয়। এই জমির মালিকরা ছিল মক্কা থেকে আগত। তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরোধী মতাদর্শের ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক এলাকার মানুষ হওয়ায় তারা সে সময় রাসূলুল্লাহকে ﷺ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে খ্রিস্টান ক্রীতদাস আদ্দাস রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য আঙ্গুর নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার পূর্বে বললেন, 'বিসমিল্লাহ', এতে আদ্দাস বেশ অবাক হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'আপনি যা বললেন তা এই দেশের লোকেরা বলে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যে আদ্দাস একজন ভিনদেশী এবং অন্য ধর্মের অনুসারী। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ? তোমার দ্বীন কী?' আদ্দাস উত্তর দিল, 'আমি খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। আমার বাড়ি ইরাকের নিনেভাতে।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি তো ইউনুস ইবন মাত্তার গ্রাম থেকে এসেছ। তিনি আল্লাহ তাআলার নবী ছিলেন।' আদ্দাস বললো, 'আপনি কীভাবে মাত্তার পুত্র ইউনুস সম্পর্কে জানলেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনি একজন নবী ছিলেন আর আমিও একজন নবী।' এ কথা শোনামাত্র আদ্দাস সম্মানবশত নিচু হয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ পায়ে চুম্বন করে। এরপর তাঁর হাত ও মাথায়

---

[42] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫।

চুম্বন করে।

জমির মালিকেরা এই দৃশ্য দেখে বললো, 'দেখেছো! সে আমাদের দাসকেও বশ করে ফেলেছে।' রাসূলুল্লাহর ﷺ অভ্যাস ছিল তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই দাওয়াহ দিতেন। আর এদিকে যে দুটি লোক কিছুক্ষণ আগে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল, তারাই এখন আদ্দাসের চুমু খাওয়ার দৃশ্য দেখে আফসোস করতে লাগলো। আদ্দাস ফিরে এলে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কী হয়েছিল? তুমি কেন তাঁর হাত ও মাথায় চুমু দিচ্ছিলে?' আদ্দাস বললেন, 'এই দুনিয়াতে তাঁর মতো ভালো মানুষ আর নেই। তিনি আমাকে এমন কিছু বলেছেন যা একজন নবী ছাড়া কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।' তখন এই দুইজন লোক তাঁকে বললো, 'তুমি তাঁর কথায় নিজের দ্বীন ত্যাগ করো না। তোমার দ্বীন তাঁর দ্বীনের চেয়ে উত্তম।' এই লোকগুলো খ্রিস্টান ছিল না, খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু তাদের মনে ইসলামবিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে তারা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার জন্য যা খুশি তা বলতো, এমনকি না-জেনেও মিথ্যা বলতেও দ্বিধা করতো না, ইসলামেই ছিল তাদের যাবতীয় এলার্জি।

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে তাইফের দিন ছিল সবচেয়ে বিষাদমাখা দিন। বহুদিন পরের কথা, আ'ইশা জানতে চাইলেন, 'ইয়া আল্লাহর রাসূল! উহুদের দিনের চাইতে মারাত্মক কোনো দিন কি আপনার জীবনে আপনি দেখেছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> *'হ্যাঁ, দেখেছি। সেটি ছিল তাইফের দিন। আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা গ্রহণ করেনি। আমি সেদিন মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত। মাঝপথে এসে দেখি মাথার ওপর এক টুকরো মেঘ। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখি জিবরীল। তিনি আমাকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে যা যা বলেছে সবই আল্লাহ তাআলা শুনেছেন। আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাদের পাঠানো হয়েছে। এরপর পাহাড়ের ফেরেশতারা আমাকে সালাম জানালেন, বললেন, ইয়া আল্লাহর রাসূল ﷺ, আপনি যদি চান, ওদেরকে দুই পাহাড়ের মধ্যে পিষে দেবো।*
>
> *আমি বললাম, না, আমি আশা করি আল্লাহ তাআলা তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।'* [43]

আসমান থেকে সাহায্য পেয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ মন শান্ত হলো। আবার তিনি চলতে শুরু করলেন, থামলেন ওয়াদীয়া নাখলায়। সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করলেন। একদিন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, সে এলাকায় ছিল কিছু জ্বীন, তাঁর

---

[43] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬।

তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলো। তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে কুরআনের আরও কিছু আয়াত শিখে এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিম হয়ে যায়।

জ্বীন মানব জাতির মতোই আল্লাহ তাআলার এক সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন। তারা মানুষের সাথে এই দুনিয়াতে বাস করে, মানুষের মতো তাদেরও সমাজব্যবস্থা আছে। তারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং তাদের পরিবার আছে। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ করে। তাদের আর মানুষের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, তারা আগুনের তৈরি আর মানুষ মাটির তৈরি, তারা মানুষদেরকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ তাদেরকে দেখতে পায় না।

শেষ পর্যন্ত সেই জ্বীনরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে মুসলিম হয়ে গেল। এরকম আরো একটি ঘটনা রয়েছে যেখানে জ্বীনরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ ঘটনাটি কুরআনে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা জ্বীনে একবার উল্লেখ করা হয়েছে ও আরেকবার উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আহকাফে।

> "স্মরণ করুন, আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বীনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হলো; তারা একে অপরকে বলতে লাগলঃ চুপ করে শোনো। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে। তারা বলেছিলঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।" (সূরা আহকাফ, ৪৬: ২৯-৩০)

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, 'জ্বীনরা বলেছে তারা এমন এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছে যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে। কিন্তু কুরআন আসার আগে তো ঈসার ﷺ ওপর কিতাব নাযিল হয়েছে, তাহলে কেন তারা ঈসার কথা বলেনি?'–কুরআনের একজন তাফসীরকার এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'ওই জ্বীনরা ছিল ইহুদি। তারা ছিল মূসার ﷺ অনুসারী। যখন তারা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেল তখন তারা বললো যে কুরআন মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে।' সেই মুফাসসির বলেছেন যে এই জ্বীনরা ইয়েমেনের অধিবাসী ছিল আর ইয়েমেনে তখন কিছু সংখ্যক ইহুদি বাস করতো। তবে এই আয়াতের ব্যাপারে এটাই একমাত্র মত, তা নয়। জ্বীনরা আরো বললো,

> "হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদের রক্ষা করবেন। যদি কেউ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে এ যমীনে আল্লাহকে ব্যর্থ করে দেওয়ার মতো কোনো ক্ষমতাই সে রাখে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারা তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" (সূরা আহকাফ, ৪৬: ৩১-৩২)

জ্বীনদের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় সাহায্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বস্তি লাভ করলেন এবং উদ্দীপনার সাথে তাঁর মিশনে মনোযোগ দিলেন।

তাইফের ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. রাসূলুল্লাহকে ﷺ লক্ষ করে যখন তাইফের লোকেরা পাথর ছুঁড়ছিল তখন তাঁকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করছিলেন যাইদ ইবন হারিসা ﷺ। নিজের শরীরকে তিনি বর্ম হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। উহুদের যুদ্ধেও একই রকম ঘটনা দেখা যায়। সেই যুদ্ধে সাহাবীরা ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ পাথরের আঘাত নয়, বরং তীরের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের পিঠ পেতে দিয়েছিলেন। এই হলো আল্লাহর রাসূলের ﷺ জন্য সাহাবীদের ﷺ ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত। আজকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নেই, নিজেদের শরীর আর রক্ত দিয়ে তাঁকে বাচানোর সুযোগ হয়তো নেই, কিন্তু তাঁর অবমাননার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো, তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারগুলোর জবাব দেওয়ার সুযোগ এখনো আছে। যে দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন, সেই দ্বীনকে রক্ষা করা, সেই দ্বীনের প্রচার ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাঁর সম্মানে নিজেদেরকে বিলিয়ে দেওয়ার সুযোগ এখনো খোলা আছে। বিখ্যাত তাবেঈ আবু মুসলিম আল খাওলানি বলেছেন, 'সাহাবীরা ﷺ কি মনে করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু তাদেরই, আর কারো নয়? রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর অধিকার কেবল তাদেরই, আর কারো নয়? না, বরং আমরা তাদের সাথে পাল্লা দেব। রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর আমাদেরও অধিকার রয়েছে আর আমরা তা আদায় করে নিতে চাই।'

রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য যাইদ বা তালহা যা করেছিলেন আজ মুসলিমরা হয়তো সেইরকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে হবে না, অন্তত চেষ্টা করতে হবে। মুহাম্মাদের ﷺ জীবন সম্পর্কে জানতে হবে এবং তা অন্যান্যদেরকেও জানাতে হবে, যাতে সবাই তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁর অনুসরণে আগ্রহী হয়।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাইফবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, উল্টো তাঁকে বের করে দেয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কথা বলে গেছেন, 'ভালো কাজ করে যাও, কেননা তুমি কখনোই জানো না তোমার কাজের ফলাফল কী' – অর্থাৎ, একটি ভালো কাজ কারো চোখে হয়তো তুচ্ছ লাগতে পারে কিন্তু সেই কাজের ফলাফল হতে পারে অনেক বড় কিছু, আর সেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না, তাই কোনো সৎকাজকেই তুচ্ছ করা উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাইফবাসী প্রত্যাখ্যান করেছিল, তা দেখে তিনি হয়তোবা ভেবে থাকতে পারেন যে তাঁর এই দাওয়াত লোকেদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেখানে দাওয়াহ দিচ্ছিলেন সেখানে খালিদ আল উদওয়ান নামে একটি ছোট্ট ছেলে ছিল, সে ছিল খাতীফ বংশের সন্তান। সেই খালিদ বহুদিন পর নিজের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, 'তাইফের মেলা চত্বরে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে

ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। আমি সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং তাঁর কথা শুনছিলাম। আমি তাঁকে সূরা আত-তারিক তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি তখনই এই সূরাটি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম যদিও আমি তখন কাফির ছিলাম। পরবর্তীতে আমি ইসলাম গ্রহণ করি।' যেখানে উপস্থিত বয়স্ক লোকেরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কথায় কান দিচ্ছিল না সেখানে এক ছোট বাচ্চা তাঁর তিলাওয়াত শুনে শুনেই একটি সূরা মুখস্থ করে ফেলে। আর কয়েক বছর পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফল দেখতে পেয়েছিলেন।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খ্রিস্টান ক্রীতদাস আদ্দাসের মধ্যকার ঘটনাটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। একজন মুসলিমের সাদাসিধে একটি আমলও যে দাওয়াতের আমলে রূপান্তরিত হতে পারে -- এই ঘটনা তার একটি চমৎকার উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়া শুরু করেছিলেন 'বিসমিল্লাহ' বলে, আর এই "বিসমিল্লাহ" শব্দটিই আদ্দাসের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আদ্দাস আগে এরকম কিছু শুনেনি, তাই সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো আর এই কথার সূত্র ধরেই রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তার আলাপচারিতা শুরু হয়। তাঁর কাছ থেকে আদ্দাস এমন কিছু জানতে পেরেছিলে যা তাঁকে রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং ছোট ছোট কাজও মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। ফলে সে ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত অনেকেই এভাবে ইসলামের দরজা খুলে দ্বীনে প্রবেশ করে। সাহাবীদের ﷺ কথাবার্তা, ব্যবহার ও চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করতো।

নতুন ভূমির সন্ধানে: হিজরত

বিভিন্ন গোত্রের প্রতি আহ্বান

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় প্রবেশ করা তাঁর জন্য সহজ ছিল না কারণ তাইফের কাহিনি মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ওই সময় একাকী মক্কায় প্রবেশ করা তাঁর জন্য নিরাপদ ছিল না। তাই তিনি নিজ শহরে প্রবেশ করার জন্য নিরাপত্তা চেয়ে উরাইক্বাতের মাধ্যমে আল আখনাস ইবন শুরাইকের কাছে সংবাদ পাঠালেন।

আখনাস ইবন শুরাইক ছিল মক্কার লোক, তার সাথে কুরাইশদের মিত্রতা ছিল যদিও সে তাদের গোত্রের ছিল না। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে আল আখনাস বললো, 'আমি যেহেতু কুরাইশদের মিত্র, কুরাইশদের কথার বাহিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কাউকে আমি আশ্রয় দিতে পারি না যে আমার বন্ধুর শত্রু।' সে রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুরোধ ফিরিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহাইল ইবন আমরের কাছেও একই সংবাদ পাঠালেন। সুহাইল ইবন আমরও তাঁকে ফিরিয়ে দিল, 'আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারবো না, কারণ আমর ইবন লুহাই বংশের হয়ে আমি এমন কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারি না যে কা'ব ইবন লুহায়ের বংশভুক্ত।' এ দুই বংশের মধ্যে রেষারেষি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবার মুতইম ইবন আদীর কাছে নিরাপত্তা চেয়ে সংবাদ পাঠালেন। মুতইম ইবন আদী এ অনুরোধ গ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহকে ﷺ নিরাপত্তা দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাড়িতে গেলেন এবং সেখানেই রাতে অবস্থান করলেন।

আল মুতইমের ছিল ছয় বা সাত সন্তান। সে তাদেরকে আদেশ দিল যেন তারা পরের দিন সকালে বিশেষ পোশাক পরিধান করে প্রস্তুত থাকে। এরপর তারা বাবার নির্দেশক্রমে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বেষ্টনী দিয়ে কাবার দিকে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফ করা শুরু করলেন। আল মুতইম ও তার ছেলেরা নির্দিষ্ট দূরত্বে বসে তাঁকে পাহারা দিতে থাকল। এসময় আবু সুফিয়ান মুতইমের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি তাঁকে শুধু নিরাপত্তা দিচ্ছ নাকি তাঁকে অনুসরণও করছ?' মুতইম বললো, 'আমি তাঁকে অনুসরণ করছি না, শুধু তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছি।' এরপর আবু সুফিয়ান বললো, 'তাহলে ঠিক আছে, যদি শুধু নিরাপত্তা দিয়ে থাকো তাহলে আমাদের আপত্তি নেই।' [44]

---

[44] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৭।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুতইমের আশ্রয়ে থেকে মক্কায় দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেলেন। আবু তালিব ও খাদিজার ؓ মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষ্য করলেন যে, মক্কায় ইসলামের দাওয়াত স্তিমিত হয়ে পড়েছে। যদিও মানুষ ধীরে ধীরে ইসলামে প্রবেশ করছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা মক্কায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি ঘাঁটি বা কেন্দ্রীয় ভূমির প্রয়োজন অনুভব করলেন যেখানে তিনি স্বাধীনভাবে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জের মৌসুমে মক্কায় আগত আরবের বিভিন্ন নেতার সাথে সাক্ষাৎ করা শুরু করলেন। তিনি তাদের ছাউনিতে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, নিজের নবী-পরিচয় তুলে ধরতেন এবং তাঁকে আশ্রয় ও সমর্থন দেওয়ার জন্য আহ্বান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলতেন,

> *'আপনাদের উপর জোর খাটানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আপনারা চাইলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন, তবে আপনাদের উপর কোনো জোরাজুরি করবো না। আমি শুধু আমার শত্রুদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাই, আমি চাই আমার রব আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পূরণ করতে পারি এবং তিনি আমার ও আমার অনুসারীদের ব্যাপারে যে ফয়সালা করেন তা মেনে নিতে পারি।'*

কিন্তু সবাই তাঁকে ফিরিয়ে দিল, কেউই তাঁকে নিরাপত্তা ও সমর্থন দিতে রাজি হলো না। সবগুলো গোত্রের নেতা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো, 'তার গোত্রের লোকেরাই তাঁকে সবচেয়ে ভালো চেনে। এমন লোককে আমরা কীভাবে আশ্রয় দিতে পারি যে তার নিজের গোত্রের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং গোত্রের লোকেরাই তাঁকে বের করে দিয়েছে। যেহেতু তার স্বগোত্রীয়রাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কাজেই আমরাও এই লোককে আশ্রয় দেব না।' মোটামুটিভাবে সবগুলো গোত্রই তাঁকে এভাবে ফিরিয়ে দিল।[45]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিন্দা বংশের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলেন কিন্তু তারা তা গ্রহণ করলো না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ গেলেন বনু আবদুল্লাহর কাছে, তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন এবং বললেন, 'দেখো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য কত সুন্দর একটি নাম ঠিক করেছেন, তোমরা হলে আবদুল্লাহর (আল্লাহর বান্দার) পুত্র।' কিন্তু অন্যান্যদের মতো তারাও তাঁকে ফিরিয়ে দিল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ গেলেন বনু হানিফা গোত্রের কাছে। তারা তাঁর সাথে প্রচণ্ড বাজে ব্যবহার করলো, আয-যুহরি এ ব্যাপারে বলেছেন, 'বনু হানিফার মতো এত রূঢ় আচরণ আর কোনো গোত্র রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে করেনি।' এই বনু হানিফা গোত্রই কয়েক বছর পরে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর কিছুদিন আগেই এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এর পরিসমাপ্তি ঘটে আবু বকর সিদ্দীকের ؓ

---

[45] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬১।

খিলাফতকালে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল মুসাইলামাহ আল কাযযাব। সে নিজেকে নবী দাবি করেছিল।

এরপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু আমর ইবন সাসা গোত্রের সেনাছাউনিতে গেলেন। এই গোত্রের নেতা ছিল বুহায়রা ইবন ফারাস। সে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করলো এবং তাঁর কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেল। সে বললো, 'আমি কসম খেয়ে বলছি, যদি কুরাইশের এই সাহসী যুবক আমার সাথে থাকত তাহলে আমি তাকে পুঁজি করে আরবদের শেষ করে দিতাম।' পুরো বিষয়টির মাঝে বুহায়রা ক্ষমতার গন্ধ পাচ্ছিল। সে দেখল যে মুহাম্মাদের ﷺ মধ্যে এমন কিছু অসাধারণ গুণাবলি রয়েছে যার কারণে তিনি আর সবার থেকে আলাদা, তাঁর মতো লোককে নিজের পক্ষে পাওয়া গেলে পুরো আরব জয় করা সহজ হয়ে যাবে। বুহায়রা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, যদি আমরা আপনাকে মেনে চলি আর আল্লাহর ইচ্ছায় শত্রুদের বিপক্ষে আপনি জয়লাভ করেন, তাহলে কি আপনি মারা যাওয়ার পর আমরা ক্ষমতায় যাবো?'

আল্লাহর রাসূল ﷺ এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই ক্ষমতা দেবেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়েছেন, ক্ষমতায় কে আছে তা আসল কথা নয়, আসল কথা হলো দ্বীনের বিজয়। আল্লাহ তাআলাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এ কথা শুনে বুহায়রা বললো, 'তাহলে আমাদের কী দায় পড়েছে যে আমরা আরবদের বিরুদ্ধে গিয়ে আপনাকে নিরাপত্তা দেব? আমরা আপনার জন্য যুদ্ধ করবো আর আপনি বিজয়ী হলে অন্য কারো হাতে ক্ষমতা চলে যাবে আর আমরা বসে বসে দেখবো?' বুহায়রাও রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল।

বনু আমর ইবন সাসা হাজ্জ থেকে নিজ দেশে ফিরে গেল। তাদের মধ্যে একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যিনি বার্ধক্যের কারণে হাজ্জে যেতে পারতেন না, কিন্তু কেউ হাজ্জ থেকে ফিরে আসলে তিনি তাদেরকে হাজ্জে কী কী ঘটেছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। তারা তাঁকে জানালো, 'এক যুবকের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল। তিনি হলেন কুরাইশের আবদুল মুত্তালিবের নাতি। তিনি নিজেকে আল্লাহর নবী হিসেবে দাবি করেছিলেন কিন্তু আমরা তাঁকে পাত্তা দিই নি।' এ কথা শুনে সেই বৃদ্ধ লোক মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'হায়! হায়! এ তোমরা কী করলে! যে ভুল করেছো তা শোধরাবার কোনো উপায় আছে কি? আছে কোনো উপায় বিষয়টি সমাধা করার? আমি কসম করে বলছি, ইসমাঈলের কোনো উত্তরসূরি আজ পর্যন্ত এরকম কোনো মিথ্যা দাবি করেনি। কুরাইশের সেই যুবক যা দাবি করেছে তা অবশ্যই সত্য। কোথায় গেল তোমাদের বিচারবুদ্ধি?'[46]

এই বৃদ্ধ লোকটি বলেছিলেন, ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্যে কেউই এ পর্যন্ত নবী হওয়ার দাবি করেনি – এর মানে হলো তৎকালীন আরবদের মধ্যে নবুওয়াতের প্রচলন

---

[46] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬১।

ছিল না। রিসালাত সম্পর্কে তৎকালীন আরবদের কোনো ধারণাই ছিল না। তারা ছিল অশিক্ষিত জাতি। তাই তিনি বলেছিলেন যে মুহাম্মাদ ﷺ যা দাবি করেছেন তা অবশ্যই সত্য।

আবু নাঈম, আবু হাকিম ও বাইহাকি থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে। আবু বকর সিদ্দীকের رضي الله عنه সাথে এক বেদুইনের একটি মজার কথোপকথন আছে, সেটি বর্ণনা করেছেন আলী رضي الله عنه।

'যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে ﷺ আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে নির্দেশ দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ও আবু বকরকে সাথে নিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন।' হাজ্জে আগত ব্যক্তিদের থাকার যাবতীয় ব্যবস্থা মিনাতেই করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন আরব গোত্রের সাথে দেখা করার জন্য এখানে এসেছিলেন। তিনি সবসময় আবু বকরকে رضي الله عنه সাথে নিয়ে বের হতেন। কারণ আবু বকর رضي الله عنه আরবদের বংশ ও পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্ত খুব ভালো করে জানতেন। বিভিন্ন গোত্রের ইতিহাস, তাদের নাম, অতীত কাহিনি – এসব তথ্য ছিল তাঁর নখদর্পণে। এই কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে এই কাজে সাথে রাখতেন, আবার আবু বকর رضي الله عنه বেশ সুপরিচিত ব্যক্তিও ছিলেন।

আবু বকর رضي الله عنه ছিলেন সবার সামনে। তিনি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন সকল ভালো কাজে অগ্রগামী, আর আরবদের বংশবৃত্তান্তের ব্যাপারেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।' তাঁরা একটি গোত্রের কাছে গেলেন। আবু বকর رضي الله عنه তাদের স্বাগত জানালেন, তারপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,
- আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

- আমরা এসেছি রাবিআ থেকে।

রাবিআ ছিল আরবের উত্তর-পূর্ব দিকের একটি গোত্র। এটি বেশ বড় গোত্র ছিল। তাই আবু বকর رضي الله عنه এ বংশ সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে আগ্রহী হলেন। তিনি বললেন,

- তোমরা কি কপাল (উচ্চবংশ) থেকে এসেছ নাকি নীচ থেকে (নিম্নবংশ)?

- আমরা এই গোত্রের মূলধারার মধ্যে সেরা।

অর্থাৎ তারা ছিল পুরো গোত্রের মাঝে সেরা। আবু বকর رضي الله عنه তাদের এই দাবির সত্যতা যাচাই করার জন্য নিজেই তাদের সাথে আলাপ শুরু করলেন।

- আচ্ছা, আওফ কি তোমাদের সেই লোক যার সম্পর্কে বলা হয় যে তার উপত্যকায় কেউই স্বাধীন নয়?
- না।

এই আওফ লোকটি ছিল রাবিআ বংশের। সে ছিল প্রচণ্ড ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব, উপত্যকার লোকেরাও তার বশ্যতা স্বীকার করে চলত। এ কারণে লোকেরা বলতো যে 'তার উপত্যকায় কেউই স্বাধীন নয়'। এরপর আবু বকর ﷺ তাদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন।

- আচ্ছা, তাহলে বুস্তান ইবন কাইস, আবুল লুওয়া এবং মুন্তাহিল আহইয়া – এরা কি তোমাদের লোক?

- না।

- তবে কি রাজাদের খুনি ও তাদের আত্মা হরণকারী – আল হাওফাযান ইবন শুরাইক তোমাদের জ্ঞাতি ভাই?

- না।

- ইজ্জতের রক্ষক ও প্রতিবেশীর বন্ধু - জাসসাস ইবন মুররা, সে কি তোমাদের গোত্রীয়?

- না।

- অনন্য পাগড়ীধারী সেই আল মুযদালাফ – সে কি তোমাদের কেউ?

- না।

- আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্দার রাজাদের সাথে কি তোমাদের কোনো সম্পর্ক আছে?

- না।

- লাখামের রাজাদের সাথে?

- না।

- তার মানে বোঝা গেল তোমরা গোত্রের মূলধারার কেউ নও, তোমরা শাখাগোত্র থেকে এসেছ।

আবু বকরের প্রশ্নবাণে তারা রীতিমত কাবু হয়ে গেল। বাইরে থেকে কেউ একজন এসে তাদেরকে এভাবে অপদস্ত করবে তা রাবিআ গোত্রের মোটেও সহ্য হলো না। উঠে দাঁড়ালো তাদের এক যুবক। সবে মাত্র দাড়ি গজানো এই যুবকের নাম ছিল দারফাল। সে আবু বকরের ﷺ উটের লাগাম ধরে বলে উঠল, 'যারা আমাদেরকে প্রশ্ন করে, আমরাও তাদের প্রশ্ন করবো। আর আমাদের কথার প্রমাণ দিতে আমরা বাধ্য নই। আপনি তো আমাদেরকে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করেছেন আর আমরা কোনো কিছুই গোপন করিনি, সবকিছুর উত্তর দিয়েছি। এখন আমরাও আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। বলুন, আপনি কে?'

- আমি কুরাইশের লোক।

- হুম, তাহলে আপনারা হলেন নেতৃত্বদানকারী ও অভিজাত সম্প্রদায়, আরবদের পথপ্রদর্শনকারী। তা আপনি কুরাইশের কোন অংশ থেকে এসেছেন?

- আমি এসেছি বনু তাইম ইবন মুররা থেকে।

বনু তাইম ছিল কুরাইশের ছোটোখাটো একটি গোত্র, তেমন নামডাক ছিল না। যুবকটি আবু বকরকে ﷺ ঘায়েল করার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়ে গেল, সে বললো,

- আপনি তো শিকারীকে তার লক্ষ্যস্থল দেখিয়ে ফেলেছেন! আচ্ছা বলুন তো, কুসাই ইবন ক্বালাব কি আপনার গোত্রীয় লোক যে মক্কা বিজয় করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে? সেই কুসাই যে সবাইকে বের করে দিয়ে নিজের লোকদের মক্কায় ঢুকিয়েছিল? মন্দির দখল করে সেখানে কুরাইশদের বসতি স্থাপন করেছিল এবং যাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'ঐক্যবদ্ধকারী'! যার ব্যাপারে কবি কবিতা লিখেছিল – তুমি কি সেই পিতার পুত্র নও যিনি এক করেছিলেন ফিহ্‌রের গোত্রগুলো?

- না, আমরা আব্দে মানাফের লোক নই, তারা উপদেশ দানে সেরা।

- তবে কি আবুল ঘাদারে, মহানেতা, আবি আস সাক – সে তোমাদের নেতা নয়?

- না।

- তবে কি আমর ইবন আবদুল মুনাফ হাশিম – যিনি নিজের লোক ও মক্কাবাসীর জন্য রুটি ও গোশত তৈরি করেছিলেন, তিনি আপনার বংশীয় লোক নন? যার ব্যাপারে কবি বলেছেন – আমর আল উলা তার লোকেদের জন্য তৈরি করেছিলেন সারীদ, যখন মক্কার লোকেরা ছিল দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ও অভাবী? যে ছিল শীত ও গ্রীষ্মের মুসাফির? কুরাইশরা যদি ডিম হয়, তবে সেই ডিমের কুসুম হলো আবদুল মানাফ। তাদের মতো সম্পদশালীও আর কেউ ছিল না আর তারা অতিথিদের কখনো ফিরিয়ে দিত না। তারা অপরাধীদের শায়েস্তা করতো আর নিরীহদের রক্ষা করতো নিজেদের তরবারির দ্বারা। আপনি যদি তাদের বাড়িতে থাকেন তবে তারা আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, আপনাকে নিরাপত্তা দিবে। সেই আমর কি আপনার গোত্রীয় ব্যক্তি নয়?

- না। আমর আমার গোত্রের নয়।

- তবে আপনি কি সেই আবদুল মুত্তালিবের আত্মীয়, যিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, মক্কার কাফেলার রক্ষক, আকাশের পাখি, বন্য পশু ও মরুভূমির সিংহের খাদ্যের যোগানদাতা? যার চেহারা জ্বলজ্বল করতো অন্ধকারে চাঁদের মতন?

- না।

- তাহলে নিশ্চয়ই আপনি ওই লোকদের মধ্য থেকে এসেছেন যারা ইফাদার সুযোগ পায়।

- না।

- তাহলে বোধ করি আপনি তাদের মধ্য থেকে এসেছেন যারা হিজাবার সুবিধা পায়।

- না।

- তা না হলে নিশ্চয়ই আপনি নাদওয়ার সুবিধা পাওয়া লোকদের একজন।

- না।

- তাহলে নিশ্চয়ই আপনি সিকায়ার সুযোগ পাওয়া ব্যক্তিদের একজন।

- না।

- আচ্ছা, তবে কি আপনি রিফাদা প্রদানকারীদের একজন?

- না।

তিনি সব প্রশ্নের উত্তরে না বলে যাচ্ছিলেন। যুবকটি তাঁকে এত প্রশ্ন করছিল যে তিনি বিরক্ত হয়ে আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি যুবকটির হাত থেকে উটের লাগাম টেনে নিলেন। তখন সেই যুবক একটি কবিতার লাইন আবৃত্তি করছিল, 'তোমার (প্রশ্নের) ঢেউ আরো বড় ঢেউয়ের মুখোমুখি। আমার এই ঢেউ তোমাকে প্রথমবার থামিয়ে দেবে, আর দ্বিতীয়বার ভাসিয়েই নিয়ে যাবে। আমি কসম খেয়ে বলছি আমার কুরাইশ ভ্রাতা, তুমি যদি আরেকটু দাঁড়িয়ে থাকতে, আমি প্রমাণ করে ছাড়তাম তুমি হলে কুরাইশদের সবচেয়ে নিম্নগোত্র থেকে উঠে আসা লোক!'

এই কথোপকথন শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসতে হাসতে সেখান থেকে আসলেন। আলী ﵁ আবু বকরকে ﵁ বললেন, 'হায়! এই বেদুইন দেখি আপনার অবস্থা খারাপ করে ফেলেছে!' আবু বকর ﵁ বললেন, 'হুম, দুর্যোগের পর আরেক দুর্যোগ, আর মানুষের মুখের কথা থেকে কতই না দুর্যোগের সৃষ্টি।'[47]

আলী ﵁ বর্ণনা করেন, 'এরপর আমরা একটি বৈঠকে গেলাম। সেখানের মানুষগুলো ছিল শান্ত প্রকৃতির ও গম্ভীর। আমরা তাদেরকে স্বাগত জানালাম। আবু বকর ﵁ তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? তারা বললো, আমরা বনু শাইবান থেকে এসেছি। আবু বকর ﵁ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে জানালেন, এই লোকগুলো শক্তিশালী এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞ। এরপর আবু বকর ﵁ গোত্রের নেতাদের কাছে গেলেন। ওই দলের নেতৃত্বে ছিল মাফরুক্ব ইবন আমর, হানি ইবন কুবাইসা, মুসান্না ইবন হারিস এবং নউমান ইবন শুরাইক । তাদের মধ্যে মুফরুক ইবন আমরের সাথে আবু বকরের আগে থেকেই ভালো পরিচয় ছিল। মুফরুকের চুলে ছিল দুটি বেণী, সেগুলো বুক পর্যন্ত নেমে এসেছিল।

আবু বকর ﵁ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

- আপনাদের লোকবল কেমন?

- আমাদের আছে এক হাজারেরও বেশি শক্তিশালী লোক, অল্পসংখ্যক লোক তাদেরকে হারাতে পারবে না, মাফরুক্ব জবাব দিল।

- আপনাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা?

---

[47] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৫।

- আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে, যেমনটা অন্য সকলের থাকে।

- শত্রুদের সাথে যুদ্ধে তোমরা কেমন নৈপুণ্য দেখাও?'

- যুদ্ধের সময় আমরা থাকি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, যুদ্ধের ঘোড়া নিয়ে আমাদের যত গর্ব, আমাদের সন্তানদের নিয়ে ততটা নই। আমরা আমাদের তলোয়ারের যতটা যত্ন নিই, আমাদের উটের তত যত্ন নিই না। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধে সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, কখনো আমরা জয়ী হই, কখনো আমাদের শত্রুরা। আচ্ছা ভালো কথা, আপনাকে তো কুরাইশের লোক মনে হচ্ছে?

- হ্যাঁ, আমি কুরাইশের লোক। আপনারা কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কথা শুনেছেন?

- হ্যাঁ, আমরা শুনেছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ ।

এরপর মাফরুক রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সরাসরি কথা বলতে চাইল। আবু বকর ؓ তাদের কথা বলার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন, মাফরুক বললো, 'হে কুরাইশের ভাই, আপনি আমাদের সামনে কী উপস্থাপন করতে চান?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে শুরু করলেন,

> *'আমি আপনাদেরকে এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি হচ্ছি আল্লাহর রাসূল। আমি আপনাদের কাছে আমাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যতক্ষণ না আমি আল্লাহর দেওয়া আদেশ পালন করে যেতে পারি। কুরাইশরা আল্লাহ তাআলার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করেছে। তারা সত্যের পথ ছেড়ে দিয়ে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই প্রশংসার যোগ্য।'*

রাসূলুল্লাহর ﷺ কথাগুলো মাফরুকের মনে ধরলো। সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ আরও কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আল আনআম থেকে কিছু আয়াত পাঠ করে শুনালেন। এরপর মাফরুক বললো, 'হে কুরাইশের ভাই, আপনি আমাদেরকে আর কী বলতে চান? আমি কসম করে বলছি, আপনি যা বললেন তা এই দুনিয়ার কোনো মানুষের বানানো কথা নয়, যদি তাই হতো তাহলে আমরা অবশ্যই জানতাম।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সূরা নাহলের কিছু আয়াত শোনালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে ইসলামের কথা বললেন। এসময় হানি ইবন কুবাইসা বললো, 'আমরা তো একাকী এসেছি, আমাদের সাথে অনেকেই আসেনি, সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের ছাড়া আমরা একাকী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।' সে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা পছন্দ করেছিল, কিন্তু গোত্রের অন্যান্যদের সাথে আলোচনা না করে সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায়নি। মাফরুক আরো বলেছিল, 'আমি মনে করি, শুধুমাত্র একটা বৈঠকের উপর নির্ভর করে, কোনো ধরনের পূর্ব পরিচিতি বা পরবর্তী

বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ না করে, পুরো বিষয়টি আগপাশ এবং ভবিষ্যত চিন্তা না করে যদি আমরা আমাদের দ্বীন ত্যাগ করে আপনার দ্বীন গ্রহণ করি, তাহলে সেটা হবে তাড়াহুড়া ও অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত।'

এখানে লক্ষণীয়, একেক গোত্রের আচরণ একেক রকম। আনসারগণ ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তারা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বনু শায়বার হানি বলেছিল, 'কোনো ধরনের পরিচিতি বা পরবর্তী সাক্ষাতের নিশ্চয়তা ছাড়া আমরা এখনই ইসলাম গ্রহণ করতে পারি না।' তাদের ধর্মীয় নেতা হারিসা বলেছিল, 'আমি আপনার কথা শুনেছি। আপনি যা বলেছেন তা আমার ভালো লেগেছে।' তারা সকলেই রাসূলুল্লাহর ﷺ কথায় অভিভূত হয়েছিল। হারিসা বললো, 'আমি আপনার কথা শুনে বিমোহিত। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে হানি ইবন কুবাইসা যা বলেছে আমিও তার সাথে একমত। মাত্র একবার সাক্ষাতের উপর ভিত্তি করে নিজেদের দ্বীন ত্যাগ করে আপনাকে অনুসরণ করা ... বিষয়টাকে তুলনা করা যায় দুটো জলাবদ্ধ এলাকা – আল-ইয়ামামা ও আস-সামাওয়ার মাঝে নিজেদের ঠেলে দেওয়ার মতো।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এই কথাটি বুঝতে পারেননি। তাই তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দুটো জলাবদ্ধ এলাকা বলতে?' মুসান্না উত্তর দিল, 'একটি হলো আরব বিশ্ব, অপরটি হলো পারস্য ও কিসরার নদী। কিসরার সাথে আমাদের এই মর্মে চুক্তি আছে যে, আমরা তাদের সাথে কোনো ঝামেলা করবো না এবং ঝামেলা করতে পারে এমন কাউকে আশ্রয় দেব না। আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা পারস্যের রাজা পছন্দ করবে না। আরবের সীমান্তবর্তী ভূমিগুলোর ক্ষেত্রে এটা সমস্যা নয়। আপনাকে আশ্রয় দিলে তারা হয়তো ক্ষমা করে দেবে আর অজুহাতও গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু এই কাজ যদি পারস্যের সাথে করা হয় তাহলে তারা মেনে নেবে না। আর যদি আপনি বলেন আমাদের এলাকার মধ্যে আপনাকে প্রতিরক্ষা দিতে হবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই, আমরা তাতে রাজি আছি।'

বনু শাইবার এলাকা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের সীমান্তে, তাদের মধ্যে কিছু চুক্তি হয়েছিল। মুসান্না এ ব্যাপারে বলেছিল, 'পারস্যের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে যে সমস্যা-করতে-পারে এমন কাউকে আমরা আশ্রয় দিব না। আর আপনি যে দ্বীনের কথা বলেছেন তা রাজার কাছে পছন্দনীয় হবে না।' সে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিল যে ইসলাম এমন দ্বীন যা রাজাদের অপছন্দের কারণ, কারণ বেশিরভাগ রাজা জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে চায় না, তারা চায় নিজেদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে। কিন্তু ইসলাম এসেছে মানুষকে এই দুনিয়াবি দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহ তাআলার দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। মুসান্না পারস্যের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দিতে অপারগ ছিল তবে তারা আরবের দিক থেকে নিরাপত্তা দিতে রাজি ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সব শুনে বললেন, 'তোমরা খারাপ কিছুই বলোনি, কোনোকিছু গোপন করোনি, যা বলার তা সরাসরি ও সুন্দরভাবে বলেছো। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এই দ্বীন তাদের হাতেই ন্যস্ত করা হবে, যারা সবদিক থেকে প্রতিরক্ষা করতে সমর্থ আছে।'[48] রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্ধেক চুক্তি করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন সামগ্রিক নিরাপত্তা, পরিপূর্ণ অঙ্গীকার।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় হলো, যেকোনো আলোচনা বা মীমাংসায় আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সব কিছুর উপরে স্থান দিতে হবে। ইসলামের ব্যাপারে কোনো ধরনের দরকষাকষি কিংবা আপোস করা যাবে না। যদি কোনো চুক্তি ইসলামি বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে সেই চুক্তি করা যাবে না। এই ঘটনাটি এমন এক সময়ের যখন মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য মুসলিমদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল, সেখানে রাসূলুল্লাহর ﷺ কোনো নিরাপত্তা ছিল না। তাঁর জন্য মক্কা ত্যাগ করা খুবই জরুরি ছিল, কিন্তু তারপরও তিনি বনু শায়বার আংশিক অঙ্গীকারের এই চুক্তিতে রাজি হননি। পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন তিনি আপসের চুক্তিতে রাজি হননি। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের স্বরূপ।

ইসলামের দূর্গ: আল-আনসার

আওস ও খাযরাজের ইসলামে প্রবেশ

ইবন ইসহাক্ব আল-আনসারদের ইসলামে আসার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। আল-আনসার ছিল দুটি গোত্র – আল আওস এবং আল খাযরাজ। এ দুটো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে তাদেরকে একসাথে বলা হতো আল-আনসার, 'আনসার' মানে রক্ষক। এ দুটি আরব গোত্র মদীনায় থাকত, কাহতান শাখার বংশধর। আরবরা আদনান ও কাহতান নামক দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। ইয়েমেনের আরবদেরকে কাহতান বলা হতো, আর আদনান হলো ইসমাঈলের ﷺ বংশধর। আওস ও খাযরাজ গোত্রের সাথে মদীনাতে তখন তিনটি ইহুদি গোত্র বাস করতো – বনু নাযির, বনু কাইনুকা ও বনু কুরাইযা। মদীনা শহরটির ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ছিল অন্যান্য শহর থেকে আলাদা, এর তিনদিক ঘেরাও ও নিরাপদ ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ছিল পাথুরে রাস্তা। সেখান দিয়ে মদীনা আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না, আর দক্ষিণ দিক কৃষিজমির গাছগাছালিতে ভরা ছিল। সুতরাং শুধুমাত্র উত্তর দিক থেকে শত্রুপক্ষ মদীনাকে আক্রমণ করতে পারত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জে আগত খাযরাজ গোত্রের ছাউনিতে গেলেন। ভেতরে ঢুকে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

- আপনারা কারা?

---

[48] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৭।

- আমরা আল খাযরাজ গোত্র থেকে এসেছি।

- আপনাদের সাথে কি ইহুদিদের মিত্রতা আছে?

- হ্যাঁ, আছে।

- আচ্ছা, আমি কি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলতে পারি?

তারা রাজি হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা শোনার প্রতি তাদের খুবই আগ্রহ ছিল। তারা ইসলামের দাওয়াত পেয়েই তা গ্রহণ করলো এবং বললো,

'আমরা আমাদের দেশ ছেড়ে এসেছি কারণ তাদের মধ্যে প্রচণ্ড শত্রুতা আর রেষারেষি লেগেই আছে, এমনটি আর কোথাও পাবেন না। হয়তোবা আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে তাদেরকে আবার একত্রিত করতে পারেন। আমরা তাদের কাছে গিয়ে এই দ্বীন ইসলামের কথা তাদের কাছে তুলে ধরব। যদি আল্লাহ আপনার মাধ্যমে তাদেরকে একত্রিত করে দেন, তাহলে আপনার চেয়ে প্রিয় মানুষ আমাদের চোখে আর কেউ হবে না।'[49]

ছয়জনের এই ছোট্ট দলটি কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই ইসলামের দাওয়াত পাওয়ামাত্রই তা গ্রহণ করে নিয়েছিল যা অন্য আরব গোত্ররা করেনি। এর পেছনে কিছু কারণ আছে। সেগুলো হলো,

১. মদীনাবাসীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অভ্যন্তরীণ সংঘাত চলছিল। আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ আর রক্তপাত হয়ে আসছিল, কিন্তু তারা চাচ্ছিল এর অবসান হোক। তাই যখন তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা শুনল তখন এই ভেবে তারা আশান্বিত হলো যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের ﷺ মাধ্যমে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দিতে পারেন।

২. ইহুদিরা তাদের প্রতিবেশী হওয়ায় তাওহীদ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ধারণার সাথে তারা পরিচিত ছিল এবং তাদের কাছে তাওহীদের ধারণার বিশেষ আবেদন ছিল। আরবরা সব সময় ইহুদিদের দ্বীনকে নিজেদের দ্বীনের চেয়ে শ্রেয় মনে করতো। এর কারণ, ইহুদিরা ছিল শিক্ষিত; তাদের কাছে কিতাব ছিল, দ্বীনের জ্ঞান ছিল। অন্যদিকে আরবদের দ্বীন বিভিন্ন উপকাহিনি আর পূর্বপুরুষদের রীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে জঘন্য কিছু রীতিনীতি প্রচলিত ছিল, যেমন: কন্যা সন্তান জীবন্ত হত্যা করা। ইহুদিরা যদি অহংকার ও পক্ষপাতী না হতো, তাহলে আরবরা হয়তোবা তাদের দ্বীন গ্রহণ করতো।

---

49 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৬।

৩. আরব ও ইহুদিদের মধ্যে কোনো গণ্ডগোল হলেই ইহুদিরা তাদের হুমকি দিত, ‘শীঘ্রই একজন রাসূলের আগমন ঘটবে। আর যখন তিনি আবির্ভূত হবেন তখন আমরা তাঁকে অনুসরণ করব এবং আদ জাতিকে যেভাবে শেষ করা হয়েছে আমরাও তোমাদেরকে সেভাবে শেষ করে দেব।’ অর্থাৎ আরবদের জানা ছিল যে ওই সময়ে একজন রাসূলের আগমন ঘটবে। এভাবে নবুওয়াতের ব্যাপারে আওস ও খাযরাজ আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল।

৪. রাসূলুল্লাহর ﷺ হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে আল আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বুয়াস নামে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে দুই গোত্রেরই অনেক নেতা মারা যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে নেতৃত্বশূন্যতা সৃষ্টি হয়, যে কারণে তারা নতুন নেতৃত্বের সন্ধানে ছিল। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা জানামাত্র তেমন কোনো আপত্তি ছাড়াই তারা তাঁকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নেয়।

মূলত এসব কারণেই মদীনা ইসলামের প্রসারের জন্য উপযুক্ত ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। আ’ইশা ﷺ বলেছেন, *‘বুয়াসের যুদ্ধ ছিল আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহর হিজরতের জন্য নির্ধারিত একটি প্রস্তুতি। এ যুদ্ধে তাদের প্রায় সব নেতা মারা পড়ে।’* সাধারণত সমাজের নেতা ও ক্ষমতাসীন লোকেরা সত্যের বিপরীতে কট্টর অবস্থান নেয়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আওস ও খাযরাজের নেতারা মারা যাওয়ায় ইসলামের পথে তাদের যাত্রা সুগম হয়। ইবন ইসহাক্ব বলেছেন, ‘ইহুদিদের সাথে একই ভূমিতে থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ইসলাম গ্রহণ আরও সহজ করে দিয়েছেন। ইহুদিরা ছিল কিতাবের অনুসারী, তাদের অনেক জ্ঞান ছিল। অন্যদিকে আল আওস ও খাযরাজের লোকেরা ছিল মুশরিক এবং মূর্তিপূজারী। তারা এর আগে ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের ভূমি কেড়ে নিয়েছিল। যখনই মুশরিকদের সাথে ইহুদিদের কোনো ঝামেলা বাঁধত তখন ইহুদিরা বলতো, একজন রাসূলকে পাঠানো হবে। তিনি আসছেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করবো এবং আদ জাতির ভাগ্যে যা ঘটেছিল তোমাদেরকেও সেই একই পরিণতি ভোগ করতে হবে।’

আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাক্বারার ২১৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, “তুমি হয়ত কোনো জিনিস অপছন্দ কর, কিন্তু তাতেই তোমার জন্য ব্যাপক কল্যাণ রয়েছে।” আওস ও খাযরাজের মধ্যে সংঘটিত বুয়াসের যুদ্ধটি ছিল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, যদিও এ যুদ্ধে দুই গোত্রেরই অনেক ক্ষতি হয়, কিন্তু তা তাদের ইসলামে প্রবেশের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

বাইয়াতের প্রথম শপথ

সেই ছয়জন পুণ্যবান লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললো, ‘আমরা দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের লোকদের ইসলামের পথে আসার জন্য আহ্বান করবো।’ মদীনায় ফিরে যাওয়ার আগে তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে পরের বছর হাজ্জের মৌসুমে দেখা করার কথা দিল। বছর ঘুরে আবার ফিরে এল হাজ্জের মৌসুম। এবার

ছয়জনের পরিবর্তে এবার বারোজন, ছয়জন ছিল আগের বছরের আর বাকি ছয়জন নতুন। প্রথম বছরে ইসলাম গ্রহণকারী ছয়জন ছিলেন আল খাযরাজ গোত্রের; অন্য আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে পাঁচজন ছিলেন আল খাযরাজ গোত্রের আর বাকি একজন এসেছিলেন আল আওস থেকে। দ্বিতীয় বছরে আল খাযরাজ থেকে ছিলেন দশজন এবং আল আওস থেকে দুইজন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বাইয়াত দিলেন। বাইয়াতের ভাষ্য ছিল এমন:

('আকাবার প্রথম বৈঠকের রাতে রাসূলুল্লাহর কাছে এই মর্মে বাইয়াত দেওয়া হয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আমরা ব্যভিচারের ধারে কাছে যাবো না, সন্তান হত্যা করবো না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেব না এবং ভালো কাজে তাঁর বিরোধিতা করবো না। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, যদি তোমরা এগুলো মেনে চলতে পার তাহলে জান্নাতে যেতে পারবে। আর যদি কোনো পাপ করে ফেল এবং সেই পাপের শাস্তি যদি এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই পাপ মাফ করে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি দুনিয়াতে পাপের শাস্তি না দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ওই পাপের জন্য শেষ বিচারের দিন শাস্তি দিতেও পারেন আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।')

সাধারণত, মহিলারা এই মর্মে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বাইয়াত করতেন। এই বাইয়াতে জিহাদের ব্যাপারে অঙ্গীকার ছিল না বলেই একে *বাইয়াতুন নিসা* বা মহিলাদের বাইয়াত বলা হয়।

এখানে একটি ফিকহী বিষয় লক্ষণীয়: এই বাইয়াতে যেসব গুনাহ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে সেগুলো সবই হলো কবীরা গুনাহ – ব্যভিচার, সন্তানদের মেরে ফেলা, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, ভালো কাজে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে এই দুনিয়াতে থাকতেই যদি গুনাহের শাস্তি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে গুনাহকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর যদি বেঁচে থাকতে শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে গুনাহকারীকে শেষ বিচারের দিন ক্ষমা করে দেওয়া হবে নাকি শাস্তি দেওয়া হবে তা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার মুসলিমদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসআব ইবন উমাইরকে ﵁ মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতিনিধি, শিক্ষক ও আলিম। মুসআব ছিলেন কুরাইশের এক ধনী পরিবারের সন্তান। মুসলিম হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন মক্কার সবচেয়ে উচ্ছন্নে যাওয়া যুবক, তাঁর পরনে থাকতো সবচেয়ে দামি সব জামাকাপড়, শরীরে থাকতো নিত্যনতুন সুগন্ধির ঘ্রাণ। তাঁর মা ছিলেন অনেক ধনী। মুসআব ছাড়া তার আর কোনো সন্তান ছিল না, তাই একমাত্র ছেলেকে অনেক আদর করতেন। কিন্তু যখন মুসআব ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর মা তাঁকে ত্যাগ করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেলেন। যে মুসআব শৈশব-কৈশোর-যৌবন কাটিয়েছিলেন প্রাচুর্যের মধ্যে, তিনিই হঠাৎ সহায়সম্বলহীন এক যুবকে পরিণত হলেন, জীবন হয়ে যায় রুক্ষ, কঠিন। মুসআব যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন, তাঁকে দাফন করার জন্য

পর্যাপ্ত টাকাপয়সাও তখন ছিল না। তাঁর গায়ে যে জামাটি ছিল তা দিয়ে তাঁকে ঠিকমত ঢেকে রাখা যাচ্ছিল না। উপস্থিত সাহাবীরা ﷺ সেই দিনের কথা বর্ণনা দিয়েছেন, 'আমরা যখন তাঁর মুখ ঢাকার চেষ্টা করছিলাম তখন তাঁর পা বের হয়ে যাচ্ছিল, আবার পা ঢাকতে গেলে মুখ দেখা যেতো। আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললাম, এখন আমরা কী করবো?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদেরকে কাপড় দিয়ে মুসআবের মুখ আর কিছু ঘাস দিয়ে পা ঢেকে দিতে বললেন।

মুসআব ইবন উমাইর ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ মদীনার প্রতিনিধি, তাঁর উপর অর্পিত এই দায়িত্ব ছিল বেশ কঠিন। তিনি মদীনায় থাকার জন্য মক্কা ত্যাগ করলেন। আল আওস ও খাযরাজের মধ্যে শত্রুতা থাকায় তিনি সালাতের ইমামতি করতেন, কারণ দুই গোত্রের কেউই অন্য গোত্রের ইমামের পেছনে সালাত আদায় করতে চাইত না। মুসআব মদীনায় আসআদ ইবন যুরারার সাথে থাকতেন। তাঁরা সেখানকার এক বাগানে অন্যান্য মুসলিমদের সাথে দেখা করতেন। তাঁরা সেখানে মুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। মুসআব তাদের সাথে নিয়মিত হালাকা করতেন। তাঁরা বসতেন মদীনার আওস-অধীনস্থ একটি এলাকায়। তখন পর্যন্ত মুসলিমদের অধিকাংশই ছিল খাযরাজ গোত্রের, আওসের অল্পসংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসআব আওস গোত্রকে ইসলামের দিকে আগ্রহী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ কারণে তিনি আল আওসের এলাকায় গেলেন।

আওসের নেতাদের বিষয়টি পছন্দ হলো না। আওসের নেতা ছিলেন সাদ ইবন মুয়ায ও উসাইদ ইবন খুযাইর। মুসআব ও আসআদ ইবন যুরারাকে আওসের এলাকায় একসাথে দেখতে পেয়ে সাদ ইবন মুয়ায খুব বিরক্ত হয়ে তার বন্ধু উসাইদকে বললেন, 'তুমি ওই দুই লোকের কাছে গিয়ে বলো যে, আমরা চাইনা তাঁরা এখানে থেকে দুর্বল ও বোকা লোকদের বিভ্রান্ত করুক। আসআদ যদি আমার আত্মীয় না হতো তবে আমি নিজে গিয়েই এই কথা বলতাম।' আসআদের সম্মানে, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে সাদ চুপ করে ছিলেন, নিজে না গিয়ে উসাইদকে পাঠালেন।

অন্যদিকে, আসআদ খাযরাজ গোত্রের হলেও তিনি ছিলেন আওসের নেতার মামাতো ভাই, সে সুবাদে তিনিই ছিলেন মুসআবকে মেহমানদারি করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি। সাদের বিরক্তি দেখে উসাইদ ইবন খুযাইর বর্শা হাতে নিয়ে মুসআব ও আসআদের সাথে কথা বলার জন্য তাদের দিকে অগ্রসর হলেন। আসআদ মুসআবকে জানিয়ে দিলেন, 'যে লোকটা আসছে সে হলো উসাইদ, সে তার লোকদের নেতা। তাঁকে যতসম্ভব ইসলামের দিকে টানার চেষ্টা করো, সে যদি মুসলিম হয় তাহলে অনেকেই তার দেখাদেখি মুসলিম হবে।' মুসআব ইবন উমাইর বললেন, 'সে শুনতে চাইলে আমি অবশ্যই তাঁকে বুঝানোর চেষ্টা করবো।'

ইবন খুযাইর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে খুব রুক্ষভাবে কথা বলতে শুরু করলেন, 'দেখ, আমরা তোমাদের এই এলাকার আশেপাশে দেখতে চাই না। আমরা চাই না তোমরা এখানকার দুর্বল ও অজ্ঞ লোকদের বিভ্রান্ত কর। নিজেদের জীবনের মায়া থাকে তো

এখান থেকে চলে যাও, না হলে এই হলো আমার বর্শা।' যখন তিনি তাদেরকে এভাবে হুমকি দিচ্ছিলেন, তখন হালাক্কায় অংশগ্রহণকারী নও মুসলিমদের একজন বলে উঠল, 'ওরা নয়, বরং তুমিই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করছ...' এই বলে সে উসাইদের সাথে তর্ক শুরু করে দিল।

পরিস্থিতি সামাল দিতে মুসআব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা যা নিয়ে কথা বলছিলাম তা কি আপনি একটু শুনে দেখবেন? যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আপনি তা গ্রহণ করবেন আর ভালো না লাগলে অগ্রাহ্য করবেন।' উসাইদ বললেন, 'ঠিক আছে শুনবো।' তিনি সেখানে বসলেন। মুসআব তাঁকে কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করে শোনালেন, ইসলামের দাওয়াত দিলেন, ইসলামের ব্যাপারে কথা বললেন। মুসআবের কথায় উসাইদের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বর্ণনা করেছেন আসআদ, 'উসাইদ মুখে কিছুই বললো না, তাঁর চেহারাই বলে দিচ্ছিল ইসলাম তাঁর হৃদয় দখল করে নিয়েছে, তাঁর মুখে ছিল প্রছন্ন এক আভা – শান্ত, প্রসন্ন একটা ছাপ।'

মুসআবের বক্তব্য হলে উসাইদ তাঁকে বললেন, 'এ দ্বীনে প্রবেশ করতে হলে কী করতে হবে?' মুসআব তাঁকে বললেন, 'আপনি পবিত্র হয়ে আসুন, তারপর সালাত আদায় করুন।' পবিত্র হয়ে উসাইদ সালাত আদায় করলেন, এরপর মুসআবকে বললেন, 'আমি আপনার কাছে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাচ্ছি যিনি মুসলিম হলে তাঁর দলের সব লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে।' এই বলে উসাইদ গেলেন সাদ ইবন মুয়াযের কাছে। উসাইদকে ফিরে আসতে দেখে সাদ বললেন, 'আল্লাহর কসম! যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল, ভিন্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে।' এটিকে বলে ফিরাসা, ফিরাসা হলো কারো চেহারা দেখে তাঁর সম্পর্কে বলে দেওয়া, আরবদের মধ্যে এই রীতি ছিল।

সাদ ইবন মুয়ায জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' উসাইদ বললেন, 'সব ঠিকঠাক আছে, তুমি চিন্তা কোরো না। আসলে একটু সমস্যা হয়েছিল, বনু হারিস (আল খাযরাজের একটি শাখা) যখন জানতে পারল যে আসআদ তোমার ভাই, তখন তারা শত্রুতাবশত তাকে খুন করতে চেয়েছিল।' পুরো ঘটনাটি উসাইদ বানিয়ে বললেন সাদ ইবন মুয়াযকে মুসআব ইবন উমাইরের কাছে পাঠানোর জন্য। উসাইদের মুখে এই কাহিনি কথা শুনে সাদ খুব রেগে গেলেন। তিনি বললেন, 'কী! তারা আমার ভাইকে খুন করতে চায়!' তিনি বর্শা নিয়ে ভাই আসআদকে রক্ষা করার জন্য চলে গেলেন এবং যাওয়ার সময় উসাইদকে বলে গেলেন, 'ধুর! তুমি আমার কোনো কাজেই আসলে না।' সাদকে আসতে দেখে আসআদ বললেন, 'মুসআব, যাকে আসতে দেখছ সে আওসের নেতা। তাকেও যতোটা পারো ইসলামের দিকে টানার চেষ্টা করো।' এদিকে সাদ ইবন মুয়ায তাদের দেখেই বুঝতে পারলেন যে উসাইদ ইচ্ছে করে গল্প ফেঁদেছেন, কারণ আসআদ বা মুসআব কাউকেই ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল না।

আসআদকে উদ্দেশ্য করে সাদ ইবন মুয়ায বললেন, 'আসআদ! তুমি কেন আমার সাথে এরকম করছ? এই লোককে কেন আমার এলাকায় নিয়ে এসেছ? তুমি আমার

সাথে তোমার সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে এসব করছো, তুমি কি এই অশিক্ষিত, সহজসরল, অসহায় লোকগুলোকে বিপথে নিয়ে যেতে চাও?'

মুসআব তখন বললেন, 'কিছু মনে না করলে আমি কিছু কথা বলতে চাই, আপনি কি তা শুনবেন? যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে তা গ্রহণ করবেন আর ভাল না লাগলে মানবেন না।' সাদ ইবন মুয়ায এ কথায় রাজি হলেন এবং তাঁর কথা শোনার জন্য বসলেন। এখানে একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, মদীনাবাসীরা বেশ খোলা মনের ছিল, মক্কার লোকরা যেমন শত্রুভাবাপন্ন ছিল, মদীনাবাসীরা তেমন ছিল না। তারা অন্যের কথা শোনার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। তাই মুসআবের কথা শোনার ব্যাপারে সাদ ইবন মুয়ায রাজি হলেন। মুসআব তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, সাদ ইবন মুয়ায ইসলাম গ্রহণ করলেন, ইসলাম লাভ করলো দূর্গের চাবি।

মুসলিম হওয়ার পর সাদ ইবন মুয়ায ﷺ প্রথমে তাঁর লোকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কী?' তারা বললো, 'আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী এবং আমাদের নেতা।' তারপর সাদ ইবন মুয়ায বললেন, 'তাহলে তোমরা মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত কেউ আমার সাথে কথা বলবে না আর আমিও তোমাদের সাথে কথা বলবো না।'

এই কথার পর সন্ধ্যার মধ্যেই বনু আসআদ গোত্রের প্রতিটি ঘরের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, আল আওসের এক বড় অংশের মাঝে ইসলামের আলো প্রবেশ করে।

আক্বাবার দ্বিতীয় শপথ

ইসলামের প্রথম বায়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল আল-আক্বাবায়, এই ঘটনা বায়াত আল উলা নামে পরিচিত। মদীনায় ইসলাম প্রচারে মুসআব ইবন উমায়ের অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মানুষ সেখানে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং পরবর্তী হাজ্জ মৌসুম চলে আসার আগে এমন অবস্থা হয় যে মদীনার প্রতিটি বাড়িতে একজন হলেও ইসলাম গ্রহণ করে। হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মদীনার নও-মুসলিমদের সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসলো। সত্তরের অধিক মুসলিম নিজ গোত্রের লোকেদের সাথে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। মদীনা থেকে আসা প্রতিনিধি দলটির সাথে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই ছিল। যদিও গোপন বৈঠকটি ছিল শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ ও মুসলিমদের মধ্যে, কিন্তু তাঁরা মদীনা থেকে যাত্রা করার সময় তাঁরা তাদের গোত্রের অমুসলিম সদস্যদের সাথে একসাথে এসেছেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সাক্ষাত করতে আসে সত্তরের অধিক মুসলিম পুরুষ ও দুইজন মুসলিম নারী।

কা'ব ইবন মালিক ও বারা ইবন মা'রুরের ঘটনা

সত্তর জন মুসলিমদের মধ্যে একজন ছিলেন কা'ব ইবন মালিক ﷺ, তিনি তাদের হাজ্জ যাত্রার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন।[50]

'আমরা সেবার হাজ্জ করতে মক্কায় যাই, আমাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল মুসলিম আর কিছু লোক অমুসলিম। আমাদের মুসলিম দলের নেতা ছিলেন বারা ইবন মা'রুর, তিনি ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয়, প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের কাছে, অর্থাৎ মুসলিমদের কাছে এসে বললেন, আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত জানতে চাই, তোমরা আমার সাথে একমত হবে কিনা আমি জানি না। আমার মতামত হলো, সালাতের সময় কাবাঘরকে পেছনে রাখতে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না।

বারা ইবন মা'রুর ﷺ কাবাকে পেছনে রেখে সালাত আদায় করতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। সে সময় কা'বা মুসলিমদের ক্বিবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি। মদীনায় বসে জেরুসালেমের আল-আক্বসা মসজিদের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে গেলে কাবাঘর মুসলিমদের পেছনে পড়ে যেতো। এ কারণে বারা ইবন মা'রুরের মধ্যে অস্বস্তি কাজ করছিল।

কা'ব তাঁকে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ জেরুসালেমের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করেন, সুতরাং আমরা তাঁর বিপরীত কাজ করবো না।' বারা বললেন, ''আমি কাবাঘরের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করবো।' এরপর থেকে তিনি কাবাঘরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে শুরু করেন। এরপর তাঁরা মক্কায় এসে পৌঁছালেন। বারা তাঁর ভাতিজা কা'ব ইবন মালিককে বললেন, 'ভাতিজা, আমাকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে নিয়ে চলো। সফরে ক্বিবলা পরিবর্তন করা ঠিক হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করবো। তোমরা তো আমার কাজকে অনুমোদন দিলে না, তাই আমার খটকা হচ্ছে। চলো, রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করে দেখি আমার কাজটা ঠিক হয়েছে কিনা।' কা'ব মক্কার এক লোকের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় আছেন জানতে চাইলেন, সে বললো,

- আপনারা কি রাসূলুল্লাহকে ﷺ চেনেন? কখনো তাঁকে দেখেছেন?

- না, তাঁকে আমরা চিনি না।

- আচ্ছা, তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবকে চেনেন?

- হ্যাঁ তাঁকে আমরা চিনি।

- তাহলে আপনারা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে দেখতে পাবেন যে, আব্বাসের সাথে একজন লোক বসে আছেন। তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ।

---

[50] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৩।

'আমরা মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম আব্বাস বসে আছেন, তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহও ﷺ বসে আছেন। আমরা সালাম দিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে দেখে আব্বাসকে তাঁর কুনিয়া নামে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,

- আবুল ফাদল, আপনি কি এ দু'জন মানুষকে চেনেন?

- হ্যাঁ চিনি, ইনি হলেন বারা ইবন মা'রুর, তাঁর গোত্রের নেতা আর ইনি হচ্ছেন কা'ব ইবন মালিক।

- কবি কা'ব নাকি?'

কা'ব ইবন মালিক ছিলেন একজন কবি। এজন্য আব্বাস যখন কা'বকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ইনিই কি কবি কা'ব কিনা।

এই ঘটনায় কা'ব তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এই বলে, 'রাসূলুল্লাহর ﷺ এই কথাটি আমি কখনো ভুলবো না।'

কা'ব ইবন মালিকের কাছে এটা বিশাল ব্যাপার ছিল যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আগে থেকে চিনতেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে এটি ছিল তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ, যে সাক্ষাতের এই মুহূর্তের জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আসছিলেন, আর সেই সাক্ষাতেই আবিষ্কার করলেন তাঁর নেতা, তাঁর এত প্রিয় এই মানুষটি তাঁকে আগে থেকেই চেনেন! এ কথা ভেবেই কা'ব ইবন মালিক গর্ববোধ করছিলেন এবং খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি আরো আনন্দিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়তো তাঁর কিছু কীর্তির কথাও শুনে থাকবেন।

এরপর বারা ইবন মা'রুর ؓ তাঁর প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, 'হে আল্লাহর নবী ﷺ! আল্লাহ তাআলা আমাকে ইসলামের পথে হিদায়াত করেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি যখন এই সফরে বের হই, তখন আমার মনে হলো, কাবাঘরকে পেছনে রাখা সমীচীন হবে না। তাই আমি কাবার দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করেছি। কিন্তু আমার সাথীরা আমার বিরোধিতা করায় আমার মনে খটকা সৃষ্টি হয়েছে, যা করছি ঠিক করছি তো? এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?' মুহাম্মাদ ﷺ বললেন, "তোমার আগে যে ক্বিবলা ছিল তা বরারবই আদায় করা উচিত।" এরপর থেকে বারা ؓ তাঁর ক্বিবলা পরিবর্তন করেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মক্কায় ছিলেন তাঁকে সালাত আদায়ের সময় কাবাকে পেছনে রাখতে হতো না। কাবাঘরকে সামনে রেখে তিনি জেরুসালেমের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে পারতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো হিজরতের পর রাসূলুল্লাহরও ﷺ ঠিক একই অনুভূতি হয়েছিল, যা হয়েছিল বারা ইবন মা'রুরের, তিনিও কাবাকে পেছনে রেখে সালাত আদায় করতে তখন অস্বস্তিবোধ করেছিলেন, এটা ঘটেছিল মদীনায়।

কা'ব বর্ণনা করেন, 'এরপর আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে, আমরা আক্বাবায় আইয়ামে তাশরিফের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবো। এরপর

আমরা হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বিষয়টি আমরা গোপন রাখলাম, রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আমাদের গোপন বৈঠক সম্পর্কে আমাদের গোত্রের মুশরিক সাথীরা কিছুই জানতো না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম আবু জাবির, তিনি ছিলেন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ও গোত্রনেতাদের একজন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আবু জাবির! আপনি আমাদের অন্যতম নেতা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আপনি যে ধর্ম অনুসরণ করছেন তার কারণে আপনি আখিরাতে জাহান্নামের জ্বালানি হবেন – এটা আমরা চাই না।' আবু জাবির তখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে আসন্ন গোপন বৈঠক সম্পর্কে জানানো হয়। তিনি সেই শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রতিনিধি হিসেবেও মনোনীত করেছিলেন। ইসলামে তাঁর বয়স ছিল অল্প, কিন্তু তাঁর বয়স নেতৃত্বের যোগ্যতার কারণে তিনি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পেয়ে যান।

বাইয়াতের রাত

অবশেষে সেই নির্ধারিত রাত এল। মুসলিমরা একজন-দুইজনের ছোট ছোট দলে আক্বাবায় যেতে শুরু করেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন না কেউ তাদের দেখে ফেলুক। একসাথে সত্তর জন লোকের একটি দল রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করতে গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এভাবে তাঁরা সবাই আক্বাবায় মিলিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মক্কা থেকে আসা একমাত্র মুসলিম, তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব। আব্বাস তখনো মুশরিক ছিলেন, এই বৈঠকে তিনিই ছিলেন একমাত্র অমুসলিম। তিনিই প্রথমে কথা শুরু করেন। তিনি বললেন,

'মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের মাঝে কেমন সম্মানের অধিকারী তা আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। আমাদের গোত্রের লোকদের হাত থেকে তাঁকে আমরা নিরাপত্তা দিয়েছি। তিনি তাঁর গোত্রের কাছে সম্মানিত এবং নিজ শহরে নিরাপদে অবস্থান করছেন। কিন্তু তিনি এখন আপনাদের সাথে এক হতে চান। আপনারা যদি মনে করেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনারা মুহাম্মাদকে ﷺ আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, সে প্রতিশ্রুতি আপনারা পূরণ করতে পারবেন, তাঁর শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন, তাহলে সিদ্ধান্ত নিন আপনারা তাঁর দায়িত্ব নেবেন কি না। আর যদি মনে করেন, শেষ পর্যন্ত আপনারা তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন না এবং তাঁকে তাঁর শত্রুদের হাতে তুলে দেবেন তবে এখনই তাঁকে রেখে যান। কারণ তিনি নিজ গোত্রের মধ্যে নিজের শহরে সম্মান ও নিরাপত্তার মাঝে আছেন।'[51]

আব্বাস ইবন মুত্তালিব আনসারদের দৃঢ়তা যাচাই করছিলেন। আনসাররা তাদের এই প্রতিশ্রুতির প্রতিটা কতো অনড় সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন। কারণ তাঁরা এমন এক ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, যে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তাদেরকে চড়া মূল্য

---

51 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৭।

দিতে হতে পারে। চারদিক থেকে তাদের উপর চাপ আসতে পারে, তাদের উপর দুর্যোগ নেমে আসতে পারে এবং এ চাপ সামলানোর ক্ষমতা পরবর্তীতে নাও থাকতে পারে। এই ধরনের একটি প্রতিরক্ষা চুক্তির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যে সহজ হবে না সে ব্যাপারটি তিনি আনসারদের জানিয়ে রাখছিলেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ আশ্রয় দেওয়া নিঃসন্দেহে একটা বিরাট ঝুঁকি, আর সেই ঝুঁকি নিতে রাজি কিনা, তাঁরা তাঁকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়ার সামর্থ্য রাখে কিনা – সে বিষয়টি যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই আব্বাস তাদের বলছিলেন, যদি তাদের এ সামর্থ্য না থাকে তাহলে তাঁরা যেন এই অঙ্গীকারে অংশ না নিয়ে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ মক্কাতেই রেখে যায়।

প্রশ্ন আসতে পারে অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কেন আব্বাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন? কারণ আব্বাস ইবন মুত্তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচা এবং বনু হাশিম গোত্রের একজন মুরুব্বি। মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে থাকতে পছন্দ করতেন এবং তার সকল কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কায় রাসূলুল্লাহকে ﷺ যারা নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আব্বাস ছিলেন তাদের একজন। তাই তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন যে, তাঁর ভাতিজা যখন মক্কা ত্যাগ করে যাবে তখন যেন সে নিরাপদে থাকে। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বৈঠকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন। বনু হাশিম গোত্রের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আব্বাস বৈঠকে উপস্থিত থেকে গোত্রের সন্তানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন।

আরো প্রশ্ন আসতে পারে চাচা আব্বাসের নিরাপত্তা কি যথেষ্ট ছিল না, যেখানে আবু তালিবও তাঁর চাচা হিসেবে তাঁকে এতদিন নিরাপত্তা দিয়ে আসছিলেন? অনেকের মতে, নিজ গোত্রের লোকেদের কাছে আবু তালিব যেরূপ সম্মানিত ছিলেন, তাদের ওপর তাঁর যেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তাঁর অন্য ভাইদের তেমনটা ছিল না। তাই বয়োজ্যেষ্ঠতার জন্য আবু তালিব যেভাবে মুহাম্মাদকে ﷺ রক্ষা করতে পেরেছেন, নিশ্চিতভাবেই আব্বাস সেভাবে পারতেন না। তিনি ছিলেন যুবক। তবুও তিনি তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করে হিজরতের আগ পর্যন্ত নবীজিকে ﷺ নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।

আব্বাসের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আনসাররা বললেন, 'আপনার কথা আমরা শুনেছি। হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, এবার আপনি কথা বলুন। বলুন আমাদের থেকে আপনি কী চান। আপনি নিজের এবং আপনার রবের জন্য আমাদের কাছ থেকে যা যা অঙ্গীকার নিতে চান, তা আমাদেরকে বলুন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন,

> *'তোমরা অঙ্গীকার করো, ভালো-মন্দ সকল অবস্থায় আমার কথা শুনবে এবং মানবে। সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আল্লাহর পথে হক্ব কথা বলে যাবে এবং এ ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। আমি*

যদি তোমাদের কাছে আসি তাহলে আমাকে সাহায্য করবে। আমাকে হেফাযত করবে সেভাবে, যেভাবে তোমরা নিজেদেরকে, নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে হেফাযত করো।'

এই অঙ্গীকার ছিল আক্বাবার প্রথম বাইয়াতের অঙ্গীকারের চেয়ে একধাপ বেশি। তখন তারা কেবল মুসলিম হওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এবার আরো একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে, আল্লাহর রাসূলকে ﷺ নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এটি ছিল আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। তিনি যা চান তিনি তা পরিষ্কার ভাষায় আনসারদেরকে জানিয়ে দিলেন, কোনো অস্পষ্টতা তিনি রাখলেন না। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন তিনি শুধু নিরাপত্তার খাতিরে মদীনায় আসছেন না, বরং সবাই তাঁকে মেনে চলবে এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা চলবে না। তাঁরা যদি আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুকে ভয় করেন তাহলে তিনি তাঁর মিশন নিয়ে এগোতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি মিশনে নেমেছেন যে মিশন সফল করতে হলে নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতা থাকা চাই – আনসারদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কথাটিই বুঝাতে চাচ্ছিলেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা শুনে বারা ইবন মা'রুর ؓ সবার প্রথমে উঠে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাইয়াত দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আল্লাহর শপথ, আমরা তো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যোদ্ধা জাতি।' বারার ؓ কথা শেষ হতে না হতেই আবুল হাইসাম ইবন তাইহান ؓ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের সাথে অন্যদের (অর্থাৎ ইহুদিদের) সন্ধি রয়েছে। আমরা যদি এই চুক্তি ভঙ্গ করি আর আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করেন, তাহলে কি আপনি আমাদের ত্যাগ করে নিজ গোত্রে ফিরে যাবেন?'

আবু হাইসাম বলতে চাচ্ছিলেন, আপনার হাতে বাইয়াত করার অর্থ হচ্ছে, আমরা এমন লোকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে পারি যাদের সাথে আমাদের সন্ধিচুক্তি রয়েছে। এ অবস্থায়, আপনি যদি বিজয় লাভ করেন, তখন কি আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন নাকি আমাদের সাথেই থাকবেন? দেখুন, আমরা কিন্তু সারাজীবনের জন্য স্বেচ্ছায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি কিন্তু আপনি কি আমাদের সাথে থাকবেন? নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে উত্তর দিলেন,

'তোমাদের রক্তই আমার রক্ত। আর তোমাদের ধ্বংসই আমার ধ্বংস। আমি তোমাদের আর তোমরা আমার। তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করবে, আমিও তাদের

সাথে সন্ধি করবো।'[52]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই ওয়াদা রেখেছিলেন। তাঁর আপন মাতৃভূমি মক্কা বিজয়ের পর তিনি সেখানে থেকে যাননি, বরং তিনি আনসারদের সাথে মদীনায় চলে যান এবং আমৃত্যু সেখানেই বসবাস করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আনসারদের সাথে অবস্থান করেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে বাইয়াত করার জন্য আনসাররা যখন তাদের হাত এগিয়ে দিতে শুরু করেন, তখন আব্বাস ইবন উবাদা দাঁড়িয়ে তাদের বাধা প্রদান করেন। তিনি ছিলেন মদীনার প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি বলেন, 'একটু থামো।' তিনি তাঁর গোত্রের লোকদেরকে ব্যাপারটি সহজভাবে নিতে এবং ধীরেসুস্থে করার জন্য বললেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

'আমরা আজ তাঁর কাছে এ কারণেই সমবেত হয়েছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ হলো সমগ্র আরবের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া। এর ফলে তোমাদের নেতাদের জীবন হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বাজবে। যদি তোমরা মনে করো, তোমরা এই ঝুঁকির ভার সইতে পারবে, তবেই তাঁকে নিজেদের কাছে নাও। তোমাদের এ কাজের বিনিময় আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর যদি নিজেদের জান তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে, তবে এখনই তাঁকে ছেড়ে দাও, এটা হবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য অজুহাত।'

তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন এই অঙ্গীকার কোনো সহজ অঙ্গীকার নয় – তোমরা কি বুঝতে পারছো, আমরা কীসের ব্যাপারে অঙ্গীকার করছি? যদি আমরা তাঁকে আশ্রয় দিই, তাহলে পুরো বিশ্বের সাথে আমাদের শত্রুতা তৈরি হবে। আমাদের দিকে তরবারি তাক করা হবে সবদিক থেকে। আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা মারা পড়তে পারে। আমাদের জান-মাল হুমকির মুখে পড়তে পারে, বিনষ্ট হতে পারে। কাজেই যদি তোমরা অঙ্গীকার করো, তবে বুঝেশুনে অঙ্গীকার করো। আর যদি তোমাদের অন্তরে কোনোরূপ ভয়-ভীতি থেকে থাকে তাহলে দেরি হওয়ার আগেই এ প্রতিশ্রুতি থেকে সরে পড়ো। তাঁরা আব্বাস ইবন উবাদাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমরা বাইয়াত করবো, এবং আমরা কখনও বাইয়াত ভঙ্গ করবো না।'

আনসাররা ছিলেন অসম্ভব দৃঢ়প্রত্যয়ী, তাঁরা প্রচণ্ড দৃঢ়তার সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন, 'আপনাকে রক্ষার বিনিময়ে আমরা কী পাবো?' – তাঁরা বলতে চাচ্ছিলেন, নিজেদের জীবন ধনসম্পদ কুরবানি করে হলেও আমরা আপনাকে রক্ষা করে যাবো কিন্তু এর বিনিময়ে আপনি আমাদের কী দেবেন? এর বিনিময় কী? কোনো

চুক্তিই একতরফা নয়। যেহেতু আমরা আপনাকে সাহায্য করতে যাচ্ছি সেহেতু নিশ্চয়ই এর বিনিময়ে আমরা কিছু পাবো, সেটা কী?

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটি শব্দই বললেন, ব্যস, '*আল জান্নাহ*',[53] এতটুকুই ছিল তাঁর ওয়াদা, আর কিচ্ছু না। তিনি তাদেরকে না মন্ত্রীত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, না দিয়েছেন বাড়িগাড়ি কিংবা টাকাপয়সার প্রতিশ্রুতি, তিনি শুধু তাদেরকে একটি জিনিসের ওয়াদা করেছেন, তা হলো জান্নাত।

আনসাররা খুশিমনে বলে উঠলেন, 'এ তো এক লাভজনক ব্যবসা! আমরা কখনই এই সুযোগ হাতছাড়া করবো না।' তাঁরা দুনিয়ার সম্পদ কিংবা ক্ষমতা চাননি, তাঁরা শুধু জান্নাতের অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট ছিলেন।

বাইয়াতের এই সংবাদটি কোনোভাবে কুরাইশদের কাছে পৌঁছে যায়। হাজ্জের মৌসুমে সত্তরের অধিক লোকের একটি বৈঠক গোপন রাখা খুব সহজ ব্যাপার না। এক বর্ণনায় এসেছে যে, শয়তান কুরাইশদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেয়। তারা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালায় এবং আনসারদেরকে খুঁজে বের করে।

পরদিন ভোরে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের একটি দল আওস ও খাযরাজ গোত্রের তাঁবুতে প্রবেশ করে। তারা জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা খবর পেয়েছি যে তোমরা নাকি মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করেছো আর তাঁকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার ও নিরাপত্তা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছো? ইয়াসরিববাসী, তোমরা জেনে রাখো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা অন্য সব আরব গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে আমাদের কাছে বেশি অপছন্দনীয়।' কুরাইশরা জানতো যে, আওস ও খাযরাজ গোত্র সহজ কোনো প্রতিপক্ষ নয়, তাঁরা ছিলেন লড়াকু যোদ্ধা।

আওস ও খাযরাজ গোত্রের মুসলিমরা চুপ করে থাকলেন, তাঁরা কোনো উত্তর দিলেন না। উত্তর দিল মুশরিকরা, তারা বললো, 'কই? এরকম কিছু তো হয়নি। আমরা তো কখনো মুহাম্মাদের সাথে দেখা করিনি।' গোত্রের মুশরিক সদস্যরা জানতোই না যে গোত্রের মুসলিম সদস্যরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ দেখা করেছে। গোপন বৈঠকের ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তাই তারা বারবার বলছিল যে, তারা মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করেনি। কা'ব ইবন মালিক বলেন, 'আমরা মুসলিমরা চুপচাপ একে অন্যের মুখের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলাম। আমরা কোনো কথাই বলিনি।'

কিন্তু কুরাইশদের মন থেকে কোনোভাবেই সন্দেহ দূর হচ্ছিল না। কা'ব বলেন, 'আমি চাইলাম কথার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিতে, যেন কুরাইশরা আসল বিষয়টি ভুলে যায়।'

---

[53] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০১।

সেখানে ছিলেন হারিস ইবন হিশাম, কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি, তার পায়ে একজোড়া নতুন জুতো। কা'ব সেটা দেখে আবু জাবিরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'আবু জাবির! আপনি একজন বড় মাপের নেতা। আপনি কি পারেন না কুরাইশদের ওই যুবকের মতো একজোড়া নতুন জুতা ব্যবহার করতে? নেতা হয়ে আপনি পুরনো জুতা পরে আছেন, আর ওই যুবক কত সুন্দর জুতা পরে আছে।'

এ কথা শুনে হারিস মন খারাপ করে বলে,'তুমি আমার জুতা নিয়ে কথা বলছো? এতোই মূল্যবান আমার জুতা? লাগবে না এই জুতা!' এই বলে সে পা থেকে জুতাজোড়া খুলে কা'ব ইবন মালিকের দিকে ছুঁড়ে মারে। আবু জাবির বলেন, 'আহ থামো তো কা'ব! তুমি তো এই যুবককে ক্ষেপিয়ে তুলেছো। তার জুতা তাকে ফিরিয়ে দাও।' কা'ব বললেন, 'না, আমি এগুলো ফেরত দেবো না। এটি আমার জন্য ভালো লক্ষণ। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে এই জুতা নিয়ে যাবো।' [54]

এতটুকুই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আনসারদের মধ্যকার বৈঠক। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এটি ছিল এযাবৎকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। এটি ছিল ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো একটি ঘটনা। ইসলাম যেন এই ঘটনার মাধ্যমে উঠে দাঁড়িয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি ভূমির সন্ধান পেলেন যেখান থেকে সুরক্ষিত ও স্বাধীনভাবে ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। এটি সম্ভব হয়েছিল আক্বাবার দ্বিতীয় বাইয়াত, বাইয়াতুল আক্বাবা আস-সানিয়ার মাধ্যমে।

বাইয়াত থেকে শিক্ষা

১. কা'ব ইবন মালিক ﷺ বলেন, 'মদীনা ত্যাগ করার পূর্বেই আমরা সালাত আদায় করতে শিখেছিলাম, আমাদের দ্বীনের জ্ঞান লাভ করেছিলাম।' এটি রাসূলুল্লাহর ﷺ হিজরতের আগের ঘটনা। সুতরাং যেসব ভাইবোনেরা ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে বিলম্ব করছেন এ অজুহাতে যে তারা বিদেশে গিয়ে কোনো শাইখের কাছে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছেন না বা কোনো ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছেন না, তাঁরা আসলে খোঁড়া যুক্তি দেখাচ্ছেন। দ্বীনের ব্যাপারে পড়াশোনা না করার ব্যাপারে এগুলো কোনো অজুহাত নয়। 'অনুকূল পরিস্থিতি'র আশায় বসে না থেকে প্রত্যেকের উচিত একটুও বিলম্ব না করে সাধ্যমতো দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়া। কা'ব ইবন মালিক এবং তাঁর সহযোগীরা যখন দ্বীনের বুঝ লাভ করেছেন, সালাত আদায় করা শিখে গেছেন, তখনো আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় প্রবেশ করেননি। তাদের সাথে কেবল একজন শিক্ষক ছিলেন – মুসআব ইবন উমাইর ﷺ। কিন্তু কা'ব ইবন মালিকের বক্তব্যের একটি অন্তর্নিহিত বার্তা রয়েছে, তা হলো – আমরা প্রস্তুত, আমরা শিখছি। দ্বীনের জ্ঞানার্জন থেকে নিজেকে বিরত রাখা একেবারেই উচিত নয়, মুসলিম মাত্রই দ্বীন জানার ব্যাপারে সচেতন থাকবে।

---

[54] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৪।

যদি কোনো মুসলিম কোনো আলিম বা শাইখের দারস্থ হতে না পারে, তাহলে তার উচিত বসে না থেকে অন্তত এমন কারো সাথে সময় কাটানো যে তার থেকে বেশি জানে। তেমন কাউকেও যদি না পাওয়া যায়, নিদেনপক্ষে কোনো আলিমের বই পড়তে শুরু করে দেওয়া উচিত। দ্বীনি পড়াশোনার মধ্যে সবসময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরি। কালক্ষেপণ করা কোনো অজুহাত হতে পারে না। ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, কুরআনের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাহান্নামীদের বেশিরভাগ আর্তনাদের কারণ হবে তাদের গড়িমসি। তারা বলবে,

"হে আল্লাহ, আমাদের একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিন, যাতে আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। হে আল্লাহ, আমাদের একবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যান, যেন আমরা দান করতে পারি। হে আল্লাহ, আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান।"

কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে, সুতরাং কখনই ভালো কাজের সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়।

২. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের কাছে তাঁর চুক্তির শর্তগুলো সম্পর্কে বলেছিলেন, তখন তাদের প্রশ্ন ছিল, 'বিনিময়ে আমরা কী পাবো?' রাসূলুল্লাহ ﷺ এক শব্দে উত্তর দিয়েছিলেন, জান্নাহ। এখানে থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, সকল ইসলামি কর্মকাণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জান্নাত, আল্লাহ আযযা ওয়াজালকে সন্তুষ্ট করাই প্রতিটি কাজের মূল উদ্দেশ্য – খ্যাতির জন্য নয়, অর্থের জন্য নয়, সামাজিকতার জন্যেও নয়। প্রতিনিয়ত নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নিজেদের জিজ্ঞেস করা উচিত – ইসলামের জন্য যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করছি, তা কেন করছি? তা কি আসলেই আল্লাহর জন্য করছি?

এই দ্বীনের জন্য প্রয়োজন আত্মত্যাগ। এই আত্মত্যাগের বিনিময় হলো জান্নাত। একজন মুসলিম দ্বীনের জন্য ত্যাগ আর কষ্ট স্বীকার করলে তার বিনিময় এই দুনিয়াতে নাও পেতে পারে, কেননা দুনিয়া ত্যাগ করাই দ্বীনের দাবি। এটি এমন একটি দ্বীন যার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে হতে পারে, কারণ এর বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত। জান্নাতে যে প্রতিদান দেওয়া হবে তা যেকোনো আত্মত্যাগের তুলনায় বহুগুণে দামি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিবেন তা অনেক দামি। আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। কাজেই জান্নাত পেতে চাইলে এই দুনিয়াতে তার জন্য চড়া মূল্যও দিতে হবে।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে কী আশা করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো লুকোছাপা রাখেননি, তিনি আনসারদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের এই কাজের জন্য তাদের ও তাদের পরিবারের জীবন হুমকির মুখে পড়তে পারে, আল্লাহর রাসূলকে ﷺ আশ্রয় দেওয়ার অর্থ নিজেদের জীবনে যুদ্ধ ডেকে আনা। আর এই কাজের বিনিময় হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দুনিয়ার প্রাচুর্য বা অর্থ-সম্পদের প্রতিশ্রুতি দেননি, ক্ষমতার প্রতিশ্রুতিও

দেননি, তিনি তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা কোনো সহজ কাজ নয়, এর জন্য অনেক সংগ্রাম করতে হবে আর এর জন্য প্রয়োজন অনেক আত্মত্যাগ। উমার ইবন খাত্তাব ﵁ বলেছিলেন যে, আয়েশের জীবন ছেড়ে দাও, আরামের জীবন চিরস্থায়ী হবে না। কাজেই যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে চায়, তাদের মনে রাখতে হবে, এই কাজের জন্যে দুনিয়াকে বিসর্জন দিতে হতে পারে। আর সে হিসেবেই নিজেদের প্রস্তুত করে নেওয়া জরুরি।

৪. আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে সত্তরের অধিক লোক সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তাঁরা ছাড়াও আরও অনেকে মুসলিম ছিলেন যারা হয়তো সেখানে আসেনি। কিন্তু বাইয়াত গ্রহণ করা মাত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন ১২ জন নেতা (নুকাবা) মনোনীত করতে। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে তাদের জন্য একজন করে নেতা নিযুক্ত করেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, দ্বীন ইসলাম সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ থাকার উপর জোর দেয়। আর এখানে যেহেতু মুসলিমদের একটি দল রাসূলের ﷺ সরাসরি তত্ত্বাবধানে নেই, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ চেয়েছিলেন, তারা যেন নিজস্ব কাঠামোর অধীনে দলবদ্ধ থাকে। তাই তিনি দেরি না করে ৭০ জনকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেন এবং তাদের উপর বারোজন নেতা নিযুক্ত করেন। তাঁরা ছিলেন নকীব বা এক ধরনের প্রতিনিধি যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে রিপোর্ট করবেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মাধ্যমে নির্দেশাবলি পাঠাবেন।

ইয়াসরিব হলো মদীনা

'আমাকে স্বপ্নে হিজরতের ভূমি দেখানো হয়েছে। সেটি ছিল খেজুরগাছ পরিবেষ্টিত, দু'টি পাথুরে অঞ্চলের মাঝে অবস্থিত।'

এই হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। বুখারিতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মক্কা থেকে এমন এক দেশে হিজরত করছি যা খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমি ধারণা করলাম যে, এলাকাটি হবে ইয়ামামা বা হিজর, কিন্তু পরে দেখা গেল যে তা ইয়াসরিব।'

মদীনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াসরিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নাম পরিবর্তন করে ইয়াসরিব নামটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যদি কেউ মদীনাকে 'ইয়াসরিব' বলে ডাকে তাহলে তাঁকে ইস্তিগফার করতে হবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এই শহরটির পরিচয়কে সম্পূর্ণ বদলে দিতে চেয়েছিলেন। ইয়াসরিবের ইতিহাস ছিল শত্রুতা আর যুদ্ধ-বিগ্রহে ভরপুর, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ একে একটি নতুন পরিচয়ে পরিচিত করতে চাইলেন। ফলে এটির নতুন নাম হলো মদীনা, মদীনাতুর রাসূলুল্লাহ ﷺ বা রাসূলুল্লাহর ﷺ শহর। মদীনা শব্দের আক্ষরিক অর্থ শহর, তবে মদীনা বলতে এখন রাসূলুল্লাহর ﷺ শহরকেই বোঝানো হয়।

সাহাবীদের রাদিয়াল্লাহু আনহুম হিজরত

আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উম্ম সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা

হিজরতের সমসাময়িক একটি ঘটনা উম্ম সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন।[55] তিনি বলেন, 'আমরা হাবশা থেকে ফিরে আসলাম। আমার স্বামী আবার হাবশায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন মদীনা হিজরতের নতুন ভূমি এবং সেখানে কিছু মুসলিম রয়েছে, তখন তিনি মদীনায় সপরিবারে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন।' এটি ছিল আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের এক বছর আগের ঘটনা। তিনি ছিলেন প্রথম দিকের মুহাজিরদের একজন।

'আমার স্বামী আমাকে একটি উটের পিঠে আরোহণ করালেন এবং আমার ছেলেকে আমার কোলে তুলে দিলেন। আমরা মক্কা ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে যাবো – এমন সময় আমার পরিবারের লোকজন আমার দিকে তেড়ে এসে বললো, আমরা

---

[55] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১২।

তোমাকে তোমার স্বামীর সাথে যেতে দেব না। এ কথা বলে তারা আমাকে আমার স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।'

ইতোমধ্যে বনু আসআদ অর্থাৎ আবু সালামার পরিবার এসে পড়লো। তারা বললো, 'আমরা তোমার সন্তানকে তোমার সাথে যেতে দেব না' – এ কথা বলে তারা শিশুটিকে ছিনিয়ে নেয়। এর ফলে আবু সালামা ও উম্ম সালামা আলাদা হয়ে গেলেন আর তাদের সন্তানকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো। উম্ম সালামার পরিবার উম্ম সালামাকে নিয়ে গেল, আর তাদের শিশু সালামাকে নিয়ে গেল আবু সালামার পরিবার। এভাবে তিনজনের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত স্ত্রী ও সন্তানকে মক্কায় রেখে আবু সালামা একাই হিজরত করে মদীনায় চলে যান। উম্ম সালামা বলেন, 'প্রতিদিন ভোরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ে চলে যেতাম আর একটি টিলার উপর বসে সারাদিন কাঁদতাম, প্রায় এক বছর পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।' এই নারী তিনি ছিলেন একজন মা, একজন স্ত্রী – অথচ স্বামী-সন্তান থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

অবশেষে বনু মুগীরার এক লোক, উম্ম সালামার চাচা, তাঁর ভাতিজির অসহায় অবস্থা দেখে তার পরিবারকে বললেন, 'এই অসহায় নারীর প্রতি কি তোমাদের কোনো দয়া হয় না? তাঁকে ছেড়ে দাও এবং স্বামী-সন্তানের সাথে মিলিত হতে দাও।' অবশেষে তারা রাজি হলো। তারা উম্ম সালামাকে বললো, 'তুমি ইচ্ছা করলে মদীনা যেতে পারো।' তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এ সংবাদ শুনে তাঁর সন্তানকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, 'এখন তুমি তোমার স্বামীর সাথে মিলিত হতে পারো।' উম্ম সালামা তাঁর সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

হিজরতের এই যাত্রায় তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা। তিনি তাঁর সন্তানসহ একটি উটের পিঠে আরোহণ করে একাকী মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। মক্কা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'তানঈম' নামক স্থানে উসমান ইবন তালহার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। উসমান তাঁকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

- আবু উমাইয়্যার মেয়ে, যাচ্ছো কোথায়?

- মদীনা যাচ্ছি।

- তোমার সাথে আর কেউ আছে কি?

- না, আমি একাই যাচ্ছি।

- তাহলে আমি তোমার সাথে যাব। তোমাকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না।

উসমান ইবন তালহা ছিলেন একজন মুশরিক, অমুসলিম। কিন্তু এই নারীটিকে এমন

একা দেখে তিনি তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন। মক্কা থেকে মদীনার পুরো যাত্রাপথে তিনি তাঁকে পাহারা দিয়ে রাখেন। উম্ম সালামা বলেন,

'আল্লাহর কসম, পুরো আরবে তাঁর মতো ভদ্র আর সম্মানিত মানুষ আর কাউকে দেখিনি। যখন আমরা কোথাও থামতাম, তখন তিনি আমার জন্য উটকে বসাতেন এবং দূরে সরে যেতেন। আমি নিচে নেমে আসলে তিনি ফিরে আসতেন এবং উটটিকে বেঁধে রাখতেন। তারপর তিনি দূরে কোনো গাছের নিচে বিশ্রাম নিতেন। পরদিন সকালে তিনি আমার উট নিয়ে আসতেন, উটকে প্রস্তুত করে আমাকে উঠতে বলতেন আর তিনি দূরে সরে যেতেন। আমি উটের পিঠে সওয়ার হলে তিনি আবার ফিরে আসতেন এবং উটের লাগাম ধরে আগে আগে চলতে থাকতেন।'

উম্ম সালামা ﵂ বলেন, 'আমাকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই আমার সঙ্গে আচরণ করেন। কুবায় পৌঁছানোর পর তিনি কুবাকে ইঙ্গিত করে বলেন, তোমার স্বামী এই গ্রামেই রয়েছে। এখন তুমি নিজে নিজে যেতে পারো।'

উম্ম সালামা বলেন, 'ইসলামের জন্য আবু সালামার পরিবারকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, তা আর কোনো পরিবারকে করতে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আর উসমান ইবন তালহার চেয়ে ভদ্র মানুষ আমি কখনও সঙ্গী হিসেবে পাইনি।' তিনি উসমান ইবন তালহার আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কেননা তখন মক্কার কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের শত্রুতা ছিল আর সেরকম একটি পরিস্থিতিতে তিনি নিজ থেকে এসে উম্ম সালামাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সাথে পুরোটা পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন এবং অনেক সম্মান করেছিলেন। তাই উম্ম সালামা ﵂ তাঁর এই আচরণের অনেক প্রশংসা করেন।

উসমান ইবন তালহা পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধে তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও তিনি মুসলিম হয়েছিলেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﵁ এবং আমর ইবনুল আস ﵁ – এই দুইজনের সমসাময়িক সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কাবা শরীফের চাবি উসমান ইবন তালহার পরিবার বনু আব্দুদ দারের কাছেই থাকতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পরেও তাদের এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেন, মক্কার চাবি তাদের কাছেই রাখেন। এখন পর্যন্ত সে নিয়ম বহাল আছে।

উমার ﵁

উমার ইবন খাত্তাব ﵁ কুরাইশদের বিন্দুমাত্র ভয় করতেন না। সবাই মদীনায় হিজরত করেছিলেন গোপনে, আর উমার রীতিমত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হিজরত করেন। তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন, সাথে নিলেন তলোয়ার, কাঁধে ঝোলালেন তীর-ধনুক, লাঠি নিতেও ভুললেন না। তিনি কাবাঘরের দিকে গেলেন, সেখানে

কুরাইশরা বসা ছিল, তাদের সামনে ধীরেসুস্থে সাতবার কাবাঘর তাওয়াফ করলেন। তারপর মাকামে গিয়ে আস্তেধীরে সালাত আদায় করলেন। তারপর জনসমাগমের দিকে গেলেন, এক এক করে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'তোদের মুখে চুনকালি পড়ুক! আল্লাহ তোদের ওই নাক ধূলোয় গড়াগড়ি খাওয়াবেন। কে আছে বাপের ব্যাটা, বুকের পাটা থাকলে আয়! যদি স্ত্রীর বিধবা হওয়ার ভয় না করিস, সন্তানের এতিম হওয়ার ভয় না করিস, নিজের মাকে সন্তানহারা বানাতে ভয় না পাস, তাহলে এই পাহাড়ে আয়! আমার সাথে লড়ে দেখা!'

কেউ তাঁর সাথে লড়ার সাহস দেখালো না। বরং তিনি দলবল নিয়ে হিজরত করতে রওনা হলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন[56], 'আমি, আইয়্যাশ ইবন আবু রাবিআ এবং হিশাম ইবন আস – আমরা পরিকল্পনা করলাম একসাথে মদীনায় হিজরত করবো। আমরা সারিফের উপর মিলিত হওয়ার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করলাম। আমরা ঠিক করলাম যে, আমাদের মধ্যে যদি কেউ ভোরে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে সে আটকা পড়েছে, সুতরাং বাকিরা তার জন্য অপেক্ষায় না থেকে মদীনায় যাত্রা শুরু করে দিবে।'

সারিফ মক্কার বাইরে একটি জায়গা, উমার ও আইয়্যাশ ভোরে সেখানে পৌঁছে গেলেন, কিন্তু হিশাম ইবন আসকে দেখা গেল না। তাই উমার আর আইয়্যাশ দুজন মিলেই যাত্রা শুরু করে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ পূর্বেই হিজরত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করেছিলেন সবার শেষে। আবু জাহেল ছিল আইয়্যাশ ইবন রাবিআর সৎ ভাই। সে তার ভাই হারিসকে নিয়ে মদীনায় চলে গেল আইয়্যাশকে ফিরিয়ে আনতে। তারা আইয়্যাশকে প্ররোচিত করলো, 'তোমার মা প্রতিজ্ঞা করেছে তোমাকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মাথার চুল আঁচড়াবেন না, রোদ ছেড়ে ছায়ায় বসবেন না। তুমি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মক্কার প্রখর রোদের নিচেই তিনি বসে থাকবেন।'

উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ দূর থেকে তাদের কথা শুনছিলেন। তিনি আইয়্যাশকে গিয়ে বললেন, 'এই লোকগুলো তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে, তোমাকে পটানোর জন্য এসব বলছে, তারা তোমাকে মক্কায় ফিরিয়ে নিতে চায়। তোমার মায়ের শপথের কথা বলছো? উকুনের জ্বালায় ঠিকই তিনি চিরুনী ব্যবহার করবেন, আর মক্কার কড়া রোদ অসহ্য ঠেকলে তিনি নিশ্চয়ই ছায়াতে না বসে পারবেন না। তুমি এদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ো না আর তাদের সাথে যেও না।'

উমার ইবন খাত্তাবকে ﷺ শয়তানও ধোঁকা দিতে পারতো না। তিনি খুব ভালোই বুঝতে পারছিলেন এসব আবু জাহেলের ষড়যন্ত্র। এদিকে মায়ের কথা শুনে আইয়্যাশ

---

[56] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৬।

অস্থির হয়ে গেলেন। তিনি উমারের উপদেশ না শুনে আবু জাহেলদের সাথে মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। উমার বললেন, 'ঠিক আছে, যেতেই যদি চাও, আমার উটনীটি সাথে নাও। এটা খুব শক্তিশালী আর দ্রুত দৌঁড়াতে পারে। পথিমধ্যে যদি সন্দেহজনক কিছু দেখ, চোখ বন্ধ করে সোজা উট নিয়ে পালিয়ে যাবে।'

এরপর আইয়্যাশ ইবন আবি রাবিআ, আবু জাহেল এবং হারিস ইবন হিশাম মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। প্রত্যেকেই নিজেদের উটের উপর বসে চলছে। পথিমধ্যে আবু জাহেল তার উটের ব্যাপারে অভিযোগ করা শুরু করে – 'কী অদ্ভুত উট রে বাবা! এত ধীরে চলে! এ তো মহা ঝামেলা।' তারপর সে আইয়্যাশকে বলে, আমার উটটি খুবই ঝামেলা করছে। তুমি কিছুক্ষণের জন্য তোমার উটকে আমারটার সাথে অদল-বদল করবে?' আইয়্যাশ ছিলেন সহজ-সরল মানুষ, তিনি রাজি হলেন, তারা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, আইয়্যাশের উট মাটিতে বসামাত্র তারা ছুটে তাঁকে আক্রমণ করে এবং বেঁধে ফেলে। তারপর টেনে-হিঁচড়ে মক্কায় নিয়ে যায়।

তারা আইয়্যাশের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালালো। একই ঘটনা ঘটেছিল তার সাথী হিশাম ইবন আসের সাথে, তিনিও মক্কায় বন্দী হয়েছিলেন। উমার ﷺ বলেন, 'আমরা মুসলিমরা নিজেদের মাঝে বলাবলি করতাম যে, যে ব্যক্তি পেছনে পড়ে রয়েছে, অর্থাৎ হিজরত করেনি এবং শত্রুদের ধোঁকায় পড়েছে, আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন না।' যারা হিজরত করতে পারেনি তারাও ভাবতেন তাদের ক্ষমা পাওয়ার বুঝি আর কোনো আশা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার আগ পর্যন্ত তাঁরা এমন ধারণাই রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করলে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন:

> "বলোঃ হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো। তার পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাত অবস্থায় আযাব আসার পূর্বে, অথচ তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না।" (সূরা আয যুমার, ৩৯: ৫৩-৫৫)

উমার ﷺ আয়াতগুলো পড়ে সেগুলো লিখে হিশামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হিশাম বলেন, 'চিঠিটি আমার নিকট পৌঁছলে আমি তুয়া উপত্যকায় উঠে সেটি পড়লাম, আবার পড়লাম এবং বারবার তা পড়তে লাগলাম। টানা কয়েকদিন বারবার পাঠ করেও আমি এর মর্ম উদ্ধার করতে পারছিলাম না। আমি যতদিন বুঝতে পারিনি কেন উমার এটি আমার কাছে পাঠালেন, ততদিন আমি সেখানে গিয়ে চিঠিটি বারবার

পড়তে থাকি। সবশেষে আমি বুঝাতে পারলাম যে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।'

কেউ যত গুনাহের কাজই করুক না কেন, আল্লাহ্ তাআলা তারপরও তাকে ক্ষমা করতে পারেন, যদি সে তাওবা করে। কেউ যদি পেছনে পড়ে যায়, হিজরত করতে না পারে, কাফিরদের হাতে প্রতারিত হয়, তবু তার জন্য সুযোগ রয়েছে। হতাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। হিশাম ইবন আস বলেন, আমি আল্লাহ্র কাছে তাওবা করলাম, এরপর উটের পিঠে চড়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

সুহাইব আর রুমী ﵁

সুহাইব আর রুমী রাসূলুল্লাহর ﷺ পরে মদীনায় আসেন। রোমান ও আরবদের মধ্যকার একটি যুদ্ধে তিনি রোমান সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হন। পরবর্তীতে তিনি রোমানদের মাঝেই বেড়ে ওঠেন এবং তাদের ভাষা রপ্ত করে ফেলেন। তাই তিনি আরবিতে কথা বলার সময় তাতে রোমান টান থাকত। বিভিন্ন মনিবের হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত দাস সুহাইব আর-রুমী আবদুল্লাহ ইবন জুদানের হাতে গিয়ে পড়েন।

আবদুল্লাহ ইবন জুদান ছিলেন মক্কার এক ধনী ব্যক্তি। তিনি সুহাইবকে ﵁ মুক্ত করে দেন। সুহাইব ﵁ ছিলেন মেধাবী, বুদ্ধিমান ও কর্মঠ যুবক, তিনি নিজেই ব্যবসা শুরু করলেন এবং বেশ দ্রুত অনেক সম্পদের মালিক হয়ে যান। হিজরতের পূর্বে তিনি একটি গর্ত করে সেখানে তাঁর সম্পদ লুকিয়ে রাখেন এবং মক্কা ত্যাগের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কুরাইশের কিছু লোক তাঁর পিছু নিয়ে তাঁর পথরোধ করলো এবং তাঁকে বললো, 'তুমি আমাদের মাঝে এসেছিলে ফকির হয়ে। এখানে এসে তুমি সম্পদ গড়েছ, প্রতিপত্তি লাভ করেছো, আর এখন তুমি সেসব নিয়ে চলে যেতে চাও? আল্লাহর শপথ, আমরা কখনোই তোমাকে যেতে দেব না।' সুহাইব ﵁ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি আমি তোমাদেরকে টাকা দেই, তোমরা আমাকে যেতে দেবে?' তারা বললো, 'হ্যাঁ, তাহলে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব।'

অবশ্য সুহাইবের হিজরতের ঘটনা অন্য একটি বর্ণনায় খানিকটা ভিন্নভাবে এসেছে: সুহাইব যখন দেখলেন কুরাইশরা তাঁর পিছে পিছে আসছে, তখন তিনি ৪০টি তীর বের করলেন এবং তাদেরকে হুমকি দিলেন যদি তারা তাঁর পথ না ছাড়ে তাহলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে এই ৪০টি তীর ছুঁড়ে মারবেন, আর এই তীরগুলো শেষ হয়ে গেলে তিনি তরবারি দিয়ে হলেও তাদের সাথে লড়বেন এবং কুরাইশদের পৌরুষত্বের শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন। এরপর তিনি তাদেরকে বললেন তাঁকে যেন যেতে দেওয়া হবে, বিনিময়ে তিনি তাদের টাকা দেবেন। এরপর কুরাইশরা বাড়াবাড়ি না করে তাঁর এই প্রস্তাবে রাজি হয়।[57]

---

[57] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৯।

শিক্ষা

১. আল্লাহ ক্ষমাশীল। গুনাহ যা-ই হোক না কেন, কখনও হতাশ হওয়া উচিত নয়, হাল ছাড়া উচিত নয়, বরং আল্লাহর কাছে তাওবা করা উচিত। সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো শির্ক। সেই শির্ক করার পরেও যদি কেউ তওবা করে, আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, আল্লাহ তাকেও ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু তা করতে হবে আল্লাহর আযাব বা মৃত্যু আসার পূর্বেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> **"তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো।" (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ৫৪)**

২. কাফেরদের ব্যাপারে সাবধান থাকা জরুরি, তাদের ব্যাপারে এতটুকু অসতর্ক হওয়া যাবে না। আইয়্যাশ ইবন আবি রাবিআ আবু জাহেলকে বিশ্বাস করে ভুল করেছিলেন। একজন মু'মিন শত্রুদের মিষ্টি কথায় প্রলুব্ধ হবে না। অনেকেই আছে সাদাসিধে ও সরলমনা। তারা এখানে-সেখানে 'ভালো ভালো' কথা শুনে বিশ্বাস করে ফেলে, রাজনীতিবিদদের সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে ফাঁদে পড়ে যায়। যারা দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের সাথে যুদ্ধ করে আসছে তাদের কথায় চট করে বিশ্বাস করা যাবে না।

নিজেদেরকে প্রতারিত হতে দেওয়া উচিত না। উমার ﵁ আবু জাহেলের এই পরিকল্পনার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। সেজন্যই তিনি আইয়্যাশকে বলেছিলেন, 'তাদেরকে বিশ্বাস কোরো না। তারা মিথ্যা বলছে। তোমার মায়ের মাথা উকুনে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তিনি অবশ্যই চুল আঁচড়াবেন। আর মক্কার প্রখর রোদে কেউ-ই বাঁচতে পারবে না, তাকে সরে ছায়াতে আসতেই হবে। মানত পূরণ করার জন্য তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই।' আল্লাহ জানেন কারা মুসলিমদের শত্রু। তিনি এই উম্মাহকে তাদের শত্রু সম্পর্কে অবগতও করেছেন। তাই মুসলিমদের ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। বরং শত্রুদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

৩. সুহাইব ﵁ ছিলেন একজন অভিবাসী। তিনি মক্কায় গিয়ে সেখানে স্থায়ী হন, ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং সেখানকার সমাজে সম্মানিত একটি অবস্থান অর্জন করেন। কিন্তু সেই একই ব্যক্তি যখন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় হিজরত করতে চাইলেন, তখন যে লোকগুলো তাঁকে সম্মান করতো, তারাই তাঁর হিজরতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য সুহাইব ﵁ একজন আদর্শ, যিনি দ্বীনের জন্য নিজের উন্নত ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়ে ঈমানের ভূমিতে হিজরত করতে উদগ্রীব ছিলেন।

হিজরতের আহ্বান

> **"বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী**

প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।" (সূরা আয-যুমার, ৩৯: ১০)

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হিজরতের দিকে ইঙ্গিত করছেন। 'ওয়া আরদুল্লাহী ওয়াসি'আহ' – আল্লাহ তাআলার জমিন প্রশস্ত। আল্লাহ মুসলিমদের বলছেন, যদি মক্কায় তোমাদের উপর জুলুম করা হয় তাহলে তোমরা অন্যত্র চলে যেতে পারো যেখানে আল্লাহ তাআলার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবে। মুফাসসির মুজাহিদ (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জন্য হিজরত করো ও জিহাদ করো এবং মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাক।' উম্মাহর প্রাথমিক যুগের প্রখ্যাত আলিম আতা বলেন, 'যদি তোমাকে কোনো পাপের দিকে আহ্বান করা হয় তাহলে তুমি পালিয়ে যেও।'

"আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহর রাস্তায় অত্যাচারিত হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দান করব। আর আখিরাতের প্রতিদান তো বিশাল, যদি তারা জানতো।" (সূরা নাহল, ১৬: ৪১)

যারা আল্লাহ তাআলার জন্যে হিজরত করে এবং নিপীড়িত হয় তাদেরকে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল এই দুনিয়ার বুকে উত্তম আবাস দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। এই আয়াতের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন মুহাজিরগণ। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় তাঁরা ছিলেন নিঃস্ব। কিন্তু এই মানুষগুলোই পরবর্তী সময়ে কেউ হন আমীর, কেউ বা সেনাপতি। দুনিয়ার বুকেই আল্লাহ তাদেরকে নিঃস্ব অবস্থা থেকে উন্নীত করে সম্মান ও ইজ্জতের আসনে আসীন করেছেন। এটাই হলো এই আয়াতে বর্ণিত 'উত্তম আবাস'। যদিও তাঁরা দুনিয়ার বুকে পুরস্কার পেয়েছেন, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল বলছেন, 'কিন্তু পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক।' আর তাই উমার ইবন খাত্তাব ﷺ খলীফা হওয়ার পর যখন মুহাজিরদের টাকাপয়সা অথবা উপহার দিতেন তখন তিনি বলতেন, 'এটি হচ্ছে এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তোমাদের জন্যে উপহার কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য আখিরাতে এর চেয়েও অনেক বেশী বরাদ্দ করে রেখেছেন।' যখন কেউ আল্লাহ তাআলার জন্য কিছু ত্যাগ করে, আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়েও ভালো প্রতিদান দিয়ে পুষিয়ে দেন।

"যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জিহাদ করেছে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নাহল, ১৬: ১১০)

হিজরত একটি ইবাদাত। ইসলামে এই ইবাদাতের মর্যাদা অনেক বেশি। যেখানেই হিজরাত আছে, সেখানেই আছে নুসরাত। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করা মুহাজিরগণ মদীনায় কোনো হোটেল বা উদ্বাস্তুশিবিরে জড়ো হননি। তাঁরা মদীনায় যাদের বাসায় উঠেছেন তাদেরকে বলা হয় আনসার। তাদেরকে আনসার বলার কারণ,

তাঁরা আল্লাহ তাআলার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা (নুসরাহ) দিয়েছেন এবং জয়ী করতে সাহায্য করেছেন। তাদের ছোট গৃহ তারা মুহাজিরদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

মদীনার ঘরগুলো কেমন ছিল? আল-হাসান আল বসরীর একটি বর্ণনা এখানে উল্লেখ্য, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরগুলো দেখেছি। সেগুলো এত ছোট ছিল যে, আমি আমার হাত দিয়ে ঘরের ছাদ ধরতে পারতাম। রাসূলুল্লাহ যখন আ'ইশার ﷺ ঘরে সালাত আদায় করতেন, ঘর ছোট হওয়ার কারণে আ'ইশাকে তাঁর পা সরিয়ে রাখতে হতো যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিকমত সিজদাহ দিতে পারেন।' রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি করে ঘর ছিল। কিন্তু সেগুলোর সাথে আলাদা করে কোনো রান্নাঘর, বসার ঘর অথবা বারান্দা বলে কিছু ছিল না। শুধুমাত্র একটি করে ঘর আর প্রতিটা ঘরই ছিল অনেক ছোট।

তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ ﷺ ও তাঁর মা এবং সুহাইব ﷺ ছিলেন হাবিব ইবন উসার ﷺ বাড়িতে। হামযা ﷺ উঠেছিলেন সাদ ইবন যুরায়রার ﷺ বাড়িতে। সাদ ইবন খাইসামের ﷺ বাড়িকে বলা হতো "ব্যাচেলর হাউজ", কারণ সেখানে অবিবাহিত মুহাজিররা থাকতেন। উবাইদা ইবনু হারিস ﷺ ও তাঁর মা, তুফাইল ইবন হারিস ﷺ, তুফাইল ইবন আমর ﷺ, আল হুসসাইন ইবন হারিস ﷺ – তাঁরা সবাই থাকতেন আবদুল্লাহ ইবন সালামার ﷺ বাসায়। এক মুসলিমের আরেক মুসলিমের প্রতি উদার হওয়া এবং তাকে সাহায্য করা মুসলিমের ঈমানের চিহ্ন। এটা ছিল আনসারদের একটি বৈশিষ্ট্য।

সেই সময়ে মুসলিমদের কেউ মদীনায়, আবার কেউ হাবশায় হিজরত করেছিলেন। এই দুই হিজরতের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। হাবশায় হিজরতের ঘটনার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তাঁরা সেখানে হিজরত করলেও সেখানকার সমাজের উপর তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। সেখানে তাঁরা সমাজ থেকে অনেকটাই আলাদা থাকতেন। তাঁরা সেখানে উদ্বাস্তুর মতো অবস্থান করেছিলেন। আর এ কারণেই আবিসিনিয়া ত্যাগ করার সময় তাঁরা সেখানে ইসলামের তেমন কোনো প্রভাব রেখে আসতে পারেননি। কিন্তু মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আর সে উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল।

ইসলামে মদীনার তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেছিলেন আল্লাহ তাআলা যেন তাদের অন্তরে মদীনার জন্য ভালোবাসার সৃষ্টি করে দেন। তিনি দুআ করেছেন, 'হে আল্লাহ, মদীনাকে আমাদের চোখে মক্কার মতো বা তার চেয়েও প্রিয় বানিয়ে দাও।' নবীজি ﷺ মদীনার বরকত বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ আযযা ওয়াজাল-এর কাছে দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ! মক্কায় তুমি যে পরিমাণ বরকত দান করেছো, মদীনাতে তার দ্বিগুণ বরকত

দাও।'

দাজ্জাল মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না। নবীজি ﷺ বলেন, দাজ্জালের কাছ থেকে মদীনাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এর প্রতিটি প্রবেশমুখে ফেরেশতারা পাহারারত রয়েছে।

মদীনায় কষ্টকর জীবনে ধৈর্যধারণের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। মদীনায় তখন প্রচণ্ড গরম ছিল এবং পরিবেশ–পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল, তাই নবীজি ﷺ বলেছেন, 'মদীনার কষ্টকর অবস্থায় যে ধৈর্য ধারণ করবে, আমি শেষ বিচারের দিন তার শাফাআতকারী হব। শেষ বিচারের দিন আমি তার হয়ে মধ্যস্থতা করব।'

মদীনায় মৃত্যুবরণকারীর জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। নবীজি ﷺ বলেছেন, 'যে মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য শেষ বিচারের দিন মধ্যস্থতাকারী হবো।' উমার ইবন খাত্তাব ؓ খলীফা হওয়ার পর থেকে চাইতেন তিনি মদীনায় শহীদ হবেন। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার রাসূলের শহরে শহীদ হিসেবে মরতে চাই।' এই দুআ শুনে তাঁর কন্যা হাফসা ؓ বললেন, "আব্বা, আপনি কিভাবে মদীনায় শহীদ হবেন? মদীনা তো নিরাপদ শহর, মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী। আপনি যদি শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চান তাহলে আপনাকে ইরাক বা সিরিয়া যেতে হবে, মদীনায় নয়।" এরপর উমার ইবন খাত্তাব ؓ বললেন, 'যদি আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু ঘটাতে চান, তাহলে তিনি তা অবশ্যই ঘটাবেন।' পরবর্তীতে দেখা যায়, উমার ؓ মদীনাতেই শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সে সময় তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ মসজিদে ইবাদতরত অবস্থায় ছিলেন।

মদীনা হলো ঈমানের আশ্রয়স্থল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ঈমান মদীনাতে ফিরে আসবে সেভাবে, যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।' মদীনা শহরে কোনো অপবিত্রতা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সেই সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, মদীনাকে পছন্দ হয় না বলে কেউ মদীনা ত্যাগ করে না, বরং আল্লাহ তাআলাই তাদের চেয়েও উত্তম কাউকে দ্বারা তাদেরকে প্রতিস্থাপন করে দেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, 'মদীনা অপবিত্র ও খারাপ লোকদের বহিষ্কার করে দেয়।' তিনি আরো বলেন, 'শেষ বিচারের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মদীনা সমস্ত খারাপ লোকদের ঠিক সেভাবেই বের করে দেয়, যেভাবে আগুন লোহার মরিচাকে দূর করে দেয়।'

স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়াজাল মদীনাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে কেউ মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, সে সেভাবে বিলীন হয়ে যাবে যেভাবে লবণ পানিতে বিলীন হয়ে যায়।'

মদীনা হলো পবিত্র নগরী। নবীজি ﷺ এর পবিত্রতা সম্পর্কে বলেছেন, 'মদীনা পবিত্র, এখানে তোমরা গাছ কাটবে না, শিকার করবে না, অস্ত্র বহন করতে পারবে না।'

রাসূলুল্লাহর ﷺ হিজরতের পটভূমি: গুপ্তহত্যার চেষ্টা

মুশরিকরা যখন দেখলো মুসলিমরা একে একে পরিবার-পরিজন নিয়ে ধন-সম্পদ ফেলে মদীনায় জমা হচ্ছে তারা অস্থির হয়ে গেল। মুসলিমদের মদীনায় হিজরতের ফলাফল কী হতে পারে তা তাদের অজানা ছিল না। তারা টের পেয়েছিল আওস এবং খাযরাজ গোত্র রাসূলুল্লাহর ﷺ নেতৃত্বে এক হচ্ছে এবং তাদের মিলিত শক্তির সাথে পেরে ওঠা সহজ কথা নয়। মদীনায় মুসলিমদের ঘাঁটি গড়ার অর্থ হলো, তাদের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক পথ অনিরাপদ হয়ে যাওয়া, কেননা কুরাইশদের ব্যবসা ছিল ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যে দীর্ঘ উপকূলীয় পথ রয়েছে সে পথেই কুরাইশদের কাফেলা চলাচলা করতো আর মদীনা থেকে সে পথ খুব দূরে নয়। কুরাইশরা দীর্ঘদিন ধরে আরবের একচ্ছত্র ক্ষমতার যে স্বপ্ন দেখে আসছিল, মদীনায় মুসলিমদের উত্থান হলে সে স্বপ্নে মুসলিমরা ব্যাঘাত ঘটাবে। অত্যাচার-নির্যাতন, প্রলোভন, সমঝোতা, মিডিয়া ক্যাম্পেইন, হত্যার হুমকি, বয়কট–কিছুই যখন কাজ হলো না তখন কুরাইশরা ক্ষুব্ধ ষাঁড়ের মত ফুঁসলে উঠলো। ব্যর্থ, পরাজিত মানুষের মত বেপরোয়া, মরিয়া, অস্থির-উন্মাদপ্রায় কুরাইশরা গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করলো: মুহাম্মাদকে ﷺ তারা মারবেই–যে করেই হোক।

দারুন নাদওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বসলো, শিরোনাম: মুহাম্মাদকে ﷺ কীভাবে থামানো যায়। কুরাইশদের বড় বড় নেতারা এ অধিবেশনে অংশ নিল। বেশ কিছু প্রস্তাব এলো। কেউ প্রস্তাব করলো তাঁকে কারাগারে আটকে রাখা হোক। কিন্তু এ প্রস্তাব খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কারণ তারা খুব ভালো করে জানতো যে, রাসূলুল্লাহকে ﷺ কারাগারে প্রেরণ করলে সাহাবীগণ ﷺ তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে পারবেন, এমনকি তাঁরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করে বসতে পারেন। প্রস্তাব হলো, রাসূলুল্লাহকে ﷺ মক্কা থেকে বের করে দেওয়া। কিন্তু এ প্রস্তাবও খুব একটা হালে পানি পেল না, কারণ রাসূলুল্লাহর ﷺ কথাবার্তা ছিল খুবই চমৎকার, তাঁর সুন্দর কথা শুনে মক্কার বাইরের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর দলে যোগ দিয়ে মক্কায় আক্রমণ চালাতে পারে।

সর্বশেষ এবং সবচেয়ে জঘন্য প্রস্তাব ছিল নবীজিকে ﷺ হত্যা করা। এই প্রস্তাব আর কারো নয়, এই প্রস্তাব কুখ্যাত আবু জাহেলের।[58] সে প্রস্তাব করলো, প্রত্যেক শক্তিশালী অভিজাত বংশের একজন করে শক্তসমর্থ কাউকে পাঠানো হবে। তাদের সবার হাতে থাকবে একটি করে ধারালো তলোয়ার। তারা সবাই একযোগে

---

[58] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩।

বদর
হিজরতের পথ নির্দেশিকা
মক্কা থেকে মদিনাহ যাওয়ার সাধারণ রাস্তা
রাসূল সা. যে পথে হিজরত করেছিলেন

রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যা করবে। ফলে হত্যার দায় নির্দিষ্ট কাউকে বহন করতে হবে না, মক্কার সমস্ত গোত্র এই হত্যার দায়ভার নেবে। সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিবার মক্কার সব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে পারবে না, তারা রক্তপণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। মুশরিকরাও খুশি মনে রক্তপণ দিয়ে দিবে। প্রস্তাবটি জঘন্য হলেও বেশ কার্যকরী ছিল, মক্কার সংসদে হত্যার বিল পাস হলো।

> **"আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করতো আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য – তখন তারা যেমন পরিকল্পনা করতো তেমনি, আল্লাহও পরিকল্পনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর পরিকল্পনাই সবচেয়ে উত্তম।"** (সূরা আনফাল, ৮: ৩০)

মুশরিকদের পরিকল্পনা ছিল রাসূলুল্লাহকে ﷺ গোপনে হত্যা করা, কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল তাঁকে তিনি রক্ষা করবেন। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁর নবী মুহাম্মাদকে ﷺ শিখিয়ে দিলেন একটি দুআ।

> "বলুনঃ হে আমার রব, যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক, আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭: ৮০)

"আমাকে সেখানে নিয়ে যান, যেখানে আমার গমন শুভ" – এখানে মদীনার কথা বোঝানো হচ্ছে; **"যেখান হতে নির্গমন শুভ সেখান হতে আমাকে বের করে নিন"** – এখানে বলা হচ্ছে মক্কার কথা এবং **"আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি"** – এখানে বলা হচ্ছে শাসনকর্তৃত্ব বা রাজনৈতিক ক্ষমতার কথা। আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিচ্ছেন এই দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে চাই শাসনকর্তৃত্ব বা শক্তি।

হিজরতের সিদ্ধান্ত

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে رضي الله عنه বিষয়টি জানানোর জন্য তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলেন। আ'ইশা رضي الله عنها সেদিনের কথা বর্ণনা করেন, 'আমরা দেখলাম একজন মানুষ মুখ কাপড়ে ঢেকে আমাদের বাড়ির দিকে আসছেন।' আবু বকর رضي الله عنه তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ। আবু বকর رضي الله عنه বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার, তা না হলে তিনি এ অসময়ে এভাবে আসতেন না।' দুপুর বেলা বিশ্রামের সময়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ এভাবে আসার কথা না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ঢুকেই আবু বকরকে رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পরিবারের

সবাই কি চলে গেছে?' আবু বকর ﷺ বললেন, 'এখানে যারা আছেন তাঁরা তো সবাই আপনার পরিবারের সদস্য।' আবু বকর ﷺ বুঝাতে চাইলেন, আমার পরিবার তো আপনার নিজের পরিবারের মতোই, তাই আপনি তাদের বিশ্বাস করতে পারেন এবং তাদের সামনেই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পারেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে ﷺ জানালেন, 'আবু বকর, আল্লাহ তাআলা আমাকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন!' আবু বকর ﷺ বললেন, 'আল্লাহর রসূল, আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই!' রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে আবু বকর ﷺ কাঁদতে লাগলেন। আ'ইশা বলেছেন, 'সেদিন আমার পিতা খুশিতে যেভাবে কেঁদেছিলেন আমি কোনোদিন কাউকে আনন্দে এভাবে কাঁদতে দেখিনি।' [59]

মদীনায় হিজরত করা যে খুব আনন্দদায়ক ভ্রমণ ছিল তা কিন্তু নয়। আবু বকর ﷺ ভালোমতোই জানতেন যে, হিজরতে রাসূলুল্লাহর ﷺ সফরসঙ্গী হওয়ার অর্থ নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া। তিনি বিপদাপন্ন একটি সফরে যাচ্ছেন জেনেও তিনি খুশিতে কেঁদে উঠেছিলেন শুধু এই কারণে যে, তিনি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ ভালোবাসতেন। নিজের জীবনের ভয়ে আবু বকর ﷺ ভীত ছিলেন না, বরং রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য এই আত্মত্যাগের সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেন।

বাসভবন ঘেরাও

গুপ্তহত্যার অপারেশনের জন্য নির্বাচিত করা হলো এগারো জনকে, এদের মধ্যে আবু জাহেল এবং আবু লাহাবও ছিল। তারা সবাই রাসূলুল্লাহর ﷺ বাসার চারদিকে ওঁৎ পেতে রইল। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে পড়লেই তাঁর বাসায় একযোগে হামলা চালাবে। তারা নিশ্চিত মনে হাসাহাসি করছিল, এবারের মিশন সফল হবেই, কেউ তাদেরকে থামাতে পারবে না। নির্ঘুম চোখে তারা অপেক্ষা করছিল সেই 'বিজয়' মুহূর্তের।

রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করছেন কুরাইশরা। সেই রাতে আলী ইবন আবু তালিবকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে রাখা কুরাইশদের আমানত বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তুমি আমার এই সবুজ হাদরামাউতি চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো। ওদের হাতে তোমার কিছুই হবে না।' আলী নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথামতো বিছানায় শুয়ে থাকলেন। সাহাবারা ﷺ আগ্রহের সাথে তাদের এই দায়িত্বগুলো পালন করতেন। এমনকি নিজেদের জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছেন খুশিমনে।

---

[59] সীরাত ইবন হিশাম, পৃষ্ঠা ১৫৬।

এদিকে কুরাইশরা ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশায়। আবু জাহেল তার সঙ্গীদের বললো, 'আরে তোমরা জানো মুহাম্মাদ কী বলে! সে বলে তার দ্বীন মানলে তোমরা নাকি আরব অনারবের বাদশাহ হবে! মরার পর তোমাদের নাকি বাগান থাকবে, জর্ডানের বাগানের মতো বাগান! আর তোমরা যদি তাকে না মানো, তাহলে তোমাদের মেরে ফেলা বৈধ হয়ে যাবে আর মরার পর তোমরা আগুনে পুড়বে!'

'হ্যাঁ, আমি এ কথাই বলেছি আর আগুনেই পুড়বে তুমি' – রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, কেউ তাঁকে আর দেখতে পেল না। সকলের অগোচরে তিনি ঘর ত্যাগ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবৃত্তি করছিলেন সূরা ইয়াসীনের আয়াত[60],

> **'আমি ওদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি এবং আবৃত করে দিয়েছি, ফলে ওরা দেখতে পায় না।" (সূরা ইয়াসিন, ৩৬: ৯)**

এদিকে কুরাইশদের সেই এগারো জন মাথায় মাটি নিয়ে বসে থাকলো নির্ধারিত সময়ের আশায়। কিন্তু তারা তার আগেই জানতে পারলো আল্লাহর রাসূল ﷺ আগেই বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। তবু দুরাশা নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো কেউ একজন বিছানায় শুয়ে আছে। তারা ভাবলো বুঝি রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে আছে। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা দেখলো শুয়ে আছে আলী। প্রচণ্ড হতাশ হয়ে আলীকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় মুহাম্মাদ?' আলী বললেন, 'জানি নাহ।'

মদীনার পথে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর رضي الله عنه ইতিমধ্যেই মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে বেশ অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্মভূমি মক্কাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই তিনি মক্কা ত্যাগ করার সময় বারবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহর নামে বলছি, মক্কা আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নগরী। আমাকে যদি এখান হতে বের করে দেওয়া না হতো তাহলে আমি কখনো এ নগরী ছেড়ে যেতাম না। এখানে থেকে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকলে আমি মক্কা ত্যাগ করতাম না।'

মদীনা অভিমুখে তাদের যাত্রা শুরু হলো। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ ﷺ খেয়াল করলেন আবু বকর رضي الله عنه কিছু সময় তাঁর আগে-আগে হাঁটছেন আবার কিছু সময় তাঁর পিছন-পিছন হাঁটছেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

- কী ব্যাপার? কখনো তুমি আমার সামনে চলছো, আবার কখনো পিছনে চলছো,

---

[60] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৪।

কেন?

- আমার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে সামনের দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার সামনে চলে যাই। আবার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার পিছন-পিছন হাঁটি।

- আবু বকর, তুমি কোনটা চাও, আমার ক্ষতি নাকি তোমার ক্ষতি?

- আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমার ক্ষতি হলে হোক, কিন্তু আপনার ক্ষতি হোক এটা আমি হতে দিতে চাই না।[61]

> **“এমন দু’জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ?”**

এরপর তাঁরা একটি গুহার কাছে পৌঁছালেন। প্রথমে আবু বকর ؓ গুহার ভেতরে ঢুকে সবকিছু ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সেখানে কোনো সাপ, বিছা অথবা কোনো শত্রুদল ঘাপটি মেরে আছে কিনা। সবকিছু নিরাপদ দেখে তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভিতরে আসতে বললেন। কিন্তু কুরাইশ মুশরিকরা তাদের গতিবিধি নজরদারি করতে সক্ষম হয় এবং গুহার খুব কাছে চলে আসে। আবু বকর ؓ রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, যদি মুশরিকদের কেউ মাথা নিচু করে পা বরাবর তাকায় তাহলে তারা আমাদের দেখে ফেলবে।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, ‘আবু বকর, এমন দু’জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ? তুমি কি তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হবে?’ গুহার খুব কাছে এসেও মুশরিকদের ফিরে যাওয়ার কারণটি ছিল খুবই অদ্ভুত। একটি অতি ঠুনকো মাকড়শার জাল।[62]

> **“... আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল...” (সূরা আনকাবূত, ২৯: ৪১)**

যে মাকড়শার জালকে একটি আঙ্গুল দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা যায়, সেই দুর্বল মাকড়সার জালই হয়ে গেল এখানে আল্লাহ তাআলার সৈনিক। এটিই গুহায় মুশরিকদের সৈনিকদের ঢুকতে বিরত রেখেছিল। আল্লাহ যদি চান, তিনি তাঁর সুবিশাল সৃষ্টির মধ্য থেকে সবচেয়ে দুর্বলতম সৃষ্টিকেও সৈনিক হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন। হিজরতের দিনে রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গী হিসেবে ছিলেন শুধু আবু বকর ؓ, সাহাবাদের ؓ কেউই সেখানে ছিলেন না। তার উপর মুশরিকরা তাদের ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহকে ﷺ সেই ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা নিজেই যথেষ্ট

---

[61] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩০। তবে সনদের বিবেচনায় বর্ণনাটি তেমন শক্তিশালী নয়।

[62] [illegible]

ছিলেন। এই ঘটনার পর আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন,

> "যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহ্ই তাঁকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাঁকে দেশান্তর করেছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি তাঁর আপন সঙ্গীকে বলেছিলেন, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, ৯: ৪০)

আবু বকরের জন্য এই আয়াত একটি বিরাট সম্মান। কারণ এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা আবু বকরকে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী বা সাহাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরের সাথে সেই গুহাতে তিনদিন অবস্থান করেন। আবু বকরের ছেলে আবদুল্লাহ তাদের সাথে রাতের বেলা গুহায় অবস্থান করতো কিন্তু দিনের বেলা মক্কায় গিয়ে খোঁজ নিত মুশরিকরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে কী পরিকল্পনা করছে। মুশরিকরা যাতে আবদুল্লাহর গুহায় যাওয়া-আসার বিষয়ে টের না পায় এজন্য সে আবু বকরের আযাদকৃত দাস আমির ইবন ফুহাইরাহকে ﵁ বলে দিত সে যেন তার ভেড়ার পাল নিয়ে আবদুল্লাহর অনুসরণ করে। এতে দুটো সুবিধা, প্রথমত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবু বকর ﵁ ভেড়ার দুধ পান করতে পারতেন। এতে তাদের খাবারের প্রয়োজন পূরণ হতো। দ্বিতীয়ত, ভেড়ার পাল আবদুল্লাহ ও আমিরের ﵄ যাত্রাপথে তাদের পায়ের ছাপ নষ্ট করে দিত, ফলে তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কেউ আঁচ করতে পারতো না।

এভাবেই তিনদিন চলে গেল। তিনদিন পর সেখানে আবদুল্লাহ্ ইবন উরাইক্বাত নামের এক ব্যক্তি এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরকে ﵁ মক্কা থেকে মদীনায় নেওয়ার জন্য নবীজি ﷺ তাকে ভাড়া করেছিলেন। সে ছিল মুশরিক। সাধারণত যে পথে সবাই মক্কা থেকে মদীনায় যায় আবদুল্লাহ ইবন উরাইক্বাত তাদেরকে সেই পথ দিয়ে না নিয়ে অন্য আরেকটি পথ দিয়ে নিয়ে যায়। মদীনা পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাঁরা উপকূল ঘেঁষে চলতে থাকেন।

হুলিয়া জারি ও মাথার দাম ঘোষণা

কুরাইশের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরকে ﵁ ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একশো উট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করে। জীবিত অথবা মৃত। তারা মরুভূমির বেদুইন গোত্রসমূহের কাছে এই পুরস্কারের ঘোষণা জানিয়ে দেয়। তারা মরুভূমির পথঘাট

সম্পর্কে দক্ষ ছিল। এমনই এক লোক ছিল সুরাকা ইবন মালিক। সে ছিল এক বেদুইন গোত্রের নেতা। হিজরতের একটি ঘটনা তার মুখে জানা যায়।[63]

"আমি বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। এমন সময় একজন এসে বললো, 'আমি দিগন্তের দিকে দুইজন লোককে দেখেছি। কুরাইশরা দুজনকে খুঁজছে। মনে হয় তারাই সেই লোক।' আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'আরে না, তারা সেই লোক হতে পারে না। কিছুক্ষণ আগেও এই দুই লোক এখানে ছিল, এইমাত্র চলে গেছে।' আসলে আমি ঠিকই জানতাম যে ওই দুইজন লোক আসলে মুহাম্মাদ আর আবু বকর। কিন্তু আমি নিজেই একশ উট পাওয়ার লোভে তাদেরকে মিথ্যে বলি।'

এরপর সুরাকা সেখানে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকলো। কারণ চট করে উঠে গেলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারে। তারপর সে বাসায় গিয়ে তার চাকরকে বললো তার ঘোড়াটি প্রস্তুত করে লুকিয়ে রাখতে। কিছুক্ষণ পর সে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে নেয় একটি লম্বা বর্শা। কেউ যেন সেই বর্শা দেখতে না পায় এজন্য সে বর্শাটি মাটির সাথে ঘেঁষে ঘেঁষে নিয়ে গেল। তারপর ঘোড়ায় চড়ে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরকে ؓ ধরার জন্য রওনা দিল। কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করলো সে ওই লোকের দাবিই ঠিক। ওই দুই লোক আসলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর ؓ।

কোটিপতি হওয়ার সুযোগ থেকে সুরাকা মাত্র অল্প কিছু হাত দূরে। অন্যদিকে, আবু বকর ؓ বারবার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চিন্তমনে কুরআন পাঠ করছিলেন। তিনি একবারও পিছন ফিরে তাকাননি। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী হতে সাহায্য করবেন। আবু বকর ؓ নিজেকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না, তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবু বকর ؓ বুঝতে পারলেন কেউ একজন তাদের অনুসরণ করছে। তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ ব্যাপারটি জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তৎক্ষণাৎ সুরাকা ঘোড়া থেকে পড়ে গেল আর ঘোড়াটি মাটিতে বসে গেল। লোভী সুরাকা আবার ঘোড়াটিকে সামলানোর চেষ্টা করলো কিন্তু সে আবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। এমন ঘটনা তার জীবনে আর কখনো ঘটেনি। তৃতীয়বার যখন একই ঘটনা ঘটলো তখন সুরাকার চোখেমুখে একরাশ ধূলি এসে পড়ল। সুরাকা বুঝতে পারল যে এই লোকের সাথে আল্লাহর সাহায্য আছে। এরপর সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনুরোধ করলো যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ আগেও যে ব্যক্তি পুরস্কারের লোভে রাসূলুল্লাহকে ﷺ কুরাইশদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য খুঁজছিল এখন সে নিজের বেঁচে থাকা নিয়েই চিন্তিত! সুরাকা বললো, 'আমার নিরাপত্তার জন্য একটি চিঠি লিখে দিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আমির ইবন ফুহাইরাহকে একটি নিরাপত্তাপত্র লেখার নির্দেশ দিলেন। পত্রটি লেখা হয়েছিল চামড়া অথবা হাড়ের উপর। সুরাকা এই পত্রটিকে স্মারকচিহ্ন হিসেবে নিজের কাছে রেখে দেয়। ৮-৯ বছর পরে নবীজির ﷺ পারস্য

---

63 সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১।

অবরোধের সময় সুরাকা মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। সুরাকা তখন সেই নিরাপত্তাপত্রটি বের করে দেখালে মুসলিমরা তাকে ছেড়ে দেয়!

নিরাপত্তাপত্র যোগাড় করে সুরাকা মক্কায় ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ খোঁজাখুঁজি করার ব্যাপারে কুরাইশদের নিরুৎসাহিত করতে লাগল। রাসূলুল্লাহই ﷺ তাকে এই কাজটি করতে অনুরোধ করেছিলেন। এভাবে সুরাকা হয়ে গেল রাসূলুল্লাহর ﷺ পাহারাদার, অথচ কিছুক্ষণ আগেও সে পুরস্কারের লোভে রাসূলুল্লাহকে ﷺ ধরার জন্য তৎপর ছিল।

যাত্রাবিরতি: উম্ম মা'বাদের তাঁবু

যাত্রাপথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ؓ খুযাআ গোত্রের উম্ম মা'বাদ নামক এক মহিলার তাঁবুর কাছে থামেন। উম্ম মা'বাদ ছিলেন একজন দানশীল মহিলা। তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়া পথিকদের তিনি আপ্যায়ন করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরকে ؓ উম্ম মা'বাদ কিছুই দিতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্ম মা'বাদের কাছে খাবারের খোঁজ করেন। উম্ম মা'বাদ বললেন যে যদি দেওয়ার মতো কিছু থাকতো তাহলে তাঁর কাছে চাওয়া লাগতো না, বরং তিনি নিজে থেকেই দিতেন। আসলে উম্ম মা'বাদের শুধু একটি দুর্বল বকরী ছিল। খরার কারণে সেটির দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর দুধ দোহানোর জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চান। উম্ম মা'বাদ তাঁকে অনুমতি দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছ থেকে একটি বড় পাত্র চেয়ে নেন। তিনি বকরীটিকে স্পর্শ করামাত্রই বকরীটি দুধ দেওয়া শুরু করে। পাত্র না ভরা পর্যন্ত বকরীটি দুধ দিতে লাগল। পাত্রটি ভরে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে তা উম্ম মা'বাদকে দেন। এরপর একে একে সবাই তৃষ্ণা মিটিয়ে দুধ পান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার শেষে দুধ পান করেন। দুধ পান শেষে তিনি বলেন, 'ঘরের সেবকরা সবার শেষেই পান করে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্ম মা'বাদের জন্য পাত্রে কিছু দুধ রেখে দেন। উম্ম মা'বাদের স্বামী বকরীর পাল নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে দুধ দেখে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই দুধ কোথা থেকে এল?' উম্ম মা'বাদ বললেন, 'এক বরকতময় লোক এসেছিলেন আজ। তিনি-ই বকরীর দুধ দোহন করেছেন।' আবু মা'বাদ স্ত্রীর কাছে সেই লোকের বর্ণনা শুনতে চাইলেন। উম্ম মা'বাদ রাসূলুল্লাহকে ﷺ একবার মাত্র দেখেছিলেন। কিন্তু যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা এখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ সম্পর্কে দেওয়া শ্রেষ্ঠ বর্ণনা।

> 'আমি তাঁকে দেখেছি, উজ্জ্বলদীপ্ত চেহারা, সুন্দর তাঁর গড়ন, সুদর্শন তাঁর মুখশ্রী, ছিপছিপে তাঁর শরীর। মাথাটা খুব ছোট নয়, বরং দেখতে তিনি অভিজাত এবং সুপুরুষ। চোখদুটো তাঁর ঘনকালো, পাঁপড়িগুলো টানাটানা। বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর চেহারা, ভরাট তাঁর কণ্ঠস্বর। ভ্রু-যুগল উঁচু আর ধনুকের মতো বাকাঁনো, চুলগুলো পরিপাটি। তাঁর গ্রীবা বিস্তৃত এবং দাড়ি বেশ ঘন। তাঁর গাম্ভীর্য তাঁর আত্মমর্যাদা প্রকাশ করে, তাঁর কথা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন

করে। তাঁর কথাগুলো মনোমুগ্ধকর আর দৃঢ়, চটুল কিংবা ফেলনা নয়। তাঁর প্রতিটি শব্দ যেন সুতোয় বাঁধা মুক্তোর মতো মসৃণ। দূর থেকে তাঁকে দেখতে যেমন উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয়, কাছ থেকে দেখলেও তাঁকেই সবচেয়ে সুদর্শন লাগে। উচ্চতায় তিনি মাঝারি। খুব লম্বাও নন আবার খাটোও নন। বাকি দুইজনের মাঝে তিনি উঁচু বৃক্ষের শাখার মতো, তবে তিনজনের মাঝে তিনিই সবচে সুন্দর। তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যখন কথা বলতেন, তারা মন দিয়ে শুনতো, তিনি যখন কিছু আদেশ দিতেন তা পালন করতে তারা ছুটে যেতো। তিনি কখনও মুখ গোমড়া করেননি। আর কেউ একবারও তাঁর কথার বিরোধিতা করেনি।'[64]

বর্ণনা শুনে আবু মা'বাদ বললেন, 'এই লোকটি নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁকে তো কুরাইশরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি যদি তাঁর সাথে দেখা করতে পারতাম তাহলে তাঁর কাছে মুসলিম হওয়ার স্বীকারোক্তি দিতাম।' তাঁর স্ত্রী উম্ম মা'বাদ আগেই রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি দিয়ে মুসলিম হয়েছিলেন।

হিজরত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

হিজরত কী?

হিজরত দুই প্রকার। একটি আক্ষরিক অর্থে আরেকটি রূপক অর্থে। আন-নাসাঈর একটি হাদীসে রূপক অর্থের হিজরত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ আযযা ওয়াজাল যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ করা হলো হিজরত।' এই অর্থে হিজরত বলতে বোঝায় গুনাহগার অবস্থা ছেড়ে আল্লাহ আযযা ওয়া জালের কাছে পরিপূর্ণ আনুগত্য সহকারে ফিরে আসা। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কুরআনে বলেন, 'অপবিত্রতা হতে দূরে থাকো'। অপবিত্রতা, মূর্তিপূজা ও হারাম কাজ ছেড়ে চলে আসাও একধরনের হিজরত আর এই ধরনের হিজরত করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক।

আরেক ধরনের হিজরত হলো দেশান্তরী হওয়া, খারাপ জায়গা ছেড়ে ভালো জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া, কুফফার শাসিত রাষ্ট্র থেকে ইসলামিক শরীয়াহ শাসিত রাষ্ট্রে চলে যাওয়া। এই ধরনের হিজরতের উদাহরণ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করা অথবা বনী ইসরাইলের সেই ব্যক্তির হিজরত, যে একশো লোক খুন করার পর এক আলিমের কাছে যায় এবং সেই আলিম তাকে বলেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমার তওবা কবুল করবেন, কিন্তু তোমাকে এই খারাপ জায়গা ত্যাগ করতে হবে এবং এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে জনগণ তোমাকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে সাহায্য করবে।

---

[64] যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড।

অর্থনৈতিক উন্নতি

হিজরতের ফলে অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আন্দালুসিয়ার শেষ ইসলামি রাষ্ট্র গ্রানাডা। যখন স্পেনের খ্রিস্টান সৈন্যরা উত্তর দিক থেকে ইসলামি রাষ্ট্র দখল করা শুরু করে তখন মুসলিমরা দক্ষিণ স্পেনে চলে যায়। এতে দক্ষিণ স্পেনের জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে ২০ লক্ষে দাঁড়ায়, কিন্তু আগত অভিবাসীরা ছিল কাজেকর্মে দক্ষ ও অভিজ্ঞ, তাই তাদের দ্বারা গ্রানাডার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। শেষ পর্যন্ত এটি সমগ্র ইউরোপের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যদিও বর্তমানের অবস্থা ভিন্ন, মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ স্থায়ীভাবে থাকার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোতে চলে যাচ্ছে, মুসলিম দেশগুলো তাদের দক্ষতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সতর্কতার মধ্যমপন্থা

হিজরতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সামান্যতম ছাড়ও দেননি। খুঁটিনাটি সব বিষয়ে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখ ঢেকে দুপুর বেলা আবু বকরের ؓ বাসায় যান।

দ্বিতীয়ত, গোপনীয়তার স্বার্থে তিনি আবু বকরকে ؓ আলোচনার সময়ে বাড়িতে কে কে আছে সেটা জেনে নেন।

তৃতীয়ত, তিনি আলী ইবন আবু তালিবকে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দেন যাতে শত্রুরা তাঁর চলে যাওয়ার ব্যাপারটি আঁচ করতে না পারে।

চতুর্থত, হিজরতের যাত্রার জন্য আগে থেকেই উট প্রস্তুত রাখা ছিল।

পঞ্চমত, চারপাশ অন্ধকার হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে ؓ সাথে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়েছিলেন।

ষষ্ঠত, তাঁরা একজন গাইড বা পথপ্রদর্শক ভাড়া করেছিলেন।

সপ্তমত, মদীনা ছিল মক্কার উত্তরে, কিন্তু শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য তাঁরা প্রথমে দক্ষিণের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

অষ্টমত, তাঁরা একটি গুহায় তিনদিন লুকিয়ে ছিলেন।

নবমত, আবদুল্লাহ দিনের বেলা তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মক্কায় থেকে যেতেন আর রাতের বেলা গুহায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ؓ কে সব জানাতেন।

দশমত, আমির ইবন ফুহায়রা তাদেরকে খাবার এনে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে আল্লাহ তাআলা তাঁকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সত্য। কিন্তু তারপরও তিনি মদীনাতে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। তিনি এর মাধ্যমে শিক্ষা দিলেন যে, মুসলিম

হিসেবে জাগতিক প্রচেষ্টার সবটুকুই ঢেলে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ দেখানো পথ অনুসারেই সকল প্রকার ইসলামি কাজকর্মের পরিকল্পনা করতে হবে ও সর্বোচ্চ শ্রম দিতে হবে। বিপদের ভয়ে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা যাবে না বরং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে কাজ করে যেতে হবে।

মুসলিম নারীদের সাহসী ভূমিকা

হিজরতের ঘটনার সিংহভাগ বর্ণিত হয়েছে আ'ইশার ﷺ সূত্রে, পুরো ঘটনা তিনিই সংরক্ষণ করেছেন। আসমা বিনতে আবি বকরকে ﷺ বলা হয়, 'যাতুন নিতাকাইন' বা দুই ফিতাওয়ালী। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বাবার জন্য থলেতে পাথেয় ও মশক গুছিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু মুখ বাঁধার জন্য কাছেধারে কোনো রশি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন নিজের কোমরের নিতাক বা বন্ধনী খুলে দু'টুকরো করে একটি দিয়ে থলে এবং অন্যটি দিয়ে মশকের মুখ বেঁধে দেন। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দুআ করেন আল্লাহ যেন এর বিনিময়ে জান্নাতে তাঁকে দুটি 'নিতাক' দান করেন, এজন্য তাঁর নাম হয় যাতুন নিতাকাইন।[65]

হিজরতের পরে তাঁর উপর বেশ ঝড় যায়। আবু বকর ﷺ চলে যাওয়ার পর আবু জাহেলসহ কুরাইশের কিছু লোক তাঁর বাড়িতে আসে। আসমা দরজা খুলে দেন, আবু জাহেল আবু বকরের ব্যাপারে জানতে চায়। আসমা জবাব দিলেন তিনি জানেন না। এ কথা শুনে আবু জাহেল তাঁর গালে জোরে আঘাত করেন। কিন্তু তারপরও তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও পিতা আবু বকরের নিরাপত্তার কথা ভেবে তা ধৈর্য ধরে সয়ে নেন। এখানে আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, তিনি সত্য গোপন করেছিলেন এবং মুসলিমের নিরাপত্তার স্বার্থে মিথ্যা বলা যায়।

আবু বকরের ﷺ পিতা, অর্থাৎ আসমা বিনত আবি বকরের ﷺ দাদা ছিলেন অন্ধ, তিনি এসে বললেন, 'আমার ছেলে দেখছি তোমাকে ভালো ঝামেলার মধ্যে ফেলে চলে গেছে। তোমার জন্য কোনো টাকা-পয়সাও রেখে যায় নি।' আসমা ﷺ ছিলেন বুদ্ধিমতী। তিনি একটি বস্তার মধ্যে কিছু পাথর ভরে নিয়ে এসে সেটা তাঁর দাদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বুঝাতে চাইলেন যে তাঁর পিতা আবু বকর ﷺ অনেক টাকাপয়সা রেখে গিয়েছেন। দাদা শুনে খুব খুশি হলেন। দাদাকে শান্ত রাখার জন্যই তিনি এই কাজটি করেছিলেন।

বন্ধু নির্বাচনের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বন্ধু হিসেবে আবু বকর সিদ্দীককে ﷺ বেছে নিয়েছিলেন। আবু বকর ﷺ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তিনি যখন জানতে পারলেন

তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে হিজরত করার মতো সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন, তখন তিনি আনন্দে কেঁদেই ফেলেছিলেন। আবু বকর ﵁ ছিলেন বুদ্ধিমান, আস্থাভাজন একজন মানুষ। গুহায় আশ্রয় নেওয়ার সময় তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ প্রথমে গুহায় ঢুকতে না দিয়ে নিজে আগে ঢুকে পরীক্ষা করে নেন বিপজ্জনক কিছু আছে কি না। অতঃপর নিশ্চিত হয়ে তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভেতরে ঢুকতে দেন।

উমার ইবন খাত্তাবের ﵁ খিলাফতের সময়ের একটি ঘটনা, তিনি শুনতে পেলেন কিছু লোক আবু বকর ﵁ আর উমারের ﵁ মধ্যে কে উত্তম – তা নিয়ে আলোচনা করছে। এটা শুনে তিনি তাদের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, 'তোমরা শুনে রাখো, আবু বকরের এক দিন উমার আর উমারের পুরো পরিবারের সারাজীবন অপেক্ষা দামি।' তারপর তিনি হিজরতের ঘটনাটি বর্ণনা করে বললেন যে, হিজরতের সেই দিনটি শুধু উমার নয়, বরং তাঁর পরিবারের পুরো জীবন থেকেও উত্তম। সাহাবারা ﵃ আবু বকর ﵁ সম্পর্কে কেমন উঁচু ধারণা পোষণ করতেন তা উমারের ﵁ এই কথার মাধ্যমে বুঝা যায়।

গোপনীয়তার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা

হিজরতের সময়ে এবং মাক্কী জীবনের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় সব কাজেই অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলছিলেন। ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা করার জন্যই তিনি গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু গোপনীয়তা ও দাওয়াহর মধ্যে অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। হিজরতের একটি ছোট্ট ঘটনা দেখিয়ে দেয় কীভাবে এই দুটো কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়।

রাসূলুল্লাহর ﷺ মক্কা ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি খুব কম লোকই জানতো। আলী ইবন আবু তালিব, আবু বকর ﵁ ও তাঁর পরিবার ছাড়া আর কেউই বিষয়টি জানতেন না। হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ﵁ যখন বের হলেন, তখন তাদের কোনো কিছুর দরকার পড়লে আবু বকরের ﵁ ব্যবসায়িক পরিচিতি বেশ কাজে লাগত। কারণ আবু বকর ﵁ ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতেন, তাই তিনি মক্কার বাইরের অনেক গোত্রের কাছে পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে, মক্কার বাইরের লোকজন রাসূলুল্লাহর ﷺ নাম শুনলেও তাঁকে সরাসরি খুব একটা চিনতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মূলত মক্কা আর মক্কার বাইরে শুধু তাইফে তাঁর দাওয়াহর কাজ করেছেন। অনেকেই তাঁর নাম শুনেছিল কিন্তু তিনি দেখতে কেমন ছিলেন সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। আবু বকর ﵁ বেশ পরিচিত থাকায় কেউ তাদেরকে দেখলে আবু বকরের সাথে কথা বলতে এগিয়ে আসতো। তারা আবু বকরকে ﵁ জিজ্ঞেস করতো যে, তাঁর সাথে থাকা লোকটি কে অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। তখন আবু বকর ﵁ জবাব দিতেন এভাবে, 'ইনি হলেন আমার পথপ্রদর্শক, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।' এ কথা শুনে তারা মনে করতো, আবু বকরের সাথে থাকা এই লোক অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে ﵁ মরুভূমির

মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও আবু বকর ﵁ বুঝিয়েছেন ভিন্ন কথা, তিনি বুঝিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথের অভিমুখে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি এটা এমনভাবে বলতেন যাতে রাসূলুল্লাহর ﷺ আসল পরিচয় গোপন থাকে কেননা রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন ছিল হুমকির মুখে। আবু বকর ﵁ মিথ্যাও বলেননি, ঘুরিয়ে কথা বলেছেন। এটাকে বলা হয় তাউরী, গোপনীয়তা রক্ষা করা।

কিন্তু একই সাথে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার সময় নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দেওয়াটাই হিকমাহ। তাই হিজরতকালে যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে আবু বুরাইদাহ আল আসলামির দেখা হয়, তখন তিনি নিজেকে সর্বশেষ রাসূল হিসেবেই নিজের পরিচয় দেন এবং তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এরপরে আবু বুরাইদাহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে বুরাইদাহ রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ১৯টি যুদ্ধের মধ্যে ১৬টি যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময়েই দুইজন চোরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তারাও মুসলিম হয়ে যায়। তিনি তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, 'আমাদের নাম হলো আল মুহানান', আল মুহানান মানে হলো 'অসম্মানিত ব্যক্তি'। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এ নাম বদলে দিয়ে তাদেরকে 'মুকরামান' বা 'সম্মানিত ব্যক্তি' হিসেবে ঘোষণা করেন।

মাক্কী জীবনেও এরকম আরেকটি ঘটনা রয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মেষপালককে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি সেই মেষপালকের কাছে দুধ খেতে চাইলেন। মেষপালক বললো, এই মুহূর্তে কোনো ছাগলের কাছেই দুধ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে ছাগলের দুধ দোহন করার অনুমতি চাইলেন। মেষপালকের অনুমতি পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ দোহন করা শুরু করলেন, আর প্রচুর পরিমাণে দুধ বের হয়ে আসল। প্রথমে মেষপালককে দুধ পান করতে দেওয়া হলো, এরপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তারপরে আবু বকর ﵁ দুধ পান করলেন। তখন মেষপালক রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করলো,

- আকাশের শপথ! সত্যি করে বলুন তো কে আপনি? আমি আপনার মতো কাউকে এখনো দেখিনি।

- আমি যদি আমার আসল পরিচয় তোমাকে দেই তাহলে তুমি কি তা গোপন রাখবে?

- হ্যাঁ, রাখবো।

- আমি মুহাম্মাদ, আল্লাহর রাসূল।

- তবে কি আপনিই সে ব্যক্তি যাকে কুরাইশরা সাবিঈ বলে সম্বোধন করে?

সাবিঈ একটি অবজ্ঞাসূচক শব্দ, কুরাইশরা ইচ্ছা করে মুসলিমদেরকে হেয় করার জন্য এই নামে ডাকতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তারা এই নামে ডেকে থাকে।' তারপর মেষপালক বললো,

- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি যা বলেছেন তা সত্য এবং আপনি মাত্র যা করলেন তা একজন রাসূলই করতে পারে। আমি এখন থেকে আপনার উপর অবতীর্ণ দ্বীনের অনুসারী।

- তুমি এখনই তা কোরো না। যখন তুমি দেখবে আমি প্রকাশ্যে নিজেকে ঘোষণা করছি, তখন তুমি এসে আমাদের সাথে যোগ দিও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মুসলিম হতে মানা করেননি, তিনি তাঁকে মুসলিম জামা'আতে যোগ দিতে বারণ করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও গোপনে দাওয়াহর কাজ করে যাচ্ছিলেন। এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ একইসাথে দাওয়াহ্ করেছেন ও নিজের পরিচয়ও গোপন রেখেছেন। এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায় কীভাবে দাওয়াহ ও গোপনীয়তা রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র সেসব ব্যক্তির কাছেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন যাদেরকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে যে তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিবেন।

স্বাবলম্বী হওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আবু বকরকে رضي الله عنه হিজরতের ব্যাপারে জানান তখন আবু বকর رضي الله عنه যাত্রার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানালেন, হিজরতের জন্য দুইটি উট প্রস্তুত করা আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছ থেকে উটটি কিনে নেন। এখানে লক্ষণীয়, একজন দাঈর অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যখন একজন আলিম সরকারী খরচে জীবনযাপন করেন, তখন সরকারি বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার প্রয়োজন হলে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সরকার তার পক্ষে ফতোয়া দেওয়ার জন্য সেই আলিমের উপরে চাপ দেয়। সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে সরকারের কোনো অন্যায়ের বিপক্ষে কথা বলতে বা তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে অনেকেই দ্বিধাবোধ করে। এ কারণে আলিম, দাঈ ও ইসলামি ব্যক্তিত্বদের অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হওয়া জরুরী।

মদীনার উপকণ্ঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ: নতুন যুগের সূচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর ؓ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাইড তাদেরকে পথ দেখিয়ে উপত্যকার কাছে নিয়ে যায়। সেখান থেকে কুবায় বনু আমর ইবন আউফের কাছে নিয়ে যায়। সেদিন ছিল সোমবার, ১২ই রবিউল আউয়াল। গনগনে রৌদ্রতপ্ত দুপুরে সূর্য তখন প্রায় মাথার উপর। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করার আশায়, তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আনসারগণ প্রতিদিন সকালে মদীনার বাইরে যেতেন। কিন্তু রোদের তাপ বেড়ে গেলে তাঁরা ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হতেন। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও তাঁরা সকাল সকাল বাইরে গিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ দেখা না পেয়ে তাঁরা সেদিনের মতো ফিরে যান। এর মধ্যে এক ইহুদি মদীনার উঁচু দালানের উপর থেকে দেখতে পেল যে, সাদা জামা পরিহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ؓ মদীনার দিকে হেঁটে আসছেন। ওই ইহুদি তাদের দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'হে আরবের লোকেরা! তোমরা যার জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলে তিনি চলে এসেছেন!' এ কথা শুনে আনসারগণ তাদের অস্ত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহকে ﷺ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ছুটে যায়। অস্ত্র নিয়ে বরণ করাই ছিল তাদের রীতি। এটা দিয়ে আরো বোঝায় যে, আগত অতিথিকে তারা নিরাপত্তা দিতে ইচ্ছুক। আরবের কিছু গোত্রে এই ঐতিহ্য এখনো বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ؓ মদীনার বাইরে কুবা নামক জায়গায় আসামাত্র আনসারগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবাতে চৌদ্দ দিন ছিলেন, এর মধ্যে তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মসজিদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বাড়িতে ছিলেন সেটিকে বলা হত 'ব্যাচেলর হাউস' বা 'কুমারবাড়ি', কারণ ওই বাসার সবাই অবিবাহিত ছিলেন।[66] সেটা ছিল সাদ ইবন খাইসামার বাড়ি। তাঁর সাথে অনেকেই দেখা করতে আসতো আর তিনি চাননি মানুষজনের আসা-যাওয়ার কারণে সেই পরিবারে কোনো অসুবিধা হোক। তাই তিনি এই বাড়িতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে থাকাকালীন সময়ে মদীনায় প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে সংবাদবাহক পাঠান। এর প্রতিউত্তরে তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য একটি বিরাট প্রতিনিধি দল পাঠান। এই প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করে বলেন, 'আসুন, আপনি এখানে নিরাপদ এবং আপনাকে মান্য করা হবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে নিছক অতিথি হিসেবে যাননি বরং তিনি একজন নেতা হিসেবে সেখানে গিয়েছেন।

---

[66] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৬।

মদীনার আকাশে নতুন চাঁদ: তালা'আল বাদরু 'আলাইনা

রাসূলুল্লাহর ﷺ মদীনাতে আগমনের দিনটি ছিল একটি চমৎকার দিন। চারদিকে সাজ সাজ রব, রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রবেশ উপলক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি। মানুষজন তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছিল, পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে, আবিসিনিয়ানরা তাদের বর্শা নাচাচ্ছিল। মহিলারা ছাদে দাঁড়িয়েছিল আর রাসূলুল্লাহকে ﷺ একনজর দেখার জন্য বাচ্চারা রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তারা বরণ করে নেয় চমৎকার একটি নাশীদ গেয়ে, চৌদ্দশ বছর পরেও মুসলিমদের কাছে অতি প্রিয় একটি সুর।

তালা' আলা বাদরু আলাইনা
মিন সানিয়াতিল ওয়াদা
ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা
মাদা 'আ লিল্লাহি দা[67]

আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, 'আমি দুটি দিন দেখেছি। একটি হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও উত্তম দিন। এই দিনটি হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরের ﷺ মদীনায় আগমনের দিন। অন্যদিনটি হলো আমার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার ও দুঃখের দিন। সেটি রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর দিন। আমি শুধু এই দুটি দিনই দেখেছি।' রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের আনন্দে বৃদ্ধ লোকরাও সেদিন ঘর থেকে বের হয়ে এসে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, 'কোন সে জন? কোন সে জন?' আনাস ইবনে মালিকের ভাষায়, 'এমন দৃশ্য আমি এর আগে কোনোদিন দেখিনি!'

মদীনার প্রথম দিনগুলো

মদীনার প্রত্যেকেই চাইছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন তাদের বাড়িতে থাকেন। তারা প্রত্যেকে তাদের বাসায় থাকার জন্য নবীজিকে ﷺ আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাজ্জারের সাথে থাকতে চান। কারণ বনু নাজ্জারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। হাশিম বনু নাজ্জারের একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। বনু নাজ্জার এসেছিল খাযরাজ থেকে, সে হিসেবে মদীনার বনু নাজ্জার ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ মায়ের গোষ্ঠী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাজ্জারের সাথে থাকার ইচ্ছার কথা সবাইকে জানিয়ে দেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, তাঁর কাছাকাছি বনু নাজ্জারের কার ঘর আছে। আবু আইয়ুব আল আনসারী ﷺ জানান তাঁর ঘর কাছাকাছি আছে। এরপর আবু আইয়ুব আনসারী রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। আবু আইয়ুব আনসারী রাসূলুল্লাহকে ﷺ উপরের ঘরে থাকার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ

---

[67] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৫। তবে এই নাশীদটি ঠিক কখন মুসলিমরা গেয়েছিল এটা নিয়ে দ্বিমত আছে।

ﷺ নিচের ঘরেই থাকতে চাইলেন। অনেকেই রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করতে আসতেন, এক্ষেত্রে তাঁর নিচ তলায় থাকার সিদ্ধান্ত সবার জন্যই সুবিধাজনক ছিল। অবশেষে আবু আইয়ুব রাজি হন। আবু আইয়ুব বলেন, 'একদিন আমাদের একটা পানির পাত্র মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। আমরা খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম, এই পানি মেঝে চুইয়ে যদি রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভিজিয়ে দেয়, তখন কী হবে? আমাদের একটিমাত্র কম্বল ছিল, আমরা সেই কম্বল মেঝের পানি শুকানোর জন্য ব্যবহার করলাম। সে রাতে আমি আর আমার স্ত্রী কম্বল ছাড়াই ঘুমালাম।'[68] এই ঘটনাটি দেখিয়ে দেয়, রাসূলুল্লাহর ﷺ সামান্যতম কষ্টও সাহাবারা ﷺ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা নিজেরা কম্বল ছাড়া ঘুমিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ﷺ গায়ে এক ফোঁটা পানি তাঁরা পড়তে দেননি।

যাইদ ইবন সাবিত ﷺ বলেন, 'আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহকে ﷺ উপহার দিয়েছিলাম। সেটি ছিল দুধ, মাখন ও রুটি দিয়ে পরিপূর্ণ বড় একটি কাঠের বাটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবু আইয়ুবের বাসায়, আমি নিজে সে উপহার তাঁর কাছে নিয়ে যাই। আমি নবীজিকে ﷺ জানাই যে, আমার মা তাঁর জন্য এ খাবার পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমার মায়ের মঙ্গল করুন।' এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে সবাই একসাথে খেলেন। এরপর খাবার নিয়ে আসেন সাদ ইবন উবাদা। তিনি আনেন মাংসের ঝোল আর রুটি। আবু আইয়ুবের বাড়িতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত মাস থেকেছিলেন। এই সাত মাস ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কেউ না কেউ, অন্তত তিন-চার জন রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে খাবার নিয়ে দেখা করতে আসতো।' এই সাহাবীদের ﷺ অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র। কিন্তু তারপরও তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য নিজেদের খাবারটুকু পর্যন্ত দিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁরা এতটাই ভালবাসতেন।

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল এই অসাধারণ মানুষগুলোকে রাসূলুল্লাহর ﷺ আনসার হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষভাগে বলেছেন, 'যদি না হিজরত করতাম, তাহলে আমি নিজেকে আল-আনসারের একজন সদস্য হিসেবেই ভাবতাম।'

মদীনার আর্থসামাজিক কাঠামো

সে সময় মদীনাতে পাঁচটি গোত্র ছিল। সেগুলোর মধ্যে তিনটি ছিল ইহুদিদের গোত্র এবং দুইটি ছিল আরবদের গোত্র। বনু নাযির, বনু কুরায়যা ও বনু কায়নুকা – এগুলো ছিল ইহুদি গোত্র। বনু কায়নুকার বসবাস ছিল মদীনার কেন্দ্রে, তারা অলংকারের ব্যবসা করতো। আগে তারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতো। কিন্তু অন্যান্য ইহুদিদের সাথে তাদের যুদ্ধ হওয়ার পর তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। বনু নাযির ও বনু কুরায়যা উভয়ই মদীনার প্রান্তে বসবাস করতো। তাদের ছিল

---

[68] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬১।

৫৯টি দুর্গ। তাদের ছিল ২০০০ সৈন্যবিশিষ্ট সামরিক বাহিনী। অন্যদিকে আল-আওস ও আল-খাযরাজ ছিল আরব গোত্র। তাদের সামরিক বাহিনী ছিল ৪০০০ সৈন্যবিশিষ্ট। এদের মধ্যে একটি গোত্র মদীনার উত্তরে বসবাস করতো আর অন্য গোত্রটি দক্ষিণে। মদীনা ছিল অনেকগুলি এলাকার সমন্বয়ে গঠিত। একেক এলাকায় ছিল একেক গোত্রের বসবাস। মদীনাবাসীর জীবিকা ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। মদীনায় ছিল খেজুরের বাগান। সেগুলো চাষ করার জন্য কৃষকদের টাকা প্রয়োজন হতো, ফলনের সময় হলে তারা সে টাকা পরিশোধ করতো। ইহুদি গোত্রগুলো তাদেরকে সুদের বিনিময়ে এই টাকা ধার দিত। এ কারণে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে কিছু তিক্ততা বিদ্যমান ছিল।

এই ছিল মোটামুটিভাবে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদীনার অবস্থা। ইসলাম আসার পর মদীনার বহুমাত্রিক সমাজে মুশরিক, ইহুদিদের সাথে নতুন যোগ হয় মুসলিমরা। তাই রাসূলুল্লাহকে ﷺ খুব সাবধানতার সাথে সবাইকে সামাল দিতে হয়েছে।

কিন্তু মদীনার কিছু লোক রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনে খুশি হতে পারেনি। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠী একসাথে থাকার কারণে মদীনার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গাধার পিঠে চড়ছিলেন। সে সময় একটি সমাবেশ দেখতে পেয়ে সেখানে গেলেন। সেই সমাবেশে আরব, মুসলিম, অমুসলিম ও ইহুদি – সবাই ছিল। তাঁর গাধাটি যেতে যেতে ধূলো উড়োচ্ছিল। তখন আবদুল্লাহ ইবন উবাই বললো, 'যান তো, আপনার ধূলো আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিন।'

আবদুল্লাহ ইবন উবাই পরবর্তীতে মুনাফিক্বদের নেতা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথায় কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে উপস্থিত সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। দাওয়াত দেওয়া শেষ হলে আবদুল্লাহ ইবন উবাই বললো, 'দেখুন, আমাদের সমাবেশে এসে এভাবে বিরক্ত করবেন না। যেখানে উঠেছেন সেখানেই থাকুন আর আপনার এসব গল্প তাদের সাথে করুন যারা আপনার কাছে আসে। আগ বাড়িয়ে আমাদের সাথে এসব গল্প করবেন না।' সাথে সাথে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বলে উঠলেন, 'না! আমরা চাই তিনি আমাদের সমাবেশে আসবেন এবং কথা বলবেন।' উপস্থিত লোকেরা চিৎকার-চেঁচামেচি এবং কথা কাটাকাটি শুরু করে দিল। ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে চলে গেল যেন যুদ্ধ বেঁধে যাবে। অবস্থা বেগতিক দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে শান্ত করতে লাগলেন, পরে সবকিছু শান্ত হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সাদ তুমি কি দেখনি আবদুল্লাহ ইবন উবাই কী করেছিল?' সাদ জানতে চাইলেন কী ঘটেছে। রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে থেকে বিস্তারিত শোনার পর তিনি বললেন, 'আপনি আসার আগে আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে তার গোত্রের লোকেরা রাজা হিসেবে প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। এজন্য সে আপনাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে।' খাযরাজ গোত্র আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে তাদের নেতা বানানোর সবরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমনের কারণে সবাই রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাদের শাসক হিসেবে মেনে নেয়। এ কারণে উবাই আর রাজা

হতে পারেনি। এরকমই একটি কঠিন জটিল পরিস্থিতিতে মদীনায় আল্লাহর রাসূলের ﷺ আগমন ঘটে।

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

চারটি প্রজেক্ট

মদীনায় পৌঁছে রাসূল ﷺ চারটি প্রজেক্ট হাতে নেন এগুলো হলো:
১) মসজিদ নির্মাণ।
২) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।
৩) মদীনার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে সে ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট দলিল বা সনদ প্রণয়ন।
৪) মুসলিম সেনাবাহিনী গড়ে তোলা।

প্রথম প্রজেক্ট: মসজিদ নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় পৌঁছেই প্রথমে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবাতে অবস্থানকালেও একই কাজ করেছিলেন। মসজিদ হলো মুসলিমদের শিক্ষাকেন্দ্র। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সবকিছুর আগে মসজিদ নির্মাণের দিকে দৃষ্টি দেন। মক্কায় তিনি দার-উল-আরকামে মুসলিমদের প্রশিক্ষণের কাজ চালাতেন। পরবর্তীতে মদীনায় মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে দার-উল-আরকামের কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করে। তবে মক্কার দার-উল-আরকাম ছিল একটি গোপন জায়গা। সেখানে মুসলিমরা সালাত আদায় করতে আসত এবং কুরআন শিক্ষা করতো। কিন্তু মদীনাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় আর গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল না। তাই নির্মিত হয় 'মসজিদ-ই-নববী।'

মসজিদের জন্য জায়গা নির্বাচন

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটে চড়ছিলেন আর লোকজন যার যার দিকে উটটিকে টানছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এটিকে ছেড়ে দাও, কারণ এটি আল্লাহর নির্দেশে চলছে।' উটটি মদীনার রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। এটি থামলো একটি শুকনো খেজুরের মাঠে। সেই মাঠের মালিক ছিল দুই এতিম ছেলে। উটটি থামলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এটিই হলো আমাদের মসজিদের জায়গা।' অতঃপর সেই জায়গাটি মসজিদের জন্য এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ থাকার জায়গা হিসেবে নির্বাচন করা হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জায়গাটি এতিম বালকদের কাছ থেকে কিনে নিতে চাইলেন। কিন্তু তারা বিক্রি করতে রাজি হলো না বরং তারা সেই জায়গাটি কোনো টাকা ছাড়াই

রাসূলুল্লাহকে ﷺ দিতে চাইল। অবশেষে মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণ কাজ শুরু হলো। মসজিদের দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল কাদামাটির ইট দিয়ে আর ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল তালপাতা দিয়ে। বৃষ্টি হলে পাতা চুইয়ে বৃষ্টির পানি তাদের মাথায় পড়তো, আর মেঝেতে ছিল শুধু বালি। মসজিদটি ছিল খুবই সাদামাটা কিন্তু এটি হলো ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বরকতময় মসজিদ। এখানেই মুসলিমদের প্রথম ও সেরা প্রজন্মটি দ্বীনের শিক্ষা লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও সাহাবাদের رضي الله عنهم সাথে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ কাঁধে ইট বহন করেছিলেন।

মসজিদ নির্মাণের ঘটনা থেকে শিক্ষা

 # "তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে..." (সূরা হাজ্জ, ২২: ৪১)

আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল মুসলিমদেরকে জমিনে কর্তৃত্ব দান করার পর তাঁরা প্রথমে যে কাজটি করেছেন তা হলো সালাত প্রতিষ্ঠা করা। সালাত প্রতিষ্ঠার এই কাজ শুরু হয়েছিল মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

মসজিদের নির্মাণকাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বশরীরে শ্রম দিয়েছেন। আরামে বসে থেকে অন্যদের আদেশ দিয়ে কাজ করিয়ে নেননি। ইসলামে নেতৃত্ব মানে অন্যকে আদেশ দেওয়া নয়, ইসলাম নেতৃত্ব হলো অন্যের সেবা। আর এ কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে করে দেখিয়েছেন।

ইসলাম মানুষের দক্ষতাকে মূল্যায়ন করে। মানুষ যে কাজে দক্ষ সেই কাজটাই তার করা উচিত। যেমন, মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণকাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবাদের رضي الله عنهم সাথে বনু নজদের এক লোক ছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন মিস্ত্রী। এই ব্যক্তি সকলের সাথে ইট আনা-নেওয়ার কাজে যোগ দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এই কাজে নিয়োজিত না করে বরং ইটের মিশ্রণ তৈরি করার কাজে নিয়োগ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নির্মাতা ব্যক্তিকে সেই কাজটিই করতে বলেছেন যে কাজে তিনি দক্ষ। দ্বীনের কাজে সবাই একই কাজ করবে – বিষয়টি তেমন নয়। সবাইকে যে একজন ভালো দাঈ, ইমাম বা আলিম হওয়া লাগবে ব্যাপারটি আসলে তা না। আল্লাহ তাআলা একেকজনকে একেক রকম দক্ষতা বা গুণ দিয়েছেন। আর এই দক্ষতাকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানোর জন্য সবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। ভালো নেতার গুণ হলো তিনি তার কর্মীদের দক্ষতা কিসে তা খুঁজে নিতে পারেন এবং সেই দক্ষতাকে বিকশিত করে তুলতে সাহায্য করেন। তবে এসব দক্ষতা অবশ্যই ইসলামের স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে।

মসজিদের ভূমিকা

> "আল্লাহ যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করা এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় বিরত রাখে না আল্লাহর স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন"। (সূরা নূর, ২৪: ৩৬-৩৮)

বর্তমান সময়ে মসজিদকে শুধু মাত্র ইবাদাতের স্থান মনে করা হলেও, রাসূলুল্লাহর ﷺ যুগে মসজিদকে শুধুই ইবাদাতের স্থান মনে করা হতো না। এটি ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক স্থান। মসজিদ ছিল সমাজের ব্যস্ততম প্রাণকেন্দ্র।

মসজিদ ইট-কাঠের নিছক একটি দালান নয়। মসজিদের প্রাণ হলো মসজিদের ভিতরে থাকা মানুষগুলো। কুরআনে সেই সব মানুষের প্রশংসা করা হয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে অবস্থান করে এবং সেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর কথা স্মরণ করে। তারা হয়তো ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কিন্তু মসজিদে গেলে তারা সেসবের কথা স্মরণ করে না। আল্লাহ তাআলার ঘরে থাকা অবস্থায় তারা শুধুমাত্র আল্লাহকেই স্মরণ করে। মসজিদ হচ্ছে সালাত ও যিকরের স্থান। এটিই মসজিদের প্রথম ও প্রাথমিক ভূমিকা।

মসজিদ মুসলিমদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র। মক্কায় মুসলিমদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল দার-উল-আরকাম, আর মদীনায় ছিল মসজিদ-ই-নববী। এখানেই রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিতেন, কথা বলতেন, আলোচনা করতেন। সাহাবাগণ ﷺ মসজিদে একসাথে বসে আল্লাহ তাআলার কিতাব নিয়ে পড়াশোনা করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যদি মানুষ আল্লাহ তাআলার ঘরে (মসজিদে) একত্রে বসে আল্লাহ তাআলার কিতাব অধ্যয়ন করে এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে চারটি জিনিস দেবেন: 'সাকিনা (প্রশান্তি), রাহমা (দয়া), ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখবে এবং আল্লাহ তাআলা আরও উন্নত জমায়েতে তাদের নাম উল্লেখ করবেন।'

মসজিদ হলো মুসলিমদের একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার জায়গা। এটি তাদের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেসব মুসলিমরা মসজিদে জামা'আতে সালাত এবং জুমু'আর সালাত আদায় করেন তারা দিনে পাঁচবার একে অপরের সাথে দেখা করার সুযোগ পান। এটি তাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধকে মজবুত

করে দেয়।

মসজিদ-ই-নববী ছিল পথিক ও গরিবদের জন্য থাকার জায়গা। এই মসজিদে আশ্রয় নেওয়া সাহাবীদের ﷺ বলা হতো আহলুস-সুফফা।

মসজিদ থেকেই তৎকালীন সময়ে সেনাদল জিহাদের জন্য যাত্রা আরম্ভ করতো। আমীরের হাতে জিহাদের পতাকা তুলে দেওয়া হতো মসজিদেই।

মসজিদ হলো দাওয়াতের স্থান। ইয়েমেন থেকে আগত খ্রিস্টানরা মসজিদে অবস্থান করেছিল। তারা সেখানে অবস্থানকালে মুসলিমদের ইবাদতরত অবস্থায় দেখতে পেত এবং মুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ আলোচনাও শুনতে পেয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায়, দাওয়াহর স্বার্থে অমুসলিমরা মসজিদে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারে।

মসজিদ-ই-নববী খুবই সাদামাটা ছিল কিন্তু এখান থেকেই জ্ঞানার্জন করেছেন মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, সাহাবাগণ ﷺ । অথচ বর্তমান সময়ে অনেক বড় বড় মসজিদ থাকলেও এই মসজিদগুলো ‘ইলমের প্রতীক নয়, বরং অর্থের শ্রাদ্ধের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আযানের সূচনা

মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর আলোচনা শুরু হয় কীভাবে সবাইকে সালাতের দিকে আহ্বান করা যায়। কেউ পরামর্শ দিল, খ্রিস্টানদের মতো ঘণ্টা ব্যবহার করা অথবা মদীনায় ইহুদিরা যেভাবে হর্ন ব্যবহার করতো সেরূপ কিছু করা। কোনো প্রস্তাবই রাসূলুল্লাহর ﷺ মন:পুত হলো না। এমন সময়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ একজন সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবন যাইদ ﷺ একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, একটি লোক একটি ঘণ্টা বহন করছে। তা দেখে তিনি ওই লোকের কাছে ঘণ্টাটির দাম জানতে চান। লোকটি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি কেন ঘন্টাটি চাও?’ আবদুল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে উত্তর দিলেন যে, তিনি এটা দিয়ে মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করবেন। লোকটি উত্তরে বললো যে, তার কাছে দেওয়ার মতো এর চেয়েও ভালো কিছু আছে। আবদুল্লাহ জানতে চাইলেন সেটি কী। লোকটি তাঁকে বলতে বললো,

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!
আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!
আশ-হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশ-হাদু আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
হাইয়্যা ‘আলাস-সালাহ

হাইয়্যা 'আলাস-সালাহ
হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ
হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ
আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আবদুল্লাহ ইবন যাইদ রাসূলুল্লাহকে ﷺ এই স্বপ্নের কথা জানান। স্বপ্নের বর্ণনা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন যে এই স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন। এরপর তিনি আবদুল্লাহকে বললেন বিলালকে এই আযান দেওয়া শিখিয়ে দিতে। বিলালের رضي الله عنه কণ্ঠস্বর ছিল খুব জোরালো আর সুন্দর। আযানের শব্দ শুনতে পেয়ে উমার رضي الله عنه দ্রুত মসজিদে আসেন। তিনি বললেন যে, তিনিও স্বপ্নে এই কথাগুলো শুনেছেন। একাধিক ব্যক্তি একই স্বপ্ন দেখার অর্থ হলো স্বপ্নটি সত্য।[69]

সেই থেকে আযান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকসমূহের একটি। যে সব জায়গায় প্রকাশ্যে আযান দেওয়া হয়, সেসব জায়গায় ইসলাম ও মুসলিমদের উপস্থিতি আছে এমনটা ধরে নেওয়া হয়।

মসজিদে নববীর একটি খুতবা

মসজিদে নববী স্থাপিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এদিন সবার উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। খুতবায় তিনি বলেন,

> *'ভাইয়েরা, ভালো কাজে এগিয়ে যাও। নিজেদের জন্য ভালো আমল আল্লাহর কাছে জমা করো। জেনে রাখো, আল্লাহর শপথ! তোমাদের প্রত্যেকের জীবনেই মৃত্যু এসে হাজির হবে। সেদিন তোমরা তোমাদের যাবতীয় সম্পদ পিছনে ফেলে যাবে। তোমাদের পালিত পশুগুলো প্রতিপালকহীন অবস্থায় পড়ে থাকবে। সেদিন তোমাদের আর আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না, কোনো পর্দা থাকবে না। সেদিন তোমাদের রব তোমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমাদের কাছে কি আমার রাসূল যায়নি? সে কি তোমাদের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দেয়নি? আমি তোমাকে অর্থবিত্ত দিয়েছি, আমার নি'আমতে তোমাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছি। কিন্তু তুমি নিজের জন্য, এই দিনের জন্য কী আমল পাঠিয়েছো?' সেদিন প্রত্যেকে তার ডানে বামে অসহায়ের মতো তাকাবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সামনে তাকিয়ে সে দেখতে পাবে জাহান্নামের আগুন!*
>
> *তাই তোমাদের সাধ্যানুযায়ী নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা*

---

[69] সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫।

করার চেষ্টা করো। যদি একটি খেজুরের অংশবিশেষ দান করা তোমার সাধ্যে কুলায় তবে তাই করো। যদি এটুকু করারও সামর্থ্য না থাকে তবে দুটি ভালো কথা বলো, ভালো আচরণ করো। জেনে রেখো, প্রত্যেকটি ভালো কাজকেই আল্লাহ তাআলা দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করেন। আল্লাহর নিরাপত্তা, মমতা আর বারাকাহ তোমাদের ঘিরে থাকুক।'[70]

আহলুস-সুফফা

যখন ক্বিবলা উত্তর দিক, অর্থাৎ জেরুসালেম বরাবর ছিল তখন মসজিদে নববীর পাশে ছায়ার জন্য একটি ছাউনি তৈরি করা হয়। সেই ছাউনিটি আস-সুফফা নামে পরিচিত ছিল। ইবন হাজর আস-সুফফা সম্পর্কে বলেছেন যে, মসজিদ-ই-নববীর পিছনের জায়গাটি আস-সুফফা নামে পরিচিত ছিল। এখানে ছিল একটি ছাউনি। এটি মূলত সেসব মানুষদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল যাদের কোনো পরিবার বা থাকার জায়গা ছিল না। সেখানে যারা থাকতেন তাদের বলা হতো আহলুস-সুফফা। আবু হুরাইরা ﷺ একজন আহলুস-সুফফা ছিলেন। তিনি বলেছেন, আস-সুফফার অধিবাসীরা ছিলেন ইসলামের অতিথি। তাদের দেখাশোনার জন্য কোনো পরিবার অথবা সম্পদ ছিল না। তাই তাঁরা সেখানে থাকতেন। যারা সেখানে থাকতেন তাদের সবাই যে অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে নিতান্তই বাধ্য হয়ে থাকতেন – বিষয়টি তেমন নয়। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আহলুস-সুফফায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এমন একজন সাহাবী ছিলেন আবু হুরাইরা ﷺ। তাঁর সম্পদ ছিল কিন্তু তিনি পড়াশোনা করে দিন কাটাতে ভালোবাসতেন। তাই তিনি আস-সুফফায় অন্যান্যদের সাথে থাকতেন। আবু হুরাইরা প্রথমদিকের সাহাবী ছিলেন না। তিনি অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তারপরেও তিনি মুহাজির ও আনসারদের থেকে অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কীভাবে তা সম্ভব হলো? এই ব্যাপারে আবু হুরাইরা ﷺ বলেছেন, মুহাজিররা যখন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তখন তিনি ক্ষুধা পেটে রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনুসরণ করতেন। তাঁর তেমন কিছুই ছিল না কিন্তু তারপরও তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সাথে থাকতেন। মুহাজিররা কিছু ভুলে গেলে তিনি সেগুলো মনে রাখতেন। অন্যদিকে আনসাররা তাদের ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আনসাররা কিছু ভুলে গেলে তিনি সেগুলো মনে করিয়ে দিতেন।

আবু হুরাইরা ﷺ তাঁর দ্বীনি পড়াশুনার জন্য 'ফুল টাইম' বরাদ্দ রেখেছিলেন বলেই রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস নিয়ে পর্যালোচনা করার মতো সময় পেতেন। তিনি রাতের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করতেন: এক অংশ ছিল ঘুমানোর জন্য, আরেক অংশ ইবাদতের জন্য বরাদ্দ এবং অন্য অংশে সারাদিন তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ যত হাদীস শুনেছেন তা নিয়ে পর্যালোচনা করতেন। যখন অন্যান্য মুহাজির ও আনসারগণ ব্যবসা

---

[70] সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩।

ও ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তখন আবু হুরাইরা আহলুস-সুফফাতে সময় দিতেন এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে থেকে সারাদিন পড়াশোনা করতেন।

আস-সুফফায় যারা থাকতেন তাদের ভরণপোষণের একটি উৎস ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ পাঠানো সাদাক্বাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সাদাক্বাহ পেলে সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি কোনো উপহার পেলে নিজের জন্য কিছু রেখে বাকিটুকু সুফফাবাসীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি ধনী সাহাবীদের ؓ উৎসাহ দিতেন যেন তাঁরা আস-সুফফার অধিবাসীদের নিজেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যদি কারো কাছে দুইজনের জন্য যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে সে যেন সেই খাবারে তৃতীয়জনকে আহ্বান করে। যদি কারো কাছে চারজনের জন্য যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে সে যেন আরো এক বা দুইজনকে সেই খাবারে শরীক করে।'[71] যেসব সাহাবা ؓ আহলুস-সুফফাদের নিমন্ত্রণ করতেন তাঁরা কোটিপতি ছিলেন এমন নয়। কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের বলেছেন যদি তাদের কাছে দুইজনের যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে যেন তৃতীয় আরেকজনকে নিয়ে খায়।

উদারতা ও অন্যের জন্য নিজের জিনিস ছেড়ে দেওয়া - এই গুণগুলো ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগ থেকে অনুশীলিত হয়ে আসছে। ইসলামের প্রথম প্রজন্মের মানুষগুলোর মধ্যে যে বন্ধন দেখা যায় তা আর কোনো যুগে দেখা যায় না। এতিম, গরিব, অভাবীদের প্রতি দয়া দেখানো, অতিথির সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা – এ সকল ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কুরআনের অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এ কাজগুলো কিন্তু ইবাদাতেরই অন্তর্ভুক্ত। কুরআন নাযিলের শুরু থেকে এসব ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মুসলিম হওয়ার সাথে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার জড়িত এবং এই ইবাদাত আল্লাহ তাআলার অনেক পছন্দের একটি ইবাদাত।

ফাতিমা ؓ ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ মেয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই মেয়েকে খুবই ভালোবাসতেন। ফাতিমা ঘরের সমস্ত কাজ নিজ হাতে করতেন, তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। স্বামী আলী ইবন আবি তালিব ؓ তাঁকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে কিছু দাস এসেছে, ফাতিমা যেন তাঁর পিতার কাছে গিয়ে একজন দাসের জন্য সুপারিশ করেন। ফলে, ফাতিমা ؓ তাঁর পিতার কাছে গিয়ে একজন দাসের জন্য অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি তোমাকে কোনো দাস দিতে পারছি না, কারণ আমি সুফফাবাসীদের খালি পেটে থাকতে দিতে পারি না। তাদের জন্য খরচ করার মতো টাকা আমার কাছে এখন নেই। আমি এই দাসদের বিক্রি করে দিব আর সেই টাকা তাদের জন্য ব্যয় করা হবে।' এ থেকে বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলুস-সুফফার জন্য কত চিন্তিত ছিলেন।

---

[71] সহীহ বুখারি, অধ্যায় সালাতের ওয়াক্ত, হাদীস ৭৮।

এমনটা ভাবা সমীচীন হবে না যে, আহলুস-সুফফারা বসে বসে বিনামূল্যে খাবার খেতেন আর কোনো কাজ করতেন না। বরং তাঁরা ছিলেন ইবাদাতগুজার লোক, তাঁরা ছিলেন সত্যিকারের আবেদ। তাঁরা দ্বীনের ব্যাপারে অনেক জ্ঞান রাখতেন। তাঁরা ছিলেন আলিম, মুজাহিদ। তাদের মধ্যে অনেকে শহীদও হয়েছেন। যেমন আবু হুরাইরা, তিনি আহলুস-সুফফার একজন সদস্য ছিলেন। তিনিই সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহলুস-সুফফার আরেকজন সদস্য হলেন হুযাইফা ইবন ইয়ামান ﷺ। তিনি শেষ যমানার অধিকাংশ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহলুস-সুফফার সদস্যদের মধ্যে হারিসা ইবন নু'মান, সালিম ইবন উমাই, খুনাইস ইবন হুদাইফাহ, সুহাইব ইবন সিনান বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। হানযালা শহীদ হয়েছিলেন উহুদের যুদ্ধে, ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। আস-সুফফার অনেকেই হুদাইবিয়াহসহ অন্যান্য যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাদের অনেকেই জীবিকা নির্বাহের জন্য খেজুরের বীজ সংগ্রহ করে পশুপাখির খাবার হিসেবে বিক্রি করতেন। তাঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ কর্ম করার চেষ্টা করতেন কিন্তু মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, তাঁরা অন্যের দারস্থ হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অবস্থাভেদে আস-সুফফার অধিবাসীদের সংখ্যা উঠানামা করতো। গড়ে মোটামুটিভাবে ৭০জন সেখানে ছিলেন। তাঁরা মসজিদ-ই-নববীর পিছনেই দিনরাত ২৪ ঘণ্টা থাকতেন। তাঁরা পড়াশোনার দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন, কেননা তাঁরা সবসময় মুসলিমদের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র মসজিদ-ই-নববীর কাছাকাছি থাকতেন। আর এটি ছিল ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এ কারণেই তাঁরা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের প্রথম প্রজন্মের সমাজটি ছিল খুব শক্তিশালী একটি সমাজ। কারণ তাঁরা একে অপরকে দেখে রাখতেন এবং কষ্ট লাঘব করতেন। স্বার্থপরতা সে সমাজে ছিল না বিধায়, কঠিন সময়েও তাঁরা একে অপরের পাশে থেকেছেন। আর তাই তাদের মাধ্যমে ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। মুনাফিকরা তাদের ভ্রাতৃত্বে কোনো চিড় ধরাতে পারেনি।

সে সময়টাতে মুসলিমদের সম্পদ খুব একটা ছিল না কিন্তু তারপরেও তাঁরা সমাজে কল্যাণমূলক সেবাগুলো চালু রেখেছেন। আস-সুফফায় যারা থাকতেন তাঁরা আল-আনসারদের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করতেন। সমাজের মানুষদের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মেটানোও এক ধরনের দাওয়াত। উবাদাহ ইবনুস-সামিত ﷺ বর্ণনা করেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তেন তখন তিনি নওমুসলিমদের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে ন্যাস্ত করতেন। যখন কোনো নওমুসলিম রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে আসত তখন তিনি ব্যস্ত থাকলে আমাদের কাছে তাকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমার বাড়িতে ছিলেন। আমরা তাকে পরিবারের সদস্যদের মতোই দেখাশোনা করেছিলাম আর তাকে কুরআন শিখিয়েছিলাম।'

আনসাররা এই ব্যাপারটি মনে রাখতেন যে, এই মুহাজিররা সবকিছু ছেড়েছুড়ে মদীনায় এসেছেন। তাই তাদের এখন সাহায্য দরকার। রাসূল ﷺ মুসলিম সমাজকে একটি সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি প্রতিটি দলের একজন করে নেতা নির্বাচন করে দেন। যেমন আবু হুরাইরা ﵁ ছিলেন আহলুস-সুফফার আরীফ। আরীফ হলেন কোনো দলের প্রতিনিধি অথবা তাদের যাবতীয় প্রয়োজন মূল নেতাকে জানানোর ব্যবস্থাকারী। আবু হুরাইরা ﵁ আহলুস-সুফফার প্রতিনিধি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলুস-সুফফাকে কোনো সংবাদ দিতে বা কিছু বলতে চাইলে আবু হুরাইরার কাছেই সংবাদ পাঠাতেন।

দ্বিতীয় প্রজেক্ট: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা

> "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা অবস্থান করছিলে এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে, অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমুহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়েত প্রাপ্ত হতে পার।" (সূরা আল ইমরান, ৩: ১০৩)

> "আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি আপনি যমীনের সব কিছু ব্যয় করে ফেলতেন, তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।" (সূরা আল-আনফাল, ৮: ৬৩)

এখানে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলছেন, মুসলিমদের অন্তরে একে অপরের জন্য যে ভালোবাসা, তা আল্লাহ তাআলা নিজগুণে তৈরি করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি চাইতেন, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়েও এই কাজটি করতে পারতেন না। এটা একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছা। তাঁরা কেউ কাউকে চিনতেন না, কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একই দ্বীনের অনুসারী হওয়ার কারণে যে ভালোবাসা তাদের মধ্যে ছিল তা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তিনিই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরস্পরের ভাই করে দিয়েছেন।

> "যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে। মুহাজরিদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। নিজেদের

> অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যারা কার্পণ্য হতে নিজেদের মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।" (সূরা হাশর, ৫৯: ৯)

আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল আনসারদের অন্তর থেকে যাবতীয় কার্পণ্য দূর করে দিয়েছিলেন। এই আয়াতে যদিও সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধ অন্য পর্যায়ের, অতুলনীয়। আস-সুহাইলি থেকে জানা যায়, কিছু ব্যক্তি বলেছেন যে, এই ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা হয় হিজরতের পাঁচ মাস পরে। আবার কেউ বলেছেন হিজরতের ৯ মাস পরে। অন্যান্যরা বলেছে মসজিদ-ই-নববী নির্মাণের পর পরই এই ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা হয়।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার সম্পর্কটি এমন ছিল যেন তাঁরা রক্তের ভাই। এমনকি প্রথমদিকে উত্তরাধিকারের বিধানগুলোও তাদের ক্ষেত্রে রক্তের ভাইয়ের সম্পর্ক ধরে প্রয়োগ করা হতো। এরূপ সম্পর্কের একটি উদাহরণ হলো সাদ ইবন রাবিআ ও আবদুর রহমান ইবন আউফের ﷺ মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধ। আবদুর রহমান ﷺ একজন মুহাজির ছিলেন। তিনি ছিলেন জান্নাতের সুখবর পাওয়া দশজন সাহাবা ﷺ, অর্থাৎ আশারে মুবাশশারার একজন। তিনি হিজরত করার পরে সাদ ইবন রাবিআ নামক আনসারীর বাড়িতে থেকেছিলেন। মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ তিনি নিজ মুখে বর্ণনা করেছেন।

"হিজরত করে মদীনায় আসার পর আল্লাহর রসূল ﷺ আমার ও সাদ ইবন রাবিআর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দেন। সাদ ইবন আর-রাবি' আমাকে বললো, 'আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। আমি আমার সম্পদের অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেব। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে – আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত পূর্ণ হলে আপনি তাকে বিয়ে করে নিতে পারেন।' আবদুর রহমান বললেন, 'আসলে আমার তো এসব কিছুর প্রয়োজন নেই। এখানে কি কোনো বাজার আছে যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়?' সাদ ইবন রাবিআ আমাকে বললো, 'হ্যাঁ আছে, তুমি কায়নুকার বাজারে যেতে পারো।'"

পরের দিন আব্দুর রাহমান ইবন আওফ বাজারে গিয়ে কিছু শুকনো ঘি ও মাখন কিনে আনেন। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত সেই বাজারে যাওয়া আসা করতেন। কয়েকদিন পরে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমানের শরীরে হলুদের চিহ্ন দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

- বিয়ে করেছো নাকি আব্দুর রাহমান?

- আবদুর রহমান মাথা নাড়লেন।

- কাকে বিয়ে করেছো?

- এক আনসারী মহিলাকে।

- তাকে কী পরিমাণ মোহরানা দিয়েছ?

- খেজুরের এক আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি।

- ঠিক আছে, এখন একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করে নাও।[72]

সাহাবাগণ ﵃ নিজেদেরকে নিজেদের আপন ভাই মনে করে নাসীহা করতেন। এরকম একটি উদাহরণ হলো সালমান ও আবু দারদা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান ও আবু দারদার মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দেন। একবার সালমান আবু দারদা'র সাথে সাক্ষাত করতে এসে তাঁর স্ত্রী উম্ম দারদাকে মলিন পোশাকে দেখতে পান। তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উম্ম দারদা বললেন, 'আপনার ভাই আবু দারদা'র পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি মোহ নেই।' কিছুক্ষণ পরে আবু দারদা এলেন। তারপর তিনি সালমানের জন্য খাবার তৈরি করে বললেন, 'তুমি খেয়ে নাও, আমি সাওম পালন করছি।' সালমান ﵁ বললেন, 'তুমি না খেলে আমিও খাবো না।' এরপর আবু দারদা বাধ্য হয়ে সিয়াম ভঙ্গ করে সালমানের সাথে খেলেন। রাত হলে আবু দারদা সালাত আদায়ে দাঁড়াতে গেলেন। কিন্তু সালমান বললেন, 'না, তুমি এখন সালাতে দাঁড়াবে না, তুমি এখন ঘুমাবে।' অগত্যা আবু দারদা ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবু দারদা আবার সালাতে দাঁড়াতে উদ্যত হলেন, সালমান আবার তাঁকে ঘুমাতে বললেন। রাতের শেষভাগে সালমান আবু দারদাকে নিজ থেকে জাগালেন এবং দু'জনেই সালাত আদায় করলেন। পরে সালমান তাঁকে বললেন, 'তোমার উপর তোমার রবের হক্ব আছে, তোমার নিজেরও তোমার উপর হক্ব আছে। আবার তোমার পরিবারেরও হক্ব রয়েছে। প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব প্রদান করো।' এরপর আবু দারদা নবীজির ﷺ নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। সব শুনে নবীজি ﷺ বললেন, 'সালমান যা বলেছে ঠিকই বলেছে।'[73]

সালমান ইবন ফারিস ﵁ মুহাজির ছিলেন কিন্তু তিনি মক্কা থেকে হিজরত করেন নি, তিনি পারস্য থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ খোঁজে মদীনাতে এসেছেন। তারপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে আবু দারদা'র ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দিয়েছেন। এভাবে আনসারগণ মুহাজিরদের নানা দিক থেকে সাহায্য করতেন এবং নিজেদের সম্পদ থেকে যতটুকু সম্ভব তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

আনসাররা একদিন নবীজিকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমাদের খেজুরের বাগানগুলো আমাদের ও মুহাজিরদের মাঝে ভাগ করে দিন।' নবীজি ﷺ বললেন, 'না, ভাগ করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।' তখন আনসাররা প্রস্তাব দিলেন, 'তাহলে এক কাজ করা যাক, মুহাজিররা আমাদের বাগানগুলো আবাদ করুক আর

---

[72] সহীহ বুখারি, অধ্যায় কেনা-বেচা, হাদীস ২।

[73] সহীহ বুখারি, অধ্যায় সাওম, হাদীস ৭৫।

উৎপাদিত খেজুরের একটা অংশের মালিক হোক।' মুহাজিররা বললেন, 'আমরা এতে রাজি আছি।'[74]

তাদের মধ্যে চুক্তি ছিল যে, মুহাজিরগণ অর্ধেক কাজ করবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে অর্ধেকের বেশি কাজ আনসাররাই করে ফেলেছেন! মুহাজিরগণ নবীজির ﷺ কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমরা উনাদের মতো এত ভালো মানুষ কখনও দেখিনি। যখন তাদের অবস্থা স্বচ্ছল থাকে, তখন তাঁরা আমাদের সাহায্য তো করেনই, যখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ দেখেছি, তখনও তাঁরা আমাদের স্বস্তিতে রেখেছেন। নিজেদের ক্ষেতে তাঁরা নিজেরা কাজ করেন অথচ আমাদেরকে ফসলের অর্ধেক দিয়ে দেন।'

আনসারদের এমন উদারতা দেখে মুহাজিররা রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আনসারগণ তো সব সওয়াব পেয়ে গেলেন, আমরা তো কিছুই পাবো না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না, তোমরা যদি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করো এবং তাদের প্রশংসা করো, তাহলেও তোমরা সাওয়াবের অধিকারী হবে।'[75] আনসার ও মুহাজিরদের সম্পর্কে দুটো জিনিস জড়িয়ে আছে–উদারতা ও কৃতজ্ঞতা। আনসাররা মুহাজিরদের জন্য নিজেদের হৃদয় খুলে দিয়েছিলেন। আর মুহাজিররাও কখনো আনসারদের উদারতার কথা ভোলেননি। তাঁরা সবসময় আনসারদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং তাদের জন্য দুআ করেছেন।

প্রথমদিকে মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিল জোড়ায় জোড়ায়। উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদেরকে আপন ভাই ধরে সম্পদ ভাগাভাগি করা হতো। মুহাজিরদের অবস্থার উন্নতি হলে এই বিশেষ সম্পর্কগুলো লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্ববোধ রয়ে যায়। তারপর থেকে উত্তরাধিকার আইন শুধুমাত্র রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো।

> **"আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত।" (সূরা আনফাল, ৮: ৭৫)**

সম্পূর্ণ নতুন একটি বন্ধনের উপর ভিত্তি করে মদীনাতে নতুন একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল। আরবদের জন্য এটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা। তৎকালীন আরবে

---

[74] সহীহ বুখারি, আনসারদের মর্যাদা, হাদীস ৭।

[75] আবু দাউদ, অধ্যায় আদাব, হাদীস ৪০।

রক্তের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, গোত্রীয় সম্পর্ক – গতানুগতিক এসব সম্পর্ক ছাড়া আরবরা অন্য কিছু চিন্তা করতে পারত না। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর এমন একটি সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে যাদের সম্পর্কের ভিত্তি রক্ত, অর্থ বা জাতীয়তা নয়, বরং তা হলো আক্বীদাহ বা ধর্মবিশ্বাস। শুধু তাই নয়, ঈমানের এ নতুন বন্ধন গড়ার সাথে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল মুসলিমদের আদেশ করলেন আগে কাফিরদের সাথে তাদের যে বন্ধন ছিল তা যেন ভেঙ্গে ফেলে।

> "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই জালিম।" (সূরা তাওবা, ৯: ২৩)

এখানে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল মুসলিমদের বলছেন যে, যেসব গোত্রের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক আছে তারা যদি মুসলিম না হয় তবে সে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে হবে। তাদের প্রতি আর আনুগত্য পোষণ করা যাবে না। এ সম্পর্কে কুরআনে আছে

> "হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ কোরো না – তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে; রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশে বের হয়ে থাক তাহলে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং হাত ও জিহবা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও। তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনো উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।" (সূরা মুমতাহিনা, ৬০: ১-৩)

মদীনায় ইসলাম আসার পর আগের আইনগুলো রদ হয়ে যায়। নতুন আইন অনুসারে মুসলিমদের সাথে কাফির গোত্রগুলোর আগের সকল সম্পর্কের ইতি ঘটে। মদীনায় আসার পর মুসলিম ও আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) মধ্যকার সম্পর্কের উপর কুরআনে বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ মদীনাতে তখন অনেক আহলে কিতাব বসবাস করতো। মদীনার আরবদের সাথে ইহুদিদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রতিবেশিসুলভ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক কীরূপ হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আয়াত অবতীর্ণ করেন।

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা মায়িদা, ৫: ৫১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বলেন, 'এখানে আল্লাহ তাআলা ইসলামের শত্রু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন – তারা কখনো তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। কেননা তোমাদের ধর্মের প্রতি তাদের হিংসা ও শত্রুতা রয়েছে। হ্যাঁ, তারা একে অপরের বন্ধু বটে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফেরে পরিণত করে দেবে। আর তোমরা কেমন করে কাফের হতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত সমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রসূল। আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তাকে সরলপথের দিশা দেওয়া হবে।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১০০-১০১)

এখানে মুসলিমদের আবার সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে যদি তারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পথ অনুসরণ করে তবে তারা কাফির হয়ে যাবে।

"ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, সে পথই সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খার অনুসরণ করেন সেই জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে – তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই ।" (সূরা বাকারা, ২: ১২০)

জাহেলী যুগের প্রত্যেকটি সম্পর্ক মদীনায় বাতিল বলে ঘোষিত হলো। অতীতে যাদের সাথে বন্ধুত্ব বা মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটলো। এরপর থেকে সকল সম্পর্কের ভিত্তি হলো ইসলাম। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', এই কালিমার প্রথমে আছে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং তারপরে স্বীকৃতি জ্ঞাপন। প্রথম অংশ হলো, লা ইলাহা, অর্থাৎ, কোনো ইলাহ নেই – এখানে একজন ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে যে, সে এতদিন যেসব জিনিসকে উপাস্য মনে করেছে – তার সব ক'টা বাতিল, সেগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। পরের অংশে বলা হচ্ছে, ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত – মানে হলো আল্লাহই একমাত্র উপাস্য, একমাত্র মা'বূদ। এই স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে এখন মানুষের আল্লাহর উপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলো।

ঠিক একইভাবে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে প্রথমে অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্ক

এই ছিল সংক্ষেপে মদীনাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দ্বিতীয় কর্মসূচি; আনসার ও মুহাজিরদের এক করা এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ গড়ে তোলা।

তৃতীয় প্রজেক্ট: মদীনার সনদ বা চুক্তিপত্র

মদীনায় ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস। এ ধরনের বহুত্ববাদী একটি সমাজে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আনুগত্য পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি সাধারণ সমস্যা। এ ধরনের জটিলতা নিরসনে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সনদ প্রণয়ন করলেন যাতে এসব বিষয়ে কোনো জটিলতার অবকাশ না থাকে এবং মদীনা একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হতে পারে। তিনি এ সনদে বিভিন্ন গোত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কীরূপ হবে, কোনো বিবাদ হলে কীভাবে তার মীমাংসা হবে, যুদ্ধে কে কার পক্ষ নেবে বা সাহায্য করবে, কারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে – এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করলেন।

চুক্তিপত্রের কয়েকটি ধারা এখানে উল্লেখ করা হলো।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. এটি নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পাদিত। কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মু'মিন ও মুসলিমদের মাঝে লিখিত। এটি তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা তাদের অনুসারী, মিত্র এবং সহযোগী।

২. এরা সকলে এক উম্মাত, অন্যদের থেকে আলাদা।

৩. কুরাইশের মুহাজিরগণ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে। নিজেদের মাঝে পূর্বের রীতিতে রক্তপণ আদায় করবে এবং নিজেদের বন্দীর মুক্তিপণ বহন করবে। আর তা করবে মু'মিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।

৪. বনু আউফ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে। নিজেদের মাঝে আগের রীতিতে রক্তপণ লেনদেন করবে এবং নিজেদের বন্দীর মুক্তিপণ বহন করবে। আর তা করবে মু'মিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।

[একই ধারা অন্য কিছু গোত্রের জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়।]

৫. যারা বাড়াবাড়ি করবে, সকল সত্যনিষ্ঠ মুসলিম তাদের বিরোধিতা করবে, যদিওবা তাদের সন্তান হয়।

৬. এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে কোনো কাফিরের বদলে হত্যা করবে না এবং কোনো কাফিরকে কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।

৭. কোনো মুসলিম কাফির কুরাইশদের জানমালের নিরাপত্তা বা আশ্রয় দেবে না।

৮. কোনো মু'মিন, যে এই লিপির ধারাগুলো স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছে তার জন্য বৈধ নয়, কোনো দুষ্কৃতিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দেওয়া।

৯. আর যে বিষয়েই তোমাদের মাঝে মতভেদ হবে তা আল্লাহর সমীপে ও মুহাম্মাদের ﷺ সমীপে উপস্থাপিত হবে।

১০. বনু আউফের ইহুদিরা মু'মিনদের সাথে এক দলভুক্ত- ইহুদিদের জন্য ইহুদিদের ধর্ম, মুসলিমদের জন্য মুসলিমদের ধর্ম।

[একই ধারা ইহুদিদের অন্যান্য গোত্রগুলো জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়।]

১১. ইহুদিরা মুহাম্মাদের অনুমতি ছাড়া (যুদ্ধার্থে) বের হবে না।

১২. ইহুদিরা বহন করবে তাদের নিজেদের ব্যয়ভার ও মুসলিমরা তাদের নিজেদের। তাদের কেউ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

১৩. মদীনাকে পবিত্র স্থান বলে গণ্য করা হবে।

১৪. এই সনদভুক্ত পক্ষগুলোর মাঝে যদি কোনো সমস্যা বা বিবাদ সৃষ্টি হয়, যা থেকে হানাহানি বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তার নিষ্পত্তিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১৫. নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না কুরাইশকে, আর না তাকে যে কুরাইশের সাহায্য করে।

১৬. চুক্তির সকল পক্ষ মদীনায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করবে।

মদীনার সনদ: কিছু পর্যালোচনা

বিশ্বাসভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকত্বের ধারণা

মদীনায় রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের মাধ্যমে আক্বীদাহ বা ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক একটি সমাজের গোড়াপত্তন ঘটে এবং গোত্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়ার এই ধারণাটি আরবদের জন্য নতুন ছিল। কারণ ইতিপূর্বে তাদের পরিচয় ছিল বংশ বা গোত্রভিত্তিক, রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা ঐক্য বজায় রাখত। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন একটি ধারণা নিয়ে আসেন। তিনি আরব থেকে "গোত্র" ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করে দিলেন "উম্মাহ" ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা দিয়ে। তিনি বনু আওস ও বনু খাযরাজকে এক করলেন, নাম দিলেন আনসার। মদীনার আনসার ও মক্কার মুহাজিরদের এক করলেন এবং তাদের সাধারণ পরিচয় দিলেন মুসলিম এবং তারা প্রত্যেকে ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক। এখানে কারো গোত্র-পরিচয় বা গায়ের রং বা জাতীয়তা প্রাধান্য পেল না, বরং যে বিষয়টি তাদের এক করলো সেটা হচ্ছে তাদের ধর্মবিশ্বাস। এমনকি যারা মক্কা-মদীনার বাইরে

থেকে আগত, তারাও ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করলো শুধু এই যোগ্যতায় যে তারা মুসলিম। তিনি সবাইকে জানিয়ে দেন যে, মুসলিমরা একে অপরের ভাই।

চুক্তিপত্রে বলা হয়েছে – "ঈমানদাররা একে অপরের সহযোগী" – এই কথার মাধ্যমে মুসলিমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিচয় লাভ করলো। সম্ভবত জাতি হিসেবে মুসলিমদের স্বকীয়তা বজায় রাখতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন অনেক নির্দেশ দিয়ে গেছেন যেখানে ইহুদিদের কাছ থেকে মুসলিমদের স্বকীয়তা ও পার্থক্য বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। মক্কার মুশরিক ও মুসলিমদের মধ্যে অনেক বিষয়ে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও মদীনার আহলে কিতাব ও মুসলিমদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপারে সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের মুসলিম পরিচয়কে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র রাখতে চেয়েছিলেন। এমন অনেক হাদীস রয়েছে যেখানে মদীনার মুসলিমদেরকে ইহুদিদের থেকে ভিন্নভাবে চলাফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যেমন: রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষ্য করলেন, মদীনার ইহুদিরা ইবাদাতের সময় চামড়ার মোজা পরে না, তাই তিনি মুসলিমদের ইবাদাতের সময় চামড়ার মোজা পরার অনুমতি দিলেন। আবার মদীনার ইহুদিরা মেহেদী দিয়ে চুল রঙ করতো না, তাই তিনি মুসলিমদেরকে মেহেদী দিয়ে চুল রঙ করার নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশটি ছিল পুরুষদের জন্য। এরকম আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে। ইবন আব্বাস ؓ এটি বর্ণনা করেছেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন দেখলেন মদীনার ইহুদিরা আশুরার দিনে, অর্থাৎ মুহাররামের ১০ তারিখ রোজা রাখে এবং তারা এই দিনের ব্যাপারে বলে, 'এইদিনে মূসা ফির'আউনকে পরাজিত করেছেন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাদের ؓ বললেন, 'তাদের (ইহুদিদের) চাইতে আমি মূসার বেশি আপন।'[77] এরপর সাহাবারা সেদিন সাওম পালন করলেন।

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়েছেন যে মূসা ؑ ছিলেন একজন মুসলিম, কিন্তু ইহুদিরা মুসলিম নয়, তাই সত্যিকারের মুসলিম হিসেবে তাঁর প্রতি আমাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি, ইহুদিদের চেয়েও বেশি, যদিও বা তারা নিজেদের মূসার অনুসারী বলে দাবি করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন (১০ই মুহাররাম) রোজা রাখা শুরু করলেন এবং অন্যদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন যে তিনি যদি পরবর্তী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন তাহলে ১০ই মুহাররামের সাথে ৯ই মুহাররামও রোজা রাখবেন। এভাবে তিনি আশুরার রোজা রাখার ব্যাপারে মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে একটি পার্থক্য করে দিয়েছিলেন যেখানে মুসলিমরা ৯ই ও ১০ই মুহাররাম রোজা রাখত আর অন্যদিকে ইহুদিরা শুধু ১০ই মুহাররাম রোজা রাখত।

সনদ থেকে এটাও স্পষ্ট যে ইহুদিরা ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক। তারা নাগরিকত্বের সুবিধা লাভ করবে, নিরাপত্তা পাবে, শর্ত ছিল তারা ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত

---

[77] সহীহ বুখারি, অধ্যায় নবীদের কাহিনী, হাদীস ৭০।

থাকবে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো দলকে সাহায্য করবে না।

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা

এই সনদ অনুসারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতীক, ধর্মীয়, পারিবারিক বিরোধ, ফৌজদারি – সকল বিষয়ের নিষ্পত্তিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ রায় চূড়ান্ত বলে গন্য হবে। সনদে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যে বিষয়েই মতভেদ হবে তা আল্লাহর সমীপে ও মুহাম্মাদের সমীপে উপস্থাপিত হবে।' অর্থাৎ মদীনার এই রাষ্ট্রটি হবে একটি শরীয়াহ শাসিত রাষ্ট্র এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হচ্ছেন সেই রাষ্ট্রের প্রধান।

ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য এখানেই, অন্য ধর্মগুলোতে 'ইবাদাত' করা হয় তাদের স্ব-স্ব উপাস্যের, কিন্তু জীবনের অন্যান্য দিক, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হয় তাদের নিজেদের ইচ্ছায় বা নিজেদের বানানো আইনে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে 'ইবাদাত' যেমন আল্লাহর জন্য, তেমনি জীবনের অন্যান্য সকল বিষয় পরিচালিত হবে "শরীয়াহ" দ্বারা, অর্থাৎ সেই সকল আইন দ্বারা যেগুলো আল্লাহ কুরআনে নাযিল করেছেন, অথবা সুন্নাহর মাধ্যমে যে সকল আইনের বৈধতা দিয়েছেন।

> **"নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন।" (সূরা নিসা, ৪: ১০৫)**

অর্থাৎ ইবাদাত বা ধর্মীয় বিষয় (Religious) পালনের জন্য যেমন কিছু বিধান আছে, তেমনি দুনিয়াবী (Worldly) বিষয় গুলোর জন্যও ইসলামে নির্দিষ্ট বিধান আছে। এছাড়া আল্লাহর দেওয়া দ্বীন নিরাপদভাবে পালনের জন্য আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরি। আধুনিক শাসন ব্যবস্থাকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় – আইনবিভাগ (Legislative), বিচারবিভাগ (Judicial) ও কার্যনির্বাহী বিভাগ (Executive) – মদীনার সনদে প্রতিটি বিভাগের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের ﷺ সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত এবং ইহুদিরাও এটি মেনে নিয়েছিল। মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর ﷺ সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। অবশ্য ইহুদিদেরকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল যে তারা যদি চায়, তাহলে তারা নিজেদের মধ্যকার কোনো সমস্যা তাদের ধর্মীয় কিতাব অনুসারে ফয়সালা করতে পারবে, আবার তারা চাইলে তাদের নিজস্ব সমস্যা ফয়সালার জন্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদালতে দারস্থ হতে পারবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ স্বাধীনতা ছিল তিনি তাদের মামলা নিষ্পত্তি করে দেবেন অথবা তাদের মামলা তাদের আদালতে বিচার করতে ফিরিয়ে দেবেন। এছাড়াও মদীনাবাসীর কারো সাথে বহিরাগত কারো মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে সেই ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ও তাঁর রাসূলের ﷺ ফয়সালা সবাইকে মেনে নিতে হবে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ কর্তৃত্ব

এই চুক্তিপত্রের মাধ্যমে মদীনাতে রাসূলুল্লাহর ﷺ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও তিনি মদীনাতে একজন অতিথি হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন কার্যত তাদের নেতা। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সূরা আন-নিসাতে বলেছেন,

> **"বস্তুত, আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।" (সূরা আন-নিসা, ৪: ৬৪)**

সনদে উল্লেখ করা হয়েছে: এই সনদভুক্ত পক্ষগুলোর মাঝে যদি কোনো সমস্যা বা বিবাদ সৃষ্টি হয়, যা থেকে হানাহানি বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তার নিষ্পত্তিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত – এই ধারা থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কর্তৃত্বের বিষয়টি সুস্পষ্ট, সেখানে ভাগ বসানোর অধিকার কারো ছিল না।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহকে ﷺ পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে। নবী হিসেবে রাসূলুল্লাহর ﷺ কর্তৃত্ব আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন পন্থায় প্রতিষ্ঠা করেছেন আর সেসব পন্থার মাঝে মদীনার সনদ অন্যতম। মদীনায় এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ চারটি প্রকল্প হাতে নেন – মসজিদ নির্মাণ, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ এবং সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা। প্রতিটি কাজ রাসূলুল্লাহর ﷺ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সনদে শুধু একজন মানুষের নাম স্থান পেয়েছে আর তিনি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। এভাবেই মদীনায় রাসূলুল্লাহর ﷺ ক্ষমতা সুসংহত হয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুমতি ছাড়া কারো মদীনা ত্যাগ করা বা যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। কুরাইশ এবং কুরাইশদের কোনো মিত্রকে সাহায্য করা এই সনদে নিষিদ্ধ করা হয়।

ইহুদি ও মুসলিমদের সম্পর্ক

মদীনার সনদ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎকালীন আহলে কিতাবদের প্রতি বেশ সহনশীলতা দেখিয়েছেন। এই চুক্তিপত্রে ইহুদিদেরকে মদীনার অর্থাৎ একটি ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। তারা নিজেদের ধর্মীয় রীতি পালন করার সুযোগ পেয়েছিল এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এই যে তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর। অন্যদিকে, ইহুদিদের উপর যে দায়িত্ব ও শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, সেগুলো হলো:

- বহিঃশত্রু কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হলে ইহুদিরা মুসলিমদের পক্ষ নেবে।
- তারা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর মতামত প্রদান করবে এবং এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে না।
- মদীনার নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য কারো কাছে প্রকাশ করবে না।
- রাসূলুল্লাহর ﷺ নির্দেশ ব্যতিরেকে কেউ মদীনা ত্যাগ করবে না।

এরকম একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে মুসলিম ও ইহুদিদের সহাবস্থানের সূচনা হলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, বরং সম্পর্ক কেবল খারাপই হয়েছে। কেননা ইহুদিরা মদীনায় মুসলিমদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুরু থেকেই তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ইহুদিরা তা হতে দেয়নি।

মদীনার পবিত্রতা বজায় রাখা

আরবদের কাছে মক্কা 'হারাম' বলে বিবেচিত ছিল, অর্থাৎ, সেখানে কোনো প্রকার রক্তারক্তি, অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা করা নিষিদ্ধ ছিল, এটি ছিল তাদের কাছে একটি পবিত্র স্থান। মদীনার একটি নির্দিষ্ট বর্ডার বা সীমানা ছিল এবং মদীনার সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাকে সকলের জন্য নিরাপদ স্থান হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মদীনার পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য সেখানে গাছকাটা, শিকার করা, যুদ্ধ ও অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

মক্কার জন্য মুহাজিরদের কাতরতা

মুহাজিরগণ মক্কার জন্য কাতরতা অনুভব করতেন। তাঁরা সেখানে ফিরে যেতে চাইতেন। বিলাল رضي الله عنه প্রায়ই বলতেন, 'উতবা ইবন রাবিআ, শায়বা ইবন রাবিআ ও উমাইয়া ইবন খালাফের উপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক; তাদের জন্যই আমাদেরকে মক্কা ছেড়ে এ রোগ-শোকের দেশে আসতে হয়েছে।' মদীনায় জলাবদ্ধতা থাকার কারণে সেখানে ম্যালেরিয়া, জ্বর প্রভৃতি রোগ একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল।

মুয়াত্তা ইবন মালিকে একটি হাদীস আছে যেটি বর্ণনা করেছেন আ'ইশা رضي الله عنها। তিনি বলেন,

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন আবু বকর ও বিলাল رضي الله عنهما ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাদেরকে দেখতে গেলাম এবং বললাম, বাবা, কেমন আছেন আপনি? বিলাল, আপনি কেমন আছেন? আমার বাবা আবু বকর رضي الله عنه জ্বরাক্রান্ত হলেই এ পংক্তিগুলি আবৃত্তি করতেন – প্রতিটি মানুষ রোজ সকাল তার আপনজনদের মাঝে কাটায়, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী। আর

বিলাল ﷺ গলার স্বর উঁচু করে আবৃত্তি করতেন: হায়, আমি যদি জানতাম আমি কি মক্কার সেই উপত্যকায় আর একটি রাত হলেও কাটাতে পারবো, আমার চারপাশ জুড়ে থাকবে ইযখির আর জলীল ঘাস। হায়, আমার ভাগ্যে কি মাজান্না কূপের পানি জুটবে? আমি কি আর কখনো শামা আর তাফিল পাহাড়ের দেখা পাব?"

আ'ইশা ﷺ বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট গিয়ে এ সংবাদ জানালাম। তখন তিনি এ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের ভালোবাসার শহর বানিয়ে দাও যেমন ভালোবাসার ছিল মক্কা, অথবা মদীনাকে মক্কা থেকেও প্রিয় করে দাও। আমাদের জন্য মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। মদীনার সা ও মুদ্দার মাঝে বিশেষ বরকত দান করো (অর্থ-সম্পদে বরকত দান করো)। এখানের জ্বর রোগকে সরিয়ে জুহফায় নিয়ে যাও।'[78]

যখন আ'ইশা ﷺ জ্বরে আক্রান্ত আমর ইবন ফুহাইরাকে দেখতে গেলেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেন তখন আমর ইবন ফুহাইরা উত্তর না দিয়ে বলতে লাগলেন, "মৃত্যু হওয়ার আগেই আমি মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছি, কাপুরুষের মৃত্যু পেছনে লেগেই থাকে।"

এখানে আবু বকর ﷺ মৃত্যুর কথা বলছিলেন, বিলাল বলছিলেন শামা ও তাফিল নামক মক্কার দুটি পাহাড়ের কথা। আর আমরও মৃত্যুর কথা স্মরণ করছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন মক্কায় ফেরার জন্য কাতর। তাঁরা সকলে নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এমন এক জায়গায় হিজরত করেছেন যেখানে তাঁরা আসতেই চাননি। তার উপর তাদের উপর শারীরিক অসুস্থতা জেঁকে বসলো। পুরো ব্যাপারটি তাদের জন্য বেশ কষ্টকর ছিল। এমনকি তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য পরিবারের সদস্যরাও আশেপাশে ছিল না। সাহাবাদের ﷺ এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন; তাই তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। এ দুআটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুআর বরকতে মুহাজিরগণ দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মদীনাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

মদীনাকে তাঁরা এত ভালোবেসেছিলেন যে মক্কা বিজয়ের পরও তাঁরা মদীনায় থেকে গেলেন। আবু বকর ﷺ, উমার ﷺ, উসমান ﷺ, বিলাল ﷺ – তাদের কেউই মক্কায় ফেরত যাননি। মু'মিনদের অন্তরে মদীনার প্রতি ভালোবাসা থাকবে – এটাই স্বাভাবিক। এখনও মুসলিমরা যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ শহরে প্রবেশ করে তখন তাদের মধ্যে একটি বিশেষ অনুভূতি তৈরি হয়। মক্কায় প্রবেশ করলে বিশাল বিশাল স্তম্ভে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদ-উল-হারামের দিকে তাকালে বিশালতার একটি অনুভূতি তৈরি হয়, কিন্তু মদীনায় মক্কার মতো পাহাড়-পর্বত নেই, সেখানে সমতল, সেখানে একধরনের প্রশান্তি অনুভব হয়। রাসূলুল্লাহর ﷺ দুআর বরকতেই মদীনা মুসলিমদের

---

[78] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, অধ্যায় ৪৫, হাদীস ১৪।

কাছে অতি প্রিয় একটি স্থান।

ইসলামের প্রথম সন্তান

হিজরতের পর মদীনায় প্রথম শিশু জন্ম নেয় আসমা বিনত আবু বকরের কোলে। এই সন্তান হলো আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের। আসমা তাঁর সন্তানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যান এবং তাঁর কোলে তুলে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি খেজুর চিবিয়ে সেটিকে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের মুখে ঢুকিয়ে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দুআ করেন। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের ছিলেন মুহাজিরদের প্রথম সন্তান।[79]

পুরো ঘটনাটি আসমা বিনত আবু বকর ﷺ নিজ মুখে বর্ণনা করেছেন:

'আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি সন্তানসম্ভবা। আমি মদীনায় এসে কুবাতে থাকলাম, সেখানেই আমি আমার পুত্র সন্তানকে প্রসব করি। এরপর আমি তাঁকে নিয়ে নবীজির s কোলে তুলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনিয়ে তা মুখে দিলেন, চাবালেন এবং সেই খেজুরের রস আমার বাচ্চার মুখে ঢেলে দিলেন। তারপর নবীজি s চিবানো খেজুরের সামান্য অংশ নবজাতকের মুখের ভিতরের তালুতে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তার জন্য দুআ করলেন এবং বরকত কামনা করলেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম সন্তান।'[80]

এ হাদীসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে ইঙ্গিত করে, সাহাবাদের ﷺ কাছে ইসলামের সূচনাবিন্দু ছিল মদীনা। কারণ সেখানেই প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মক্কায় অতিবাহিত ১৩টি বছর যেন এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিকাল ছিল। আসমা এখানে বলেননি যে হিজরতের পর জন্ম নেওয়া প্রথম শিশু অথবা মদীনায় জন্ম নেওয়া প্রথম শিশু; বরং তিনি বলেছেন "উলিদা ফীল ইসলাম" – অর্থাৎ, ইসলামের প্রথম সন্তান। মুসলিমরা যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম মেনে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে একমাত্র তখনই ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে। সাহাবিদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি দেখিয়ে দেয় বর্তমানের মুসলিমরা ইসলামের অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়ে আছে।

ইহুদি পণ্ডিত থেকে মুসলিম: আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মদীনার ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী পণ্ডিত বা রাবী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ । নবীজির ﷺ আগমনের খবর শুনে তিনি তাঁর সাথে

---

79 সহীহ বুখারি, অধ্যায় আনসারদের মর্যাদা, হাদীস ১৩৬।

80 সহীহ বুখারি, অধ্যায় আক্বীকা, হাদীস ৩।

দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইমাম আহমেদ থেকে জানা যায়, আবদুল্লাহ ইবন সালাম ﷺ যখন রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখলেন, তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। আল্লাহর রাসূলের ﷺ চেহারা থেকেই যেন সত্যের আলো উদ্ভাসিত হতো। আবদুল্লাহ ইবন সালাম একজন ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন, তাই তিনি মুহাম্মাদকে ﷺ পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন যে তিনি আসলেই রাসূল কি না। ইহুদি পণ্ডিতরা সর্বশেষ রাসূলের আগমনের নিদর্শন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আনাস ﷺ এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন:

আবদুল্লাহ ইবন সালামের ﷺ কাছে নবী করীমের ﷺ আগমনের সংবাদ এসে পৌঁছলে তিনি এসে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তিনি বললেন, "আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি। এগুলোর সঠিক উত্তর একজন নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (১) ক্বিয়ামতের সর্বপ্রথম লক্ষণ কী? (২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম খাবার কী? (৩) কী কারণে সন্তান আকৃতিতে কখনও পিতার মতো কখনো বা মায়ের মতো হয়?"

নবীজি ﷺ উত্তরে বললেন, "এ বিষয়গুলি সম্পর্কে এই মাত্র জিবরীল ﷺ আমাকে জানিয়ে গেলেন"। আবদুল্লাহ ইবন সালাম ﷺ একথা শুনে বললেন, "তিনিই ফেরেশতাদের মধ্যে ইহুদীদের শত্রু।" নবীজি ﷺ বললেন, '(১) ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সর্বপ্রথম লক্ষণ হলো লেলিহান আগুন যা মানুষকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে এবং সবাইকে সমবেত করবে। (২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম খাবার হলো মাছের কলিজার বাড়তি অংশ। (৩) যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান পিতার অনুরূপ হয় আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান মায়ের অনুরূপ হয়।'

আবদুল্লাহ ইবন সালাম ﷺ বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। হে রাসূলুল্লাহ ﷺ, ইহুদীরা এমন একটি জাতি যারা অন্যের কুৎসা রটনায় অত্যন্ত পটু। আমার ইসলাম গ্রহণের খবর প্রকাশ পাবার আগে আমার ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন তারা কী বলে। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ডাকলেন, তারা হাজির হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মাঝে আবদুল্লাহ ইবন সালাম কেমন লোক?" তারা বললো, "তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। তিনি আমাদের সবচেয়ে মর্যাদাবান এবং সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তির সন্তান।" রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বল তো, যদি আবদুল্লাহ ইবন সালাম ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে? তোমরা তখন কী করবে?" তারা বললো, "আল্লাহ তাকে এ কাজ থেকে রক্ষা করুন।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার একথাটি জিজ্ঞেস করলেন, তারা একই উত্তর দিল। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ।" এ কথা শুনে ইহুদীরা বলতে লাগল, "সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বাজে লোক এবং খারাপ লোকের সন্তান।" অতঃপর তারা তাঁকে অপমান করে আরো অনেক

কথাবার্তা বললো। আবদুল্লাহ ইবন সালাম ﷺ বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি এমন কিছুরই আশংকা করছিলাম।"[৪১]

যখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম জিবরীল ফেরেশতাকে ইহুদিদের শত্রু বলে উল্লেখ করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সামনে সূরা আল-বাক্বারাহর একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন,

> **"যে শত্রু হবে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের, জিবরীলের ও মীকাঈলের – তবে নিশ্চয় আল্লাহ সেসব কাফিরদের শত্রু।" (সূরা বাক্বারাহ, ২: ৯৮)**

আল্লাহ তাআলা সব ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেছেন আর সব ফেরেশতাই আল্লাহকে সম্মান করেন। কোনো নির্দিষ্ট ফেরেশতাকে বন্ধু বা শত্রু ভাবার কোনো কারণ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবন সালামের এই ভুল ধারণাটিকে সংশোধন করে দিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তাতে আরেকটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার আছে। এই দুনিয়াতে মাছের কলিজা হয়তো খুব জনপ্রিয় কোনো খাবার নয়, কিন্তু জান্নাতের সবকিছুই দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে। নাম শুনে একই রকম মনে হলেও জান্নাতে সবকিছু পুরোপুরি ভিন্ন হবে। আর তৃতীয় প্রশ্নের যে উত্তর আল্লাহর রাসূল ﷺ দিয়েছেন তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান বলে যে, যদি পিতার জিন (Gene) সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করে তবে সন্তান পিতার অনুরূপ হবে আর একইভাবে যদি মায়ের জিন সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করে তবে সন্তান মায়ের অনুরূপ হবে। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক এ কথাটিই বলেছেন, কারণ বীর্যের মাধ্যমে পুরুষের জিন এবং ডিম্বাণুর মাধ্যমে মহিলার জিন প্রবাহিত হয়।

ইহুদিরা মুখের উপরে যেভাবে আবদুল্লাহ ইবন সালাম সম্পর্কে মিথ্যে বলেছে – তা দেখে বোঝা যায় তারা মিথ্যাচারে কতটা পারদর্শী। এই ধরনের ছোট ছোট ঘটনাগুলো মুসলিম ও ইহুদিদের সম্পর্কে ভাঙনে প্রভাবক হয়ে দাঁড়ায়। ইহুদিরা কোনোভাবেই মুহাম্মাদকে ﷺ রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে একমাত্র সত্য ও শেষ দ্বীন হিসেবে মেনে নিতে পারছিল না। তারা আড়ালে থেকে প্রায়ই ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতো।

অন্য এক বর্ণনায় ইবন আব্বাস ﷺ বলেছেন, যখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম, সালাবা ইবন সা'ইয়া, উসাইদ ইবন সা'ইয়া, আসাদ ইবন উবাইদসহ আরও কিছু ইহুদি মুসলিম হয়ে গেল তখন ইহুদিদের আলিমরা বলতে লাগলো, "যারা মুহাম্মাদের দ্বীনের অনুসারী হয়েছে তারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক।" তারা মনে করতো যদি

---

[81] সহীহ বুখারি, অধ্যায় নবীদের কাহিনী, হাদীস ৪।

এই লোকগুলো আসলেই ধার্মিক হতো তাহলে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের দীন ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করতো না।"

"তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সেজদা করে। তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হলো সৎকর্মশীল। তারা যেসব সৎকাজ করবে, কোনো অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বিষয়ে অবগত।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১১৩-১১৫)

ক্বিবলার পরিবর্তন

রাসূলুল্লাহর ﷺ মদীনায় হিজরতের ১৪ মাস পরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে। তা হলো ক্বিবলার পরিবর্তন। মক্কাতে থাকাকালীন সময়ে ক্বিবলা ছিল জেরুসালেম বরাবর; কিন্তু তখন ক্বিবলা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি, কারণ মক্কায় থাকাকালীন তিনি জেরুসালেম ও কাবা উভয়কে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। এভাবে তিনি জেরুসালেম ও কাবা – উভয়ের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে পারতেন। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর দেখা গেল যে, সেখান থেকে মক্কা ও জেরুসালেমের অবস্থান পরস্পরের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা বরাবর সালাত আদায় করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করার সাহস পাননি। এরপর আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ইবরাহীমের ﷺ ক্বিবলা অর্থাৎ কাবাকে মুসলিমদের ক্বিবলা বানানোর নির্দেশ দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন। এ আয়াতটি মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন ক্বিবলা বরাবর সালাত আদায় করলেন। এরই মধ্যে একজন সাহাবী ﷺ মদীনার কয়েক মাইল দূরে তাঁর গোত্রকে ক্বিবলা পরিবর্তনের খবরটি জানানোর জন্য বের হয়ে পড়েন। তিনি গিয়ে দেখলেন যে তাঁরা পুরনো ক্বিবলা অর্থাৎ জেরুসালেম বরাবর আসরের সালাত পড়ছে। ওই অবস্থাতেই সেই সাহাবী ﷺ তাদেরকে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি মাত্রই রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মক্কা বরাবর সালাত আদায় করেছি।' এ কথা শুনে তাঁরা তৎক্ষণাৎ সালাতের মধ্যেই নিজেদের ক্বিবলা মক্কার দিকে পরিবর্তন করে ফেললো। এ ঘটনা থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সাহাবিদের ﷺ প্রবল আনুগত্য যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় সেই সমাজে একজন মুসলিমের কথার উপর সবাই কতটা আস্থা রাখত।

কিন্তু এ ঘটনাটি বেশ কিছু বিতর্কের জন্ম দেয়। শুধুমাত্র ক্বিবলা পরিবর্তনের বিষয় নিয়েই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সূরা আল-বাক্বারাহর ৪০টি আয়াত নাযিল করেছেন। ইবনুল কায়্যিম বলেন যে এটি ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুশরিকদের জন্য

একটি পরীক্ষা। কাবা ছিল আরবের মুশরিকদের ক্বিবলা, তাই ক্বিবলার দিক পরিবর্তনের পর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলতে শুরু করলো, "তিনি আমাদের ক্বিবলার দিকে ফিরে এসেছেন, এখন তিনি আমাদের ধর্মের দিকেও ফিরে আসবেন।" ইবনুল কায়্যিম আরও বলেন, এই ক্বিবলা পরিবর্তন ছিল মুনাফিক্বদের জন্যেও একটা পরীক্ষা ছিল যারা বলতো মুহাম্মাদ ﷺ নিজেই জানে না সে কী করছে; সে বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছে। ক্বিবলার পরিবর্তন ইহুদিদের জন্যেও একটি পরীক্ষা ছিল। ইহুদিরা জেরুসালেমকে নবীদের ক্বিবলা বলে বিশ্বাস করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ক্বিবলা পরিবর্তন করলেন, তখন তারা তাঁর সম্পর্কে বলতে শুরু করলো, 'তিনি পূর্বের নবীদের ক্বিবলা পরিত্যাগ করেছেন – এতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি আল্লাহর রাসূল নন।' পাশাপাশি এটা মুসলিমদের জন্যও একটি পরীক্ষা ছিল – আল্লাহ দেখতে চাইছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসরণে তারা কতোটা দৃঢ় – তারাও কি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ক্বিবলা পরিবর্তন করছেন কি না। অর্থাৎ এই একটি ঘটনা ছিল মুসলিম-মুশরিক-ইহুদী-মুনাফিক্ব সকলের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা।

"এখন নির্বোধেরা বলবে, কীসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ওই ক্বিবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুনঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান।" (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ১৪২)

কাবা, মক্কা কিংবা জেরুসালেম – সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, আর তাই মুসলিমরা কোন দিক বরাবর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে তা ঠিক করে দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়া জালের, তাই আল্লাহ বলছেন, "পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ।" ইবনে কাসীর বলেন, 'যদি আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন নতুন একটি ক্বিবলা নির্ধারণ করে দেন, তাহলে আমাদেরকে ঠিক সেই ক্বিবলামুখি হতে হবে। আমরা তাঁরই বান্দা এবং তাঁরই অধীনস্থ।' ইহুদিরা মনে করতো আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেন না, তাই দুটো ক্বিবলার যেকোনো একটি ঠিক, আরেকটি ভুল। মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা আরও বলতো, "যদি প্রথম ক্বিবলা ঠিক হয় তাহলে নতুন ক্বিবলা বরাবর ইবাদত করে তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আর যদি দ্বিতীয় ক্বিবলা ঠিক হয় তাহলে তো তোমাদের এতদিনের ইবাদত সব বিফলে গেল।" ইহুদিদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তাআলা আরেকটি আয়াত নাযিল করেন।

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের উপর। আপনি যে ক্বিবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই ক্বিবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান (সালাত) নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুনাময়।"

(সূরা বাক্বারাহ, ২: ১৪৩)

উম্মাতান ওয়াসাত মানে হলো উত্তম ও সম্মানিত উম্মাত। ইবন কাসীর এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন,

"আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মাধ্যমে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'তোমাদেরকে এই পছন্দনীয় ক্বিবলার দিকে ফিরাবার কারণ এই যে, তোমরা নিজেরাও পছন্দনীয় উম্মাত। তোমরা ক্বিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মাতের উপর সাক্ষ্য দেবে, কেননা তারা সবাই তোমাদের মর্যাদা স্বীকার করে।'

ইহুদিদের একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, কোনো ব্যক্তি যদি ওয়াহীর আগমনের পূর্বে মারা যায় তবে তার সমস্ত ইবাদত বিফলে যাবে। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, পূর্বের ক্বিবলা বরাবর মুসলিমদের ইবাদত আল্লাহ নষ্ট করে দিবেন না।

> "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে ক্বিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেই দিকেই মুখ করো। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে।"

সূরা আল বাক্বারাহর পরবর্তী আয়াতগুলোতে (১৪৪-১৫০) আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার ক্বিবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানেন না। তারাও একে অন্যের কেবলা মানে না। যদি আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।
>
> বাস্তব সত্য সেটাই যা আপনার পালনকর্তা বলেন। কাজেই আপনি সন্দিহান হবেন না। আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে, যে দিকে সে মুখ করে (ইবাদত করবে) । কাজেই সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত

করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

আর যে স্থান থেকে আপনি বের হন, নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরান – নিঃসন্দেহে এটাই হলো আপনার রবের পক্ষ থেকে সত্য। বস্তুতঃ তোমার রব তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন।

আর আপনি যেখান থেকেই বেরিয়ে আসুন এবং যেখানেই অবস্থান করুন, সেই দিকেই মুখ ফেরাও, যাতে করে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে। অবশ্য যারা অবিবেচক, তাদের কথা ভিন্ন, তাদের আপত্তিতে ভীত হয়ো না। আমাকেই ভয় করো। যাতে আমি তোমাদের জন্যে আমার অনুগ্রহ সমূহ পূর্ণ করে দেই এবং তাতে যেন তোমরা সরলপথ প্রাপ্ত হও।”

“...তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর...” – বর্তমান সময়ে ইসলাম যখন কাফির ও মুনাফিক্বদের কাছ থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ ও সমালোচনার শিকার, সেই সময়ে এই আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেয়। প্রতিটি যুগেই ইসলামবিদ্বেষী কিছু লোক থাকে। তারা ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিধানের দোষ খুঁজে বেড়ায়। যেমন এই যুগে তারা বলে, ইসলাম নারীদের শোষণ করে, অথচ তারাই একসময় মনে করতো ইসলাম নারীদেরকে বেশি-বেশি অধিকার দিয়েছে। ইসলাম সন্ত্রাসবাদের ধর্ম, অশান্তির ধর্ম – ইত্যাদি নানানরকমের প্রপাগান্ডা চালায়। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ঈমানদারদের বলেছেন যে, ঈমানদাররা যেন ওইসব লোকদের ভয় না পেয়ে শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে। কাজেই একজন মুসলিম এসব ইসলামবিদ্বেষীদের কথায় পাত্তা না দিয়ে শুধু তা-ই করবে যা আল্লাহ আযযা ওয়াজাল করতে বলেছেন। আল্লাহর দেওয়া প্রতিটি বিধান, প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মুসলিমদের জন্য একেকটি অনুগ্রহ।

মদীনার অর্থনৈতিক উন্নয়ন

নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশ কিছু উদ্যোগ নেন। তিনি মসজিদ-উল-হারামের পাশের একটি জায়গাকে মদীনার বাজার হিসেবে নির্ধারণ করলেন। এটি ছিল মদীনার কেন্দ্রীয় বাজার। এ বাজারকে তিনি করমুক্ত বাজার হিসেবে ঘোষণা করেন। একবার হঠাৎ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেল সাহাবারা ﷺ নবীজির ﷺ কাছে আসেন। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আনাস ইবন মালিক ﷺ।

লোকজন এসে রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললো, ‘হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়ে গেছে, তাই আপনি আমাদের জন্য জিনিসপত্রের দাম স্থির করে দিন।’ এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দাম নির্ধারণের মালিক,

তিনিই দাম কমান, তিনিই দাম বাড়ান। আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই যে আমার উপর কারো জুলুমের কোনো অভিযোগ থাকবে না।'[82]

দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি হলো: রিযিকের মালিক হলেন আল্লাহ আযযা ওয়াজাল। দ্রব্যের দাম উৎপাদন ও চাহিদার সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে এবং এই পরিবর্তন আল্লাহ তাআলার হাতে। তিনিই সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করে দেন, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে হাত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় ইসলামি অর্থনীতি ব্যবসার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস করে, বেচাকেনায় দামের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে না। তবে কৃত্রিমভাবে সংকট সৃষ্টি করে বা মজুতদারির মাধ্যমে দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে ইসলামের কঠোর বিধিনিষেধ আছে এবং সে সংক্রান্ত বাজার পর্যবেক্ষণ নীতিমালাও রয়েছে।

আ'ইশার ﵂ সাথে বিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ আ'ইশার ﵂ সাথে সংসার শুরু করেন হিজরতের পর, সেটা হিজরতের প্রথম বা দ্বিতীয় বছরের ঘটনা, যদিও তাদের বিয়ে হয়েছিল মাক্কী জীবনের শেষের দিকে যখন আ'ইশার ﵂ বয়স ছিল ছয় বছর। মদীনায় আসার পরে তাঁকে রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে তুলে আনা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আ'ইশাকে ﵂ বিয়ে করেন তখন তাঁর ﷺ বয়স ছিল ৫৪ বছর, কিন্তু তখনও তিনি আসলে যেন যুবক! আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আ'ইশার ﵂ সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। বয়স রাসূলুল্লাহকে ﷺ বেঁধে রাখতে পারেনি, তিনি তাঁর স্ত্রী আ'ইশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন! যেমন, একদিন তাঁরা দু'জন সফরে বের হয়েছিলেন, আ'ইশা সেদিনের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে,

'আমি তাঁর সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিলাম এবং জিতে গেলাম! কিন্তু পরে যখন আমি কিছুটা মোটা হয়ে গেলাম, তখন আবার তাঁর সাথে দৌড়ে অংশ নিলাম কিন্তু এবার তিনি আমাকে দৌড়ে হারিয়ে দেন। আর তখন তিনি বললেন, এটা হলো পূর্বের হারের বদলা!'[83] অর্থাৎ আগেরবার আ'ইশা ﵂ জিতেছিলেন, আর পরেরবার জিতলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশ স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ ছিলেন আর আল্লাহ তাআলার রাসূল হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর এরকম শারীরিক দক্ষতার দরকার ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাবিআ গোত্রের প্রতিনিধিদলের সাথে দেখা করেন তখন তাঁর

---

[82] আবু দাউদ, অধ্যায় ইজারাহ, হাদীস ৩৬।

[83] আবু দাউদ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১০২।

বয়স ছিল ৫০ বছর। কিন্তু রাবিআ গোত্রের নেতা তার গোত্রের লোকদের কাছে রাসূলুল্লাহকে ﷺ 'যুবক' হিসেবে উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন খুবই প্রাণবন্ত এবং উদ্যমী একজন মানুষ। তাই তাঁকে দেখে তরুণ মনে হতো। এছাড়াও আনাস ইবন মালিকের বর্ণিত হিজরতের কাহিনিতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন ছিলেন তা বোঝা যায়। তিনি উল্লেখ করেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ؓ মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন লোকজন আবু বকরকে ؓ চিনতে পারলেও রাসূলুল্লাহকে ﷺ চিনতে পারেনি কারণ রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখতে যুবকদের মতো লাগতো আর সেটা তারা ধারণা করেনি।' আনাস তাঁর সেই বর্ণনায় আবু বকরকে ؓ 'বয়স্ক ব্যক্তি' আর রাসূলুল্লাহকে ﷺ উল্লেখ করেছেন 'যুবক' হিসেবে। এ সম্পর্কে ইবন হাজার আল-আসকালানি মন্তব্য করেছেন যে, আবু বকরের বয়স যেমন তেমনই লাগতো, বড় বা ছোট মনে হতো না। অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরের চেয়ে দুই বছরের বড় ছিলেন কিন্তু তারপরও তাঁকে দেখতে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক মনে হতো।

চতুর্থ প্রজেক্ট: মুজাহিদ বাহিনী গঠন

জিহাদের সূচনা

মাদানী যুগ মানেই জিহাদের যুগ। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগে জিহাদ কী তা বোঝা জরুরি। মাদানী যুগ ছিল ১০ বছর স্থায়ী আর এই অল্প সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ১৯টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৫৫টির বেশি সামরিক অভিযান পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ এই ১০ বছরের মধ্যে ৭০টিরও বেশি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, বছরে গড়ে ৭টি করে যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই ব্যাপক প্রস্তুতি, অর্থায়ন, অস্ত্রায়ণ এবং সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করা – এই প্রতিটি কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়সাপেক্ষ। এছাড়াও তখনকার প্রযুক্তিতে আকাশপথের ব্যবহার ছিল না তাই একেকটি অভিযান বা যুদ্ধস্থলে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় করে পৌঁছাতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে অনেক সময় লেগে যেতো। এর থেকে বোঝা যায় মদীনার যুগ ছিল কেবলই যুদ্ধের যুগ এবং এই যুদ্ধগুলোর পেছনে অনেক শ্রম, সময় ও অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন এসব যুদ্ধের পেছনে এত সময় ও শক্তি ব্যয় করলেন।

জিহাদ নিয়ে আলোচনা করা আরেকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো বর্তমানে জিহাদের ব্যাপারে নানা ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জিহাদ কী, এর উদ্দেশ্য কী এবং এর পেছনের কারণ কী ইত্যাদি এসব ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন দেখলে এই প্রতিটি প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন জবাব পাওয়া সম্ভব।

জিহাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'প্রচেষ্টা', এর মানে হলো 'সংগ্রাম বা চেষ্টা করা'। কিন্তু ইসলামে এ শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। আরবিতে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর আভিধানিক অর্থ একরকম কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় শব্দগুলোর ভিন্ন অর্থ

রয়েছে। যেমন: আরবি শব্দ 'সালাত' এর আভিধানিক অর্থ হলো 'দুআ'। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় সালাত বলতে দুআ বোঝায় না, বরং বিশেষ একটি ইবাদাত বোঝায় যা মুসলিমরা দৈনিক পাঁচবার আদায় করে থাকে। তেমনিভাবে যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা হলেও ইসলামি পরিভাষায় যাকাত হলো একটি বিশেষ ইবাদাত, বছরান্তে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে দান করা। এভাবেই ইসলাম পুরনো শব্দকে নতুন অর্থে সংজ্ঞায়িত করে। তেমনি জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'প্রচেষ্টা' হলেও যেকোনো প্রকার প্রচেষ্টাকে, এমনকি হোক তা ইসলামের পথে, তাকে জিহাদ বলে গণ্য করা হয় না। বরং সালাত বা যাকাতের মতো জিহাদ শব্দ দ্বারাও একটি বিশেষ ইবাদাতের কথা বোঝানো হয়। তাই ইসলামি পরিভাষায় শব্দটির অর্থ হলো যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণ করে অর্থাৎ যারা আল্লাহর শত্রু তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধ করা। চারটি সুপ্রতিষ্ঠিত মাযহাবের সংজ্ঞা অনুযায়ী জিহাদ মানে হলো আল্লাহর পথে আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করা।

আল্লাহ আযযা ওয়াজালের পথে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধ হলো অন্যায় ও অসত্যের পক্ষে যুদ্ধ। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে সকল প্রকার রক্তপাত নিষিদ্ধ, শুধু ব্যতিক্রম হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। এর পক্ষে দলীল হলো,

> **"যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।" (সূরা নিসা, ৪: ৭৬)**

এই আয়াতে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সকল যুদ্ধকে দুইভাগে ভাগ করেছেন, একটি যুদ্ধ হলো আল্লাহর পথে ঈমানদারদের যুদ্ধ এবং অপরটি তাগুতের পক্ষে কাফিরদের যুদ্ধ। সংক্ষেপে তাগূত হলো সেই সত্তা বা উপাস্য যাকে আল্লাহর পাশাপাশি ইবাদাত করা হয় অথবা সেই সীমালঙ্ঘনকারী যে নিজেকে এমন আনুগত্য বা কর্তৃত্বের আসনে দাবি করেছে যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

আল্লাহর রাস্তায় ঈমানদারদের যুদ্ধ একটি প্রশংসনীয় ইবাদাত। ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোনো যুদ্ধের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর দ্বীনকে সুসংহত করা। এই কারণে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধের বৈধতা ইসলামে নেই। ইসলামে জিহাদের একটাই উদ্দেশ্য, তা হলো শুধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' – এর জন্য যুদ্ধ, একমাত্র এই যুদ্ধই হলো ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ।

আল্লাহ তাআলা হলেন খালিক্ব, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, তাই বৈধতা ও অবৈধতাকে সংজ্ঞায়িত করার অধিকার একমাত্র তাঁর। যে কোনো আইনকে বৈধতা এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। উদাহরণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সপ্তাহের ৭টা দিনই সমান, কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়াজালের কাছে শুক্রবার

সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। ভৌগলিক বা সৌর ক্যালেন্ডারের হিসেবে রামাদান মাসের সাথে অন্যান্য মাসের কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা অন্যান্য মাসের চেয়ে এই রামাদান মাসকে অধিক পছন্দনীয় মাস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। ঠিক একইভাবে তিনি জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনকে পছন্দ করেছেন, এ দশদিনের আমলগুলোর জন্য বিশেষ পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন। আবার রামাদানের শেষ দশ রাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই শেষ দশ রাতের বিজোড় রাতগুলোর মধ্য থেকে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল লাইলাতুল কদর নির্ধারণ করেছেন যেটি বছরের শ্রেষ্ঠতম রাত। যেকোনো কিছুর পবিত্রতা ও যেকোনো কাজের বৈধতা প্রদানের মালিক কেবল আল্লাহ আযযা ওয়াজাল।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে অন্য সব কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার দাসে পরিণত করা। সুতরাং সৃষ্টির দাস না হয়ে বরং মানুষ সৃষ্টিকর্তার দাস হবে – এটাই মানুষের জন্য সাজে, কেননা, মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা এবং সৃষ্টির সেরা হয়ে সে আরেক সৃষ্টির ইবাদাত করতে পারে না। জিহাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো মুসলিম-অমুসলিম সকলকে ইসলামের কল্যাণময় শাসনের ছায়াতলে নিয়ে আসা। ইসলামে কাউকে মুসলিম হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় না, তবে ইসলামি ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হয় যাতে করে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে পারে এবং ইসলাম গ্রহণে উৎসাহী হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আল্লাহ সেইসব লোকদের দেখে অভিভূত হন যাদেরকে শেকলবদ্ধ করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। একজন আলিম এই কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, এরা হলো সেসব লোক যাদেরকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এর ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

গড়পড়তা মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে খুব একটা চিন্তিত নয়, হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কাবাসীদের ডেকে বলেছিলেন, 'আমি এসেছি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে' – তখন আবু লাহাব রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলেছিল, 'ধ্বংস হোক তোমার হাত। এসব অনর্থক আলাপ করার জন্যই কি তুমি আমাদের ডেকেছ?'

আবু লাহাবের বিরক্তির কারণ হলো সে দুনিয়া কামানো বন্ধ করে এসেছিল এই ভেবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সত্যি, কিন্তু আবু লাহাবের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি, কারণ সেখানে দুনিয়ার লাভের কোনো কথা নেই। তাই যখন আবু লাহাব দেখতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে তাওহীদের পথে ডাকছেন তখন সে খুব রেগে গেল। ওই সময়ই আল্লাহ তাআলা সূরা আল-মাসাদ (১১১: ১-৫) নাযিল করেন।

জিহাদ হলো এমন একটি পন্থা যা মানুষকে ইসলামকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা

করতে বাধ্য করে। মাক্কী জীবনের ১৩ বছরের দাওয়াতী কার্যক্রমে খুব অল্প লোকই মুসলিম হয়েছিল, কিন্তু যখন সাহাবারা رضي الله عنهم মদীনায় এসে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ শুরু করলেন এবং লোকেরা ইসলামের ছায়ায় আসলো তখন তারা তাদের কথা গুরুত্বের সাথে নিতে বাধ্য হলো, কারণ তখন তাদের হাতে কর্তৃত্ব ছিল। তাঁরা শাসনক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন বিধায় এই দাওয়াহ অনেক কার্যকরী হয়েছিল। মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

যেখানে মক্কায় ১৩ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মাত্র ১০০ জনের মতো সাহাবা رضي الله عنهم ছিলেন, সেখানে মদীনাতে প্রতি বছর হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতো। মক্কা বিজয়ের সময় অংশ নিয়েছিল দশ হাজার মুসলিম, বিদায় হাজ্জে অংশ নিয়েছে নব্বই হাজার, আর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন তখন জানাযা পড়েছিল ১ লক্ষ চৌদ্দ হাজার মুসলিম। এই পরিসংখ্যানটি দেখিয়ে দেয় জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকরী হলে কত দ্রুত ইসলাম মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

জিহাদের হুকুম নাযিল হয়েছে কয়েকটি ধাপে, ইবনুল কায়্যিম তাঁর যা'দ-উল-মাআদ গ্রন্থে বলেছেন প্রাথমিক যুগে জিহাদ নিষিদ্ধ ছিল, জিহাদ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মুসলিমদের ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন। এরপর তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় তবে তা বাধ্যতামূলক ছিল না; নিছক অনুমতি দেওয়া হয়।

> "যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।" (সূরা হাজ্জ, ২২: ৩৯)

পরবর্তী পর্যায়ে ধাপে তাদেরকে আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়।

> "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা বাক্বারা, ২: ১৯০)

অবশেষে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিলেন। এরপর সর্বশেষ ধাপের নির্দেশ এল এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা উম্মাহর জন্য চূড়ান্ত বিধান প্রকাশ করলেন। এই ধাপে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহকে ﷺ সমস্ত কাফিরদেরদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

> "...আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে..." (সূরা তাওবাহ, ৯: ৩৬)

এ সম্পর্কিত একটি হাদীস রয়েছে যা ২০ জনেরও অধিক সাহাবী ﷺ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো,

ইবন উমার থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ S আল্লাহর রাসূল, আর তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।'[84]

জিহাদের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা কুরআনের কিছু আয়াতে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন:

ইসলামের প্রচার

আল্লাহ তাআলার দ্বীন বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়া।

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়..." (সূরা আনফাল, ৮: ৩৯)

ইবাদাতের স্থানসমূহ সুরক্ষিত রাখা

"আল্লাহ মু'মিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে – যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিস্টানদের নির্জন গির্জা, ইবাদত খানা, (ইহুদিদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী

---

[84] সহীহ বুখারি, অধ্যায় ঈমান, হাদীস ১৮।

শক্তিধর।" (সূরা হাজ্জ, ২২: ৩৮-৪০)

জিহাদ হলো মানুষের রক্ষাকবচ। যদি জিহাদের হুকুম না থাকতো, তাহলে মু'মিনরা ধ্বংস হয়ে যেতো, একে বলা হয় সুন্নাত-উল-মুদাফা'আহ। যদি না আল্লাহ তাআলা জিহাদের হুকুম জারি করতেন, তাহলে খ্রিস্টানদের গীর্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদগুলো ধ্বংস হয়ে যেতো। যে কারণে মসজিদের সাথে খ্রিস্টানদের গীর্জা ও ইহুদিদের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ হলো, মুসলিমরা সর্বপ্রথম জিহাদ শুরু করেনি, বরং সর্বপ্রথম যাদের উপর জিহাদের হুকুম নাযিল হয়েছে তারা হলো বনী ইসরাইল, তারাই সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে জিহাদে অংশ নিয়েছে। এ কারণে তাদের ইবাদাতখানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বনী ইসরাইলের আগের জাতিদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়নি। সে সময়ে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন মু'জিযার মাধ্যমে নবীদের শত্রুদের ধ্বংস করে দিতেন, তাই তখন মু'মিনদের যুদ্ধে জড়ানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। সর্বপ্রথম জিহাদ করেছে মূসার ﷺ উম্মাত।

"তারা এমন লোক – যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।" (সূরা হাজ্জ, ২২: ৪১)

দুনিয়ার বুক থেকে অন্যায়-অত্যাচার উচ্ছেদ করা

জিহাদের উদ্দেশ্য অশান্তি সৃষ্টি করা নয় বরং অশান্তি এবং যাবতীয় অন্যায় ও জুলম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই জিহাদের উদ্দেশ্য। শয়তানের উদ্দেশ্য ভালো কাজকে মন্দ হিসেবে উপস্থাপন করা এবং মন্দ কাজকে ভালো হিসেবে। জিহাদ একটি ইবাদাত এবং এই ইবাদাতকে অশান্তি বা ফিতনা ভাবার কোনো কারণ নেই, কেননা আল্লাহ তাআলাই বলছেন জিহাদের মাধ্যমে বস্তুত শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়।

"... আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।" (সূরা বাকারাহ, ২: ২৫১)

জিহাদ হলো মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা

"... আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান..." (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৪)

সুতরাং সশস্ত্র যুদ্ধ হলো মু'মিন ও কাফির – উভয়ের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। জিহাদের

মাধ্যমে আল্লাহ মু'মিনদের ধৈর্য পরীক্ষা করেন। তিনি যাচাই করেন মু'মিনরা তাঁর রাহে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। একজন মু'মিন আল্লাহ তাআলার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার হিসেবে নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে পারে, আর জিহাদের মাধ্যমেই প্রমাণ হয় বান্দা কাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, আল্লাহকে নাকি তাঁর সৃষ্টিকে।

জিহাদ হলো এমন একটি আমল যার মাধ্যমে অন্তরের রোগ ধরা পড়ে। যেমন মুনাফিক্বরা মুসলিমদের সাথে বেশ ভালোভাবেই মিশে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের আসল চেহারা প্রকাশ পেত জিহাদের সময়, এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন:

> "তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দুই-একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে..." (সূরা তাওবা, ৯: ১২৬)

রাসূলুল্লাহর ﷺ সময় প্রতিবছর প্রায় একটি অথবা দুইটি যুদ্ধ সংঘটিত হতো আর তখন মুনাফিক্বদের নিফাক্ব প্রকাশ পেত।

> "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে – যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুক্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও – যাদেরকে তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তোমাদের কোনো হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬০)

> "যুদ্ধ কর ওদের সাথে – আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন – আর দূর করবেন তাদের মনের ক্ষোভ। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, ৯: ১৪-১৫)

> "সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর আপনি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করেননি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলেন, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ – যেন ঈমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। আর এমনিভাবেই আল্লাহ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা-কৌশল।" (সূরা আনফাল, ৮: ১৭-১৮)

সত্য থেকে বাতিলকে পৃথক করে দেওয়া, মুনাফিক্বদের দ্বিমুখিতা প্রকাশ করে দেওয়া

"আল্লাহ এমন নন যে, তিনি মু'মিনদেরকে (এমন অবস্থায়) ছেড়ে দেবেন যার উপর তোমরা আছো – যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন নাপাককে পাক থেকে। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে জানাবেন, তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাটা প্রতিদান।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৭৯)

এভাবেই জিহাদ ভালো থেকে খারাপকে আলাদা করে ফেলে। এ আয়াতসমূহ উহুদ যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয় কারণ আবদুল্লাহ ইবন উবাই মাঝপথে এ অভিযান থেকে মূল বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে আলাদা হয়ে যায়।

জিহাদ হলো আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার একটি কৌশল

"আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মু'মিনদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।" (সূরা নিসা, ৪: ৮৪)

মক্কায় যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের উপর কাফেররা নানাভাবে অত্যাচার করতো তবুও তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। নিজেদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখাটা আরবদের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না, কারণ তাদের গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। গোত্রের কেউ আক্রান্ত হলে কেউ ছেড়ে দিত না। তাই নিজেদেরকে যুদ্ধ থেকে সংযত রাখা মক্কার মুসলিমদের জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। এটা ছিল তাদের ধৈর্যের পরীক্ষা। জিহাদের হুকুম আসার পর আবু বকর ﷺ বললেন, 'আমি জানতাম জিহাদের হুকুম আসবে। একদিন না একদিন আমাদেরকে লড়তে হবেই। আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি তাতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছাড়া উত্তরণের আর কোনো পথ নেই।'

মদীনার প্রাথমিক দিনগুলোতে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলে যে হিজরতের আগেই এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু জিহাদের আসল প্রশিক্ষণ মদীনাতে শুরু হয়। আল্লাহ তাআলার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই প্রস্তুতি, আর তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ শুরু থেকেই মুসলিমদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এই প্রশিক্ষণ ছিল শারীরিক ও আধ্যাত্মিক - উভয় প্রকারের প্রশিক্ষণ। এটিই ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ নেওয়া চতুর্থ প্রকল্প।

মুজাহিদ বাহিনী গঠন

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তাকে ঠিক প্রচলিত অর্থে সেনাবাহিনী বলা যায় না। কারণ তাঁরা পেশাদার সৈনিক ছিলেন না। বরং তাদেরকে বলা চলে মিলিশিয়া বা বেসামরিক যোদ্ধা-- তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল কিন্তু তাঁরা নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হতো। শর্তগুলো হলো:

১) ইসলাম
২) বয়ঃপ্রাপ্ত হতে হবে
৩) মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে
৪) এমন কোনো শারীরিক ত্রুটি না থাকা যা থাকলে যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না।
৫) আর্থিক সামর্থ্য থাকা, এই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ প্রত্যেক যোদ্ধার খরচ বহন করার মতো সামর্থ্য রাসূলুল্লাহর ﷺ ছিল না। প্রত্যেককে নিজের খরচ নিজেকেই বহন করতে হতো।

একই সাথে রাসূলুল্লাহ তাঁর বাহিনীকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করছিলেন। কুরআনে জিহাদ বিষয়ক অসংখ্য আয়াত আছে যা একজন মুসলিমকে জিহাদের ময়দানের জন্য আত্মিকভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করে।

> "নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং যে সওদা তোমরা (আল্লাহর সাথে) করেছো, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আত-তওবা, ৯: ১১১)

জিহাদের শিক্ষার সাথেই এসেছে ধৈর্যের শিক্ষা:

> "তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধবংস করে দিতে চান।
>
> তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল। আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো

তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৪০-১৪৩)

এই আয়াতগুলো হলো মুসলিমদের জন্য জিহাদের ব্যাপারে প্রস্তুতিমূলক ও উদ্বুদ্ধকারী আয়াত। এছাড়াও জিহাদের মর্যাদার ব্যাপারে এসেছে রাসূলুল্লাহর ﷺ অসংখ্য হাদীস।

আবু হুরাইরা d থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বললো, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, এরকম কিছু নেই। এরপর তিনি বললেন, তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে থাকবে এবং এতটুকু আলস্য করবে না? আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙবে না। লোকটি বললো, তা কার সাধ্য? আবু হুরাইরা মন্তব্য করেন, 'মুজাহিদ তখনও নেকী পায় যখন তার ঘোড়া রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঘোরাঘুরি করে।'[85]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, একজন মুজাহিদের সওয়াব ক্রমাগত সালাত ও সিয়াম রাখার চেয়ে বেশি। কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা নাফসের জিহাদ থেকে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, সালাত ও সাওম নফসের জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিমরা যখন তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়ায ইবন জাবালকে ডেকে বললেন,

"তুমি যদি জানতে চাও তবে আমি তোমাকে দ্বীনের মূলভিত্তি, স্তম্ভ আর চূড়া সম্পর্কে বলবো। ইসলাম হলো দ্বীনের ভিত্তি, এর স্তম্ভ হলো সালাত আর এর চূড়া হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।"[86]

উমার ইবন উবাইদুল্লাহর আযাদকৃত দাস আবুন নাযার ﷺ থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি উমার ইবন উবাইদুল্লাহর লেখক ছিলাম। তিনি বলেন, আমার নিকট আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা একটি চিঠি লেখেন। তখন আমি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হয়েছিলাম। আমি চিঠিটি পড়লাম, তাতে লেখা ছিল,

কোনো এক সম্মুখসমরে আল্লাহর রাসূল সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, শোনো, তোমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্খা কোরো না এবং আল্লাহ তাআলার কাছে নিরাপত্তার দুআ চাইবে। কিন্তু যদি তোমরা কখনো শত্রুর

---

[85] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৪।

[86] ইমাম নববীর ৪০ হাদীস, হাদীস ২৯।

সম্মুখীন হও তখন ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রেখো, তরবারীর ছায়াতলে জান্নাত।'[87]

যাইদ ইবন খালিদ আল-জুহানি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

'যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করে দিল, সেও জিহাদে অংশগ্রহণ করলো। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধান করলো, সেও জিহাদে অংশ নিল।'[88]

একই সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সাহাবিরা শারীরিকভাবে শক্তসমর্থ ছিলেন, তাঁরা যে ধরনের কাজ করতেন তাতে তাদের যথেষ্ট শারীরিক দক্ষতা ছিল। তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল। যেমন, মক্কা ও মদীনার আশেপাশে কোনো সমুদ্র ছিল না, তাই তাঁরা সাঁতার জানতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাঁতার শেখার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে তীর চালনা, লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি নানারকম সামরিক দক্ষতায় দক্ষ করে তুলছিলেন।

সামরিক প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে – যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও – যাদেরকে তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তোমাদের কোনো হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬০)

উক্বাহ ইবন আমির d থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ s মিম্বারে বসে সূরা আনফালের এই আয়াতটি পাঠ করে বললেন,

আলা ইন্নাল কুওয়্যাতার রামী, ইন্নাল কুওয়্যাতার রামী, ইন্নাল কুওয়্যাতার রামী!
"শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী!"[89]

এখানে রামী বলতে মূলত বোঝানো হচ্ছে নিক্ষেপ করা, তা হতে পারে তীর বা অন্য

---

[87] সহীহ বুখারি, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ১৭৫।

[88] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ইমারাহ, হাদীস ১৯৮।

[89] তিরমিযী, অধ্যায় রাসূলুল্লাহর তাফসীর, হাদীস ৩৩৬৩ (আরবি রেফারেন্স)।

যেকোনো কিছু যা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

(উক্বাহ ইবন আমীর এ বিষয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে সুনান আবু দাউদে। তিনি বলেন,

'আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি: মহান আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিনজন মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এক, তীর প্রস্তুতকারীকে, যে জিহাদের সৎ উদ্দেশ্যে তা তৈরি করেছে। দুই, তীর নিক্ষেপকারীকে এবং তিন, তীরের তূণবাহীকে, যে প্রতিবার তীর নিক্ষেপকারীকে তীর নিক্ষেপের জন্য সহযোগিতা করেছে। কাজেই তোমরা তীর নিক্ষেপ করো এবং ঘোড়ায় চড়ো। তবে ঘোড়ায় আরোহণ করার চাইতে তীর নিক্ষেপই আমার কাছে বেশি প্রিয়। তিন প্রকারের বিনোদন ছাড়া আর কোনো প্রকারের বিনোদন অনুমোদিত নয়, সেগুলো হলো, এক, পুরুষের জন্য তার ঘোড়াকে কৌশলের প্রশিক্ষণ দান, দুই, নিজ স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ করা এবং তিন, তীর ধনুক চালনার প্রশিক্ষণ নেওয়া। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর, বিরাগভাজন হয়ে তার ব্যবহার ছেড়ে দেয়, সে যেন একটি উত্তম নি'আমত ত্যাগ করলো। সে নি'আমত ত্যাগ করলো এবং অকৃতজ্ঞ হলো।'[৯০]

এরকম আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে তিনটির বদলে চারটির কথা বলা হয়েছে এবং চতুর্থটি হলো নিজে সাঁতার শেখা এবং অন্যদেরকে তা শেখানো। সুতরাং এ চারটি জিনিস ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক উপকরণ সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।)

সামরিক প্রশিক্ষণের উপর এই ব্যাপক গুরুত্ব দেখিয়ে দেয় মুসলিমরা একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এ ধরনের ক্ষেত্রে পুরো সমাজের ব্যাপক সামরিকায়ন করা হয় এবং সমাজের মনোযোগ ও প্রচেষ্টার একটা বড় অংশকে সমরশক্তির পেছনে ব্যয় করা হয় যেন তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা করতে পারে। রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে এভাবেই মুসলিম সমাজ নিজেকে প্রস্তুত করছিল। নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদেরকে তাদের জান-মাল-কথা দিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তৎকালীন অবস্থা মুসলিমদের অনুকূলে ছিল না। কুরাইশরা তাদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পরপরই কুরাইশরা আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের কাছে চিঠি লিখে বলে,

'তুমি আশ্রয় দিয়েছ আমাদের সবচেয়ে ভয়ানক শত্রুকে। হয় তুমি তাকে হত্যা করবে,

---

90 আবু দাউদ, অধ্যায় জিহাদ, হাদীস ৩৭।

অথবা তাকে মদীনা থেকে বের করে দেবে। যদি তা না করো, তবে আমরা শপথ করছি, তোমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেব না। আমরা তোমাদের পুরুষদের হত্যা করবো এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে দাসী বানিয়ে ছাড়বো।'

এমন আরো একটি ঘটনা ঘটে যখন সাদ ইবন মুয়ায ﷺ কাবা তাওয়াফ করার জন্য মক্কায় যান। তখন তিনি উমাইয়্যা ইবন খালাফের সাথে দেখা করেন। উমাইয়্যা ইবন খালাফের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব জাহেলিয়াতের সময় থেকেই। তিনি উমাইয়্যাকে কাবা তাওয়াফ করার জন্য সুবিধাজনক সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। যখন কাবায় লোকজন কম থাকবে তখন তিনি তাওয়াফ করতে চাচ্ছিলেন। তাঁরা কিছুটা দেরিতে তাওয়াফ করলেন। কিন্তু আবু জাহেল তাদের দেখে ফেললো। তখন সে উমাইয়্যাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার সাথে থাকা লোকটি কে?' উমাইয়্যা বললো, 'সে হলো সাদ ইবন মুয়ায।' সাদ ইবন মুয়ায বেশ পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মদীনায় যে দুইটি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল এর মধ্যে একটি ছিল আল-আওস গোত্র। সাদ ইবন মুয়ায আল-আওস গোত্রের প্রধান ছিলেন। আবু জাহেল উমাইয়্যাকে বললো, 'তুমি তাকে কাবা তাওয়াফ করতে সাহায্য করে কাজটা ঠিক করোনি, কারণ তাঁর গোত্রের লোকেরাই মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছে।'

তখন সাদ ইবন মুয়ায আবু জাহেলকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'দেখো, তুমি যদি আমাকে তাওয়াফ করতে বাধা দাও, তাহলে তোমাদের কাফেলাকেও আমি চলাচলে বাধা দেবো।' কুরাইশদের কাফেলাগুলোকে মদীনা হয়ে যেতে হতো, তাই সাদ তাকে কাফেলা আটকানোর হুমকি দেন। এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, কুরাইশরা অনবরত বিভিন্ন উপায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের ﷺ কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতো। নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে এ জাতীয় হুমকি ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সামরিকীকরণের খুব প্রয়োজন ছিল।

সামরিক অভিযানের শুরু: গাযওয়া ও সারিয়া

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জিহাদের অনুমতি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠানো শুরু করলেন 'সারিয়া' । সীরাহর বইগুলোতে দু'ধরনের যুদ্ধের কথা এসেছে, একটি হলো সারিয়া ও অপরটি হলো গাযওয়া । বদর বা উহুদের যুদ্ধকে বলা হয় গাযওয়ায়ে বদর বা গাযওয়ায়ে উহুদ; অন্যদিকে আবু উবাইদাহর নেতৃত্বে সামরিক অভিযানকে বলা হয়েছে সারিয়ায়ে আবু উবাইদাহ। পার্থক্য হলো, যেসব অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ অংশগ্রহণ করেননি সেগুলোকে সারিয়া বলা হয় আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে যেসব অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয় গাযওয়া। গাযওয়া বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয় সেসব যুদ্ধ যেগুলোতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে সেনাদল পাঠানো হয় আর সারিয়া বলতে বোঝানো হয় সেনা অভিযান (Military Raid)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম যে গাযওয়ায় অংশ নিয়েছেন সেটি হলো গাযওয়াত উল আবওয়া। এই গাযওয়াতে কোনো যুদ্ধ হয়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাইদাহ্ ইবন হারিসের নেতৃত্বে সারিয়া পাঠান। এ দলে ৬০ জন মুহাজির ছিলেন। তাঁরা সবাই পায়ে হেঁটে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা রাতে হাঁটতেন আর দিনে লুকিয়ে থাকতেন। এ অভিযানে তীর ছোঁড়াছুড়ি হয়েছিল কিন্তু কেউ মারা যায়নি। ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিমদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যিনি তীর ছুঁড়েছিলেন তিনি হলেন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ﷺ। তিনি বলেছেন, 'আমিই সেই জন যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপ করি।'

এরপর হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিবের ﷺ নেতৃত্বে আরেকটি সারিয়া পাঠানো হয়। এ অভিযানে ৩০ জন মুহাজিরকে পাঠানো হয়। এবার তাঁরা উটে চড়ে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কুরাইশদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার জন্য গিয়েছিলেন। এ কাফেলাতে কুরাইশদের প্রচুর সম্পদ ছিল এবং এর সাথে অনেক রক্ষক ছিল। শেষপর্যন্ত এ অভিযানেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, কেননা সে এলাকায় এক গোত্রনেতার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরাইশদের চুক্তি ছিল। কোনো ধরনের মারামারি যাতে না হয় সে ব্যাপারে তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। এ ঘটনার পর আবু জাহেল তার লোকদের কাছে গিয়ে সতর্ক করে বললো যে, মুহাম্মাদ ﷺ 'ক্রুদ্ধ সিংহের' ন্যায় তাদের পেছনে লেগেছে, কেননা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আবু জাহেল তার লোকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বললো যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাদের কাফেলা ও তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে।

আরো একটি গাযওয়া সংঘটিত হয়েছিল যার নাম গাযওয়ায়ে বুয়াত। কুরাইশদের একটি কাফেলা দখল করার জন্য এই অভিযান পরিচালিত হয় কিন্তু কাফেলাটি পাওয়া যায়নি।

গাযওয়াত আল আশিরাতেও একটি কাফেলা আটক করার জন্য সেনাদল পাঠানো হয় কিন্তু সেটিও পাওয়া যায়নি। এরপরে ঘটে সারিয়ায়ে সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস এবং গাযওয়ায়ে বদর উলা। হিজরতের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

সারিয়ায়ে নাখলা

ইসলামের ইতিহাসে এই সারিয়া বেশ তাৎপর্য বহন করে। এই সারিয়ার নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ﷺ। এই সারিয়াতে অল্পসংখ্যক সাহাবীকে ﷺ তাঁর সাথে পাঠানো হয়, উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের একটি কাফেলা আক্রমণ করা। অভিযানের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবন জাহশের হাতে একটি চিঠি দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে বলেন। সেখানে গিয়ে দুইদিন পর চিঠিটি পড়ার নির্দেশ দিলেন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ নির্দেশ অনুযায়ী আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ﷺ দুইদিন পরে চিঠিটি খুললেন। চিঠিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছিলেন মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় যেতে। চিঠিতে আরো লেখা ছিল, অভিযানে প্রেরিত সাহাবীদের ﷺ মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় যেতে চান তাঁরা যেন আবদুল্লাহ ইবন জাহশকে ﷺ অনুসরণ করেন। অর্থাৎ এই সারিয়াতে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না, কেউ চাইলে অংশ না নেওয়ারও সুযোগ ছিল।[91] সম্ভবত অভিযানটি বেশ বিপদজনক হওয়ায় এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

আবদুল্লাহ ইবন জাহশকে ﷺ যে এলাকায় যেতে বলা হয়েছিল সেটি কাফেরদের ভূখণ্ডের কাছাকাছি ছিল। সেখানে একটি কুরাইশ কাফেলা পাওয়া যাবে, সেটি আক্রমণ করাই ছিল এই সারিয়ার উদ্দেশ্য। এর আগ পর্যন্ত যতগুলো সারিয়া পরিচালিত হয়েছে সেগুলো ছিল মদীনার কাছাকাছি, কিন্তু এবারের বিষয়টি ভিন্ন। মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী এই জায়গাটি মদীনা থেকে বেশ দূরে হওয়ায় এ অভিযানটি বিপদজনক ছিল। আবদুল্লাহ ইবন জাহশ পত্রে যা লিখা ছিল তা দলের অন্যান্যদের জানিয়ে দিলেন এবং বললেন যে তিনি এই অভিযানে যাবেন এবং যার ইচ্ছা হয় তিনি যেন তাঁকে অনুসরণ করেন। আবদুল্লাহ ইবন জাহশসহ দলের সবার জন্য এ অভিযানটি ঐচ্ছিক ছিল। দলের সবাই আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ﷺ এর সাথে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য এতটাই উদগ্রীব ছিলেন যে কেউই দল থেকে বের হননি। তাদের এই অদম্য বাসনাই বলে দেয় তাঁরা দুনিয়ার জন্য যুদ্ধ করতেন না, বরং তাঁরা আল্লাহর জন্যই যুদ্ধ করতেন।

তাঁরা শেষ পর্যন্ত কুরাইশ কাফেলা খুঁজে পেলেন। কাফেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তেমন একটা শক্তিশালী ছিল না, মাত্র চারজন লোক পাহারায় ছিল। তাঁরা কাফেলার খুব কাছাকাছি চলে আসলেন, তীরের সীমানার ভেতর কাফেলা চলে আসলো। কিন্তু তখন সাহাবারা ﷺ একটি ব্যাপার নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। সেদিন ছিল রজব মাসের শেষ দিন আর চারটি পবিত্র আরবি মাসের একটি হলো রজব। আরবরা এই চারটি পবিত্র মাসে নিজেদেরকে যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত রাখত। তাই তারা ভাবলেন, একদিন পরে আক্রমণ করলেই হয়, পবিত্র মাসে আর যুদ্ধ করতে হবে না। কিন্তু সমস্যা হলো তাঁরা যদি পরদিনের জন্য অপেক্ষা করেন তবে কাফেলা মক্কার পবিত্র সীমানার ভেতরে ঢুকে যাবে, পবিত্র সীমানার ভেতরেও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, হয় তাদেরকে পবিত্র মাসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করতে হবে, নতুবা মক্কার পবিত্রতা লঙ্ঘন করতে হবে। অবশেষে তাঁরা সেদিনই অর্থাৎ রজব মাসে কাফেলা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের ছোঁড়া তীরের আঘাতে চারজন পাহারাদারের আলহাদরামি নামে একজন মারা গেল, আরেকজন পালিয়ে গেল আর বাকি দুইজনকে কারাবন্দী হিসেবে আটক করা হলো। পুরো কাফেলা মুসলিমদের হাতে চলে আসে। এরপর তাঁরা মদীনায় ফিরে এলেন।

---

[91] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৯।

এ ঘটনাটি সবার চায়ের কাপে ঝড় তুললো, সবার মুখে মুখে এই অভিযান নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা। কুরাইশরা এই সুযোগের হাতছাড়া করতে ভুল করলো না। তারা এই ঘটনাকে পুঁজি করে ব্যাপক হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালালো। তারা খুব বড় করে এই কাহিনি প্রচার করতে লাগলো। তারা বলে বেড়ালো – মুহাম্মাদ আর তাঁর লোকেরা পবিত্র মাসের রীতি ভেঙেছে। তাঁরা পবিত্র মাসে রক্তপাত করেছে, আমাদের লোকদের বন্দী হিসেবে তুলে নিয়েছে। পবিত্র মাসে আমাদের সম্পদ চুরি করেছে, এই করেছে, সেই করেছে – এভাবে তারা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল তুললো। অভিযানে অংশ নেওয়া সাহাবীরা ﷺ ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, 'আমি তো তোমাদেরকে এই পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেইনি।' অন্যান্য মুসলিমরা তাদেরকে নিন্দা জানাতে লাগলেন – তোমরা এমন কাজ কীভাবে করলে? কার নির্দেশে করলে?

অভিযানে অংশ নেওয়া সাহাবীরা ﷺ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। তাঁরা মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত বোধ করতে থাকলেন। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারটি কীভাবে বিচার করবেন তা নিয়ে তাঁরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযানে বন্দী ব্যক্তি ও কাফেলার কোনোকিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে সারিয়ার সদস্যরা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন, অথচ তাদের দখলকৃত কাফেলার সম্পদ কেউ গ্রহণ করছে না, বরং সবাই তাদের প্রতি নারাজ। অন্যদিকে কুরাইশরা এ ঘটনাটির সুযোগ নিচ্ছিল। এরপর সূরা বাকারাহর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়[92],

> **"সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্দ্বকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে"। (সূরা বাক্বারাহ, ২: ২১৭)**

এই ঘটনার পর আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, 'সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা কি ইসলামের বিধানে আছে?; আল্লাহ তাআলা এই প্রশ্নের জবাবে উত্তর দিলেন, ;হ্যাঁ, আবদুল্লাহ ও তাঁর লোকেরা যে কাজ করেছেন অর্থাৎ পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা

---

92 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪১।

অনেক বড় পাপ।' কিন্তু এরপরেই আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে শিখিয়ে দিলেন কীভাবে এই সব ঘটনা সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বললেন, এই সাহাবারা ﵃ যা করেছেন তা ভীষণ গুনাহের কাজ কিন্তু এরপরই আল্লাহ তাআলা কুফফারদের দ্বারা সংঘটিত বড় বড় অপরাধগুলোর তালিকা তুলে ধরলেন।

প্রথমত, আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। কুরাইশের লোকেরা মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিত।

দ্বিতীয়ত, কুফরি করা, এটি হলো আরো একটি বড় গুনাহের কাজ যা কুরাইশের লোকেরা অনবরত করেই যাচ্ছিল।

তৃতীয়ত, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেওয়া । মুসলিমদেরকে তখন মক্কায় যেতে দেওয়া হতো না।

চতুর্থত, সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা- কুরাইশরা মুহাজিরদের মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল।

এই আয়াতটি সবাইকে পুরো বিষয়টি সঠিকভাবে দেখতে শেখালো। আল্লাহ তাআলা বললেন, আবদুল্লাহ ইবন জাহশ যা করেছিলেন, তা ভুল ছিল, কিন্তু কুরাইশরা ১৩ বছর ধরে যা করে আসছে তা আরো অনেক গুণ বড় অপরাধ। আল্লাহ চাননি, কাফিরদের প্রচারণার প্রভাবে মুসলিমরা নিজেদের ভুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ুক আর কাফিরদের অপরাধগুলো ভুলে যাক।

আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ও তাঁর সঙ্গীরা যখন দেখলেন যে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের কৃতকর্মের উপর বেশি আলোকপাত করেছেন এবং এই ব্যাপারে সব কিছু পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন তখন তাঁরা স্বস্তি পেলেন। এখন তারা আশা করছেন স্বীকৃতির! এরপর আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারাহর নিচের আয়াতটি (২: ২১৮) অবতীর্ণ করেন:

> **"আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে লড়াই জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুণাময়।"**

আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, যদিও আবদুল্লাহ ইবন জাহশ ও তাঁর সঙ্গীরা ভুল করেছেন, তবুও তাঁরা আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা করতেই পারেন। যেহেতু তাঁরা মুজাহিদ, কাজেই তাঁরা অবশ্যই জিহাদের পুরস্কারের আশা রাখবেন।

ইসলামের ইতিহাসে আবদুল্লাহ ইবন জাহশের এই সারিয়া ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ

সারিয়াতে সর্বপ্রথম যুদ্ধবন্দী গ্রহণ করা হয়, সর্বপ্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নেওয়া হয় এবং সর্বপ্রথম কোনো কাফিরকে হত্যা করা হয়। এটা ছিল তাদের জন্য মর্যাদার বিষয়।

উপরোক্ত দু'টো আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেলার সম্পদ ও দুইজন বন্দীকে গ্রহণ করলেন। কুরাইশের লোকেরা এই দুই বন্দীকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য এসেছিল। অন্যদিকে সারিয়ায় অংশ নেওয়া দুই সদস্য তাদের উট খুঁজতে বের হয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন সারিয়ার ওই দুইজন লোক ফিরে না আসা পর্যন্ত বন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে না। আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশঙ্কা করছিলেন যে কুরাইশরা হয়ত তাদেরকে হত্যা করতে পারে। একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমকে কখনো শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবে না, যেভাবে দেননি রাসূলুল্লাহ ﷺ, তিনি তাদেরকে কতোটা ভালোবাসতেন তা তাঁর এই কাজ থেকে বোঝা যায়। অতঃপর সেই দুইজন মুসলিম – সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ও উতবা ﷺ ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেন। বন্দীদের একজন আল-হাকিম ইবন কেইসান মুসলিম হয়ে যান। তিনি মদীনাতেই থেকে যান। পরবর্তীতে তিনি শহীদ হন। আরেকজন বন্দী উসমান ইবন আল-মুঘিরা মক্কায় চলে যায় এবং কাফের হিসেবে মৃত্যুবরণ করে।

সারিয়ায়ে নাখলা থেকে পাওয়া শিক্ষা

১) কাফিরদের একটি কৌশল হলো, তারা মুসলিমদের একটি ভুল খুঁজে বের করবে এবং ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করে ব্যাপক হৈ-চৈ করবে। তারা সত্যকে অসম্পূর্ণ কিংবা বিকৃতভাবে তুলে ধরবে। মুসলিমদেরকে খুব বাজেভাবে উপস্থাপন করবে। মুসলিমদের কাফেরদের এই ধরনের অভ্যাসের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে, তাকে পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে হবে এবং সঠিকভাবে পরিস্থিতি বিচার করতে হবে। ঠিক যেভাবে আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারাহর উপরোক্ত আয়াতের (২: ২১৭-২১৮) মাধ্যমে সবার কাছে সারিয়ার পুরো ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

সুতরাং আজকের দিনে যদি মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসেবে অথবা ইসলামকে সহিংসতার ধর্ম বলে অভিযুক্ত করা হয় তবে সবাইকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, ইরাকে এক মিলিয়নের বেশি মানুষকে খুন করা হয়েছে, ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে অত্যাচারিত হচ্ছে। কাশ্মীর, চেচনিয়া, চীনের মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে অন্যায়-অত্যাচারের স্বীকার হয়েছে। মুসলিমদের অত্যাচারিত হওয়ার এই তালিকা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। যদি মুসলিমরা কোনো ভুল করে ফেলে, তাহলে ইতিহাস থেকে এই ব্যাপারগুলো তুলে আনতে হবে আর এতে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে মুসলিমরা যদি ভুল কিছু করেও থাকে, তবুও তা মুসলিমদের উপর কাফেরদের কৃত অন্যায়-অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করতে পারবে না।

পুরো পরিস্থিতিকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে... মুসলিমদের মিডিয়ার ধোঁকার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে, মিডিয়া সত্যের পক্ষে নেই। আল্লাহ তাআলার শত্রুরা

মুসলিমদের পক্ষে নেই।

একজন মুসলিমকে এসব ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। যেকোনো কিছু শোনামাত্র বিশ্বাস করা উচিত নয়। কুরাইশরা সেদিন মুসলিমদের সাথে যা করেছিল, আজকে ইসলামের শত্রুরা ঠিক তা-ই করছে। তারা সেসব দাঈদের হত্যা করছে যারা সত্যিকারের ইসলাম প্রচার করছেন, অথবা তাদেরকে কারাবন্দী করছে কিংবা হত্যার হুমকি দিচ্ছে। সত্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করলেই মুসলিমদের নিগ্রহের শিকার হতে হচ্ছে, মুসলিমদের রক্ত হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। এ অবস্থায় মুসলিমদের দিকে কাফিরদের আঙুল তোলার কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না, বরং মুসলিমদেরই উচিত কাফেরদের কৃত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অপরাধের তালিকা তাদের দিকে ছুঁড়ে মারা।

২) মুসলিমদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা থাকা খুব জরুরি। নবীজি ﷺ দুইজন মুসলিমকে ফিরে পাওয়ার আগ পর্যন্ত বন্দী কাফিরদের ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ থেকে বোঝা যায়, মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা কতটা জরুরি।

অন্যান্য সারিয়া থেকে পাওয়া শিক্ষা

১) ছোট ছোট এইসব সামরিক অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল চারিদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমদের উপস্থিতি জানান দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন জায়গায় সারিয়া পাঠিয়ে সবাইকে একটি বার্তা পাঠিয়ে দিলেন যে, মুসলিমদের একটি সামরিক শক্তি আছে এবং তারা তা ব্যবহার করতে সক্ষম। সেই যুগে আরবে গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থায় যদি কোনো গোত্র দুর্বল হতো তবে শক্তিশালী কোনো গোত্র সেই দুর্বলতার সুযোগ নিত। তাই আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে মুসলিমদের শক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সারিয়া প্রেরণ করতেন। তখন পর্যন্ত কুরাইশরা আরব গোত্রগুলোর মাঝে বেশ উঁচু অবস্থানে ছিল। তাদের আরবের প্রধান হিসেবে গণ্য করা হতো। তারা ছিল কাবার রক্ষক। তাই আরবের অন্যান্য গোত্রদের মাঝে তাদের প্রতি বিশেষ ধরনের সম্মান ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ধারণাটিকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন এই অঞ্চলে কুরাইশদের একটি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুসলিমরা আছে।

২) রাসূলুল্লাহ ﷺ সব গোত্রের সাথে যুদ্ধে জড়াননি। কিছু গোত্রের সাথে তিনি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেন। রাসূলুল্লাহকে ﷺ তখন মুশরিকদের সাথে সন্ধিচুক্তি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই সারিয়াগুলো সন্ধিচুক্তির পথ সুগম করে দেয়।

৩) সারিয়াগুলো প্রেরণ করা হতো মূলত অর্থনৈতিক কারণে। অধিকাংশ সারিয়া কুরাইশদের কাফেলা দখল করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ইসলামি ফিকহ অনুসারে, যখন মুসলিম রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধাবস্থায় থাকে, তখন শত্রুদের সম্পদ ও রক্ত মুসলিমদের জন্য হালাল হয়ে যায়। এসব সারিয়ার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ

কুরাইশদের অর্থনীতিতে আঘাত করেন। এটি ছিল কুরাইশদের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। বদর যুদ্ধের সূচনাই হয়েছিল আবু সুফিয়ানের অধীনস্থ একটি কাফেলা আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

৪) এই অভিযানগুলো ছিল মুসলিমদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণস্বরূপ। তাঁরা এসব সারিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধের ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এসবের মাধ্যমে তাঁরা যুদ্ধের ময়দান পরিদর্শন, শত্রুপক্ষকে আচমকা আক্রমণে ছত্রভঙ্গ করা ইত্যাদি নানারকম সামরিক কায়দা-কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। একই সাথে তাঁরা আশেপাশের এলাকা ও গোত্রগুলোর শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিলেন। কুরাইশ ও মুসলিমদের এই বিরোধ চলাকালীন সময়ে যতগুলো সারিয়া প্রেরণ করা হয়েছে তার সবই করেছে মুসলিমরা। কুরাইশদের মধ্যে এই কৌশল প্রচলিত ছিল না, বলা যেতে পারে এটা পুরোপুরিই ইসলামি সমর সংস্কৃতির অংশ।

যদিও মদীনাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমরা মদীনাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন না। তাদের সংখ্যা কম ছিল। একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুতেই ঘুমাতে পারছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন কেউ যেন তাঁকে সারা রাত পাহারা দেয়। আ'ইশা ﵂ এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন,

"আল্লাহর রাসূল ﷺ এক রাতে বিছানায় শুয়ে বলছিলেন: মু'মিনদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে সারা রাত আমাকে পাহারা দেবে? আ'ইশা বললেন, 'আমরা অস্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেলাম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি?' তখন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ﵁ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি।' আয়শা ﵂ বলেছেন, 'সেই রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এতটাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।"[93]

ইবন হাজার এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেছেন, নিরাপত্তার বিষয়ে মুসলিমদের উদাসীন বা অসতর্ক হওয়া উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুমকির আশংকা করছিলেন এবং তিনি এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ঘুমাতে পারছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন কেউ তাঁকে পাহারা দিক। এ থেকে বুঝা যায় যে, একজন মুসলিমের অসতর্ক হওয়া উচিত না। তিনি আরও বলেছেন যে, নেতা, কিংবা আলিমদের নিরাপত্তা দেওয়া মুসলিমদের দায়িত্ব। তৃতীয় যে মন্তব্যটি তিনি করেছেন তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরাপত্তা চেয়েছেন এই কারণে যেন তাঁর উম্মাহ নিরাপত্তা ও সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে মনোযোগী হয়। এটা ছিল তাদের জন্য একটি শিক্ষা। তবে পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহর নিরাপত্তার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই নিজের হাতে নিয়েছিলেন, সে পর্যন্ত সাহাবীরা ﵃ আল্লাহর রাসূলের ﷺ নিরাপত্তার বিষয়টি দেখতেন।

---

[93] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় সাহাবিদের মর্যাদা, হাদীস ৬০।

"...আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন..."(সূরা মায়িদা,৫:৬৭)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা নবীজিকে ﷺ বলে দিলেন যে, তাঁর কোনো পাহারাদারের দরকার নেই। আল্লাহ নিজেই তাঁর রাসূলের ﷺ নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে এসে সাদকে চলে যেতে বললেন।

বদরের যুদ্ধ

পটভূমি

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষ। কুরাইশদের সবচেয়ে বড় কাফেলাকে আশ-শামের উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো। কুরাইশদের অন্যতম নেতা আবু সুফিয়ান ছিল সেই কাফেলার নেতৃত্বে। রাসূলুল্লাহর ﷺ শক্তিশালী *ইন্টেলিজেন্স টিম* ছিল। তাদের মাধ্যমে তিনি নিয়মিত শত্রুপক্ষের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতেন। এই খবর পাওয়া মাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই কাফেলার খোঁজ নেওয়ার জন্য গুপ্তচর পাঠান। বুসাইসাহ ইবন উমরু তথ্য যোগাড় করে সরাসরি রাসূলুল্লাহর ﷺ বাসায় এলেন, সেই সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে ছিলেন শুধুমাত্র আনাস ﷺ ও বুসাইসাহ। বুসাইসাহ রাসূলুল্লাহকে ﷺ সে কাফেলার অবস্থান জানালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত বের হয়ে এসে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘আমরা একটা অভিযানে বের হবো, আমাদের লোক দরকার। যাদের সাথে এই মুহূর্তে চড়ার মতো বাহন প্রস্তুত আছে, শুধু তারাই এসো।’ অনেকেই তাদের চড়ার উপযোগী জন্তু মদীনার নিকটস্থ পাহাড়ে ঘাস খাওয়ানোর জন্য রেখে এসেছিলেন। তাঁরা সেগুলো আনার জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, ‘না, শুধু তারাই যোগ দেবে যাদের বাহন প্রস্তুত আছে।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ একদমই দেরি করতে চাচ্ছিলেন না। প্রস্তুতির জন্য তিনি আলাদাভাবে সময় নষ্ট করতে চাননি। এ কারণেই এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা খুব কম ছিল। মুসলিমদের মধ্যে সেই সময় যুদ্ধ করার মতো অন্তত ১৫০০ লোক গণনা করা হয়েছিল, কিন্তু এই অভিযানে অংশ নিতে পেরেছিল মাত্র ৩১৭ জন, মতান্তরে ৩১৯ জন।

আবু সুফিয়ানের অধীনস্থ কাফেলাটি দখল করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘এই কাফেলাটি কুরাইশদের। এতে প্রচুর সম্পদ থাকবে। এটিকে আক্রমণ করো যাতে আল্লাহ তাদের সম্পদ তোমাদেরকে গনীমত হিসেবে প্রদান করেন।’ এদিকে আবু সুফিয়ান বেশ সতর্ক ছিল। কারণ এর আগে ঘনঘন বেশ কিছু কাফেলা আক্রমণ হওয়ায় আবু জাহেল তার লোকদের মুহাম্মাদের ﷺ সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল। এ কারণে আবু সুফিয়ানও রাসূলুল্লাহর ﷺ অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য গোয়েন্দা পাঠায়। আবু সুফিয়ান বদরে পৌঁছে যায়, বদর আর মদীনার দুরত্ব প্রায় দেড়শো কিলোমিটার। বদরে পৌঁছে সে উটের বিষ্ঠা হাতে নিয়ে গুঁড়ো করে পরীক্ষা করলো। সে এই বিষ্ঠা দেখে বুঝে গেল যে, এই বিষ্ঠা মদীনার খেজুর খাওয়া উটের বিষ্ঠা। সে বুঝে ফেললো মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীরা কাফেলা আক্রমণ করার জন্য আসছে। আবু সুফিয়ান কুরাইশদের কাছে সম্ভাব্য আক্রমণের ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করলো

এবং কাফেলা রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে খবর পাঠালো। এ সংবাদ দামদাম ইবন আমর আল-ঘিফারীকে দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সে মক্কায় পৌঁছবার আগেই মক্কায় এ বিষয়টি নিয়ে হৈ-চৈ লেগে যায়।

মক্কার পরিস্থিতি

রাসূলুল্লাহর ﷺ ফুফু আতিকা বিনত আবদুল মুত্তালিব মক্কায় থাকতেন। তিনি সে রাতে একটি স্বপ্ন দেখেন।[94] তিনি দেখলেন যে, এক লোক উটে চড়ে দ্রুত মক্কার দিকে আসছে এবং সে মক্কার অধিবাসীদেরকে চিৎকার করে ডাকছে। তার উট প্রথমে কাবাঘরের উপর, তারপর মক্কার এক পাহাড়ের চূড়ার উপর গিয়ে দাঁড়াল। তারপর সে কুরাইশদের সাবধান করে বললো, 'তিনদিনের মধ্যে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।' এ কথা বলে লোকটি একটি পাথর নিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে ছুঁড়ে মারলো। পাথরটি মক্কার ভূমিতে পড়ামাত্র বিস্ফোরিত হলো। মক্কার প্রতিটি ঘরে সেই বিস্ফোরণ থেকে ছিটকে আসা বস্তু আঘাত হানলো।

আতিকা এই স্বপ্ন দেখে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি তাঁর ভাই আল-আব্বাসকে স্বপ্নের কথা জানান এবং অন্য কাউকে এর কথা জানাতে নিষেধ করেন। আল-আব্বাস সব কিছু শুনে তাঁর বোনকে এ ব্যাপারে চুপ থাকতে বলেন। কিন্তু আল-আব্বাস নিজেই বন্ধু ওয়ালীদ ইবন উতবাকে এই স্বপ্নের কথা বলে দেন। আবার এও বলে দেন যেন সে অন্য কাউকে এই স্বপ্নের কথা না বলে। কিন্তু ওয়ালীদ তাঁর পিতাকে এই স্বপ্নের কথা জানিয়ে দেন। আর এভাবেই এই সংবাদ সারা মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। আল আব্বাস বলেছেন, 'আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে কাবা তাওয়াফ করতে গিয়ে দেখি সেখানে আবু জাহেল অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের সাথে বসে আতিকার স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করছে।' আল-আব্বাসকে দেখে আবু জাহেল তাকে তাওয়াফ সেরে তাদের সাথে আলোচনায় বসতে বলে। তাওয়াফ শেষে আল-আব্বাস তাদের আলোচনায় যোগ দেয়। তখন আবু জাহেল তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তা কতদিন ধরে তোমাদের পরিবারে এই মহিলা নবী আছে?' আব্বাস আবু জাহেলের কথা না বুঝার ভান করলেন। আবু জাহেল এরপর আতিকার স্বপ্নের প্রসঙ্গ তুলে প্রচণ্ড শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বললো, 'তোমরা যারা আবদুল মুত্তালিবের পরিবার, তোমাদের তো একটা পুরুষ নবী আছেই, তাতেও দেখি তোমরা খুশি নও, এখন দেখছি মহিলা নবীও বানিয়ে নিয়েছ!' এরপর আবু জাহেল বললো, 'আতিকা তিনদিনের আল্টিমেটাম দিয়েছে, তো আমরা ভাবছি এই তিনদিন অপেক্ষা করে দেখবো আদৌ কিছু হয় কি না! এর মধ্যে সে যা বলেছে তা সত্যি না হলে তোমাদেরকে আরবের সবচেয়ে বড় মিথ্যুক বলে ঘোষণা দেওয়া হবে।'

আবু জাহেল আবদুল মুত্তালিবের পরিবারের সদস্যদের খুব অপমান করলো। আল-

---

[94] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৩।

আব্বাস বাড়িতে ফিরে এলে এবার তাঁকে পেল আবদুল মুত্তালিব পরিবারের মহিলা সদস্যরা। আব্বাসের নীরবতা দেখে তাঁরা তাঁর উপর খুব রেগে গেল এবং তাঁর উপর এক চোট নিল। তাঁরা তাঁকে বললো, 'তোমার মুখের উপর ওই বেয়াদব বুড়ো লোকটা তোমার পরিবারের পুরুষদের অপমান করলো, মহিলাদের অপমান করলো, আর তুমি কিছুই বললে না, শুধুই শুনে গেলে? তোমার কি এসব কথা গায়ে লাগে না?' আল-আব্বাস তখন বললেন, 'আমি অবশ্যই এসব মেনে নেওয়ার মতো মানুষ নই। কিন্তু সে আগে কখনো আমার সাথে এমনটা করেনি। তবে আমি কসম করে বলছি আমি তার কথার উচিত জবাব দিব। এরপর সে যদি আবার তোমাদের সম্পর্কে এরূপ কথা বলে তবে আমি তাকে ছাড়বো না।' তিনদিন পর আব্বাস হারামে গিয়ে আবু জাহেলের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন যাতে আবু জাহেল তাঁকে ডাক দেয় আর এই সুযোগে তিনি আবু জাহেলের দুর্ব্যবহারের শোধ নিতে পারে।

আল আব্বাস বর্ণনা করেন, 'আতিকার স্বপ্ন দেখার তৃতীয় দিন সকালের কথা, এই ভেবে আমার মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছিল যে আমি কেন আবু জাহেলকে সেদিন কোনো কথা না শুনিয়ে ছেড়ে দিলাম। আমি মসজিদে গিয়ে আবু জাহেলকে দেখলাম। তাকে দেখে মনে মনে ভাবছি, আজকে তাকে কথা শুনিয়েই ছাড়বো, এই ভেবে আমি তার দিকে এগোচ্ছি। আবু জাহেল ছিল ঘাগু মানুষ। ধারালো চেহারা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আর শাণিত তার চাহনি। কিন্তু তাকে মসজিদের দরজার দিকে দৌড়ে আসতে দেখে আমি মনে মনে ভাবলাম, এই লোকের আবার কী হলো? সে কি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ভয়ে এরকম করছে? আসলে সে কিছু একটা শুনে ভয় পেয়েছিল যা আমি তখনও শুনতে পাইনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তখন দামদাম ইবন আমর আল-ঘিফারী। এই লোককেই আবু সুফিয়ান জরুরি সংবাদসহ পাঠিয়েছিল। সে আতিকার স্বপ্নের তিনদিন পর মক্কায় এসে পৌঁছায়। সে মক্কায় এসে উট থেকে নেমে উটের নাক কেটে ফেলে এবং লাগামটি নিচে নামিয়ে নিজের জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলে চিৎকার করে লোকজনকে ডেকে বলতে লাগলো, 'হে কুরাইশ! কাফেলা! কাফেলা! মুহাম্মাদ ও তাঁর লোকেরা আবু সুফিয়ানের কাছে রক্ষিত তোমাদের সম্পদ দখল করার জন্য আসছে। আমার মনে হয় না তোমরা তা রক্ষা করতে পারবে। সাহায্য! সাহায্য!'

তার এই কর্মকাণ্ড দেখে মক্কার সবার তখন দিশেহারা অবস্থা। আল-আব্বাস বলেন, 'এ কথা শোনার পর সবাই ব্যক্তিগত আক্রোশের কথা ভুলে গেল।' তখন সবার মনোযোগ পড়লো কাফেলা রক্ষার দিকে। কাফেলা রক্ষা করার জন্য কুরাইশের লোকেরা একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

মদীনার ঘটনাক্রম

রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযানের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সাহাবাদের ﷺ সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। আবু বকর ﷺ ও উমার ﷺ তাদের মতামত দিলেন কিন্তু

তাদের বক্তব্য শোনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ তেমন আগ্রহী ছিলেন না। সাদ ইবন উবাদা বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনি কি আমাদের মতামত জানতে চান?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, জানতে চাই।' এরপর সাদ ইবন উবাদা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, যদি আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাহলে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব, আর আপনি যদি বারক উল-ঘামাদ পর্যন্ত যান তাহলে আমরাও সেদিকে যাব।"[95]

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব খুশি হলেন। আনসাররা বাইয়াতের সময় রাসূলুল্লাহকে ﷺ মদীনার অভ্যন্তরে নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার বাইরে অভিযানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন তাই তিনি এ ব্যাপারে আনসারদের মতামত জানতে চাচ্ছিলেন। এ কারণেই তিনি আবু বকর ﷺ ও উমারের ﷺ কথা শোনার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। আনসাররা চাইলে বলতে পারতেন যে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তাদের চুক্তি হয়েছিল শুধুমাত্র মদীনার অভ্যন্তরে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু তারা সেটা বলেননি, বরং তাঁরা উদগ্রীব ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য যুদ্ধ করতে, হোক সেটা মদীনার ভিতরে বা বাইরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটাই মনে মনে চাচ্ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেলার অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে তিনি কিছুসংখ্যক সাহাবাকে যুদ্ধ করার মতো বয়স না হওয়ার কারণে ফিরিয়ে দেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমার ইবন খাত্তাব ও আল-বারাকে পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু তাদেরকেই সাথে নেন যারা জিহাদে যেতে প্রবলভাবে উৎসাহী ছিল। ইসলামের প্রথম যুগের এই যোদ্ধাদের একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তা হলো, তাঁরা আদর্শিকভাবে এতটাই অনুপ্রাণিত ছিলেন যে তাঁরা নিজ প্রেরণায় যুদ্ধে অংশ নিতে মুখিয়ে থাকতেন। অন্যদিকে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ সেনাবাহিনীতে সৈন্যরা যুদ্ধ করে মূলত বিভিন্ন সেবা ও অর্থের আশায়। তারা যুদ্ধকে নিছক 'চাকরি' হিসেবে দেখে। সুযোগ পেলেই বা পরিস্থিতি একটু কঠিন হলেই তারা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায়।

আ'ইশা ﷺ বর্ণনা করেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বদরের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি যখন (মদীনা থেকে চার মাইল দূরে) হাররাত-উল-ওয়াবারাতে পৌঁছলেন, তখন এক লোক তাঁর কাছে আসলো। লোকটি বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য বেশ সুপরিচিত ছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গীরা লোকটিকে দেখে বেশ খুশি হলেন। লোকটি বললো, আমি এসেছি তোমার সাথে যেতে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করো? সে বললো, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি ফিরে যাও, আমি কোনো মুশরিকের কাছ থেকে সাহায্য নেব না। এরপর সে চলে গেল, আমরা যখন শাজারায় পৌঁছলাম, তখন আবার

---

[95] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় জিহাদ এবং সারিয়া, হাদীস ১০৩। কিছু বর্ণনায় এসেছে সাদ ইবন মুয়াযের নাম।

লোকটির দেখা মিললো। সে আবার একই প্রস্তাব দিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একই কথা বললেন, তুমি ফিরে যাও, আমি কোনো মুশরিকের কাছ থেকে সাহায্য নেব না। এরপর লোকটি আবার বাইদায় এসে রাসূলুল্লাহকে ﷺ নাগালে পেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করো? এবারে সে বললো, হ্যাঁ, করি, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি আমাদের সাথে চলো।'

তখন মুসলিমদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। তাই তিনজন সাহাবীর ﷺ জন্য একটি করে উট বরাদ্দ ছিল। তাঁরা পালাক্রমে উটের পিঠে চড়তেন। অন্যান্যদের মতো রাসূলুল্লাহও ﷺ দুইজন সাহাবীর ﷺ সাথে একটি উট ভাগাভাগি করে চড়তেন। যখন তাদের পালা আসত তখন তাঁরা নিজেরা না চড়ে রাসূলুল্লাহকে ﷺ চড়ার জন্য অনুরোধ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলতেন, 'তোমরা আমার চেয়ে শক্তিশালী নও আর আমিও তোমাদের মতো আল্লাহর কাছে পুরস্কারের প্রত্যাশী।'

যুদ্ধের ঘনঘটা

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ানের কাফেলা দখল করার জন্য বদর অভিমুখে যাচ্ছিলেন। আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। সে নিজেই ওই স্থানে পায়চারি করে দেখছিল কোথায় কী আছে। সে বদরের কুয়াগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার লোকদের ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, কারা এই কুয়াগুলো থেকে পানি তুলেছে?' তাঁরা বললো যে, তারা দুইজন অপরিচিত লোককে দেখেছে। আবু সুফিয়ান উটের পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে করতে উটের বিষ্ঠা পেল। সে হাতে সেই বিষ্ঠা নিয়ে পিষে ফেললো। বিষ্ঠা দেখে সে বুঝতে পারল যে, সেগুলো খেজুরের বিষ্ঠা আর খেজুরগুলো মদীনার। তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মদীনা থেকে তার কাফেলার উপর নজরদারি চলছে। সে তৎক্ষণাৎ কাফেলার দিক পরিবর্তন করে উপকূলের দিকে প্রবল বেগে পালিয়ে গেল। ফলে সে মুসলিমদেরকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলো। সে মক্কার লোকদের চিঠি লিখে জানিয়ে দিল যে, কাফেলা এখন নিরাপদ, আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আবু জাহেল তাতে রাজি হলো না। সে বললো, 'আল্লাহর কসম! বদরে পৌছানোর আগে আমরা ফিরে যাবো না।' তারা কাফেলা রক্ষা করার জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু কাফেলা নিরাপদ – এই খবর পাওয়ার পরও তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অটল থাকে। মুসলিমদের শেষ করে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

বদরে প্রতি বছর আরবরা মেলার আয়োজন করতো আর বেচাকেনা করতো। আবু জাহেল যেতে যেতে সবাইকে বলছিল, 'আমরা সেখানে যাব। তিন দিন ধরে উৎসব করবো, উট জবাই করব, মদ খাব আর গায়িকারা আমাদের জন্য গান বাজনা পরিবেশন করবে! বেদুইনরা আমাদের অভিযান ও উৎসব সম্পর্কে জানবে, তারা

আমাদের সম্মান করবে। চলো আমরা এগিয়ে যাই।'[96]

আবু জাহেলের মূল উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের শক্তি সামর্থ্যের প্রদর্শনী দেখানো। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সূরা আনফালে বলেন,

> **"আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের ঘর থেকে অহঙ্কার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বের হয়েছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা প্রদান করে, আর তারা যা করে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪৭)**

মুসলিমদের শুরা

কুরাইশদের যুদ্ধে বের হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাদের কাফেলা ইতোমধ্যেই নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছে যায়, কিন্তু তবু তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য আর অহংকার প্রকাশের জন্য বের হয়েছিল। তারা তাদের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে দম্ভ করছিল। রাসূল ﷺ বুঝতে পারলেন যে, কাফেলাটি অন্যদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু কুরাইশরা ব্যাপক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি ভেবেছিলেন তাদেরকে কাফেলার ৪০ জনের সাথে মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, ১০০০ জনের বিশাল বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শূরা ডাকলেন আর সাহাবাদের ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা এ ব্যাপারে কে কী ভাবছেন। আবু বকর ﷺ দাঁড়িয়ে কিছু কথা বললেন, উমারও ﷺ একই কথা বললেন। এরপর দাঁড়ালেন মিকদাদ ইবন আসওয়াদ, তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তার জন্য অগ্রসর হোন। বনী ইসরাঈল তাদের নবী মূসাকে বলেছিল, মূসা, তুমি তোমার রবকে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখান থেকে নড়ছি না। কিন্তু আমরা আপনাকে কখনোই এমন কথা বলব না। আমরা যুদ্ধ করবো আপনার সামনে থেকে, আপনার পেছন থেকে, আপনার ডানে দাঁড়িয়ে এবং আপনার বামে দাঁড়িয়ে। আপনি আপনার রবকে নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হোন, আমরাও আপনার সাথে আছি।'[97]

একথা শুনে আল্লাহর রাসূলের ﷺ মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। তিনি উৎসাহের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। মিক্বদাদের এই কথাগুলো ছিল সাহাবাদের ﷺ জন্য প্রেরণা। কিন্তু সবাই এ যুদ্ধে অংশ নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ তাঁরা মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন কাফেলা আক্রমণ করতে, বিশাল বাহিনীর সাথে লড়বার জন্য নয়। তাদের এই মনের কথা তাঁরা গোপন রাখলেও, আল্লাহ তা কুরআনে প্রকাশ করে দেন। কুরআনে এই যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয় ইতিহাসগ্রন্থেও। কিন্তু পার্থক্য হলো এই যে, একজন ইতিহাসবেত্তা শুধু তা-ই লেখেন

---

[96] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৮।

[97] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬১।

যা তিনি উপলব্ধি করছেন, বাইরে থেকে দেখছেন। কিন্তু কার মনে কী আছে তা তিনি জানেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তা জানেন, তাই বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> "যেমন করে আপনাকে আপনার রব ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না।" (সূরা আনফাল, ৮: ৫)

কিছু কিছু সাহাবী ﷺ এই যুদ্ধে অংশ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা ছিলেন মু'মিন। তাঁরাই ছিলেন সে সময়ের সেরা মুসলিমদের একেকজন। যুদ্ধ স্বাভাবিকভাবেই একটি অপছন্দনীয় বিষয়। আর মুসলিম বাহিনী হিসাবে এটিই ছিল প্রথম।

> "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা বাক্বারাহ, ২: ২১৬)

আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল এরপর বলেন,

> "তারা আপনার সাথে বিতর্ক করছে সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হওয়ার পর। যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হচ্ছে, আর তারা তা দেখছে। স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দু'টি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ওটা তোমাদের করতলগত হবে। তোমরা এই আশা করেছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে। অথচ আল্লাহ চাচ্ছিলেন তাঁর 'কথা' দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফেরদের মূল কেটে দেবেন – যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬-৮)

আল্লাহ মুসলিমদের মনের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন, 'আর তোমরা চাইছিলে যে কণ্টকহীন, বাধা বিপত্তিহীন কাফেলাটি যেন তোমাদের ভাগে আসে'। অর্থাৎ, লোকেরা কাফেলা চেয়েছিল। সেটা আক্রমণ করা ছিল তুলনামূলক সহজ, সেটিতে মুহাজিরদের অর্থ ছিল। এটাই ছিল তাদের পরিকল্পনা।

কিন্তু আল্লাহরও পরিকল্পনা ছিল, আর আল্লাহর পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হয়। মুসলিমরা চেয়েছিল নিছক কাফেলা আক্রমণ করে সম্পদ নিয়ে যেতে, তারা বড় কোনো যুদ্ধে জড়াতে চায়নি। কিন্তু আল্লাহ চাননি এই যুদ্ধ হোক নিছক মুহাজিরদের

সম্পদ ফিরে পাওয়ার যুদ্ধ, তিনি চেয়েছেন আরো বড় কিছু। তিনি চেয়েছেন এই যুদ্ধে হক্ব ও বাতিলের আদর্শ মুখোমুখি হোক আর তিনি হক্বকে জয়ী করেন এবং মিথ্যাকে পরাজিত করেন। তিনি পরিস্থিতিকে এমনভাবে বদলে দেন যে, মুসলিমদের এই যুদ্ধে অংশ নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আর একারণে এই দিনকে বলা হয় ফুরক্বানের দিন বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী দিন।

গোপন তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশ বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছিলেন। বদরের কাছাকাছি তিনি তাঁর এক সাহাবির সাথে থামলেন। ইবনে হিশাম বলেছেন, এই সাহাবি ছিলেন আবু বকর ؓ। তাঁরা এক বৃদ্ধ বেদুইনকে থামিয়ে তার কাছে কুরাইশ এবং মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইলেন। বুড়ো লোকটি বললো,

- আপনারা নিজেদের পরিচয় না দেওয়ার আগে আমি কিছুই বলবো না।

- আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যদি আমাদেরকে তথ্য দেন তাহলে আমরা কারা সেটা আপনাকে বলবো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন।

- আচ্ছা আমি তথ্য দিলে তোমরাও দেবে, তাই তো?

- হ্যাঁ।

- আমি শুনেছি, মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা অমুক দিন বের হয়েছে। যদি তা সত্য হয় তবে আজ তাদের অমুক জায়গায় থাকার কথা, (বৃদ্ধ ঠিক ঠিক সে জায়গার কথাই বললো, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা অবস্থান করছিলেন) আর আমি শুনেছি কুরাইশরা অমুক দিন বের হয়েছে। আর এটি যদি সত্য হয়, তবে তাদের আজকে অমুক জায়গায় থাকার কথা। এবার তোমরা বলো তোমরা কোথা থেকে এসেছ।

- আমরা 'মা' থেকে এসেছি।'

এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে চলে আসছিলেন আর বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞেস করছিলো 'মা থেকে মানে কী? এটা কি ইরাকের পানি থেকে?' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো উত্তর না দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন যেন লোকটি আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না পায়। আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে চেয়েছিলেন 'আমরা মা অর্থাৎ পানি থেকে এসেছি।' কারণ আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কুরআনে বলেন 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পানি থেকে'। কথার কৌশলে আল্লাহর রাসূল ﷺ বুড়ো লোকটিকে এড়িয়ে গেলেন এবং তাকে কোনো তথ্য দিলেন না।[৭৪]

---

[৭৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৬।

মুহাম্মাদ ﷺ কুরাইশদের অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে গেলেন। এই বৃদ্ধ লোকটির তথ্য বেশ নির্ভরযোগ্য ছিল, কারণ সে মুহাম্মাদ ﷺ আর তাঁর সাহাবিদের অবস্থান সঠিকভাবে আন্দাজ করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের কাছে ফিরে গেলেন। তিনি কুরাইশদের সম্পর্কে আরো খবর আনতে আলী ইবনে আবি তালিব, আয যুবাইর এবং সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের সাথে কিছু সাহাবিদের ﷺ পাঠালেন। তাঁরা কুরাইশদের বাহিনীর এক ক্রীতদাসকে দেখতে পেয়ে আটক করে নিয়ে আসেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাদের লোক?' সে বললো 'আমি কুরাইশ বাহিনীর লোক।' সাহাবারা ﷺ তাকে প্রহার করে আবু সুফিয়ানের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কিন্তু সেই ক্রীতদাসটি আবু সুফিয়ান কোথায় আছে তা জানতো না। সাহাবারা ﷺ তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আর কাদের সম্পর্কে জানো?' সে বললো, 'আমি আবু জাহেল, আবু উমাইয়্যা ইবন খালাফ, উতবা ইবন রাবিয়া এবং কুরাইশ বাহিনীর বিখ্যাত লোকদের সম্পর্কে জানি।' কিন্তু তাঁরা তাকে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য মারতে শুরু করলেন। এরপর সে বললো, 'ঠিক আছে আমি বলছি আবু সুফিয়ান কোথায়।' এ কথা বলার পর সাহাবারা ﷺ তাকে প্রহার করা বন্ধ করলেন। তখন সে বললো, 'আমি জানি না আবু সুফিয়ান কোথায়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সালাত শেষ করে বললেন, 'যখন সে সত্য বলেছিল তখন তোমরা তাকে প্রহার করেছো, আর যখন মিথ্যা বলেছে তখন তাকে ছেড়ে দিয়েছ।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

- আচ্ছা, কুরাইশদের লোকবল কেমন?

- অনেক হবে।

- তাদের সংখ্যা কতো?

- ঠিক বলতে পারছি না।

- আচ্ছা, তারা প্রতিদিন কয়টি উট জবাই করে তা জানো?

- তারা একদিন ১০টি উট জবাই করে আর পরের দিন জবাই করে ৯টি।

- হুম, তাহলে তাদের সংখ্যা ৯০০ থেকে ১০০০ জন।

দুই বাহিনীর পরিসংখ্যান

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সঠিক সংখ্যা ছিল ৯৫০ জন। রাসূলুল্লাহর ﷺ হিসাব প্রায় ঠিক ছিল। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৩০০ জনের একটু বেশি, অর্থাৎ মুসলিমরা ছিল কুরাইশদের ৩ ভাগের ১ ভাগ। তাদের মধ্যে ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির, ৬১ জন ছিলেন আল আওস গোত্রের আর ১৭০ জন ছিলেন আল খাযরাজের। আল আউস গোত্রের বাসস্থান ছিল মদীনার উপরিভাগে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেনা সংগ্রহ করার সময় বলেছিলেন, যাদের বাহন প্রস্তুত আছে শুধু তাঁরা সেনাদলে যোগদান করতে পারবে। তাই আল আউস গোত্রের লোকেরা একটু দূরে বসবাস করায় তাদের অল্পসংখ্যক লোক এই যুদ্ধে যোগদান করতে পেরেছে।

বুখারি থেকে বর্ণিত, আল বারা ইবন আযিব ﵁ বর্ণনা করেন, 'আমরা, রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবারা ﵃ যখন বদরের কথা আলোচনা করতাম, তখন আমরা বলতাম – বদরে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সংখ্যা আর তালুতের যুদ্ধে অংশ নেওয়া মুজাহিদ, যারা নদীর পানিপান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে পেরেছিল তাদের সংখ্যা সমান। আর যারা এতে সফল হয়েছিল তাঁরা ছিল মু'মিন, তাঁরা ৩১০ জনের একটু বেশি ছিল।'

বদরের মুসলিম আর বনী ইসরাইলদের যারা তালুতের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে একটা মিল ছিল। আল বারা এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তা হলো, বনী ইসরাঈলের যেসব মু'মিন তালুতের সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছিল তারাই ছিল তাদের যুগে সেরা। আর বদরে যেসব মু'মিন যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন তাদের যুগের সেরা। তাঁরা দুনিয়াবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাই তাঁরাই ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের ছিল নিজস্ব ব্যানার, পতাকা, স্লোগান আর রণধ্বনি। যুদ্ধে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ধরে রাখাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য। বদরের যুদ্ধের ব্যানার ছিল সাদা। এটি ছিল মুসআব ইবনে উমাইরের হাতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি কালো পতাকা বহন করিয়েছিলেন; একটির নাম ছিল আল উকবা, এটি ছিল আলী ইবনে আবি তালিবের হাতে এবং অপর কালো পতাকাটি আনসারদের একজনের হাতে দেওয়া হয়েছিল।

পুরো বাহিনীর মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল। একটি ছিল যুবাইরের আর অন্যটি আল মিক্দাদ ইবন আসওয়াদের হাতে। মুসলিমদের উট ছিল ৭০টি; প্রতিটি উট ৩ জনকে পালাক্রমে ভাগাভাগি করে চড়তে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের উটটি আলী ইবনে আবি তালিব এবং মারসাদ ইবনে মারসাদ আল ঘানাওয়ীর সাথে ভাগাভাগি করেছিলেন।

রণক্ষেত্রে অবস্থান

যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে। তিনি ভাবছেন কোন অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করলে কৌশলগত সুবিধা হবে। তিনি ভেবেচিন্তে একটি অবস্থান নির্বাচন করলেন। তখন একজন আনসারী সাহাবি, আল হাব্বাব ইবন আল মুনযির ﵁ রাসূলুল্লাহকে ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ, আল্লাহ কি আপনাকে ওয়াহীর মাধ্যমে এই জায়গা নির্ধারণ করতে আদেশ দিয়েছেন নাকি আপনি কৌশলগত কারণে জায়গাটি পছন্দ করেছেন?

আল হাব্বাবের প্রশ্নের ধরনটি লক্ষণীয়। তিনি জানতে চাইছেন সেই নির্দিষ্ট জায়গাটি পছন্দ করার কারণ কী। যদি এটি আল্লাহর তরফ থেকে ওয়াহী হয়, তাহলে আল হাব্বাব তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন, কিন্তু যদি যুদ্ধের কোনো কৌশল হয় তাহলে তাঁর কিছু বলার আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'না, এটা ওয়াহী নয়, এটা নিছক

যুদ্ধের কৌশল। আল মুনযির তখন প্রস্তাব করলেন যে, তাদের উচিত বদরের কুয়া পর্যন্ত পৌঁছানো এবং কুয়াকে পেছনে রেখে একটি জলাধার তৈরি করে কুয়ার সামনে অবস্থান নেওয়া। তিনি এর পেছনে যুক্তিও দেখালেন। মুসলিমরা যদি এই অবস্থানে থাকে তাহলে কুরাইশরা পানির নাগাল পাবে না কিন্তু মুসলিমদের দখলে প্রচুর পানি থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই প্রস্তাব খুবই পছন্দ করলেন এবং সে অনুযায়ী যুদ্ধের অবস্থান বেছে নিলেন।

আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের বৃষ্টিপাত

যুদ্ধের আগের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি স্বপ্ন দেখলেন। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আল্লাহ তাদের মনে স্বপ্নের মাধ্যমে শক্তি যোগান। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন যে বাস্তব সংখ্যার চেয়ে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যের সংখ্যা খুবই কম। কেন আল্লাহ আযযা ওয়াজাল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার চেয়ে কম দেখালেন? আল্লাহ আযযা ওয়াজাল চেয়েছিলেন মু'মিনদের অন্তর দৃঢ় রাখতে। কুরাইশ বাহিনী ছিল মুসলিম বাহিনীর তিনগুণ। এটা মুসলিমদের মনোবল দুর্বল হওয়ার কারণ হতে পারে। যদি কোনো সৈন্য এটা ভেবে যুদ্ধের ময়দানে যায় যে, তাদের জেতার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাহলে সে যুদ্ধের ময়দানে ভেঙে পড়বে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে দেখান যেন মুসলিমরা হতোদ্যম হয়ে না পড়ে।

> **"আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ স্বপ্নে আপনাকে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন – বেশি করে দেখালে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এ বিষয় নিয়ে তোমরা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিতে – কিন্তু আল্লাহ (এটা হতে না দিয়ে) তোমাদের রক্ষা করেছেন। মানুষের অন্তরে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে, তা তিনি জানেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪৩)**

আরবে তখন বৃষ্টির মৌসুম ছিল না, কিন্তু তবু পরদিন সকালে বৃষ্টি হয়েছিল। ইবনে ইসহাক্ব বলেছেন যে, উপত্যকাটি ছিল নরম আর বাদামী; আকাশ থেকে পানি মাটিকে এমনভাবে আর্দ্র করে দিয়েছিল যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর বাহিনীর অগ্রসর হতে কোনো কষ্ট হয়নি। অপরদিকে কুরাইশদের উপর এতই বৃষ্টি হয়েছিল যে, তাঁরা ঠিক মতো সামনে এগুতেই পারছিল না।

এই বৃষ্টি দুপক্ষের উপরেই বর্ষিত হয়েছিল; মুসলিম আর কাফিরদের উপর, কিন্তু মুসলিমদের জন্য মাটি হয়েছিল আর্দ্র আর নমনীয়। অথচ একই বৃষ্টি কুরাইশদের জন্য মাটিকে করে দিয়েছিল কর্দমাক্ত আর দুঃসাধ্য। এটা তাদের সেনাবাহিনীকে বিপাকে ফেলে দেয়। একই বৃষ্টি – কিন্তু দুপক্ষের উপর দু'রকম প্রভাব, এটি ছিল আল্লাহ আযযা ওয়া জালের পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য। সেই সকালে কিছু মুসলিম স্বপ্নদোষের কারণে অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেছিলেন। শয়তান মুসলিমদের মনে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছিল, 'কীভাবে তোমরা অপবিত্র অবস্থায় যুদ্ধ করবে?" তাই আল্লাহ

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ

সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী দিন
১৭ই রমাদান ২য় হিজরী
১৩ই মার্চ ৬২৪ সাল

আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসাগলানো প্রাচীর।
(সূরা সফ-৪)

বস্তুত আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।
(সূরা আলে ইমরান-১২৩)
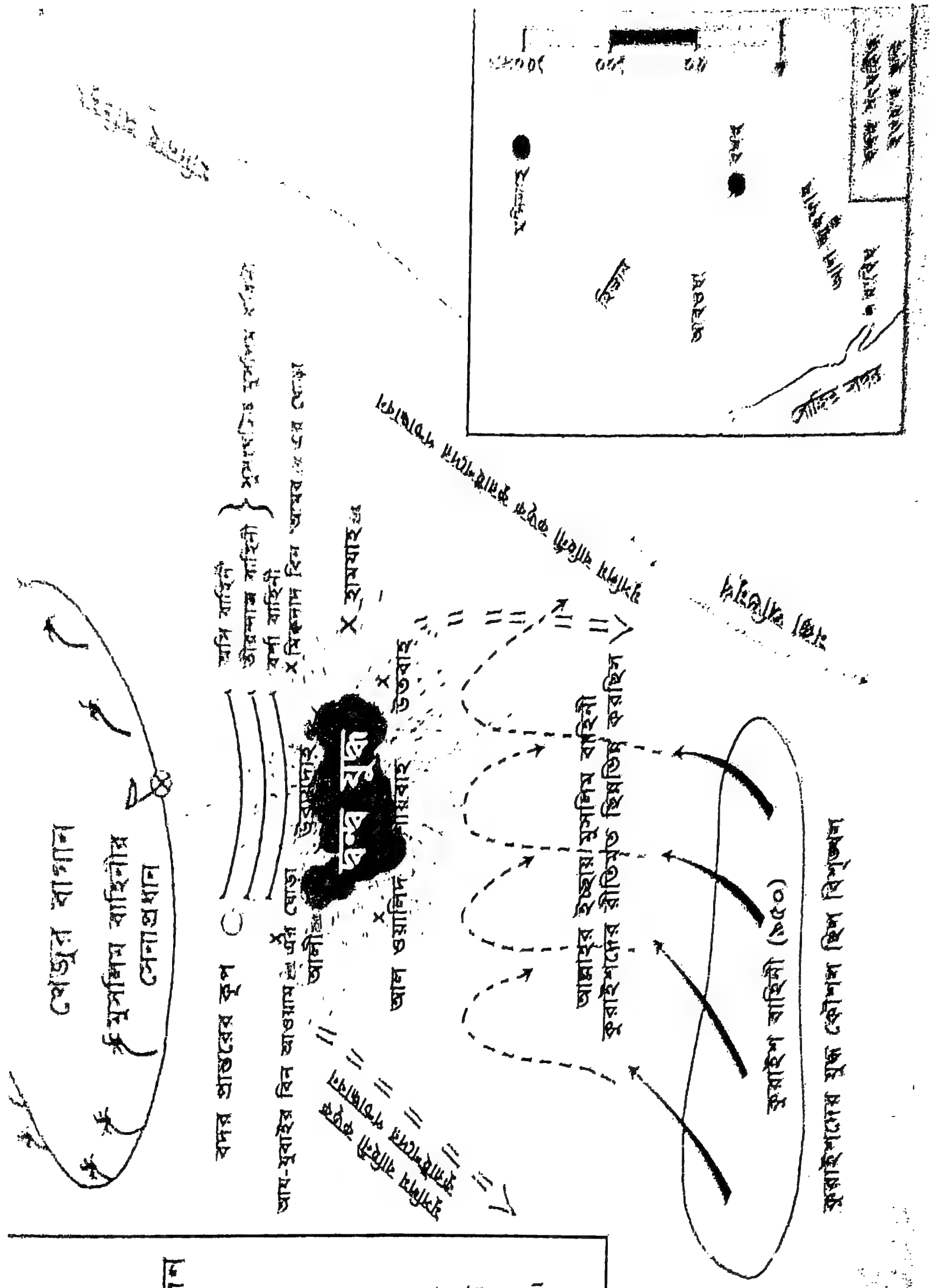
আযযাওয়াজাল ওই মুসলিমদের অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পানি বর্ষণ করে তাদের পবিত্র করে দিয়েছিলেন।

> "আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা আর স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেছেন – উদ্দেশ্য ছিল এ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের পবিত্র করবেন, তোমাদের মন থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করবেন, তোমাদের মনে বৃদ্ধি করবেন সাহস এবং (সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে) তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের পদক্ষেপ মজবুত করবেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ১১)

যুদ্ধের পূর্বরাত্রি

আলী ইবনে আবি তালিব যুদ্ধের আগের রাতের ব্যাপারে বলেছেন, সকল মুসলিমরা ঘুমিয়ে ছিল। এই ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকাহ, আল্লাহ বলেছেন, "তিনি আরোপ করেছিলেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা…" সাধারণত যুদ্ধের আগের রাতে সবাই খুব উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, ভীত অবস্থায় থাকে। কিন্তু সাহাবারা ﷺ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে আলিমরা বলেছেন, যুদ্ধের আগে ঘুমানো হচ্ছে ঈমানের লক্ষণ, আর নামাজে ঘুমানো হচ্ছে নিফাকের লক্ষণ, কেননা অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ আযযাওয়াজাল বলেছেন, যখন মুনাফিকরা সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। যুদ্ধের আগে বা যুদ্ধের সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব হলো ঈমানের লক্ষণ, কারণ এটি অন্তরে থাকা আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে।

কিন্তু একজন মানুষ সেই রাতে ঘুমাননি। সারা রাত জেগে ছিলেন। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি সারারাত দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন।

> "যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে, তারা ছিল দূর প্রান্তে, আর কুরাইশ কাফেলা ছিল তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে। (যুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে) তোমরা যদি পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা-ই ঘটাতে চেয়েছিলেন যা হওয়ারই ছিল। (এ জন্যেই তিনি উভয় দলকে রণক্ষেত্রে মুখোমুখি করালেন) যাতে করে – যে দলটি ধ্বংস হওয়ার, তারা যেন ধ্বংস হয় সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর – আর যে দলটি বেঁচে থাকবে, তারাও যেন বেঁচে থাকে সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর। আর নিশ্চিতই আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪২)

মুসলিমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ হয়নি। কাফিররাও মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়নি, ময়দানে মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে তাদের পারস্পরিক কোনো অঙ্গীকার ছিল না। মুসলিমরা কুরাইশদের মুখোমুখি হতে চায়নি, আর না

কুরাইশরা মুসলিমদের। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছিলেন ভিন্ন কিছু। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিমরা কুরাইশদের মুখোমুখি হোক। আবু সুফিয়ানসহ আরও কিছু কুরাইশ যুদ্ধে জড়াতে চাইছিল না। এমনকি কিছু সংখ্যক কুরাইশ ভয় পাচ্ছিল এই ভেবে যে, তারা যুদ্ধ করছে আল্লাহর একজন নবীর সাথে। কিন্তু তাদের মনের ভেতরে ছিল ঔদ্ধত্য। তাই তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসরণ করেনি। এধরনের কুফরকে বলা হয় কুফর আল ইস্তিকবার, ঔদ্ধত্য থেকে কুফরি। অন্যদিকে অনেক মুসলিমও যুদ্ধ করতে চাননি, কারণ তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন কাফেলা আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে, যুদ্ধে অংশ নিতে নয়। "যে দল ধ্বংস হওয়ার, তারা যেন সত্যমিথ্যা স্পষ্ট হওয়ার পর ধ্বংস হয়, যে দল বেঁচে থাকার, তারাও যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট হওয়ার পর বেঁচে থাকে" - এই যুদ্ধ ছিল ঈমান আর কুফরের চূড়ান্ত পরীক্ষা।

এদিকে সাদ ইবন মুয়ায ﷺ একটি পরামর্শ নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেলেন। তিনি দাবি করলেন যেন রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য একটি তাঁবু বানানো হয় আর তাঁর নিরাপত্তার জন্য প্রহরী প্রস্তুত করা হয়। সাদ বলেছিলেন, 'আমরা আশা করি মুসলিমরাই এই যুদ্ধে জিতে যাবে। কিন্তু যদি মুসলিমরা পরাজিত হয় তাহলে রাসূলুল্লাহর ﷺ উচিত মদীনায় ফিরে যাওয়া। কেননা মদীনার মুসলিমরা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ সেভাবে চায় যেভাবে আমরা তাঁকে চাই। আর তাঁরা যদি জানতো আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি, তাহলে তাঁরা বসে থাকত না। তাদেরকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর মিশন চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন - এটাই আমি বিশ্বাস করি।' সাদ এখানে সম্ভবত আল আওস গোত্রের কথা বলছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে যোগদান করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর জন্য দুআ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য একটি তাঁবু বানানো হয়। তিনি সেখানেই থাকেন। আবু বকর ﷺ ছিলেন তাঁর দেহরক্ষী।

অবশ্যম্ভাবী সংঘাত এড়ানোর প্রচেষ্টা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন কুরাইশরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে আক্বানক্বাল পাহাড়ের পেছনে বালুময় উপত্যকার কাছে জড়ো হচ্ছে। তাদের দেখে তিনি ﷺ বলে উঠলেন,

> *'হে আল্লাহ! কুরাইশরা আজ নেমে এসেছে অহংকার আর দম্ভভরে– তোমার বিরোধিতায় আর তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! আজ তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের বড় বেশি প্রয়োজন। হে আল্লাহ! তুমি আজ ওদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।'*

কুরাইশ কাফির বাহিনীর মাঝে লাল উটে আরোহিত এক কাফিরকে দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'কুরাইশদের কারো মাঝে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে, তবে এ লাল উটের আরোহীর মাঝেই রয়েছে। অন্যেরা যদি তাঁর কথা মেনে নিত, তাহলে

সঠিক পথ পেত।'[99] লাল উটের এই আরোহী ছিল কুরাইশদের অন্যতম নেতা উতবাহ ইবন রাবিয়াহ। কুরাইশরা মুসলিম বাহিনীর সামরিক শক্তি আর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য উমার ইবনে ওয়াহাবকে পাঠিয়েছিল। উমার ফিরে গিয়ে বলে, 'কুরাইশরা, তোমরা শোনো! আমি তাদের উটের পিঠে সাক্ষাৎ মৃত্যু দেখেছি। তাদের মধ্যে কারো অস্ত্র আর সম্বল শুধু তাদের তরবারি। আল্লাহর শপথ! তোমাদেরকে না মেরে তারা মরবে না। তাদের প্রত্যেকে যদি আমাদের একজনকেও হত্যা করে, তাহলে আমাদের বেঁচে থেকে কী লাভ? কাজেই কুরাইশরা, তোমরা যা কিছু করবে, ভেবে চিন্তে কোরো।'

উমার ইবনে ওয়াহাব দেখেছিল যে, মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় বেশ কম। কিন্তু তাদের দেখে তার মনে হয়েছে তাঁরা মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। তাঁরা এসেছে মারতে এবং মরতে। হাকিম ইবনে হিযাম লাল উটের আরোহী সে কুরাইশ নেতার কাছে গিয়ে বললো,

- আমি কি আপনাকে এমন পরামর্শ দিব যা গ্রহণ করলে সারাজীবন লোকেদের মুখে আপনার প্রশংসা থাকবে।

- হ্যাঁ, বলো সেটা কী? উতবা জানতে চাইলো।

- আপনি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে মক্কায় ফেরত যান। হাদরামির রক্তপণ আপনিই পরিশোধ করে দিন, এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সবাইকে এর মধ্যে জড়াবেন না।

- ঠিক আছে, হাদরামির রক্তমূল্য আমি নিজে থেকে পুষিয়ে দিতে রাজি আছি। তুমি এক কাজ করো। তুমি আবু জাহেলের কাছে যাও, তাকে বোঝাও। সে-ই সবাইকে যুদ্ধের ব্যাপারে উসকানি দিয়ে উত্তেজিত করছে।

উতবা হাকিমের প্রস্তাবে রাজি হলো, সে যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে চাইলো। এই যুদ্ধের একটা অন্যতম কারণ ছিল হাদরামি হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। হাদরামি নিহত হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবন জাহশের নেতৃত্বে পরিচালিত সারিয়ায়ে নাখলার অভিযানে। উতবা ছিল হাদরামির মিত্র, তাই হাকিম তাকে এই যুদ্ধকে এড়ানোর জন্য বিকল্প পন্থা হিসাবে হাদরামির রক্তপণ দিয়ে দিতে অনুরোধ করে। এই প্রস্তাবটি উতবার পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু তাদের নেতা ছিল আবু জাহেল, তাই তার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ছিল। উতবা দাঁড়িয়ে কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বললো,

'শোনো, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে লড়াইয়ে আমাদের তেমন কোনো অর্জন নেই। যদি তোমরা তাঁকে মেরে ফেলো তাহলে এমন সব মানুষ মারা পড়বে যাদের নিহত চেহারা দেখতে তোমাদের কারোই ভালো লাগবে না। তোমরা তো তোমাদের চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই অথবা গোত্রের কাউকেই হত্যা করবে। তোমরা ফিরে

---

[99] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭২।

চলো এবং মুহাম্মাদকে আরবের অন্য গোত্রগুলোর হাতে ছেড়ে দাও। যদি তারা মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের মেরে ফেলে তবে তোমাদের ইচ্ছাই পূরণ হবে। আর যদি মুহাম্মাদ বিজয়ী হয়, তাহলে সে আমাদের উপর প্রতিশোধ নেবে না।'

উতবা কুরাইশদেরকে এসব কথা বলছিল। অন্যদিকে হাকিম ইবনে হিযাম, আবু জাহেলকে এসব ব্যাপার বুঝানোর চেষ্টা করছিল। আবু জাহেল তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তাকে খোঁচা দিয়ে বললো, 'উতবা কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাঠানোর মতো পেল না!' হাকিম বললো, 'হ্যাঁ, হয়তো সে অন্য কাউকে পাঠাতে পারতো, কিন্তু মানুষটা উতবা বলেই আমি তার বার্তাবাহক হয়েছি, অন্য কারো হয়ে আমি কথা বলতে আসতাম না।'

এরপর আবু জাহেল বললো, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের দেখে ভয়ে উতবার বুক শুকিয়ে গেছে। আমরা কক্ষনো মক্কায় ফিরে যাবো না, যতক্ষণ আল্লাহ, মুহাম্মাদ আর আমাদের মধ্যে একটি ফয়সালা না করেন। সে ভয় পাচ্ছে আমরা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের কচুকাটা করবো। তার ছেলে তো তাদের সাথেই আছে। ছেলেকে বাঁচাতেই সে মুসলিমদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে।'

কুরাইশদেরকে উত্তেজিত করার জন্য এরপর আবু জাহেল আমর ইবন হাদরামির ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললো, 'ভাবতে পারো! তোমারই বন্ধু, তোমারই আশ্রয়দাতা উতবা চায় মক্কায় ফিরে যেতে! তুমি যাও, গিয়ে সবাইকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান করো।' আমর ইবন হাদরামির ভাই তার মৃত ভাইয়ের স্মৃতিকে তরতাজা করতে কুরাইশ বাহিনীর সামনে গিয়ে বলতে থাকে, 'হায় আমর, হায় আমর'! এভাবে সে নানাভাবে তাদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

আবু জাহেল শুধু তার বাহিনীকে মুসলিমদের উপর উত্তেজিত করেনি, সে উতবাকেও ক্ষেপিয়ে দিতে সফল হয়। উতবা যখন শুনলো আবু জাহেল তাকে ছোট করার জন্য বলেছে, 'উতবার বুক শুকিয়ে গেছে', তখন সে নিজের পৌরুষ দেখানোর জন্য বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, দেখা যাবে, কার বুক শুকিয়ে গেছে, আমার না তার!' আবু জাহেলের কথাকে ভুল প্রমাণ করতে গিয়ে বদরের দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে সবার আগে এগিয়ে যায়। আবু জাহেলের ব্যক্তিত্বই ছিল এমন। সে উসকানি দিয়ে মানুষকে ক্ষেপিয়ে দিতে পারত। সে একাই পুরো কুরাইশ বাহিনীকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম হয়।

উতবার ঘটনা থেকে শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ উতবার ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, 'কুরাইশদের কারো মাঝে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে, তবে তা উতবার মাঝেই রয়েছে। তারা যদি তার কথা শুনতো তবে তারা সঠিক কাজটাই করতো।' কাফিরদের মধ্যে দু'ধরনের লোক আছে। একটি দল হলো উগ্রপন্থী, ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী। তারা যুদ্ধ ও রক্তারক্তি পছন্দ করে। অপর দলটির জ্ঞান এবং বোধবুদ্ধি আছে, তারা মধ্যমপন্থায় বিশ্বাস

করে। কিন্তু, যখনই ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে কাফিরদের বিরোধ হয়, তখন এই মধ্যমপন্থী কাফিরদের মতামত, উগ্রপন্থী কাফিরদের কুযুক্তি ও উত্তেজক বিবৃতির নিচে চাপা পড়ে যায়। ফলে এই উগ্রপন্থীরা যুদ্ধে চালকের আসনে আসীন হয়।

অনেক মুসলিম সরলমনে এমনটা আশা করে যে, কাফিরদের মধ্যেও যেহেতু কিছু যুদ্ধবিরোধী, মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোক আছে, নিশ্চয়ই তাদের কথা এসব 'উগ্রবাদী, জঙ্গী কাফির'দের উপর প্রাধান্য পাবে এবং কাফিররা যুদ্ধের পথ ছেড়ে দেবে। এক কুফর শক্তির সাথে আরেক কুফর শক্তির সংঘাতে এমনটা হলেও, যখন আল্লাহর দ্বীনের সাথে, আল্লাহর নবীদের সাথে বা নবীদের অনুসারীদের সাথে কুফরের সংঘাত হয় তখন শান্তিকামীদের কণ্ঠ উগ্রবাদীদের জোরালো মিডিয়া প্রপাগান্ডার নিচে চাপা পড়ে – এটাই বাস্তবতা।

যেমন, আবু সুফিয়ানের কথায় যুক্তি ছিল। সে কুরাইশ বাহিনীকে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ এড়াতে বলেছিল। বনু যাহরা গোত্রের নেতা ছিল আখনাস ইবন শুরাইক। তারা এ যুদ্ধে জড়ায়নি, তারা নিজেদের ভাইদের বিরুদ্ধে লড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। একইভাবে উতবা এবং হাকিম ইবন হিযামও যুদ্ধের বিপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের কথায় কুরাইশরা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত হয়নি।

ইসলাম ও মুসলিমদের কোনো ব্যাপারে কাফিরদের আচরণ স্বাভাবিক থেকে ভিন্ন। যেমন আবু সুফিয়ানের ছেলেকে মুসলিমরা যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে যায়। আবু সুফিয়ানকে বলা হয় সে যেন মুক্তিপণ দিয়ে তার ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিমরা তার এক ছেলেকে আগে হত্যা করেছিল। তাই সে জিদের বশে অপর ছেলেকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে প্রত্যাখ্যান করে। নিজের ছেলেকে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে ছাড়িয়ে আনেনি, বরং মুসলিমদের শিক্ষা দিতে সে কুরাইশদের দীর্ঘদিনের একটি প্রথা ভাঙে। কুরাইশরা হাজ্জযাত্রীদেরকে খুব সম্মান করতো। বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে তারা সকল হাজ্জযাত্রীকে আদর-আপ্যায়ন করতো। কিন্তু সেবার কোনো এক আরব মুসলিম গোত্রের এক সদস্য হাজ্জ করতে গেলে প্রতিশোধ স্বরুপ আবু সুফিয়ান তাকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রাখে।

ইবনে ইসহাক্ব বলেন, 'কুরাইশরা ঐতিহাসিকভাবে হাজীদের প্রতি অতিথিপরায়ণ ছিল। কিন্তু প্রথমবারের মতো তারা ওই রীতি ভঙ্গ করে। আবু সুফিয়ান ওই মুসলিমকে কারাবন্দী করে রাখে। কারাবন্দী মুসলিমের পরিবার রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এসে বিষয়টি জানায়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ানের ছেলেকে মুক্ত করে দেন। এরপর আবু সুফিয়ান সেই কারাবন্দী মুসলিমকে মুক্ত করে দেয়।'

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মুসলিমদের প্রতি কাফিরদের আচরণ স্বাভাবিক থেকে আলাদা। ইসলাম ও মুসলিম সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের নৈতিকতার মানদণ্ড পাল্টে যায়। সবার জন্য একই আইন, কিন্তু মুসলিমদের জন্য ভিন্ন। কাফিরদের মধ্যে কোনো প্রজ্ঞাবান, শান্তিকামী আর মধ্যমপন্থী মানুষ থাকলেও মুসলিমদের বিষয় আসলে তাদের চেহারা

পাল্টে যায়। শয়তান তার অনুসারীদের মধ্যে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে চায় যে, ইসলামের অনুসারীদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

আল্লাহ চেয়েছিলেন যেন এই যুদ্ধ হয়। আর যখন শত্রুরা দেখলো মুসলিমরা সংখ্যায় কম, তখন তারা খুশি হয়ে যুদ্ধে নামলো। কেননা তারা ভাবছিল এ যুদ্ধে তাদের জেতার সম্ভাবনাই বেশি। তারা বে-খেয়াল আর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে যুদ্ধে নামে। এটি ছিল তাদেরকে যুদ্ধে আনার জন্য টোপস্বরূপ। কিন্তু যখন তারা মুসলিমদের প্রকৃত শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে অনুধাবন করে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়।

সামরিক কৌশল

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক সামরিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যার ব্যবহার আরবরা এর আগে করেনি। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই যুদ্ধে সারিবদ্ধ আক্রমণের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনি সৈন্যদেরকে তাদের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারি, তৃতীয় সারি - এভাবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাতেন। প্রথম সারিতে তিনি রাখতেন বর্শাধারী সৈন্যদের, আর তার পেছনে রাখতেন তীরন্দাজদের। তীরন্দাজরা পিছন থেকে তীর ছুঁড়তো আর প্রথম সারির সৈন্যরা শত্রুদেরকে সামনে অগ্রসর হতে বাধা দিত। এটি ছিল আরবদের জন্য নতুন কৌশল। আল্লাহ বলেন,

> **"আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।" (সূরা আস-সাফ, ৬১: ৪)**

যুদ্ধের এ সারিবদ্ধ কৌশলকে বলা হয় যাহফ। রোমান আর পারস্যরা এই কৌশল ব্যবহার করতো। এই পদ্ধতিতে একজন সেনাপ্রধানের পক্ষে তাঁর বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ ছিল। এভাবেই নবীজি ﷺ বেশিরভাগ যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

মুজাহিদদের প্রতি রাসূলুল্লাহর ﷺ উৎসাহ প্রদান

বদরের ময়দান। ইসলামের প্রথম মুজাহিদ বাহিনী প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,

> *"যে কেউ তাদের সাথে বীরত্বের সাথে লড়াই করবে এবং পিছু না হটে সামনের দিকে অগ্রসর হবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"*

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'ছুটে যাও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আকাশ এবং পৃথিবীর সমান!' উমাইর ইবন আল হামাম জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি! সত্যিই এত বড় জান্নাত আছে?', রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ! অবশ্যই আছে!' একথা শুনে উমাইর বলে উঠলেন, 'বাহ! বাহ!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাহ কেন

বললে?' উমাইর উত্তর দিলেন, 'আমি ভাবছি, ইশ! আমি যদি জান্নাতে যেতে পারতাম!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'অবশ্যই! তুমি জান্নাতীদেরই একজন!' এরপর উমাইর ইবন হামাম উঠে দাঁড়ালেন এবং কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে শুরু করলেন। হঠাৎ উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে বললেন, 'আরে! খেজুরগুলো খেতে তো অনেক সময় লেগে যাবে!'

উমাইর রাসূলুল্লাহর ﷺ কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহর পথে মারা যেতে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শহীদ হওয়ার জন্য এতটা আকুল ছিলেন যে, তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল খেজুর খাওয়া শেষ করে যুদ্ধে যোগ দিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই তিনি খেজুরগুলো ফেলে সাথে সাথে ময়দানে ছুটে যান।[100]

রাসূল ﷺ তাঁর বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, কারণ তা ছিল আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ।

> **"হে নবী, তুমি মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করো, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশো জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। এর কারণ হচ্ছে, তারা এমন এক জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না। (সূরা আনফাল, ৮: ৬৫)**

যুদ্ধমঞ্চ: বদর

রাসূলুল্লাহ ﷺ তীক্ষ্ণ চোখে সৈনিকদের সারির দিকে লক্ষ্য রাখছেন। তাঁর হাতে একটি তীর। তিনি যুদ্ধে সেনাদের সারি এমনভাবে সোজা করে সাজাতেন যেন তিনি সালাতের কাতার সোজা করছেন। সারিতে দাঁড়ানো এক সৈন্যের নাম ছিল সাওয়াদ ইবন গাযিয়াহ। তিনি তাঁর সারি থেকে একটু সামনে এগিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেটে আস্তে করে তীর দিয়ে একটি খোঁচা দিয়ে তাকে সারির ভেতর ঠেলে দিলেন। সাওয়াদ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আমাকে আঘাত করেছেন, আমি এর বদলা নিতে চাই।' এটা ছিল যুদ্ধের কিছুক্ষণ আগের ঘটনা। এক যোদ্ধা রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলছে সে বদলা নিতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেট উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, 'বদলা নেবে! নাও!'

রাসূল ﷺ রাগ করলেন না, সাওয়াদকে জেলে বন্দী করতেও বললেন না। কারণ এখানে একজন সৈনিক তার কমান্ডারের সাথে এমন আচরণ করছে। সাওয়াদ 'বদলা' নিলেন – তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ জড়িয়ে ধরে পেটে চুমু খেলেন – এই ছিল

---

[100] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৭।

তাঁর বদলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এমন আচরণের কারণ জানতে চাইলেন। সাওয়াদ জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি দেখতেই পাচ্ছেন কী হতে চলেছে। আমার জীবনের শেষ স্পর্শ আমি আপনার সাথে চেয়েছি আল্লাহর রাসূল ﷺ!'[101]

সাওয়াদ ﷺ আশঙ্কা করছিলেন তিনি এই যুদ্ধে নিহত হবেন। সাহাবীদের ﷺ জন্য বদরের আগে সেই মুহূর্তগুলো ছিল শঙ্কা দিয়ে ঘেরা। তাঁরা জানতেন না বাঁচবেন কি মরবেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন মৃত্যুর সামনে। রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য তাদের ভালোবাসা ছিল প্রচণ্ড। তাই শেষবারের মতো সাওয়াদ ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীরের স্পর্শ পেতে চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবী সাওয়াদকে ﷺ ইচ্ছা করে আঘাত দেননি, সাওয়াদ তা ভালো করেই জানতেন। কিন্তু তিনি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন যেন রাসূলুল্লাহকে ﷺ জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারেন। মুসলিমরা এভাবে ভাবতেন না যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ কারণে আজকে তাদের বিপদ, তাঁরা মৃত্যুর সম্মুখীন। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ জন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়াদের ﷺ জন্য দুআ করলেন।

সাওয়াদ যেভাবে রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবেসেছেন, সেটাই সত্যিকারের ভালোবাসা। কবিতা কিংবা নাশিদ নয়, রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য সত্যিকারের ভালোবাসা হলো তাঁর জন্য, তাঁর সম্মানের জন্য, তাঁর আনীত দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা না করা। নিজের জান, মাল, পরিবার, টাকা-পয়সা, সন্তান-সন্ততি, মেধা – সবকিছুকে কুরবানি করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালোবাসা মানে তাঁর দ্বীনকে ভালোবাসা, তাঁর শরীয়াহ ও সুন্নাহকে ভালোবাসা, তাঁর সবকিছুকে ভালোবাসা। একজন মু'মিন কুফরে ফিরে যাওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া পছন্দ করবে। এর আগে একজন মু'মিন কখনো ঈমানের মিষ্টতা উপলব্ধি করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনী সাজালেন, লড়াইয়ের স্থান বাছাই করলেন, তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করলেন – একে একে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। জাগতিক সকল প্রস্তুতি নেওয়া শেষ করে এরপর তিনি আল্লাহ আযযা ওয়া জালের উপর ভরসা করে দুআ করলেন। এটিই হলো তাওয়াক্কুল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পাশে গিয়ে দুই হাত তুলে দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তিনি খুব গভীরভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তিনি বললেন,

> *'হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছো, তা পূরণ করো। আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন করছি। তা না হলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদাত করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।'*[102]

---

[101] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৭।

[102] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৯।

আজকের মতো কোটি কোটি মুসলিম সেই দিন ছিল না। মুসলিমদের সংখ্যা সেদিন ছিল এতই অল্প যে, যদি যুদ্ধে তারা নিহত হতো, তাহলে আল্লাহর ইবাদাত করার মতো আর কেউ থাকতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করেই যাচ্ছিলেন। একসময় তাঁর শরীর থেকে চাদর খুলে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাকুলতা দেখে আবু বকরের ﷺ খুব খারাপ লাগলো। তিনি বললেন, 'অনেক তো হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ।'

আবু বকর ﷺ বলতে চাচ্ছিলেন যে, কেন আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেকে ক্লান্ত করে তুলছেন যখন আল্লাহ তাঁকে ﷺ সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। আবু বকর ﷺ ছিলেন নরম মনের মানুষ। রাসূলুল্লাহর ﷺ আবেগ তাঁকে খুব স্পর্শ করতো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশ উৎফুল্ল ভাব নিয়ে বাইরে গেলেন ও সূরা আল কামারের দুটি আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন।

> "সংঘবদ্ধ দলটি শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে। বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময়। আর কিয়ামত অতি ভয়ঙ্কর ও তিক্ততর।" (সূরা আল-ক্বমার, ৫৪: ৪৫-৪৬)

রাসূলুল্লাহর ﷺ দীর্ঘ দুআর পর আল্লাহ তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ দেন।

> "আর স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট (কাতর কণ্ঠে) ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করছি।" (সূরা আনফাল, ৮: ৯)

আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে ﷺ জানিয়ে দিলেন তিনি ১০০০ ফেরেশতা পাঠাবেন। কাফিরদের সাথে লড়তে একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট, জিবরীল ﷺ তাঁর পাখার সরু প্রান্ত দিয়েই পুরো লূত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারপরেও আল্লাহ তাআলা এক হাজার ফেরেশতা পাঠানোর ওয়াদা করেছেন। কারণ তিনি চেয়েছেন আল্লাহর রাসূলের ﷺ মনে স্বস্তি এনে দিতে। এখানে সংখ্যা আসল কথা নয়, আসল কথা হলো রাসূলুল্লাহর ﷺ মনের প্রশান্তি।

> "সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ১৭)

কুরাইশ বাহিনীতে ছিল এক প্রচণ্ড বদমেজাজি লোক। তার নাম আল আসওয়াদ আল

মাখযুমি। সে জিদ করলো যে সে মুসলিমদের কব্জায় থাকা কুয়া থেকে পানি তুলে খাবে। আসওয়াদ কুয়ার দিকে এগোতে থাকলো। হামযা ﷺ তার পায়ে আঘাত করলেন, তার পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু সে এতই একগুঁয়ে ছিল কাটা-পা নিয়ে সে কুয়ার দিকে যেতে থাকলো। শপথ পূরণ করতে সে বদ্ধপরিকর। হামযা আবার তাকে আঘাত করলেন, শেষ পর্যন্ত সে মারা যায়।

উতবা ইবন রাবিয়াহ, তাঁর ছেলে আল ওয়ালিদ ইবন উতবা ও তার ভাই শায়েবা - কুরাইশদের মধ্য থেকে এই তিনজন দাঁড়িয়ে গেল। তারা মুসলিমদের দ্বৈত যুদ্ধের আহ্বান জানালো। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আনসারদের মধ্য থেকে তিনজন এগিয়ে যান। আউফ, মুয়ায ইবনে আফরা এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। তাঁরা এগিয়ে গেলে উতবা তাদেরকে বললো,

- তোমরা কারা?
- আমরা আল আনসার।
- কিন্তু আমরা তোমাদের সাথে লড়তে চাই না। আমরা আমাদের নিজেদের লোকদের সাথে লড়বো, যারা আমাদের মধ্য থেকে মুসলিম হয়ে গেছে।[103]

উতবা মুহাজির কারো সাথে লড়তে চাইছিল। উতবা ছিল কুরাইশদের বিশিষ্ট নেতা। আবু জাহেল তাকে কাপুরুষ ডেকে এত ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল যে সে নিজের পৌরুষ প্রমাণে তার ভাই আর ছেলেকে নিয়ে দ্বৈত যুদ্ধে নেমে যায়। রাসূলুল্লাহও ﷺ চাচ্ছিলেন দ্বৈত যুদ্ধে আনসাররা অংশ না নিক। তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর আত্মীয় এবং পরিবারের মধ্যে থেকে কেউ লড়তে এগিয়ে যাক। কেননা এটাই ছিল মুশরিক আর মুসলিমদের মধ্যকার প্রথম সমুখ যুদ্ধ, এর আগে যদিও বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হয়েছিল, কিন্তু এটি ছিল একটি যুদ্ধ, প্রথম যুদ্ধ। আর এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদেরকে ফেরত পাঠিয়ে তিনজন মুহাজিরকে বাছাই করলেন, 'হামযা, উবাইদা এবং আলী, তোমরা ওঠো!' এরা তিনজনই রাসূলুল্লাহর ﷺ আত্মীয়। হামযা ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচা, আর আলী এবং উবাইদা ইবন হারিস – এ দু'জন ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচাতো ভাই। তাঁরা তিনজন দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুরাইশদের জবাব দিতে এগিয়ে যান। এই তিনজনের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন উবাইদা। তিনি তাই লড়লেন উতবার সাথে, সে ছিল মুশরিকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। আলী লড়লেন ওয়ালিদের সাথে, তাঁরা দু'জনেই ছিলেন স্ব স্ব পক্ষের দ্বন্দ্বযোদ্ধাদের মাঝে কনিষ্ঠ। হামযা ﷺ মুকাবিলা করলেন শাইবার।

হামযা ﷺ আর আলী ﷺ দুইজনই খুব দ্রুততার সাথে তাদের প্রতিপক্ষকে খতম করে দেন। কিন্তু উতবা আর উবাইদা ﷺ একে অপরকে আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণ করতে

---

[103] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮০।

থাকেন। দু'জন দু'জনকে আঘাত করেন এবং দু'জনই আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তখন আলী এবং হামযা এসে উতবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলেন।

আহত উবাইদাকে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে নিয়ে আসা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উরুতে উবাইদার মাথা রেখে তাকে সম্মান করলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচা আবু তালিব বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের কথা ভুলে যাবো কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ খেদমত করে যাবো, কখনো ভুলবো না।' রাসূলুল্লাহর ﷺ কোলে শুয়ে উবাইদা ﷺ বলেন, 'হায়, যদি আবু তালিব দেখতে পেতন যে আমি তাঁর কথা রেখেছি!' উবাইদা ইবন হারিস, রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য তাঁর জীবন দিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি একজন শহীদ।'

বদরের প্রান্তরের সেই দ্বৈত যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন[104],

> "এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। যারা কুফর করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং তাদের চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, বলা হবেঃ দহন যন্ত্রণা আস্বাদন কর (এরা ছিল বিতর্কে প্রথম দল যারা ঈমানে আনে নি) ।
>
> (বিতর্কের দ্বিতীয় দল) যারা ঈমানে এনেছে এবং এবং ভালো কাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন আর মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে, তাদের পোশাক হবে রেশমের। তারা পথপ্রদর্শিত হয়েছিল সৎবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহর পথে।" (সূরা হাজ্জ, ২২: ২০-২৪)

দ্বৈত যুদ্ধে হেরে গিয়ে কুরাইশরা রাগে অন্ধ হয়ে যায়। তারা মুসলিমদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন শত্রুরা কাছে না আসা পর্যন্ত যেন তারা আক্রমণ না করে। তিনি তাদের আদেশ করলেন, 'তোমরা তোমাদের তরবারি বের করো না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা তোমাদের নিকটে আসে।'

যুদ্ধ শুরুর পর মুশরিকরা মুসলিমদের তাদের সংখ্যার দ্বিগুণ দেখতে লাগলো। যুদ্ধ শুরুর আগে তারা সংখ্যায় মুসলিমদের কম দেখেছিল, কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন তারা মুসলিমদের দেখলো যেন তাঁরা সংখ্যায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ, মুশরিকরা ছিল ১০০০ আর তারা দেখল যে ২০০০ জন মুসলিম। সেটা দেখে তাদের মনোবল আরো ভেঙে

---

[104] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযী, হাদীস ২২।

পড়ে।

> **"নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল যুদ্ধ করছিল আল্লাহর পথে, আর অপর দলটি ছিল কাফের, তারা স্বচক্ষে মুসলিমদের সংখ্যায় তাদের দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৩)**

যুদ্ধে মুসলিমদের রণধ্বনি ছিল 'আহাদ! আহাদ!' মুসলিমদের প্রতিটি যুদ্ধে সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু স্লোগান ও রণধ্বনি থাকতো। পুরো যুদ্ধজুড়ে তারা সেগুলো আবৃত্তি করতো।

একজন আনসারী সাহাবি হারিসা ইবন শুরাকা আল-খাযরাজি ﷺ এই যুদ্ধে ভুলক্রমে মুসলিমদের ছোঁড়া একটি তীরে নিহত হন। যুদ্ধের পর তাঁর মা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে দেখা করে জানতে চাইলেন, 'আমার ছেলে কি জান্নাতে যাবে? যদি সে জান্নাত পায় তাহলে আমি অনেক খুশি হবো। কিন্তু যদি না যায় তাহলে অনেক কষ্ট পাবো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কেন যাবে না? অবশ্যই যাবে! জান্নাতে অনেক বাগান আছে, আর তোমার ছেলে আছে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু বাগানটায়!'

> **"বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। স্মরণ করুন আপনি যখন বলতে লাগলেন মু'মিনদেরকে – তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। অবশ্য, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে স্মরণ করো এবং শত্রুপক্ষ তোমাদের উপর হঠাৎ চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের রব (প্রয়োজনে) পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আসলে এ সংখ্যাটা বলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য একটি সুসংবাদ দিয়েছেন, (বিজয়ের জন্য তো তিনিই যথেষ্ট) যাতে তোমাদের মন প্রশান্ত ও আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য ও বিজয়! সে তো পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১২৩-১২৬)**

মুসলিমদের বিজয়ের জন্য ফেরেশতা পাঠানোর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবু আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠিয়েছেন মুসলিমদের স্বস্তি প্রদান করার জন্য, তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দিতে। এই যুদ্ধে সেদিন নেমেছিলেন স্বয়ং জিবরীল।

ফেরেশতারা ছিলেন সাদা রঙের পাগড়ি পরিহিত। শুধু জিবরীল পরেছিলেন হলুদ পাগড়ি, যেন তাঁকে আলাদা করা সহজ হয়। তিনি ছিলেন সেদিন ফেরেশতা বাহিনীর নেতা। যুদ্ধে এক মুসলিম প্রবল বেগে এক কাফিরকে ধাওয়া করছিলেন। ধাওয়া

করতে করতে সে হঠাৎ তাঁর মাথার উপরে চাবুকের শপাং শপাং আওয়াজ শুনে পান। তাঁর কাছে মনে হলো, কেউ একজন ঘোড়ার উপর থেকে বলছে, 'চল হায়যুম! চল!' এরপর সে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন তাঁর সামনের সেই কাফির মাটিতে পড়ে আছে, তার নাক থেঁতলে গেছে এবং চাবুকের আঘাতে তার মুখ দু'ভাগ হয়ে গেছে। এটি ছিল আগুনের একটি আঘাত। সেই আনসারী সাহাবি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বিষয়টি জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি সত্য বলছো, এটি ছিল তৃতীয় আসমানের সাহায্য।' অর্থাৎ, এটি ছিলেন একজন ফেরেশতা। তিনি "হায়যুম" নামক ঘোড়ায় আরোহণ করছিলেন।

গিফারী গোত্রের এক লোক তার নিজ মুখে বর্ণনা করেছে সেদিনের আসমানী সাহায্যের কথা: 'আমি আর আমার চাচাতো ভাই বদরের সেইদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমরা তখনো মুশরিক ছিলাম। আমরা একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসে যুদ্ধ শুরুর অপেক্ষা করছি। সেখানে বসে দেখছি কে এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। এক পর্যায়ে এক টুকরো মেঘ এগিয়ে আসলো। মেঘটি পাহাড়ের কাছাকাছি আসার পর আমরা ঘোড়ার ছোটাছুটির আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেইসাথে আরও একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'উক্বদিম হায়যুম!' আমার বন্ধু ঘটনাস্থলেই ভয় পেয়ে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা যায়। আমিও ভয়ে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে পরে সুস্থ হয়ে উঠি।'

আবু দাউদ মাযুনী বলেন, 'আমি আমার সামনের এক মুশরিককে ধাওয়া করছিলাম। হঠাৎ দেখি আমি তাকে মারার আগেই তার মাথা শরীর থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম তাকে অন্য কেউ হত্যা করেছে।' আনাস ইবন মালিক ﵁ বলেন, 'লাশগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, কারা ফেরেশতাদের হাতে মরেছে আর কারা আমাদের তলোয়ারের আঘাতে মরেছে। যারা ফেরেশতাদের হাতে মরেছে তাদের ঘাড়ে আঙ্গুলের ছাপ দেখে মনে হচ্ছিল তাদেরকে তপ্ত লোহা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।'

ফেরেশতারা সেদিনের সেই যুদ্ধে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা ধরে ধরে যুদ্ধবন্দিদেরও পাকড়াও করেছিলেন। আল-আব্বাসকে সেদিন নবীজির ﷺ কাছে ধরে নিয়ে আসেন এক আনসারী সাহাবি। আল আব্বাস বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে তো এই লোক পাকড়াও করেনি। আমাকে পাকড়াও করেছে বর্মবিহীন এক সুদর্শন পুরুষ। সে সওয়ারী ছিল সাদা-কালো ছোপ-ছোপযুক্ত ঘোড়ার উপর। আমি তাকে আপনার সৈন্যদের মধ্যে দেখতে পাইনি।' একজন আনসারী বললেন, 'না! আমিই তাকে পাকড়াও করেছি আল্লাহর রাসূল ﷺ', রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "চুপ থাকো, আল্লাহ তোমাকে একজন সম্মানিত ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন" ।

ইবনে আব্বাস বলেন, 'একমাত্র বদরের যুদ্ধেই ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করেছেন। অন্য যুদ্ধে তাঁরা অতিরিক্ত সৈন্য বাহিনী এবং সহায়তা প্রস্তুত রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা যুদ্ধ করেননি। এই যুদ্ধে ৭০ জন মুশরিক নিহত হয় এবং ৭০ জন যুদ্ধবন্দী হয়।

মুসলিমদের কেউ যুদ্ধবন্দী হয়নি, শাহাদাত বরণ করেন ১৪ জন। ৬ জন ছিলেন মুহাজির, আল খাযরাজ থেকে ৬ জন এবং আল আউস থেকে ২ জন।

আবু জাহেল: এক ফেরাউনের জীবনাবসান

এই যুদ্ধেই কুরাইশদের জাঁদরেল নেতা, ইসলামের ঘোরতর শত্রু আবু জাহেলের শেষ পরিণতি হয়। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাহমান ইবন আউফ ﷺ।[105] যুদ্ধের ময়দানে সেদিন আব্দুর রহমান ইবন আউফের পাশে যুদ্ধ করছিল দুই বাচ্চা ছেলে। তিনি বাচ্চা দুটোকে দেখে মনে মনে বিরক্ত হলেন। সৈনিকরা সবসময় চায় তাদের পাশে শক্তিশালী সহযোদ্ধা থাকুক। যুদ্ধ চলছে, এ অবস্থায় আব্দুর রাহমান ইবন আউফকে তাঁর ডান পাশের ছেলেটি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'চাচা, এখানে আবু জাহেল কে? আমাকে একটু দেখিয়ে দিন।' আব্দুর রাহমান ইবন আউফ জিজ্ঞেস করলেন, 'বালক, তুমি আবু জাহেলকে কেন খুঁজছো?' ছেলেটি জবাব দিল, 'আল্লাহর কসম! আমি যদি তাকে দেখতে পাই তাহলে তাকে হত্যা করবো অথবা আমি নিজে মরে যাব।' এই কথা শুনে আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ বুঝলেন তিনি ছেলেগুলোকে যেমন ভেবেছিলেন তারা তেমন নয়, তারা অনেক সাহসী। আব্দুর রাহমান ডান পাশের সেই ছেলেকে আবু জাহেলের অবস্থান দেখিয়ে দিলেন।

আব্দুর রাহমানের বাম পাশের ছেলেটিও তাঁর কানে ফিসফিস করে একই প্রশ্ন করলো। এই দুই ভাই আবু জাহেলকে হত্যা করার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছিল। তাই তারা ফিসফিস করছিলো যেন অপরজন শুনতে না পায়। আব্দুর রাহমানের বর্ণনায়, 'ছেলে দুটি বাজ পাখির বেগে আবু জাহেলের দিকে ধেয়ে গেল আর আঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললো।'

এরা দু'জন ছিল মুয়ায ইবনে আমর ইবন জামুহ এবং মুয়ায ইবনে আফরা। তাঁরা ছিল সহোদর ভাই। এদের মধ্যে একজন আবু জাহেলকে আক্রমণ করে তার পা ভেঙে দেয়। আবু জাহেলের ছেলে ইকরিমা সেটা দেখতে পেয়ে মুয়াযের হাতে আঘাত করে। তার হাত শরীর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলতে থাকে। কাটা হাত নিয়ে যুদ্ধ করতে মুয়াযের অসুবিধা হচ্ছিল। তাই সে কাটা হাতে পা রেখে টান দিয়ে সেটা শরীর থেকে পুরোপুরি আলাদা করে আবার যুদ্ধে মনোযোগ দেয়। এই দুই কিশোর আবু জাহেলকে মারাত্মকভাবে আহত করে মাটিতে ফেলে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আছে আমাকে আবু জাহেলের শেষ পরিণতির কথা জানাবে?' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমি আবু জাহেলকে খুঁজতে গেলাম। দেখলাম মাটিতে এক লোক পড়ে আছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি এটাই আবু জাহেল। আমি তার গলায় পা রাখলাম। মক্কায় সে একবার

---

[105] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৫।

আমাকে বন্দী করে লাথি মেরেছিল।' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর দুশমন! দেখলি তো শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তোকে কীভাবে অপমানিত করলেন?' আবু জাহেল বললো, 'আল্লাহ আমাকে অপমানিত করেছেন? আরে, যাকে হত্যা করলি তার চেয়ে অভিজাত আর কেউ কি আছে? বল আমাকে আজ কারা জয়ী হয়েছে?' আবু জাহেল তার শেষ মুহূর্তে এসেও যুদ্ধের ফলাফল জানতে চেয়েছিল। অপর এক বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন যে, 'আবু জাহেল মাটিতে শুয়ে তার ধারালো তরবারি নিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। আমার তরবারিটি ছিল ভোঁতা। আমি আবু জাহেলের হাতে আঘাত করে তার তরবারি ফেলে দিলাম আর তার বুকের উপর পা দিয়ে দাঁড়ালাম। আবু জাহেল আমাকে বললো, 'ওরে বকরীর রাখাল, তুই বহুত উঁচু জায়গায় উঠে পড়েছিস।' মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও আবু জাহেল তার ঔদ্ধত্য দেখিয়ে চলছিল। ইবনে মাসউদ বলেন, 'এরপর আমি তার মাথা কেটে নিয়ে সেটি আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে নিয়ে গেলাম। আমার খুব খুশি লাগছিল কারণ আমি আবু জাহেলের মাথা আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে নিয়ে যাচ্ছি। আনন্দে আমি যেন হাওয়ায় ভাসতে থাকলাম।' ইবনে মাসউদ আবু জাহেলের কাটা মাথা নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে হাজির হলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এই হলো আল্লাহর দুশমনের মাথা!' রাসূলুল্লাহ ﷺ খুশিতে আত্মহারা হলেন, 'সত্যি!' ইবনে মাসউদ বললেন, 'হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল ﷺ!'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তোকে অপমানিত করেছেন, তুই আল্লাহর শত্রু। প্রত্যেক উম্মাতের একজন ফিরআউন আছে, আর এ হচ্ছে এই উম্মাতের ফিরআউন।'

আবু জাহেলকে হত্যা করতে আল্লাহ বেছে নিয়েছেন আনসারদের দুই কিশোর এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে আবু জাহেল অপদস্থ করতো। তিনি ছিলেন খুবই পাতলা গড়নের। একদিন তিনি খেজুর গাছে উঠে বসেছিলেন। বাতাস বইছিলো আর তিনি কেঁপে উঠছিলেন। তাঁর সরু সরু পা দেখে সাহাবারা ﷺ হেসে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'তোমরা কি একারণে হাসছো যে তাঁর পা খুবই সরু? আল্লাহর কসম, ক্বিয়ামাতের দিনে এই পা দুটো মীযানে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও ভারি হবে।'

কে কত পেশিবহুল বা শক্তিশালী – সেটাই সবকিছু নয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন খুবই হালকা-পাতলা, মক্কার নিচু গোত্রের একজন সদস্য, দাসীর সন্তান। কিন্তু তাঁকে দিয়েই আল্লাহ কুরাইশদের সবচেয়ে অভিজাত, প্রভাবশালী এবং জাঁদরেল নেতাকে হত্যা করিয়েছেন। একজন মুসলিম মুজাহিদ তার যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে কিন্তু সেগুলোর উপর তাওয়াক্কুল করবে না, তাওয়াক্কুল করবে শুধু আল্লাহর উপর।

ইবনে কাসির (রহ) আবু জাহেলের মৃত্যু সম্পর্কে বলেন, 'আবু জাহেলের মৃত্যু হয়েছিল আনসারী এক যুবকের হাতে। এরপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ তার বুকের ওপর পা দিয়ে উঠে দাঁড়ান। এর মাধ্যমে আল্লাহ মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দিয়েছেন। আবু

জাহেলের স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারতো, ছাদ ধসে কিংবা বজ্রপাতে। কিন্তু লাঞ্ছনার মাধ্যমে তার মৃত্যু হওয়ায় ঈমানদারদের অন্তর বেশি প্রশান্ত হয়েছে।'

> **"যুদ্ধ কর ওদের সাথে – আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন – আর দূর করবেন তাদের মনের ক্ষোভ। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"** (সূরা তাওবাহ, ৯: ১৪-১৫)

এখানে প্রতিশোধের ব্যাপারটি জড়িত। মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে মক্কার কুরাইশদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছিল। তাই আল্লাহ মু'মিনদের হাতে কাফিরদের শাস্তি দিয়েছেন যেন তাদের পরিণতি দেখে 'মু'মিনদের অন্তর শান্ত হয়' এবং 'তাদের মনের ক্ষোভ দূর হয়'।

নিয়তির টানে নিহত: উমাইয়া ইবন খালাফ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, সাদ ইবন মুয়ায ছিলেন উমাইয়া ইবন খালাফের অন্তরঙ্গ বন্ধু। যখনই উমাইয়া মদীনায় ভ্রমণে যেতো, সে সাদের ﷺ সাথে থাকতো। আর সাদ ﷺ যখন মক্কায় যেতেন তখন উমাইয়ার সাথে থাকতেন। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় পৌঁছালেন, সাদ তখন মক্কায় উমরা করতে এসেছিলেন। মক্কায় তিনি উমাইয়ার বাড়িতে উঠেছিলেন। তিনি উমাইয়াকে বললেন, 'আচ্ছা উমাইয়া, কোন সময়ে কাবার চারপাশটা খালি থাকে? আমি কাবাঘর তাওয়াফ করতে চাই।' উমাইয়া তাকে নিয়ে দুপুরে বের হলো। তখন আবু জাহেলের সাথে দেখা। আবু জাহেল তাদের দেখে বললো, 'হে আবু সাফওয়ান! তোমার সাথে এই লোকটি কে?' সে বলেছিল, 'সে হচ্ছে সাদ'।

আবু জাহেল সাদ ইবন মুয়াযকে সম্বোধন করে বললো, 'বাহ! তুমি দেখি মক্কায় নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছো! অথচ তুমি মক্কার এমন লোকদের নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছো যারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে! তুমি নাকি তাদের সবরকমের সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর! আল্লাহর কসম! আবু সাফওয়ান (উমাইয়া) যদি তোমার সাথে না থাকতো, তুমি তোমার পরিবারের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না।'

সাদ নিজেই ছিলেন একজন গোত্রনেতা। তিনি আবু জাহেলের হম্বিতম্বি পছন্দ করলেন না। তিনি গলা উঁচু করে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তুমি যদি আমাকে তাওয়াফ করতে বাধা দিতে, তাহলে আমিও তোমাকে এমন কাজে বাধা দেব যা তোমার জন্য আরো খারাপ হবে। মদীনার উপকণ্ঠ দিয়ে তোমার বাণিজ্যিক কাফেলার যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেব।' এই কথা শুনে উমাইয়া সাদকে বললো, 'সাদ, আবুল হাকাম মক্কার নেতা। তার সাথে উঁচু গলায় কথা বোলো না।' সাদ জবাবে বললেন, 'উমাইয়া, থামো!

আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূলকে ﷺ বলতে শুনেছি যে, তুমি মুসলিমদের হাতে মারা পড়বে।' উমাইয়া জিজ্ঞেস করলো, 'মক্কায়? সাদ বললেন, 'তা আমি জানি না।' উমাইয়া রাসূলুল্লাহর ﷺ এ ভবিষ্যতবাণী শুনে খুবই ভয় পেয়ে গেল।

উমাইয়া তার পরিবারের কাছে গেল। তার স্ত্রীকে বললো, 'উম্মে সাফওয়ান! তুমি কি জানো সাদ আমাকে কী বলেছে?' সে জিজ্ঞেস করলো, 'কী বলেছে সে?' উমাইয়া বললো, 'সে দাবি করছে যে মুহাম্মাদ ﷺ তার সাহাবাদেরকে ﷺ বলেছে যে তারা নাকি আমাকে হত্যা করবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সেটা কি মক্কায় ঘটবে, সে বললো সে জানে না।' তারপর উমাইয়া নিজেই বললো, 'আল্লাহর কসম! আমি কখনই মক্কার বাইরে যাবো না।' কিন্তু যখন বদরের দিন আসলো, আবু জাহেল সবাইকে যুদ্ধে যেতে আহ্বান করছিল এই বলে যে, 'যাও! তোমাদের কাফেলা রক্ষা করো।' কিন্তু উমাইয়া যেতে চাইলো না। সে ভয় পাচ্ছিল যদি সে মক্কার বাইরে গেলে মারা পড়ে। আবু জাহেল তার কাছে এসে বললো, 'দেখো আবু সাফওয়ান, তুমি একজন নেতা! তুমি যদি যুদ্ধে না যাও তাহলে অন্যেরাও বসে থাকবে।' আবু জাহেল তাকে চাপ দিতে লাগলো, একসময় উমাইয়া রাজি হলো। সে বললো, 'তুমি যেহেতু আমার সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য করেছো, আল্লাহর শপথ, আমি মক্কার সেরা উটে চড়ে যুদ্ধে যাবো।' সে তার স্ত্রীকে বললো, 'উম্মে সাফওয়ান, আমার যা যা লাগবে প্রস্তুত করো।' উম্ম সাফওয়ান তাকে বললো, 'তুমি কি ভুলে গেছ তোমার মদীনার ভাই তোমাকে কী বলেছে?' উমাইয়া বললো, 'না আমি ভুলিনি, কিন্তু আমি খুব বেশি দূর যাবো না।' রওনা হওয়ার পর সে রাস্তার যেখানেই কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে, সেখানেই সে তার উট বেঁধে রেখেছে। গোটা পথ জুড়ে সে এমনটা করলো এবং শেষ পর্যন্ত বদরের প্রান্তরে সে আল্লাহর হুকুমে মারা গেল।[106]

উমাইয়া ছিল একজন কাফির, কিন্তু মন থেকে ঠিকই সে বিশ্বাস করতো মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। তাই সে মক্কা ছেড়ে বের হতে ভয় পাচ্ছিল। যখন বদর যুদ্ধের ডাক আসলো, সে যেতে চাইলো না। তাই আবু জাহেল তাকে অপমান করার জন্য তার হাতে "মাবখারা" ধরিয়ে দিল, মাবখারা হচ্ছে এক ধরনের চুলা। বয়স্ক মহিলারা এই ধরনের চুলা ব্যবহার করে। উমাইয়াকে সে বুঝাতে চাইলো, 'তোমার মতো কাপুরুষের উচিত মহিলাদের চুলা নিয়ে বসে থাকা।' আবু জাহেল উমাইয়াকে ক্ষেপিয়ে তুলে যুদ্ধে নিয়ে যেতে চাইছিল। তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহর ﷺ ভবিষ্যতবাণী মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে ভয়ে ভয়ে যুদ্ধে গেল। প্রতিটি বিরতিতে তার মনে হলো, "আর সামনে এগোবো না", কিন্তু সে অগ্রসর হতে হতে একেবারে যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

যুদ্ধে উমাইয়া বন্দী হয়। উমাইয়া তার জাহেলিয়াতের পুরোনো বন্ধু আবদুর রাহমান ইবন আউফকে দেখে ডেকে ওঠেন, 'হে আব্দ আমর...!' কিন্তু আব্দুর রাহমান ইবন আউফ শুনেও না শোনার ভান করলেন। কারণ এটা ছিল তাঁর জাহেলিয়াত যুগের

---

[106] সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযি, হাদীস ২।

নাম। এদিকে উমাইয়াও তাঁকে তাঁর মুসলিম নাম "আব্দুর রহমান" ডাকতে চাচ্ছিল না। সে বললো, 'তোমাকে আব্দ আমর বলে ডাকলাম তুমি শুনলে না। আর আমিও তোমাকে আব্দুর রাহমান বলে ডাকবো না। এক কাজ করলে কেমন হয়, আমরা তোমার জন্য এমন একটা নাম ঠিক করি যে নাম শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যে থাকবে?' আব্দুর রাহমান ইবন আউফ বললেন, 'ঠিক আছে, তুমিই একটি নাম ঠিক করো।' উমাইয়া তাঁর নাম দিলেন আবদুল্লাহ, যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। আব্দুর রাহমান রাজি হলেন।

কথায় কথায় উমাইয়া আব্দুর রাহমানকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, যুদ্ধে তোমাদের দলে একটা লোককে দেখলাম যার বুক উটপাখির পালক দিয়ে ঢাকা। সে কে ছিল?' আব্দুর রাহমান ইবন আউফ উত্তর দিলেন, 'তিনি হচ্ছেন হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব'। উমাইয়া ইবন খালাফ বললো, 'হুম, এই লোকই আমাদের সর্বনাশ করেছে'।

আব্দুর রাহমান আর উমাইয়া ছিলেন জাহেলিয়াতের বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আবদুর রাহমান ইবন আউফের সাথে উমাইয়া ইবন খালাফের এই মর্মে চুক্তি ছিল যে, আব্দুর রাহমান মদীনায় উমাইয়ার ব্যবসা ও সম্পদ দেখাশোনা আর উমাইয়া মক্কায় আব্দুর রাহমানের সম্পদ বা পরিবারের দেখাশোনা করবে। যাই হোক, যুদ্ধ শেষে আব্দুর রাহমান শত্রুদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কিছু বর্ম নিয়ে হাঁটছিলেন। উমাইয়া তাঁকে বললো,

- আচ্ছা, তুমি কি তোমার হাতের ওই বর্মগুলো থেকে দামি কিছু চাও না?
- হ্যাঁ চাই, কিন্তু সেটা কী? আব্দুর রাহমান ইবন আউফ জিজ্ঞেস করলেন।
- আমি আর আমার ছেলে, তুমি আমাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে বন্দী করো।

উমাইয়া নিজের জান বাঁচানোর জন্য আব্দুর রাহমান ইবন আউফের হাতে বন্দী হতে চাইলো। উমাইয়া ছিল বেশ ধনী। তাই তাকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করলে আবদুর রাহমানও ভালো অংকের মুক্তিপণ লাভ করবেন, দু'জনেরই লাভ। আবদুর রাহমান ইবন আউফ তখন বর্মগুলো ফেলে দিয়ে বাপ-ছেলেকে আটক করলেন।

কিন্তু এমন একজন মানুষ উমাইয়াকে দেখে ফেললেন যে উমাইয়াকে শায়েস্তা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি হলেন বিলাল ইবনে রাবাহ ﷺ, উমাইয়ার সাবেক দাস। উমাইয়ার সাথে আব্দুর রাহমান ইবন আউফের শত্রুতা খুব বেশিদিনের নয়। তার আগে তাঁরা বন্ধু ছিলেন, কিন্তু বিলালের সাথে উমাইয়ার সম্পর্ক ছিল প্রচণ্ড তেতো। জাহিলিয়াতের যুগে বিলাল ছিলেন উমাইয়ার দাস। উমাইয়া তাঁকে নির্মমভাবে অত্যাচার করতো।

উমাইয়াকে দেখে বিলালের দুঃসহ স্মৃতি মনে পড়ে গেল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'উমাইয়া! কাফিরদের সর্দার!' আব্দুর রাহমান বললেন, 'বিলাল শোনো! সে আমার কয়েদি, আমার অধীনে আছে।' আব্দুর রাহমান বিলালকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন

যেন সে উমাইয়ার সাথে কিছু না করে কারণ সে যুদ্ধবন্দী। বিলাল বুঝলেন আব্দুর রাহমান ইবন আউফ উমাইয়াকে তাঁর হাতে ছাড়বেন না। তখন তিনি আনসারদের কাছে গিয়ে বললেন, 'ওই লোক হলো উমাইয়া! কুরাইশদের নেতা! হয় সে বেঁচে থাকবে না হয় আমি। আমি তাকে ছাড়বো না।' বিলালের কথা শুনে আনসাররা তৎক্ষণে ঘটনাস্থলে চলে এসেছে। আব্দুর রাহমান আশংকা করছিলেন যে তারা তাঁর ধরা যুদ্ধবন্দীদের ধরে নিয়ে মেরে ফেলবে। তাই তিনি উমাইয়ার পুত্র আলিকে তাদের জন্য ছেড়ে দিলেন যেন আলিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আনসাররা আলিকে হত্যা করে আবার উমাইয়াকে ধরার জন্য ছুটে গেলেন। উমাইয়া ছিল মোটাসোটা। আব্দুর রাহমান তাকে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসিয়ে নিজ শরীরকে ঢাল বানিয়ে উমাইয়াকে রক্ষা করার জন্য তার উপর শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আনসাররা তাদের তরবারি আব্দুর রাহমানের শরীরের নিচে দিয়ে ঢুকিয়ে উমাইয়াকে হত্যা করলেন। ধস্তাধস্তির মধ্যে কোনো এক আনসারি সাহাবীর তরবারি আব্দুর রাহমানের পায়ে লেগে জখম হয়।

আব্দুর রাহমান বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বিলালের উপর রহম করুন। আমার বর্মগুলো, আমার গ্রেফতার করা বন্দী দুটোই গেল।'[107]

উমাইয়া ইবন খালাফ ছিল কাফিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, এটাই ছিল তার শেষ পরিণতি। আল্লাহর রাসূলের ﷺ ভবিষ্যতবাণী সত্য হলো। মুসলিমদের হাতে সে মারা পড়লো। সে যুদ্ধে আসতে চায়নি। আসার পরেও সে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। মুসলিমদের হাতেই তাকে মরতে হয়।

অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের মৃত্যু

মুশরিকদের অন্যতম বিখ্যাত যোদ্ধা ছিল আবুল কিরশ। সে ছিল বেশ মোটাসোটা, ভুঁড়িওয়ালা, আগাগোড়া লোহার বর্মে আচ্ছাদিত। তার দুটি চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﷺ ছিলেন কৌশলী ও সাহসী যোদ্ধা। তিনি তাঁর বর্শা ছুঁড়ে প্রথম চেষ্টাতেই সরাসরি আবুল কিরশের চোখে আঘাত করতে সমর্থ হন। বর্মের ছোটো ছিদ্র দিয়ে বর্শা আবুল কিরশের চোখ হয়ে মাথায় ঢুকে যায়, আবুল কিরশ মাটিতে পড়ে যায় এবং মারা যায়। বর্মের ছিদ্র এতই ছোট ছিল যে সেটাকে বের করা সম্ভব হচ্ছিল না। আয যুবাইর তখন আবুল কিরশের শরীরের উপর দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে টেনে বর্শাটিকে বর্মের ছিদ্র থেকে বের করে আনেন। সেটা করতে গিয়ে বর্শার দুই মাথাই বেঁকে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বর্শাটিকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিজের জন্য রেখে দেন। আল্লাহর রাসূলের ﷺ ইন্তেকালের পর আবু বকর ﷺ এই বর্শা নিজের কাছে রেখে দেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তা যায় উমারের ﷺ কাছে। তাঁর মৃত্যুর পর যুবাইর তা ফিরে পান। কিন্তু উসমান ﷺ আবার এটি চেয়ে বসলে যুবাইর তা খলিফার কাছে দিয়ে দেন। উসমানের মৃত্যুর পর সেই বর্শা ছিল আলির ﷺ কাছে। আলীর

---

107 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০১।

মৃত্যুর পর যুবাইরের ছেলে আবদুল্লাহ ﷺ বর্শাটি পান।[108]

কুরাইশদের মধ্যে কিছু মহৎ ব্যক্তিত্ব ছিল। তার মধ্যে একজন হলো আবুল বাখতারি। কাফির হলেও মুসলিমদের প্রতি সে নিষ্ঠুর ছিল না। শেবে আবু তালিবে যখন বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে তিন বছর ধরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় তখন এই অবরোধের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন এই আবুল বাখতারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এই প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি মুসলিমদেরকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন, 'যদি আবুল বাখতারিকে যুদ্ধের মাঠে দেখো তাহলে তাকে হত্যা কোরো না।'

কোনো কাফির যদি মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তাহলে মুসলিমদেরও উচিত তার প্রতি সদয় হওয়া। একজন আনসার সাহাবী ﷺ সেদিন ময়দানে আবুল বাখতারিকে দেখে তাকে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তাকে যেন হত্যা করা না হয়। সে জিজ্ঞেস করলো, 'আর আমার সাথীদের কী হবে?' আনসার উত্তর দিলেন যে, 'তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব, কিন্তু তোমার সাথীদের ছাড়বো না।' আবুল বাখতারি বললো, 'আমি আমার সাথীদের রক্ষা করতে লড়াই করে যাবো।' সেই আনসারী সাহাবি বাধ্য হয়ে আল বাখতারির সাথে লড়াই করলেন। লড়াইয়ে আবুল বাখতারি নিহত হন।

ওই আনসারী সাহাবি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বলেন, 'সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। আমি তাকে বন্দী করে আপনার কাছে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছি কিন্তু সে জোরপূর্বক আমার সাথে লড়াই করে। তাই আমি পাল্টা আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেছি।'[109]

যুদ্ধের অব্যবহিত পর

আল্লাহর রাসূল ﷺ বদরের যুদ্ধে নিহত ২৪ নেতার লাশকে একটি নোংরা পরিত্যক্ত কুয়ায় ফেলে দেওয়ার আদেশ করেন। এরপর সেই ২৪ জন নেতার লাশ ওই জায়গায় নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।

এ যুদ্ধে নিহত হয় কাফিরদের বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতা। তাদের মধ্যে একজন ছিল উতবা ইবন রাবি'য়াহ। তার লাশ টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তারই পুত্র আবু হুযাইফা ﷺ। তিনি বিমর্ষ মুখে সেই দৃশ্য দেখছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখে বুঝলেন তাঁর মন বেশ খারাপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি তাঁর পিতার পরিণতি দেখে দুঃখ পেয়েছেন কি না। আবু হুযাইফা জবাবে বললেন,

---

108 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৮।

109 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০০।

'আমি কসম করে বলছি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আমার পিতার পরিণতিতে কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমি তাঁর মাঝে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং ভালো কিছু দেখে ভেবেছিলাম হয়তো এগুলো তাকে একদিন ইসলামের ছায়ায় নিয়ে আসবে। কিন্তু এখন তাঁর পরিণাম দেখে, কুফরির উপর তাঁর জীবন শেষ হতে দেখে খুব কষ্ট লাগছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু হুযাইফার জন্য দুআ করলেন।

হিদায়াতের বিষয়টি আল্লাহর হাতে, কেউ এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আবু হুযাইফা বলছিলেন তাঁর পিতা ছিলেন প্রজ্ঞাবান, যুক্তিবাদী, ভালো মানুষ আর দূরদর্শী ব্যক্তি। কিন্তু এসকল গুণ থাকা সত্ত্বেও সে ঈমান আনেনি, যেমনটা আবু হুযাইফা আশা করেছিলেন। আবু তালিবের ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যাপার হয়েছিল। আবু তালিবের মধ্যে অসাধারণ কিছু গুণ ছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, কিন্তু তবু আবু তালিব মুসলিম হননি। আবু তালিব সারাজীবন আল্লাহর নবীকে আশ্রয় দিয়ে কাফির অবস্থায় মারা গেছেন, আর আবু সুফিয়ান দীর্ঘদিন আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শেষ অবধি মারা যান মুসলিম হিসেবে। অন্যদিকে উমার ইবন খাত্তাব ؓ প্রাথমিক যুগে ইসলামের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও পরে মুসলিম হয়েছেন। অথচ উমার ইসলাম গ্রহণ করবেন এমনটা কেউ আশাও করেনি। তিনি যে শুধু মুসলিম হয়েছিলেন তা নয়, তিনি শ্রেষ্ঠ মুসলিমদের একজন হয়েছিলেন।

ভালোবাসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে হওয়া চাই। আবু হুযাইফা তাঁর পিতার পরিণতিতে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু এজন্য তিনি দুঃখে ইসলাম ছেড়ে যাননি বা কাউকে দোষারোপও করেননি। তিনি আল্লাহর ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছিলেন। ইসলামের অবস্থান পরিবার, সমাজ – সবকিছুর উপরে। যদি কারো কাছে সুন্দর করে দাওয়াহ পৌছানোর পরেও সে মুসলিম না হয় তাহলে অস্থির হওয়া উচিত নয়, কেননা এটা আল্লাহরই ইচ্ছা। আর যদি তারা মুসলিম হয় তাহলে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাদের পথ দেখিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো গোত্র বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সে স্থানের উপকণ্ঠে তিনদিন অবস্থান করতেন। বদর প্রান্তরে অবস্থানের পর তৃতীয় দিন তিনি তাঁর উট প্রস্তুত করতে আদেশ দেন। এরপর তিনি হাঁটতে থাকেন। সাহাবারা ؓ তাকে বরাবরের মতো অনুসরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ গিয়ে দাঁড়ালেন আল-ক্বালীবের সেই কুয়ার কিনারায়। কুয়ায় নিক্ষিপ্ত ওই নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে তিনি ডাকতে শুরু করলেন। তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

> *'হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে, সেটাই কি তোমাদের জন্য ভালো হতো না? আমাদের রব আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি, তোমাদের রব তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তোমরা তা সত্য পেয়েছ*

কি?'[110]

এ কথা শুনে 'উমার ﷺ অবাক হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, আপনি এমন সব দেহের সাথে কি কথা বলছেন, যাদের রুহ নেই!' নবীজি ﷺ বললেন, 'সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যা বলছি তোমরা ওদের চাইতে বেশি শুনতে পাও না। কিন্তু ওরা জবাব দিতে পারে না।' আল্লাহ তাদেরকে অপমান ও তাচ্ছিল্য করতে, অনুশোচনা ও লজ্জা দিতে তাদের দেহে সাময়িকভাবে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। তাদের যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দিতে আল্লাহ কথাগুলো তাদের শুনিয়েছিলেন।

মদীনায় বিজয়সংবাদ প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর বিজয়ের সংবাদ সবার কাছে পৌঁছে দিতে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা এবং যাইদ ইবন হারিসাকে মদীনায় পাঠান । আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা গেলেন মদীনার বহির্ভাগ আওয়ালিতে। সেখানে তিনি প্রত্যেক আনসারের বাড়িতে সংবাদ পৌঁছে দিলেন। আর যুদ্ধ জয়ের সংবাদ নিয়ে যাইদ ইবন হারিসা মদীনার একদম ভেতরে চলে গেলেন। যাইদ ইবন হারিসা রাসূলুল্লাহর ﷺ উটনীর পিঠে বসে নিহত কুরাইশ নেতাদের নাম ধরে ধরে বলতে লাগলেন 'উতবা ইবন রাবিয়াহ নিহত হয়েছে! আবু জাহেলও নিহত হয়েছে!' এভাবে ঘোষণা দিয়ে তিনি যখন উচ্ছ্বাসের সাথে মদীনায় প্রবেশ করছেন, তখন মদীনার মুনাফিক্ব আর ইহুদিরা বলাবলি করতে লাগলো, 'এ লোক পাগল নাকি! সে যে কী বলছে সে তো নিজেই জানে না! তার মাথা ঠিক নেই, সে মনে হয় ভয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। তোমরা দেখেছ যাইদ কার উটের পিঠে চড়ে এসেছে? এটা মুহাম্মাদের উট, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ যুদ্ধে মারা গেছে। তা না হলে তার উট যাইদ পেল কী করে?' তারা এসব কথা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিল।

উসামা এবং উসমান বদরের যুদ্ধে অংশ নেননি। নবীজি ﷺ তাঁর কন্যা রুকাইয়ার দেখাশুনা করতে তাঁদের রেখে গিয়েছিলেন। উসামা তাঁর বাবা যাইদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা! আপনি যে খবর দিলেন তা কি সত্যি?' যাইদ বললেন, 'হ্যাঁ সত্যি!' এরপর লোকেরা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো যাইদ ইবন হারিসা যা বলছেন তা সত্য কি না। তিনিও বিজয়ের সংবাদ নিশ্চিত করলেন। তিনি জানালেন পরদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধবন্দীদের মদীনায় নিয়ে আসবেন।

মানুষজন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না কী ঘটেছে! ৩০০ জনের বাহিনী হাজার জনের বাহিনীকে পরাজিত করেছে, তাদের বড় বড় নেতাদের হত্যা করেছে – এটা এতই খুশির খবর যে তাদের ঠিক বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। পরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ

---

[110] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১২।

বন্দীদের নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন। বন্দীদেরকে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হলো। রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রী সাওদাহ ﷺ, যুদ্ধে বন্দী বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা সুহাইল ইবন আমরকে দেখলেন তার হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধা অবস্থায়। তাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'তুমি যুদ্ধ করে ইজ্জতের সাথে মরতে পারলে না সুহাইল?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই কথা শুনে বললেন, 'সাওদাহ, তুমি কি তাদেরকে আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলছো?' সুহাইলের মতো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্য সেদিন সেভাবে হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা ছিল লজ্জা আর অবমাননার বিষয়। তাই দেখে সাওদাহ কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল এভাবে অপদস্থ হওয়ার চেয়ে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে মরে যাওয়াই সুহাইলের মতো নেতার জন্য সাজে। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মস্ত বড় অপরাধ, এর মাঝে কৃতিত্ব নেই। সাওদাহ ﷺ তাঁর ভুল বুঝতে পেরে দুঃখিত হলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমি আসলে তার এ অবস্থা দেখে একথা না বলে থাকতে পারছিলাম না।'[111] বদরে পরাজয়ের কারণে কুরাইশ নেতারা এতটাই অপমানিত আর অপদস্থ হয়েছিল যে রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রীও শত্রুর করুণ অবস্থা দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফেরার পথে একবার যাত্রাবিরতি দেন। সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকেরা এসে তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। একজন আনসার তাদেরকে বললেন, 'আপনারা কেন আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন? আমরা তো লড়েছি কিছু টেকো বুড়োর সাথে। তারা মরতেই এসেছিল আর আমরা তাদের উটের মতো জবাই করেছি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এভাবে বলতে নিষেধ করলেন, কারণ যারা নিহত হয়েছিল তারা যেমন-তেমন লোক ছিল না, তারা ছিল কুরাইশদের নেতা। সেই আনসার যোদ্ধার কাছে মনে হয়েছিল তাদের সাথে লড়াই করা ছিল খুব সহজ কারণ এই বয়স্ক নেতারা জানতোই না কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু আসলে এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতা পাঠিয়েছেন বলে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ করা সহজ হয়েছিল। এই যুদ্ধে কুরাইশরাই ছিল শক্তিমত্তা ও অস্ত্রশস্ত্রের বিচারে এগিয়ে। যদি আল্লাহ মুসলিমদের সাহায্য না করতেন তবে মুসলিমরা হেরে যেতো।

---

[111] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৩।

বদর পরবর্তী মক্কা: শোক ও গ্লানি

এদিকে মক্কায় কুরাইশদের পরাজয়ের বার্তা পৌঁছে দেয় হায়সুমান ইবনে আবদুল্লাহ খুযাই। সে মক্কার দিকে ছুটে যায়। যারা যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তাদের সবার নাম সে এক এক করে উল্লেখ করেছিল। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া তখন মক্কাতেই ছিল। সে ভাবতেই পারলো না কুরাইশরা যুদ্ধে হেরেছে। সে হায়সুমানের বার্তা শুনে তার বন্ধুদের বলে, 'পাগল হয়ে গেল নাকি! তাকে আমার কথা জিজ্ঞেস করে দেখো তো সে কী বলে। আমার নাম বললে বুঝবে তার মাথা ঠিক নেই।' তাকে সাফওয়ানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে ঠিক ঠিক উত্তর দিল, 'সাফওয়ান তো মরেনি। সে বসে আছে কাবার হাতীমে। কিন্তু আমি তার বাবা এবং ভাইকে নিজ চোখে মরতে দেখেছি।' মক্কার লোকেরা বিশ্বাস করতে পারছিল না তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে হেরে গেছে। তাদের কল্পনাতেও আসেনি তাদের বড় বড় নেতারা এভাবে যুদ্ধে মারা পড়বে।

আবু লাহাবের মৃত্যু

কুরাইশদের মধ্যে যারা যুদ্ধে যায়নি, তাদের মধ্যে একজন ছিল আবু লাহাব। তবে সে তার বদলে অন্য একজনকে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিল। বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের খবর শুনে কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা আবু লাহাবের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বর্ণনা করেছেন মক্কার এক মুসলিম, রাফি। রাফি ছিলেন আল আব্বাসের একজন দাস, সে পরিবারের সবাই ছিল মুসলিম। রাফি, আল আব্বাস, আল আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফাদল - তারা প্রত্যেকেই মুসলিম ছিলেন। রাফির কাজ ছিল তীর বানানো। একদিন সে কাবার উঠানে বসে তীরে ধার দিচ্ছিল, আবু লাহাব তার সামনে পিঠ দিয়ে বসা। কুরাইশদের এক যোদ্ধাকে আসতে দেখে আবু লাহাব তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এসো, যুদ্ধে কী ঘটেছে আমাদেরকে জানাও'। লোকটি বললো, 'যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমরা নিজেদেরকে তাদের হাতে মরার জন্য আর বন্দী হওয়ার জন্য তুলে দিলাম। কিন্তু আমি আসলে এজন্য কাউকে দোষারোপ করবো না, কারণ আমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করছিলাম তারা ছিল আকাশ ও যমীনের মাঝে ঘোড়ায় সওয়ারী সাদা পোশাক পরা কিছু পুরুষ। তাদের সাথে মোকাবেলায় আমরা কিছুতেই টিকতে পারছিলাম না।'

এই সৈন্য বলতে চাচ্ছিল যে, হ্যাঁ এটি সত্য যে কুরাইশরা হেরেছে কিন্তু এখানে মুসলিমদের কোনো কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব হলো আকাশ থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসা সাদা পোশাকধারী সেই লোকদের। তাদেরকে কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছিল না। এই বর্ণনা শুনে রাফি নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারলো না। মনের অজান্তেই সে আবু লাহাবের সামনে বলে বসলো, 'আল্লাহর কসম! তাঁরা ছিলেন মালাইকা!' আবু লাহাব সে কথা শুনে রাফির মুখে ঘুষি মেরে বসলো। বদলা নিতে রাফিও এগিয়ে গেল। কিন্তু আবু লাহাব তাঁর চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল। সে রাফির উপরে বসে তাকে মারতে

লাগলো। তখন উম্মুল ফাদল লাঠি দিয়ে আবু লাহাবের মাথায় জোরে আঘাত করে তাকে সরিয়ে দিয়ে বললো, 'কী মনে করেছো তুমি? তার মনিব নেই বলে তুমি তাকে যেভাবে খুশি মারতে পারবে?'

আবু লাহাব চলে গেল। এক সপ্তাহ পরের ঘটনা, আবু লাহাব এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। তার মাথায় আঘাতের স্থান থেকে সারা শরীরে ঘা হয়ে যায়। এই রোগটি এমনই ভয়ানক ছিল যে, এই রোগের রোগীর কাছেও কেউ যেতো না। আবু লাহাব মারা গেল, কিন্তু কেউ তাকে কবর দিতে আসলো না। তিন দিন পার হয়ে গেল, তার শরীর পঁচতে শুরু করলো। আবু লাহাবের দুই ছেলেকে ডেকে বলা হলো, 'লজ্জা লাগে না তোদের? তিন দিন ধরে তোদের বাপ ঘরে মরে পড়ে আছে আর তোরা কেউ তাকে কবরও দিচ্ছিস না!' তারা বললো তারা ওই রোগের ভয়ে কাছে যেতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত তারা কোনোমতে আবু লাহাবের লাশ টেনে-হিঁচড়ে মক্কার বাইরে একটি দেওয়ালের কাছে ফেলে রাখলো এবং দূর থেকে পাথর ছুঁড়ে তার মৃতদেহ ঢেকে দিল। তারা আবু লাহাবের জন্য কবর পর্যন্ত খোঁড়েনি। অপমানের সাথে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।[112]

শোক পালনে নিষেধাজ্ঞা

মুসলিমদের বিজয়ের উল্লাসে ভাটা দিতে কুরাইশরা আইন জারি করলো পরাজয়ের দুঃখে মক্কায় কেউ প্রকাশ্যে কান্নাকাটি করতে পারবে না। কারো স্বজন হারানোর দুঃখে বিলাপ করতে পারবে না। তারা মুক্তিপণের বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করতেও সবাইকে নিষেধ করে দেয়, যেন মুক্তিপণের মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া না হয়। ইবনে কাসির এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'আমি মনে করি, যারা মরেছে তারা তো শাস্তি পেয়েছেই, উপরন্তু যারা জীবিত ছিল তাদেরও আল্লাহ শাস্তি দিলেন কাঁদতে না দেওয়ার মাধ্যমে। কেননা কান্না বেদনার্ত অন্তরকে শান্ত করে।' অর্থাৎ বিলাপের এই নিষেধাজ্ঞা জীবিত কুরাইশদের জন্য এক প্রকার শাস্তি হিসেবে কাজ করে।

এরপর ইবনে কাসির বলেন যে, ইবন ইসহাক্ব বলেছেন, 'মক্কার আল আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব বদরের যুদ্ধে তার তিন পুত্রকে হারায়। এই লোকটি ছিল অন্ধ এবং বৃদ্ধ। তিন পুত্রকে হারিয়ে সে প্রবল শোকাহত। কিন্তু এই মানুষটিকেও ছেলের মৃত্যুতে কাঁদার অনুমতি দেওয়া হয়নি। একরাতে এক মহিলার কান্নার আওয়াজ শুনে সে বললো, 'যাও খোঁজ নিয়ে আসো কাঁদার উপর নিষেধাজ্ঞা এখনো আছে কি না। কুরাইশরা কি তাদের নিহত স্বজনদের জন্য কাঁদবে না? তাহলে আমি আমার বড় ছেলে আবু হাকিমের জন্য কাঁদতাম, কষ্টে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।' খোঁজ নিয়ে জানা

---

[112] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৬।

গেল সেই মহিলা তার উট হারানোর দুঃখে কাঁদছে। এরপর আল আসওয়াদ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো,[113]

মহিলা কাঁদছে হায় উট হারালো তাই, উটের শোকে তার বুঝি চোখে ঘুম নাই।
উটের জন্য কাঁদিসনে যদিও তা হারিয়েছে, বদরের কথা ভেবে কাঁদ,
ওরে কপাল পুড়েছে।

এই বৃদ্ধ লোকটি তার তিন সন্তানদের জন্য কাঁদারও অনুমতি পায়নি কারণ কাফিররা চাচ্ছিল না মুসলিমরা জানুক যে কাফিররা দুঃখ করছে। তারা ভাব ধরছিল যে তারা নিহত স্বজন বা মুক্তিপণ বা বন্দীদের ব্যাপারে কোনো পরোয়াই করছে না।

গনিমাহ: বিরোধ ও বিধান

সূরা আনফাল নাযিল হয়েছিল বদরের যুদ্ধের পর। সূরা আল আনফালের প্রথম আয়াত সম্পর্কে উবাদাহ ইবন সামিত বলেন, 'এটি নাযিল হয়েছিল আমাদের মুসলিমদের ব্যাপারে। তখন আমরা একে অন্যের সাথে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে বিতর্ক করছিলাম।' এই যুদ্ধে মুসলিমদের একদল রাসূলুল্লাহকে ﷺ নিরাপত্তা দিচ্ছিল। দ্বিতীয় দল শত্রুদের ধাওয়া করছিলো, আর তৃতীয় দল যুদ্ধের গনিমতের মাল সংগ্রহ করছিল। যারা গনিমতের মাল সংগ্রহ করেছিল তাঁরা বললো গনিমতের মালের তারাই মালিক। যারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ নিরাপত্তা দিয়েছিলো তারা বললো এই সম্পদে তাদেরও ভাগ আছে কারণ তারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ নিরাপত্তার বিষয়টি দেখেছে। আর তৃতীয় দল যারা শত্রুদের ধাওয়া করেছিলো তারা বললো যদি তারা শত্রুর মোকাবেলা না করতো তাহলে কেউ কিছুই পেত না। তারা সকলে বিষয়টি নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ আযযাওয়াজাল নাযিল করলেন নিম্নোক্ত আয়াত:

> **"লোকেরা আপনাকে গণিমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলে দিন, গণিমতের মাল আল্লাহ ও রাসূলের জন্য। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরা আনফাল, ৮: ১)**

অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহ আর তাঁর রাসূলের ﷺ হাতে। বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত সকল সম্পদ আল্লাহর রাসূলকে ﷺ দেওয়া হয়েছিল, একেবারে সব কিছুই। এই আয়াতটি মুজাহিদদের ৩টি শিক্ষা দিচ্ছে, তাকওয়া, ঐক্য এবং আনুগত্য। প্রথম শিক্ষা হলো, "আল্লাহকে ভয় করো...", অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাপারে মুজাহিদদের ভয় থাকতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য তাকওয়া জরুরি। তা না হলে

---

113 আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৭।

সেটা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হবে না, অন্য উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ঐক্য বা নিয়ম শৃঙ্খলা – 'নিজেদের সম্পর্ককে সুষ্ঠু সুন্দর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করো', অর্থাৎ মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ থাকা, মুজাহিদদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকতে হবে। তৃতীয় শিক্ষা এই ছিল যে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো' – মু'মিন হওয়ার জন্য অবশ্যই আল্লাহ আর তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনের ব্যাপারে বিধান জারি করেন।

> **"আর জেনে রাখ যে, তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয় আল্লাহর জন্যই তার এক পঞ্চমাংশ ও রাসূলের জন্য, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং যা আমরা আমাদের বান্দার কাছে নাযিল করেছি সেই ফুরকানের দিনে, যেদিন দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল – আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (সূরা আনফাল, ৮: ৪১)**

অর্থাৎ, গনিমতের মালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ বা শতকরা আশি ভাগ বণ্টন করা হবে সৈনিকদের মাঝে। পদাতিক সৈন্যরা পাবে এক ভাগ, আর অশ্বারোহী সৈনিকরা পাবে তিন ভাগ।

বাকি বিশ ভাগকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে, প্রতিটি ভাগে শতকরা ৪ ভাগ। এই পাঁচটি ভাগ হলো,

১) আল্লাহর জন্য

২) রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য

৩) রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট আত্মীয়দের জন্য

৪) এতিম, অভাবগ্রস্তদের জন্য

৫) মুসাফিরের জন্য

এখন আল্লাহ আর তাঁর রাসূলের ﷺ জন্য যে ৮ ভাগ নির্ধারিত তা ইসলামের কল্যাণের যেকোনো কাজে খরচ করা যাবে। যেমন, মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি। এই ব্যাপারে খলিফা বা ইমামের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

যুদ্ধবন্দি

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের ৭০ জন মুসলিমদের হাতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা পড়ে। এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুরা ডাকলেন। তিনি সাহাবীদের ﵃ থেকে মতামত শুনলেন। আবু বকরের ﵁ মত ছিল,

'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, এরা তো আমাদের আত্মীয় এবং আমাদের গোত্রেরই লোক। আমার মতে আপনি এদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিন। মুক্তিপণ হিসেবে আমরা যা পাবো, তা আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবো। আর এমনও হতে পারে, আল্লাহ তাআলা এদেরকে হিদায়াত দেবেন আর তারা একদিন মুসলিম হবে।'

উমার ইবনে খাত্তাব ﵁ দ্বিমত পোষণ করলেন, তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, এরাই আপনাকে আপনার ঘর থেকে বিতাড়িত করেছে, আপনাকে মিথ্যাবাদী অপবাদ দিয়েছে। আমি আবু বকরের সাথে দ্বিমত পোষণ করি। এদেরকে এখানে আনুন আর এক এক করে গর্দান ফেলে দিন।' উমার তাঁর এক আত্মীয়ের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন, 'একে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি একে মেরে ফেলি। আক্বীলকে তুলে দিন তার ভাই আলীর কাছে, আলী তার ভাইকে হত্যা করুক। হামযার হাতে তুলে দিনে হামযার ভাইকে, হামযা তাকে হত্যা করুক। এতে করে আল্লাহ জানবেন মুশরিকদের প্রতি আমাদের কোনো সমবেদনা নেই। এই লোকগুলো হলো নাটের গুরু, কাফেরদের নেতা।'

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ﵁ মত দিলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ, আপনি এমন এক জায়গা বের করুন যেখানে অনেক গাছপালা আছে, আপনি সেখানে তাদের ঢুকিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিন।'

যে যার মত দিল। বিভিন্ন জনের মত শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন না কী করবেন। তিনি নিজে একা একা কিছুক্ষণ ভাবার জন্য সময় নিলেন। এসে দেখলেন মুসলিমরা দুইটি মতে স্থির হয়েছে, আবু বকর ﵁ এবং উমারের ﵁ মত। তিনি তখন এই দু'জন সাহাবীর ﵄ চারিত্রিক দিক সবার সামনে তুলে ধরলেন, 'আবু বকর হলো নবী ইবরাহীমের ﵇ মতো। তিনি বলেছিলেন, 'যারা আমার অনুসরণ করবে তারা আমার সাথে আর যারা আমার অনুসরণ করে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আবু বকর হলো ঈসার ﵇ মতো, তিনি বলেছিলেন, 'তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তারা তো তোমারই গোলাম আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো তাহলে তুমি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।'

অর্থাৎ আবু বকর ﵁ ছিলেন নবী ইবরাহীম ও ঈসার মতো যারা তাদের কওমের প্রতি দয়ালু ছিলেন। রাসূল ﷺ এরপর বললেন উমারের কথা, 'উমার হচ্ছে নূহের মতো, তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ এই জমিনে তুমি কাফিরদের ছেড়ে দিও না। উমারের

উদাহরণ হলো মূসা নবীর মতো। তিনি বলেছিলেন 'হে আল্লাহ তাদের সম্পদ বিনষ্ট করে দাও এবং তাদের অন্তরকে শক্ত করে দাও যেন তারা আযাব আসার আগে ঈমান না আনে।'[114]

এই বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের পরিবার-পরিজন আছে, তাদের দেখাশোনার ব্যাপার আছে। কাজেই তোমরা মুক্তিপণ আদায় করো, মুক্তিপণের টাকা ছাড়া যেন কেউ মুক্তি না পায়। আর যদি মুক্তিপণ না দেয়, তাহলে তাদের মেরে ফেলো।'

শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরের ﷺ মতই গ্রহণ করলেন। পরদিন সকালে উমার ﷺ গেলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে। গিয়ে দেখেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁদছেন, সাথে কাদঁছেন আবু বকরও ﷺ । তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনি এবং আপনার সাথি কাঁদছেন কেন, কী হয়েছে? আমাকে বলেন কেন কাঁদছেন, আমিও কাঁদি। যদি কান্না না পায় তাহলে জোর করে হলেও কাঁদবো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করায় তোমার সঙ্গীদের উপর যে আযাব পেশ করা হয়েছে, তা দেখে কাঁদছি।' তিনি একটা গাছ দেখিয়ে বললেন, 'ওদের ওপর যে আযাব আপতিত হতে পারতো তা এই গাছের চেয়েও নিকটবর্তী করে আমাকে পেশ করা হয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বোঝাতে চেয়েছেন যে মুসলিমরা মুক্তিপণ গ্রহণ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেননি। তিনি বলেছেন,

> **"নবীর জন্য এটা সঙ্গত নয় যে, তাঁর নিকট যুদ্ধবন্দি থাকবে (এবং পণের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করবেন) যতক্ষণ না তিনি শত্রুদের ব্যাপকভাবে পরাজিত করবেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চাচ্ছেন আখিরাত। আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। যদি আল্লাহর লিখন নির্ধারিত না হয়ে থাকতো তবে যে ব্যবস্থা তোমরা অবলম্বন করেছো, তাতে তোমাদের উপর কোন বড় শাস্তি এসে পড়তো।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬৭, ৬৮)**

আল্লাহ বলছেন রাসূলুল্লাহর ﷺ উচিত ছিল বন্দীদের হত্যা করা, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সেটাই চেয়েছেন। সে সময়ে মুসলিমদের ইসলামি রাষ্ট্রের বয়স খুব বেশি নয়। একটি নবগঠিত রাষ্ট্র হিসেবে মুসলিমদের উচিত শুরু থেকেই দাপট দেখানো, ক্ষমতার প্রদর্শনী করা। মুক্তিপণ আদায় করা হলে কাফিররা মুসলিমদের তেমন সমীহের চোখে দেখবে না। কিন্তু যদি মুসলিমরা তাদের বন্দীদের হত্যা করতো, তাহলে তারা অনেক বেশি ভয় পেত এবং মুসলিমদের সমীহ করা শিখত।

---

[114] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১৮।

যদিও আল্লাহ তাদের এই সিদ্ধান্ত পছন্দ করেননি, তথাপি তিনি মুসলিমদেরকে কোনো শাস্তি দেননি। 'মৃদু ধমক' দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন, কারণ মুক্তিপণ নেওয়াকে আল্লাহ আগেই হালাল হিসেবে নির্ধারিত করেছেন।

> **"অতএব তোমরা যে গণিমত নিয়েছ, সেটিকে হালাল ভেবে খাও, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, দয়াময়।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬৭, ৬৮)**

'মুতআম ইবনে আদি যদি জীবিত থাকতো আর এসকল যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতো, আমি তাহলে তার সম্মানে এদের সকলকে মুক্ত করে দিতাম।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি বলেছিলেন আল মুতআম ইবনে আদি সম্পর্কে। মুতআম ইবন আদী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ নিরাপত্তা দিয়ে কাবাঘর তাওয়াফের জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন। যদিও তিনি অমুসলিম ছিলেন, তারপরেও তার সততা ও মুসলিমদের প্রতি সদাচরণের কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। শুধু এক ব্যক্তির কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের সব যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে সে অনুযায়ী আচরণ করতেন। তিনি কঠোরতা দেখিয়েছেন, তিনি নম্রতাও দেখিয়েছেন। তিনি ভালো মানুষদের প্রতি সদয় ছিলেন এবং খারাপ মানুষদের সাথে যথোচিত আচরণ করতেন।

তাই মুসলিমদের এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা কাফিরদের প্রতি কেবল নিষ্ঠুরতাই প্রদর্শন করবে। আবার এমন আচরণ ও কাম্য নয় যে তারা নমঃনমঃ হয়ে কেবল তাদের খুশি করার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত থাকবে। একজন মুসলিমের উচিত পরিস্থিতি বিবেচনা করা এবং বিচক্ষণের মতো কাজ করা। এক জন মানুষের আবেগকে বশ করা শিখতে হবে। লোকে কী ভাবছে সে ব্যাপারে অতি-উদ্বিগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

কটুক্তিকারীদের পরিণতি

৭০ জন বন্দীদের মধ্য থেকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আলাদা করে দুই ব্যক্তিকে বেছে নিলেন। তারা হলো উকবা ইবন আবি মুয়াইত এবং নযর ইবনে হারিস। রাসূলুল্লাহ ﷺ উকবাকে ডাকলেন, উকবা অবাক হয়ে বললো, 'আমি কেন আল্লাহর রাসূল! সবার মধ্য হতে আমাকে মেরে ফেলতে চান কেন? যদি বাদ বাকি সবাইকে মেরে ফেলতে চান তাহলে আমাকেও তাদের সাথে মেরে ফেলুন। আর যদি বাকিদের মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেন, তবে আমার সাথেও তাই করুন। আপনি সবার মাঝে কেবল আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য বাছাই করছেন কেন?' রাসূলুল্লাহ

ﷺ বললেন, 'তোমাকে হত্যা করার কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ প্রতি তোমার বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ও শত্রুতা।' এরপর উকবা বলে উঠলো, 'তবে কে আমার বাচ্চাদের দেখাশোনা করবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললে, 'আগুন! আসিম, যাও তাকে টেনে নিয়ে যাও। তার মস্তক কর্তন করো।'

আসিম ইবন সাবিত ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে উকবার শিরচ্ছেদ করলেন। আর নযর ইবনে হারিসকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন আলী ইবন আবি তালিব। এই দুইজন মানুষকে তাদের দুষ্কর্মের জন্য বিশেষভাবে বাছাই করা হয়েছিল।

ইবনে কাসির মন্তব্য করেন, 'আমি শুধু এ কথাই বলব যে, এই দুই লোক ছিল আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য, অবাধ্য, খারাপ, হিংসুটে এবং কট্টর কাফের। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো। আল্লাহ তাআলা প্রকৃতপক্ষেই তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন।'

কী ছিল তাদের অপরাধ?

উকবা ইবন আবি মুয়াইত কাবার পাশে নামাজরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘাড়ে পা দিয়ে চেপে ধরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ওই মুহূর্তে তাঁর মনে হচ্ছিল যেন উনার চোখ কোটর থেকে বের হয়ে আসবে আর তিনি মারা যাবেন। এই একই লোক অন্য আরেকদিন রাসূলুল্লাহর ﷺ রুকুরত অবস্থায় তাঁর উপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়। ফাতিমা ﷺ এসে সেগুলো সরান। কুরাইশদের মধ্যে উকবা ছিল জঘন্য এক শয়তান। তাই তার শাস্তি ছিল কঠোর।

নযর ইবনে হারিস রাসূলুল্লাহর ﷺ গায়ে হাত দেয়নি কিংবা মুসলিমদেরকে নির্যাতন করেনি। তার অপরাধ ছিল সে ইসলামের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। সে যুগে সাহিত্য চর্চা হতো মুখে মুখে। সে পারস্য থেকে ইসবান্দিয়া আর রুস্তমের গল্প শিখে মক্কায় ফিরে এসে সে সব গল্পের আসর বসায় আর দাবি করতে থাকে তার গল্প মুহাম্মাদের গল্পের চেয়ে সেরা। সে মানুষদের বলতো: 'মুহাম্মাদের কী এমন আছে যে সে নবী হয়ে গেল? আমি নযর ইবনে হারিসও তো তার মতো করে গল্প বলতে পারি!' এভাবে করে সে মানুষকে রাসূলুল্লাহর ﷺ মজলিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নানারকম কারসাজি করতো।

সকল যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কেবল এই দুইজনকে হত্যা করা হয় আর বাকিদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের ﷺ বিশেষভাবে নির্দেশ দেন, 'যুদ্ধবন্দীদের সাথে সদয় আচরণ করো।' মুসআব ইবন উমাইরের ভাই আবু আযীয বলেন, 'আনসারদের এক দল আমাকে বদর থেকে নিয়ে ফিরছিল। দুপুর ও রাতের খাবারের সময় হলে তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে রুটি দিয়ে আপ্যায়ন করলো আর নিজেরা খেজুর খেল। তাদের হাতে যতগুলো রুটির টুকরা ছিল সেগুলোর সবকটি তারা

আমাকে খেতে দেয়। আমি খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম। রুটিগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে চাইলাম, কিন্তু তারা সেগুলো স্পর্শও করেনি, আমাকেই আবার ফিরিয়ে দেয়।' রুটি ছিল খেজুরের থেকে ভালো মানের খাবার আর আনসাররা রুটি না খেয়ে খেজুর দিয়ে রোজা ছাড়ছিলেন অথচ বন্দীদেরকে রুটি দিচ্ছিলেন।

এ ব্যাপারে ইবনে হিশাম মন্তব্য করেন, 'এই আবু আযীয ছিল বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পতাকাবাহক।' সে কোনো সাধারণ পদাতিক সৈন্য ছিল না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে ﵃ এই ধরনের মানুষের সাথেও ভালো ব্যবহারের আদেশ করেন।

আরেক যুদ্ধবন্দী আল-ওয়ালিদ ইবন মুঘীরাও প্রায় একই রকম মন্তব্য করেছে, 'আমরা চড়তাম ঘোড়ার পিঠে আর তারা হাঁটতো।' অনেক বন্দী মুসলিমদের কাছ থেকে এরকম ভালো আচরণ পেয়ে মুসলিম হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহর ﷺ যুদ্ধ জীবনে এটা ছিল সাধারণ ঘটনা। অনেক যুদ্ধবন্দী মুসলিমদের কাছ থেকে ভালো আচরণ পেয়ে মুসলিম হয়ে তাদের সাথে থেকে যায়।

কোনো কোনো যুদ্ধবন্দী ইসলাম গ্রহণ করে বিষয়টা গোপন রাখতো। তারা মুসলিমদের সাথে না থেকে ইচ্ছে করেই নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেতো আর তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ফিরে এসে মুসলিম হতো। তারা নিজ গোত্রকে এটা দেখাতে চাইতো যে, তারা তরবারির ভয়ে মুসলিম হয়নি। যেমনটা হয়েছিল আবু আযীযের ক্ষেত্রে। সে ভালো আচরণ পেয়ে মুসলিম হয়েছে। কাজেই উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করাটা জরুরি, হোক সেটা শত্রুর সাথে। মুসলিমদের উচিত শত্রুদের ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মানের সাথে আচরণ করা। একজন মুসলিম নিষ্ঠুর, অসৎ কিংবা প্রতারক হবে না। সে সততা ও সম্মান দিয়ে সকলের সাথে আচরণ করবে। তার মধ্যে কোনো লুকোছাপা থাকবে না। সে খোলাখুলি কথা বলবে। তবে যারা নির্দয় আচরণ পাবার যোগ্য তারা ব্যতিক্রম; এদের সাথে ভালো আচরণ করার কোনো কারণ নেই। এদের সাথে নম্রভাবে আচরণ করা হলো বোকামি। কেননা এরা সত্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং মুসলিমদের ক্ষতি করে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ চাচা আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো মুসলিম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'কুরাইশ বাহিনীর সাথে আপনার অবস্থান থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। আপনার অন্তর ইসলাম গ্রহণ করেছে কি না তা আল্লাহই ভালো জানেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন। একটা মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখেই তাকে বিচার করতে হবে। কার হৃদয়ে কী আছে তা এক আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ছাড়া কেউ জানে না। মুসলিমরা এটাই দেখেছে যে, আল-আব্বাস কুরাইশদের পক্ষ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি শত্রুবাহিনীর সাথে

যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন, কাজেই তাঁকে শত্রু হিসেবেই বিচার করা হয়েছে, মুখের কথার উপরে নয়। খলিফা হওয়ার পর উমার ইবন খাত্তাব ﷺ সবাইকে উদ্দেশ্য করে একদিন বললেন,

'আল্লাহর রাসূলের যুগে আল্লাহর পক্ষ হতে ওয়াহী নাযিল হয়ে কখনো কখনো জানিয়ে দেওয়া হতো কার হৃদয়ে কী আছে। সে হিসেবে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানের কথা ভিন্ন. এখন আমরা কাউকে প্রকাশ্যে যা করতে দেখি তার উপর ভিত্তি করে বিচার করবো। যাকে আমরা ভালো কাজ করতে দেখি তাকে আমরা বিশ্বাস করবো এবং প্রাধান্য দেব। গোপন কাজের জন্য আমরা কাউকে পাকড়াও করবো না, সে বিচার আল্লাহ করবেন। কিন্তু আমরা এমন কাউকে বিশ্বাস করবো না যে প্রকাশ্যে খারাপ কিছু দেখায়, যদিও সে দাবি করে তার নিয়ত ভালো।'

এটি ইসলামের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। কার হৃদয়ে কী চলছে তার উপর ভিত্তি করে কোনো মানুষকে বিচার করা উচিত নয়। আমরা তাদের কাজকর্ম দেখে বিচার করব।

আল-আব্বাসের কাছে মুক্তিপণ চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আপনি মাটির নিচে যে টাকা রেখেছেন সেটার কী হলো? আপনি আপনার স্ত্রী উম্মে ফাদলকে বলে রেখেছেন, 'যদি আমি মারা যাই, তাহলে এই অর্থ খরচ করবে।'' আল-আব্বাস বললেন, 'আমি সাক্ষী এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি এবং আমার স্ত্রী ছাড়া এই গুপ্তধনের কথা কেউ জানে না।' এরপর আল-আব্বাস তাঁর মুক্তিপণ পরিশোধ করলেন। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আয়াতটি প্রকাশ করেছেন।

> **"হে নবী, যারা আপনার হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোনো রকম মঙ্গলচিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। আর যদি তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় (তাহলে আপনি ভাববেন না), এরা তো এর আগে আল্লাহর সাথেও ইতিপূর্বে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অতঃপর তিনি তাদের উপর তোমাদের বিজয় দান করেছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত, সুকৌশলী।"** (সূরা আনফাল, ৮: ৭০)

যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করেছিল এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি পেয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলছেন, যদি তারা আসলেই মুসলিম হয়, তাহলে তাদের থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ যা কিছু মুক্তিপণ হিসেবে নিয়েছেন, আল্লাহ তার থেকে বেশি কিছু তাদের ফিরিয়ে দেবেন। আল-আব্বাস বললেন, 'আমি আমার

মুক্তিপণের জন্য ২০ উকিয়া স্বর্ণ পরিশোধ করেছিলাম, কিন্তু আল্লাহ আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তার আরো অনেক বেশি।'

আবুল আস ছিলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যা যাইনাবের ﷺ স্বামী। আবুল আস ছিল কাফির। মুসলিমদের সাথে মুশরিকদের বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হওয়ার আগেই তার সাথে যাইনাবের বিয়ে হয়েছিল। বদরের যুদ্ধে আবুল আস বন্দী হয়েছিল। মক্কায় অবস্থানকারী যাইনাব তাঁর স্বামীকে মুক্ত করতে চাইলেন।

যাইনাব ﷺ তাঁর স্বামীকে মুক্ত করার জন্য অনেক অর্থ পাঠিয়ে দেন। সাথে দিলেন তাঁর গলার হার। এই হার তাঁর মা খাদিজা ﷺ বিয়ের সময় তাকে উপহার দিয়েছিলেন। মুক্তিপণ হিসেবে পাঠানো এই হার দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব আবেগপ্রবণ হয়ে যান। যে আনসার আবুল আসকে বেঁধে রেখেছিল তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যদি আবুল আসকে তার স্ত্রীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং তার স্ত্রীর জিনিস তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক মনে করো, তবে তা-ই করো।' তারা তৎক্ষণাৎ আবুল আসকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিল। গলার হারটিও ফেরত পাঠানো হয়।

তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন। শর্তটি হলো আবুল আস আর কখনোই মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে সাহায্য করবেন না এবং মক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যাইনাবকে পাঠিয়ে দেবেন। আবুল আস তার কথা রেখেছিল। সে মক্কায় ফিরে গিয়ে যাইনাবকে মক্কা ছেড়ে তাঁর বাবার কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

এরপর যাইনাব মক্কা ত্যাগের পরিকল্পনা করেন। যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে তাঁর দেবর কিনানা ইবনে রাবী'আ একটি উট নিয়ে আসেন। উটের পিঠে 'হাউদাহ'তে যাইনাব চড়ে বসেন। হাউদাহ হলো উটের পিঠে বসার জন্য বানানো আসন। কিনানের সাথে তাঁর তীর-ধনুক ছিল। সে যাইনাবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন ছিল দিনের বেলা। কিছু কুরাইশ তাদেরকে দেখতে পেয়ে আটকানোর সিদ্ধান্ত নিল। তারা যাইনাবের পিছু নিয়ে দুতুয়া নামক স্থানে তাদের ধরে ফেললো। হাব্বার ইবনে আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব নামক এক লোক বর্শা দিয়ে যাইনাবকে ভয় দেখায়। যাইনাব হাউদাহ থেকে পড়ে যান। এতে তাঁর গর্ভপাত ঘটে। কিনান তার তূণীর থেকে তীর বের করে সবাইকে হুমকি দিলেন, 'আল্লাহর কসম, যদি কেউ আমার কাছে আসে তবে আমি তাঁর দিকে তীর ছুঁড়বো।' তখন অন্যেরা তাঁর কাছ থেকে দ্রুত সরে যায়। তখন আবু সুফিয়ান সেখানে অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের নিয়ে পৌঁছে বললো, 'তোমার তীর নামিয়ে রাখো, আমরা তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

কিনান তাঁর অস্ত্র নামিয়ে রাখলেন। আবু সুফিয়ান এসে বললো,

'তুমি কাজটি ভালো করোনি কিনানা। মুহাম্মাদ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। তা সত্ত্বেও এক মহিলাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছো আর সেটাও প্রকাশ্য দিবালোকে। তুমি আর অন্য কাউকে নয়, বরং মুহাম্মাদের মেয়েকে প্রকাশ্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দিচ্ছ। লোকেরা দেখে ভাবছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমরা আজকে দুর্বল, অপমানিত। তাই সবার সামনে এভাবে তুমি এই কাজ করছো। তোমার এই কাজ আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতাই প্রকাশ করছে। আমি শপথ করে বলছি আমরা যাইনাবকে তাঁর বাবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই না, আমরা প্রতিশোধও নিতে চাই না। কিন্তু তোমার উচিত প্রকাশ্যে নয়, বরং গোপনে তাকে তাঁর বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসা।'

তৎকালীন কুরাইশরা ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হলেও মুসলিম মহিলাদের সম্মান করতো। এটুকুও আজকের যুগে কাফিরদের থেকে দেখা যায় না।

বদর যুদ্ধের আরেক বন্দী ছিল আবু আযযা। সে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো আমার আর্থিক অবস্থার কথা জানেন। আমি দরিদ্র এবং আমার পরিবার আছে। আমার প্রতি দয়া করুন।' আবু আযযা ছিল গরিব। তার মেয়েদের দেখাশোনা করার প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে এক শর্তে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি আমার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করবে না। বদরে তুমি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ। কিন্তু এরপর যদি কখনো তোমাকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয় তুমি তাতে অস্বীকৃতি জানাবে।' আবু আযযা এই শর্তে রাজি হয়। ফলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু উহুদের যুদ্ধে কুরাইশরা তাকে যুদ্ধে যোগ দিতে প্ররোচিত করে এবং তাকে যুদ্ধে আনতে সক্ষম হয়। আবারো সে মুসলিমদের হাতে ধরা পড়ে। এবারও সে দারিদ্র্যের ছুতো দিয়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু রাসূল ﷺ এবার আর তাকে কোনো সুযোগ দিলেন না। তিনি বললেন, 'তুমি দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলবে আমি মুহাম্মাদকে দু'বার ধোঁকা দিয়েছি - এ সুযোগ তোমাকে আমি দেব না।'

মুহাম্মাদ ﷺ আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন না। তাকে সহজে ঠকানো বা প্রতারিত করা যেতো না। তিনি দয়ালু, সহানুভূতিশীল, সহিষ্ণু ছিলেন সত্যি, কিন্তু কেউ তার সরলতার সুযোগ নিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করবে - এটা তিনি মেনে নিতেন না। আবু আযযাকে সেখানেই শিরচ্ছেদ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মু'মিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।' এটি মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। একজন মুসলিমের এতটা সরলমনা হওয়া উচিত নয় যে সে যা শুনবে তা-ই বিশ্বাস করবে এবং মিডিয়ার চটকদার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। কারা ইসলাম ও মুসলিমদের উপকার করে এবং কারা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করে -এ ব্যাপারে একজন মুসলিমের সতর্ক থাকা উচিত।

সুহাইল ইবন আমর ছিলেন কুরাইশদের উচ্চবংশীয় এক নেতা। যুদ্ধে তাঁকে একজন বন্দী হিসাবে আটক করা হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণায় তিনি সক্রিয় ছিলেন। তাঁর

বাগ্মিতা ও সুশীল ভাষা ব্যবহার করে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা ছড়াতেন। উমার ইবন খাত্তাব ﷺ রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমাকে অনুমতি দিন আমি সুহাইল ইবন আমরের সামনের দুটো দাঁত ফেলে দিই। তার জিহ্বা ঝুলে থাকবে। সে আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে আজেবাজে বকতে পারবে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না, আমি তার অঙ্গহানি করবো না, কেননা তাতে আল্লাহ আমার অঙ্গহানি করতে পারেন।' শত্রুর সাথে এরূপ ব্যবহার করা ইসলামি পন্থা নয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হতে পারে সে কোনোদিন এমন অবস্থানে থাকবে যেদিন তার সমালোচনা করার সুযোগ তোমার থাকবে না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আশা করছিলেন হয়তো একদিন ইসলামের পক্ষেই সুহাইল কথা বলে উঠবে। আল্লাহর রাসূলের এই আশা সত্যি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর পর আরব গোত্রগুলো যখন ইসলাম ত্যাগ করে তখন এই সুহাইল ইবন আমরের কারণে মক্কার লোকেরা ইসলামের উপরে দৃঢ় ছিল। তিনি বলতেন, 'হে কুরাইশের লোকজন! সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করে সবার আগে তা ত্যাগ করে বসো না। যার উপরে আমাদের সন্দেহ জাগবে, তার শিরচ্ছেদ করা হবে।' এই কথাগুলো মক্কার লোকজনকে ইসলামের প্রতি অটল থাকতে সাহায্য করে।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যাদের অক্ষরজ্ঞান ছিল তাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যদি তুমি দশজনকে পড়তে ও লিখতে শেখাতে পার, তবে সেটাই তোমার মুক্তিপণ হবে।' শিক্ষা ও সাক্ষরতার উপর ইসলামের গুরুত্ব এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান

যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য কী হবে তা নির্ভর করবে মুসলিম ইমামের সিদ্ধান্তের উপর। তিনি চারটি কাজের যেকোনো একটি করতে পারেন।

১) তিনি তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন

২) তাদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিতে পারেন

৩) মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তিদান করতে পারেন

৪) যুদ্ধবন্দীদের দাস বানাতে পারেন

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে মুসলিমদের নিজস্ব শরীআহ আছে। এই ব্যাপারে পার্থিব মানবরচিত আইন মানতে মুসলিমরা বাধ্য নয়। মুসলিমরা কেবল তাদের নিজস্ব শরীআহ মানতে বাধ্য, জেনেভা কনভেনশান নয়।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের ﷺ মর্যাদা

বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা ﷺ বিশেষ সম্মানে সম্মানিত। জিবরীল রাসূলুল্লাহকে ﷺ একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'বদরে অংশ নেওয়া সাহাবীদের ﷺ আপনি কী হিসেবে বিবেচনা করেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, 'মুসলিমদের মধ্যে তারা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।' জিবরীল বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশ নেওয়া ফেরেশতারাও অনুরূপ।' বদর শুধু মুসলিমদের জন্য নয় বরং সে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতাদের জন্যেও বিশেষ একটি ঘটনা।

এ প্রসঙ্গে হাতিব ইবন আবি বালতাহর একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে। তিনি ছিলেন বদরে অংশ নেওয়া সাহাবী। কিন্তু একবার রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মক্কার লোকেদের কাছে রাসূলুল্লাহর ﷺ মক্কা অভিযানের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়ে একটি চিঠি পাঠান। কাজটি তিনি করেছিলেন নিজের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য। এ খবর জানাজানি হলে, উমার ইবন খাত্তাব ﷺ রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ। আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে মেরে ফেলি। সে একটা মুনাফিক।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'উমার, সম্ভবত আল্লাহ বদরের লোকজনদের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, তোমরা যা খুশি কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।' এই কথা শুনে উমারের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে। শুধুমাত্র বদর যুদ্ধে অংশ নেওয়ার কারণে একটি বড় অপরাধ করেও হাতিব ইবন আবি বালতাহ মাফ পেয়ে যান।

বদর যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব

মুনাফিক্বদের উত্থান

বদরের যুদ্ধের পর নতুন এক শ্রেণির মানুষের উদ্ভব হয়, *আল-মুনাফিকুন*। মদীনার অনেক লোক মুসলিমদের বিজয় দেখে খুশি হতে পারেনি। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা ঘোষণা দেওয়ার মতো সাহস বা শক্তি তাদের ছিল না। তারা প্রকাশ্যে ইসলামকে স্বীকৃতি দিল ঠিকই কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তাদের মনের অবস্থা বোঝার উপায় ছিল না। তারা মুসলিমদের মতোই সালাত পড়তো, রোজা রাখতো, এমনকি যাকাতও দিত। কিন্তু মন থেকে তারা ইসলামকে অপছন্দ করতো, মুসলিমদের ঘৃণা করতো এবং চাইত যেন ইসলাম দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরা হচ্ছে মুনাফিক্ব। তখন আধিপত্য ছিল ইসলামের আর মুসলিমরা ছিল শক্তিশালী। তাই তারা মনের কথা ব্যক্ত করার সাহস করতো না।

এই মুনাফিক্বেরা তখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। সকল শত্রুদের মধ্যে তারাই ছিল সবচেয়ে বিপদজনক, কেননা তারা মুসলিমদের সাথে থাকতো এবং তাদের কাছে সব খবরাখবর থাকতো। তারা এই তথ্যগুলো বহিঃশত্রুদের কাছে পাচার করে দিত। এদেরকে শায়েস্তা করা সহজ ছিল না। কারণ

তারা তাদের কুফরি প্রকাশ করতো না। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহও ﷺ এ ব্যাপারে কিছু জানতেন না।

গুপ্তহত্যার চেষ্টা

উমাইর ইবনে ওয়াহাব ছিল কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম নিকৃষ্ট লোক। একদিন সে সাফওয়ান ইবন উমাইয়ার সাথে কাবার পাশে বসে বলছিল, 'যদি আমার এত ঋণ না থাকত, যদি বাচ্চাকাচ্চাদের দেখাশোনা করতে না হতো, তাহলে আমি নিজেই মুহাম্মাদকে গুপ্তহত্যা করতাম।' সাফওয়ান এই কথার সুযোগ নিয়ে বললো, 'তুমি চিন্তা কোরো না, আমি আছি। যদি তোমার কিছু হয়, আমি তোমার ঋণ শোধ করে দেব আর তোমার বাচ্চাদেরও দেখাশোনা করবো।'

উমাইর ইবনে ওয়াহাব সাফওয়ানের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলো যে, সে রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যা করতে মদীনায় যাবে। উমাইর তার তরবারী বিষের মধ্যে ভালো করে চুবিয়ে বিষ মাখিয়ে নিল। তারপর সেটি নিয়ে মদীনায় গেল। মদীনার রাস্তায় সে হাঁটছে, পথিমধ্যে পড়লো একটি ছোটখাট সমাবেশ। সেখানে উমার ইবন খাত্তাব ﷺ কিছু লোকের সাথে বদর যুদ্ধ নিয়ে গল্প করছিলেন। মুসলিমদের মাঝে তখনো বদরের রেশ কাটেনি, সবার মুখে বদর নিয়ে কথা। যারা বদরে অংশ নেয়নি তারা আগ্রহভরে উমারের মুখে বদরের কথা শুনছে।

উমাইর ইবনে ওয়াহাবকে দেখে উমার ﷺ বলে উঠলেন, 'আল্লাহর দুশমন উমাইর ইবনে ওয়াহাব ভালো কোনো উদ্দেশ্যে এখানে আসেনি।' এই বলে উমার ﷺ সেখান থেকে উঠে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন আর খাপ থেকে তরবারী বের করে তার গলায় ঠেকালেন। তারপর তাকে ধরে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে নিয়ে গেলেন আর বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহর এই শত্রু এখানে কোনো ভালো উদ্দেশ্যে আসেনি!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'উমার, তাকে ছেড়ে দাও, আমি দেখছি বিষয়টা।' উমার ﷺ তাকে ছেড়ে দিলেন কিন্তু অন্যান্য সাহাবাদের ﷺ বলে দিলেন তারা উমায়ের ইবন ওয়াহাবকে যেন চোখে চোখে রাখে এবং রাসূলুল্লাহকে ﷺ পাহারা দিয়ে রাখে।

উমায়ের ইবন ওয়াহাব রাসূলুল্লাহকে ﷺ সম্ভাষণ জানাল, 'শুভ সকাল', রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ আমাদেরকে এই কথার পরিবর্তে একটি উত্তম সম্ভাষণ শিখিয়েছেন – আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ।' উমাইর ইবনে ওয়াহাব বললো, 'খুব বেশী দিন হয়নি আপনি এই সম্ভাষণ ব্যবহার করছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এ নিয়ে কথা বাড়ালেন না। তিনি আসল কথায় চলে গেলেন, 'তুমি কেন এসেছ বলোতো।' সে বললো, 'আমি এসেছি আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে।' তার ছেলের নাম ওয়াহাব। সে বদরে যুদ্ধবন্দী হয়েছিল সত্যি, কিন্তু এটা ছিল তার মদীনায় ঢোকার অজুহাত মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সত্যি করে বলো, কেন তুমি এসেছ?'

উমায়ের জোর দিয়ে বললো সে তার ছেলেকে মুক্ত করতেই এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে তুমি তরবারী কেন বহন করছ?' উমায়ের জবাব দিল, 'চুলোয় যাক এই তরবারি! এই তরবারি আমাদের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনেনি!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'না, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি এসেছ আমাকে হত্যা করতে। তুমি কাবার পাশে বসে সাফওয়ানের সাথে পরামর্শ করেছো। তুমি তাকে বলেছো যে, যদি তুমি ঋণে জর্জরিত না হতে, তোমার বাচ্চাকাচ্চাকে দেখাশোনা করতে না হতো, তাহলে তুমি আমাকে হত্যা করতে। এরপর সাফওয়ান তোমাকে বলেছে, 'যদি তোমার কিছু হয়, তখন আমি তোমার দেনা শোধ করে দেব আর আমি তোমার বাচ্চাদের দেখাশোনা করব'। এরপর তুমি সাফওয়ানের সাথে এই মর্মে রাজি হয়েছ যে, তুমি এই ব্যাপারটি গোপন রাখবে এবং তুমি কাউকে এ কথা জানাবে না।'

উমায়ের বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল! সে বললো, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল! আর কেউ আমার ও সাফওয়ানের এই কথোপকথন আড়ি পেতে শুনেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আপনাকে এই কথোপকথনের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমাদের এই ভাইকে তোমরা সাহায্য করো। তাকে কুরআন শিক্ষা দাও এবং তার ছেলেকে মুক্ত করে দাও।' এভাবে উমায়ের ইবনে ওয়াহাব মুসলিম হয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন।

ওদিকে সাফওয়ান মক্কার লোকেদের আশ্বস্ত করছিলেন, 'শীঘ্রই তোমরা এমন খবর শুনবে যা তোমাদেরকে বদরের দুঃখ ভুলিয়ে দেবে।' কিন্তু সাফওয়ানের আশায় গুড়েবালি ঢেলে দিয়ে উমায়ের ইবনে ওয়াহাব মক্কায় ফিরে ইসলামের ঘোষণা দিলেন। সাফওয়ান প্রচণ্ড রেগে গেল। সে পণ করলো আর কখনো উমায়েরের সাথে কথা বলবে না। উমাইর ইবনে ওয়াহাব, যিনি কুরাইশদের মধ্যে একজন খুব জঘন্য ধরনের লোক ছিলেন, তিনিই তখন ইসলামের একজন দাঈতে পরিণত হলেন, মুসলিমদের উপর নিপীড়ন করার পরিবর্তে এবার তিনি সেসব মানুষকে পীড়া দিতে থাকলেন যারা মুসলিমদের পীড়া দিত। অনেক লোক উমাইর ইবনে ওয়াহাবের দাওয়াতের ফলে মুসলিম হয়েছিল।[115]

বদর যুদ্ধের শিক্ষা

প্রথমত, বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।
বিজয়ের পর সাধারণত সৈন্যরা তাদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, সাহসিকতা নিয়ে গর্ববোধ করে। কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কখনোই মুসলিমদের বিজয়ের জন্য তাদের প্রশংসা করেননি।

---

[115] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪২।

> "(আসলে) এ সংখ্যাটা (বলে) আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে একটি সুসংবাদ দিয়েছেন, (নতুবা বিজয়ের জন্য তো তিনি একাই যথেষ্ট, আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন) যেন এর ফলে তোমাদের মন (কিছুটা) প্রশান্ত (ও আশ্বস্ত) হতে পারে, আর সাহায্য ও বিজয়। সে তো পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে, তিনিই সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১২৬)

> "(যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে) তাদের তোমরা কেউই হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তাআলাই তাদের হত্যা করেছেন, আর তুমি যখন (তাদের প্রতি) তীর নিক্ষেপ করছিলে, (মূলত) তুমি নিক্ষেপ করোনি বরং করেছেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং।" (সূরা আনফাল, ৮: ১৭)

সুতরাং কৃতিত্ব কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য কঠিন কাজকে সহজ করে দেন। নিজ যোগ্যতায় মুসলিমরা বদরে বিজয়ী হয়নি, বরং আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করেছেন। জীবনের যেকোনো অর্জন - হোক তা ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা কিংবা দাঈ হিসেবে সফলতা, শুধুমাত্র আল্লাহ তাওফীক্ব দেন বলেই তা সম্ভব হয়।

> "স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে কম, এই যমীনে তোমাদের মনে করা হতো তোমরা অত্যন্ত দুর্বল, তোমরা সর্বদাই এ ভয়ে থাকতে যে, কখন (অন্য) মানুষরা তোমাদের ওপর চড়াও হবে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র রিযক দান করেছেন। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।" (সূরা আনফাল, ৮: ২৬)

আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের তাদের আগের অবস্থা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা ছিল সংখ্যায় কম, নিপীড়িত এবং ভীতসন্ত্রস্ত। কিন্তু আল্লাহ তাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন ও সবকিছুর যোগান দিয়েছেন। বদরে অনেকগুলো আলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। যেমন:

সৈন্যের সংখ্যা কম দেখা।

যুদ্ধের আগে বৃষ্টি।

যুদ্ধের আগের রাতে মুসলিমদের শান্তিপূর্ণ ঘুম।

ফেরেশতাদের অবতরণ।

উমাইয়্যা নিহত হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর ﷺ ভবিষৎবাণী ফলে যাওয়া।

উকাশাহ ইবন মিহযানের তরবারি যুদ্ধে ভেঙ্গে যায়, পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাঠের গুড়িকে সত্যিকারের তরবারিতে পরিণত করেন।

কাফির নেতৃবৃন্দের মৃত্যু – যুদ্ধের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে রেখেছিলেন, 'এই জায়গায় অমুক মারা যাবে। ওই জায়গায় তমুক মারা যাবে।' তিনি যেসব জায়গায় যাদের মৃত্যু হবে বলে দিয়েছিলেন, ঠিক সে সে জায়গায় তাদের মৃত্যু হয়।

কাতাদা ইবনে নোমান যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর একটি চোখ কোটর থেকে বের হয়ে ঝুলতে থাকে। সাহাবারা ﷺ সেটা কেটে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের তা করতে মানা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ঝুলে থাকা চোখটি হাতে নিয়ে কোটরের ভিতর আবার বসিয়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। কাতাদা বলেন, 'ওই ঘটনার পর থেকে সেই চোখে আমি অন্য চোখ থেকেও ভালো দেখতে পেতাম।'

আল-আব্বাসের অর্থ-সম্পদ কোথায় আছে সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর ﷺ ওয়াহী মারফত জেনে যাওয়া।

ওয়াহাব ইবনে উমায়েরের গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে যাওয়া।

বদরের যুদ্ধের এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল আল্লাহর ইচ্ছায়। প্রতিটি ঘটনাই অলৌকিক। কুরআন ছাড়াও রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে অনেক মু'জিযা ছিল। সেগুলো বেশিরভাগই ঘটেছিল জিহাদের সময়ে। আল্লাহ তাআলার বেশিরভাগ আউলিয়ার 'কারামত' ঘটে জিহাদের সময়ে।

দ্বিতীয়ত, বদরের যুদ্ধের সৈনিকরা ঈমানকে নিজের পরিবার অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নিজ পরিবারের কাফির সদস্যদের চেয়ে তাঁরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিন ভাইদের বেশি আপন করে নিয়েছিলেন । তাঁরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছিলেন এবং কুফরির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন।

বদর যুদ্ধে আবু বকর ﷺ ছিলেন মুসলিমদের পক্ষে। তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান ছিল কুফফারদের পক্ষে। এই ঘটনার পরের কথা। আব্দুর রাহমান তাঁর বাবাকে বললেন, 'বাবা, আমি আপনাকে বদরের দিনে ময়দানে দেখেছিলাম। কিন্তু আমি আপনাকে এড়িয়ে গেছি, কারণ আমি আপনাকে আক্রমণ করতে চাইনি।' আবু বকর ﷺ বললেন, 'সেদিন আমি তোমাকে দেখিনি, তবে যদি দেখতাম, আমি তোমার পিছু নিতাম এবং তোমাকে হত্যা করতাম।' আবু বকর ﷺ নিজ ছেলের সাথে যুদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। ঈমানের মূল্য রক্তের সম্পর্ক থেকেও দামি। তাই তিনি নিজের ছেলেকে আল্লাহর জন্য হত্যা করতে চেয়েছিলেন।

'তার হাত ভালো করে বাঁধো, দড়ির বাঁধন শক্ত করো। তার মা বেশ ধনী। তিনি তার ছেলের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দেবেন।'

এ কথাগুলো বলেছিলেন মুসআব ইবনে উমাইর। তাঁর ভাই আবু আযীয ছিল কুরাইশদের পক্ষে। যুদ্ধে আবু আযীয বন্দী হয়, আনসাররা তাকে বেঁধে রেখেছিল। বন্দী আবু আযীযের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মুসআব আনসারদেরকে এই

কথাগুলো বলেন। আবু আযীয অবাক হয়ে গেল এই ভেবে, কীভাবে একজন মানুষ তার ভাইকে শক্ত করে বাঁধা আর মুক্তিপণ চাওয়ার কথা বলতে পারে!

আবু আযীয বললো, 'ভাই! তুমি আমার সাথে এমন আচরণ করলে!' মুসআব বললেন, 'ভাই হিসেবে সে তোমার চেয়ে আমার বেশি আপন।' – তিনি ইঙ্গিত করলেন সেই আনসারের দিকে যে আবু আযীযকে ধরে রেখেছে, 'এরাই হলো আমার সত্যিকারের ভাই, তুমি নও। ইসলামের কারণে আজকে এরা আমার ভাই। যদিও তুমি আমার রক্তের ভাই কিন্তু তোমার কুফরি আমাদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।'

কুরাইশদের মধ্যে কিছু তরুণ ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ কুরাইশদের বিখ্যাত পরিবারের সন্তান। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালো জানতেন। সাধারণত তরুণরা একটু অন্যরকম হতে পছন্দ করে। প্রায়ই তারা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে যেতে চায়। এদের মধ্যে ছিল আলী ইবন উমাইয়া ইবন খালাফ, আবুল ক্বায়েস ইবন আল-ওয়ালিদ ইবন মুঘিরা, আবু ক্বায়েস ইবন ফাকিহ, আল-হারিস ইবন জামা'আ, এবং আল-আউস ইবন মুন্নাব্বিহ – এরা সকলেই ছিল ধনী কুরাইশ পরিবারের সন্তান। তারা মুসলিম হয়েছিল, কিন্তু ইসলামের জন্য কোনো প্রকার ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে রাজি ছিল না। তাই তারা মক্কায় রয়ে যায়, মদীনায় হিজরত করেনি। এরা ছিল বিগড়ে যাওয়া তরুণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা হিজরত করেনি। বলা চলে তারা হিজরতের 'ঝামেলায়' যেতে রাজি হয়নি। শুধু তাই নয়, তারা তাদের বাপ ও তাদের গোত্রদের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়।

ইবনে হিশাম বলেন, 'তারা সকলেই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়।' এরা সকলে কিন্তু মুসলিম ছিল। হয়তো তারা যুদ্ধে অংশ নিতে চায়নি, কিন্তু তাদের পরিণতি ছিল অবমাননাকর মৃত্যু।

ইসলাম মানে কেবল কালিমা পাঠ নয়, ইসলামের সাথে জড়িয়ে আছে ত্যাগ স্বীকার। নামকাওয়াস্তে মুসলিমের সাথে সত্যিকারের মুসলিমদের পার্থক্য এই যে, সত্যিকারের মুসলিমরা ইসলামের খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। এই মুসলিমরা, যারা বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সাথে এসেছিল, হয়তো তারা নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে যুদ্ধে এসেছিল, হয়তো তারা মুসলিমদের লক্ষ্য করে একটি তীরও ছোঁড়েনি, তরবারি চালায়নি। কিন্তু এদের ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেছেন?

> "নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম, কতো নিকৃষ্ট সে আবাস!" (সূরা আন-নিসা, ৪: ৯৭)

ইসলাম অবহেলা বা হেলাফেলা করার দ্বীন নয়। ঢিলেঢালে ইসলাম পালন করলে এর কোনো মূল্য ইসলামে নেই। ইসলাম গুরুত্বের সাথে নেওয়ার দ্বীন। এটা পার্ট-টাইম চাকরির মতো নয়, কিংবা এমন নয় যে যখন খুশি করলাম আর মন-না-চাইলে ছেড়ে দিলাম। এই ধরনের ধর্মকর্মের স্থান ইসলামে নেই। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল যে জান্নাতের অঙ্গীকার দিয়েছেন, সে জান্নাতের জন্য কষ্ট করতে হবে।

ইবনে আব্বাস এ আয়াতের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, 'মুশরিকদের সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের সাথে কিছু মুসলিম বদরে যোগ দিয়েছিল। তাদের কেউ নিহত হয়েছে মুসলিমদের ছোঁড়া তীরে, কেউ নিহত হয়েছে মুসলিমদের তরবারিতে, তাই আল্লাহ সূরা নিসার এই আয়াতটি নাযিল করেছেন।'

এই আয়াতে মক্কায় পড়ে থাকা এইসব নামকা ওয়াস্তে মুসলিমদের কথাই বলা হয়েছে। তাদের ইসলাম তাদের কোনো কাজে আসেনি। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাগ্যে জুটেছে জাহান্নামের আগুন। কেননা তারা হিজরত করেনি।

তৃতীয়ত, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করেছিলেন, তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করেছিলেন। যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে ভালো স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন, তাদেরকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়েছিলেন। এই সবকিছুর পর তিনি তাঁবুর ভেতরে গিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। এটাই হলো তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের অর্থ হলো দুনিয়াবী সকল উপায়ে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জালের উপর ভরসা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাধ্যমতো সবধরনের প্রস্তুতিই নিয়েছিলেন। এরপর তিনি আল্লাহ আযযা ওয়া জালের কাছে দুআ করা আরম্ভ করেছিলেন।

একবার কিছু লোক অলসভাবে হাঁটছিল আর এমন ভাব করছিল যেন তারা যুহদ করছে। উমার ইবন খাত্তাব ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কারা?' তারা বললো, 'আমরা মুতাওয়াক্কিলুন।' আল্লাহর উপর যারা তাওয়াক্কুল করে তাদের বলা হয় মুতাওয়াক্কিলুন । উমার ﷺ এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে লাঠি দিয়ে পিটুনি দিয়ে বললেন, 'তোমরা কি জানো না যে, আকাশ থেকে স্বর্ণ ও রুপার বৃষ্টি বর্ষণ হয় না? যাও, তোমরা কাজ করে খেতে শেখ।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যদি তোমরা আল্লাহর উপর সঠিক ভাবে তাওয়াক্কুল কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের পাখির মতো রিযিক প্রদান করবেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং বিকেলে ভরপেটে বাড়ি ফিরে।' পাখিরা বাসায় বসে থাকে না। তারা কাজ করতে বেরিয়ে যায় আর খাবার খুঁজে নেয়। তাই তাওয়াক্কুলের মধ্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। কেউ চেষ্টা না করে এই দাবি করতে পারবে না আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি। যদিও চেষ্টাই সবকিছু নয়, চেষ্টার উপর ভরসা করা যাবে না। নিজের বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা অথবা দুনিয়ার কোনো কিছুর উপর

নির্ভর করা চলবে না, ভরসা ও নির্ভরতা কেবল আল্লাহর উপর। তাই শুধু নিজের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করা কিংবা চেষ্টা না করে শুধু দুআ করা- দুটিই প্রান্তিকতা এবং বর্জনীয়। চেষ্টা এবং তাওয়াক্কুল – দুটিই একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ছয় বছর পর...

রাসূল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করছেন বিজয়ী হয়ে। তাঁকে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে না, জাতীয় সঙ্গীত বাজছে না, নেই কোনো লাল গালিচা, আর তাঁর মাঝেও নেই কোনো অহংকারের ছাপ। তিনি বুক উঁচু করে, অবনত মস্তকে, আল্লাহর প্রতি বিনম্র চিত্তে সেখানে প্রবেশ করছেন। তিনি উটের পিঠে, ঢোকার সময় তিনি আল্লাহর কাছে সাজদারত, তিনি এতটাই নীচু হয়ে আছেন যে তাঁর দাড়ি উটের সাথে লেগে আছে। তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য নেই, আছে নম্রতা, নেই উত্তেজনা, আছে সাকিনাহ, প্রশান্তি।

এভাবেই কাবাঘরের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর চারিদিক ঘিরে অসংখ্য মানুষ। মক্কার জনতার চোখেমুখে বিস্ময়, ভয়, কৌতূহল! তাদের ভাগ্য নির্ভর করছে একটি মানুষের সিদ্ধান্তের উপর – সেই মুহাম্মাদ ﷺ, যাকে তারা অপমান করেছে, দিনের পর দিন অভুক্ত রেখেছে, দেশছাড়া করে ছেড়েছে – আজ তিনিই বীরের বেশে নেতা হয়ে ফিরে এসেছেন নিজের ঘরে। কুরাইশের লোকেরা আজ তাঁর তরবারীর নীচে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন,

- তোমাদের কী ধারণা? আজ তোমাদের সাথে আমি কেমন ব্যবহার করবো?
- আপনার কাছ থেকে এক মহৎ ভাইয়ের মতো আচরণ আশা করি।

রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সেটাই বলব যা ইউসুফ তাঁর ভাইদের বলেছিলেন, লা তাসরীবা 'আলাইকুমুল ইয়াওম - আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত, স্বাধীন।

মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে কীভাবে এই বিশাল পরিবর্তন রচিত হলো? মক্কার মেষ চরানো এক যুবক হয়ে গেলেন অসাধারণ এক নেতা, আরবের অধিপতি, সাহাবীদের ﷺ কাঙ্ক্ষিত আশ্রয়। মৃত্যুর পরেও যাঁর ছায়া আমাদেরকে আগলে রেখেছে। কী ছিল সেই মহান পুরুষের যাত্রা, প্রতিকূলতা ও সংগ্রাম? উত্তরগুলো পরবর্তী পর্বে সম্পূর্ণতা পাবে ইন শাআল্লাহ। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে তাঁর জীবনের বাকি অংশের কাহিনি। রাসূলুল্লাহর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, আমীন!

[পরবর্তী খণ্ডে সমাপ্য, ইন শা আল্লাহ]

রেইনড্রপস মিডিয়া

'আমার উম্মতের উদাহরণ হচ্ছে বৃষ্টির মতো'

রেইনড্রপস এর প্রকাশিত অন্যান্য বই:

- ❖ প্রাচীর
- ❖ সীরাহ শেষ খন্ড

অডিও লেকচার সিরিজ:

- ❖ পরকালের পথে যাত্রা
- ❖ পথিকৃৎদের পদচিহ্ন: নবীদের জীবন

চিরকুট ভিডিও:

- ❖ রামাদানের চিঠি

আমি তাঁকে দেখেছি, উজ্জ্বলদীপ্ত চেহারা; সুন্দর তাঁর গড়ন, সুদর্শন তাঁর মুখশ্রী, ছিপছিপে তাঁর শরীর। মাথাটা খুব ছোট নয়, বরং দেখতে তিনি অভিজাত এবং সুপুরুষ। চোখদুটো তাঁর ঘনকালো, পাঁপড়িগুলো টানাটানা। বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর চেহারা, ভরাট তাঁর কণ্ঠস্বর। ভ্রু-যুগল উঁচু আর ধনুকের মতো বাঁকানো, চুলগুলো পরিপাটি। তাঁর গ্রীবা বিস্তৃত এবং দাড়ি বেশ ঘন। তাঁর গাম্ভীর্য তাঁর আত্মমর্যাদা প্রকাশ করে, তাঁর কথা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। তাঁর কথাগুলো মনোমুগ্ধকর আর দৃঢ়, চটুল কিংবা ফেলনা নয়। তাঁর প্রতিটি শব্দ যেন সুতোয় বাঁধা মুক্তোর মতো স্পষ্ট। দূর থেকে তাঁকে দেখতে যেমন উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয়, কাছ থেকে দেখলেও তাঁকেই সবচেয়ে সুদর্শন লাগে। উচ্চতায় তিনি মাঝারি। খুব লম্বাও নন আবার খাটোও নন। বাকি দুইজনের মাঝে তিনি উঁচু বৃক্ষের শাখার মতো, তবে তিনজনের মাঝে তিনিই সবচে সুন্দর। তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যখন কথা বলতেন, তারা মন দিয়ে শুনতো, তিনি যখন কিছু আদেশ দিতেন তা পালন করতে তারা ছুটে যেতো। তিনি কখনও মুখ গোমড়া করেননি। আর কেউ একবারও তাঁর কথার বিরোধিতা করেনি।